



দ্য চিটাগং ইউনিভার্সিটি
জার্নাল অব আর্টস অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ



**THE CHITTAGONG UNIVERSITY
JOURNAL OF ARTS AND HUMANITIES**

সংখ্যা ৩৬ ২০২০ * Vol. XXXVI 2020



দ্য চিটাগং ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ

**THE CHITTAGONG UNIVERSITY
JOURNAL OF ARTS
AND HUMANITIES**

**কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ
Faculty of Arts and Humanities**

Vol. XXXVI, 2020, Published in November 2024
সংখ্যা ৩৬, ২০২০ নভেম্বর ২০২৪-এ প্রকাশিত

Published by
Registrar
University of Chittagong

Copyright:
University of Chittagong

Printed by:
MAA Art Press

Cover Design:
Uttam Kumar Barua

Price
Tk. 600.00
US \$ 20.00

ISSN 1993-5536

This journal is an official publication of the Faculty of Arts and Humanities, University of Chittagong. Opinions expressed in the essays are authors'; they do not reflect the views either of the editor or of the university.

দ্য চিটাগং ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ

সংখ্যা ৩৬, ২০২০

নির্বাহী সম্পাদক

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মাহবুবুল হক

সম্পাদনা পর্ষদ

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আনোয়ার সাঈদ, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর মাহ-এ-নূর কুদ্দসী ইসলাম, ইংরেজি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর মোহাম্মদ জমালুল আকবর চৌধুরী, ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. মো. কোরবান আলী, দর্শন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ বশির আহাম্মদ, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ড. মোহাম্মদ আমির হোসাইন, সহযোগী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন কাদেরী, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

জনাব ইব্রাহিম হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক, আই.এম.এল, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. কুস্তুল বড়ুয়া, নাট্যকলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ড. নিত্যানন্দ গাইন, সহযোগী অধ্যাপক, চারুকলা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ড. মো. নূরে আলম, সহযোগী অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

জনাব শাসনানন্দ বড়ুয়া রূপম, সহযোগী অধ্যাপক, পালি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

জনাব রাজপতি দাশ, সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ড. গোলাম মহিউদ্দিন, অধ্যাপক, আই.ই.আর. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মাহবুবুল হক, সভাপতি, বাংলাদেশ স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

The Chittagong University Journal of Arts & Humanities

Volume XXXVI, 2020

Executive Editor

Dr. Mohammad Mahbubul Hoque

Members:

Professor Dr. Mohammod Anowar Sayed, Department of Bangla

Professor Mah-E-Nur Qudsi Islam, Department of English

Professor Mohammad Jamalul Akbar Chowdhury, Department of History

Professor Dr. Md. Korban Ali, Department of Philosophy

Professor Dr. Mohammad Bashir Ahamed, Department of Islamic History & Culture

Dr. Md. Amir Hossain, Associate Professor, Department of Arabic

Professor Dr. Mohammed Mamtaz Uddin Qaderi, Department of Islamic Studies

Mr. Ibrahim Hossain, Associate Professor, Institute of Modern Languages

Professor Dr. Kuntal Barua, Department of Dramatics

Dr. Nityananda Gaine, Associate Professor, Institute of Fine Arts

Dr. Mohammad Noor-e-Alam, Associate Professor, Department of Persian Language & Literature

Mr. Shasananda Barua Rupan, Associate Professor, Department of Pali

Dr. Rajpati Das, Associate Professor, Department of Sanskrit

Professor Dr. Golam Mohiuddin, Institute of Education & Research

Professor Dr. Mohammad Mahbubul Hoque, Chairman, Department of Bangladesh Studies

সম্পাদকীয়

কলা ও মানববিদ্যা অনুষদের জার্নাল হিসেবে বর্তমান সংখ্যাটি ৩৬তম। বাংলা, ইংরেজি, আরবি ও ফারসি ভাষায় রচিত মোট ২৩টি প্রবন্ধ এখানে স্থান পেয়েছে। ইতিহাস, ভাষা ও সাহিত্য, নাট্যকলা ও চারুকলা এবং ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের নানাবিধ বিষয়ে প্রবন্ধগুলো রচিত হয়েছে।

জার্নাল প্রকাশের দীর্ঘ জট নিরসনের লক্ষ্যে ডিনের দায়িত্ব পালনকালে (২০২২-২০২৪) অনুষদ জার্নালের মোট ৬টি সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বক্ষ্যমাণ সংখ্যাটি ৯৯তম অনুষদ সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে আমার সম্পাদনায় তৃতীয় অনলাইন (www.jah.cu.ac.bd) সংস্করণসহ প্রকাশিত হলো।

১৯৮৬ সালে থেকে MLA style manual অনুযায়ী জার্নাল প্রকাশের সিদ্ধান্ত ছিল; কিন্তু তা করা যায়নি; ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধে ভিন্ন ভিন্ন style অনুসরণ করা হয়েছে। অনুষদ অফিসে সংরক্ষিত MLA style manual অনুসরণ করে ৩৫তম সংখ্যাটি প্রকাশ করা হয়েছিল; ওইটি ছিল পুরাতন সংস্করণ। বর্তমান সংখ্যাটি MLA style manual সর্বশেষ সংস্করণ অনুযায়ী প্রকাশিত হলো। MLA style manual অনুসরণের ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধান করেছেন ইংরেজি বিভাগের প্রফেসর ড. সরওয়ার মোরশেদ এবং অনুষদের ইংরেজি শিক্ষক জনাব সারজানা আক্তার (সহকারী অধ্যাপক) ও জনাব নৈরঞ্জনা চাকমা (প্রভাষক); তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

জার্নাল প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পাদনা পরিষদের সম্মানিত সদস্যগণের যথাযথ সহযোগিতা পেয়েছি। তাঁদের পরামর্শ অনুযায়ী প্রবন্ধ প্রকাশের প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে। আমি প্রবন্ধ মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ সদস্যদের ধন্যবাদ জানাই। জার্নাল প্রকাশের কাজ এগিয়ে নেওয়ার জন্য আরবি বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শাযাআত উল্লাহ ফারুকী ও ইংরেজি বিভাগের জনাব গোলাম হোসেন হাবীব (জি এইচ হাবীব)-এর সহযোগিতা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করছি।

যথেষ্ট সতর্কতা সত্ত্বেও কিছু মুদ্রণ প্রমাদ রয়ে গেছে। এ জন্য আমি সম্পাদনা পরিষদের পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশ করছি। আশা করি, ভবিষ্যতে জার্নাল যথাযথভাবে প্রকাশিত হবে।



১৩/১১/২০২৪

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মাহবুবুল হক

নির্বাহী সম্পাদক

দ্য চিটাগং ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ, ৩৬তম সংখ্যা, ২০২০

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

দ্য চিটাগং ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ
The Chittagong University Journal of Arts and Humanities

সংখ্যা ৩৬, ২০২০ নভেম্বর ২০২৪-এ প্রকাশিত Vol. XXXVI, 2020, Published in November 2024

সূচিপত্র:	পৃষ্ঠা
নীতিশিক্ষার গুরুত্ব: প্রসঙ্গ ব্যক্তি ও সমাজ জীবন	১-১৬
ড. এফ. এম. এনায়েত হোসেন	
দাওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে 'হিকমত' অবলম্বনের তাৎপর্য: একটি প্রায়োগিক বিশ্লেষণ	১৭-৩৪
ড. মুহাম্মদ নূরুল আমিন নূরী	
বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ২০২০ সালে প্রকাশিত বাংলাগ্রন্থের শিরোনাম পর্যবেক্ষণ ও শ্রেণিকরণ	৩৫-৫২
ড. মোহাম্মদ নেয়ামত উল্লাহ ভূঁইয়া	
আরবি নাট্যসাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ: একটি পর্যালোচনা	৫৩-৬৬
ড. মোহাম্মদ আমির হোসাইন	
তারাক্ষরের ছোটগল্পে তন্ত্র ও তাত্ত্বিকসাধনা	৬৭-৭৬
ড. শিপক কৃষ্ণ দেব নাথ	
বৌদ্ধ দর্শনে কর্মতত্ত্ব এবং প্রাত্যহিক জীবনে কর্মের প্রভাব	৭৭-৯০
ড. সুদীপ্তা বড়ুয়া	
স্যার সাইয়েদ আহমদ খান ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদের ভাবনায় প্রাচ্যবিদদের চিন্তাদর্শন	৯১-১০৪
ড. মুহাম্মদ শফিউল্লাহ কুতুবী	
আলমগীর কবিরের ধীরে বহে মেঘনা চলচ্চিত্রে মুক্তিযুদ্ধ	১০৫-১১৬
ড. মো: মোরশেদুল আলম	
বৌদ্ধ দর্শনের কার্য-কারণ-তত্ত্বের স্বরূপ ও প্রাসঙ্গিকতা: একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ	১১৭-১৩৪
শাসনানন্দ বড়ুয়া রূপন	

নিজামি গাঞ্জুবি ও তাঁর পঞ্চরত্ন ড. আব্দুল করিম	১৩৫-১৪৪
ব্রিটিশ শাসনামলে পূর্ব বাংলার প্রশাসনিক বিন্যাস (১৭৯৩-১৯৪৭): কিছু পর্যবেক্ষণ ড. রওশন আরা আফরোজ	১৪৫-১৫৪
বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা: সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম মো: জাকির হোসেন	১৫৫-১৬৬
ইসলামে আত্মোন্নয়ন: পথ ও পদ্ধতি ড. মুহাম্মদ এনামুল হক	১৬৭-১৮৪
আল-কুরআনের নামসমূহ ও নামকরণের কারণ: তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ড. মুহাম্মদ মানজুরুর রহমান	১৮৫-২০৪
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নৈতিক শিক্ষা: কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির যোগ রীতা রানী ধর	২০৫-২১৮
আমির খসরুর পাণ্ডুলিপি: তথ্যানুসন্ধান ও সমীক্ষা আলতাফ হোসেন	২১৯-২৩০
বাংলা সনেটের রূপ-রীতি ও উত্তরাধিকার কাইছার উদ্দিন (কাইছার কবির)	২৩১-২৪৬
Theory of Knowledge and Liberation in Nyāya Rajpati Das	২৪৭-২৫৬
Construction of Place in the Land of “The Handsomest Drowned Man in The World” Sarjana Akter	২৫৭-২৬২
أنس بن مالك رضي الله عنه: حياته ومساهمته في الحديث (আনাস ইবন মালিক (রা.): জীবনী ও হাদীসে তাঁর অবদান) ড. আ.ম. কাজী মুহাম্মদ হারুন উর রশীদ	২৬৩-২৮০

أهمية الوحدة والترابط في القصيدة: دراسة نقدية

২৮১-২৯২

(ক্বাসিদায় অর্থের সঙ্গতি ও ঐক্যের গুরুত্ব: একটি সমালোচনামূলক অধ্যয়ন)

ড. মুহাম্মদ জুনাইদুল ইসলাম

حياة محمد حسين هيكل: مساهمته في الأدب والرواية

২৯৩-৩১০

(মুহাম্মদ হুসাইন হায়কল-এর জীবনী: সাহিত্য ও উপন্যাসে তাঁর অবদান)

ড. হুমায়ুন কবির

استراتژی‌های داستان پردازی در گلستان شیخ سعدی

৩১১-৩২২

(শেখ সাদীর গুলিস্তানে গল্প বলার কৌশল)

ড. মো. নূরে আলম

নীতিশিক্ষার গুরুত্ব: প্রসঙ্গ ব্যক্তি ও সমাজজীবন

ড. এফ. এম. এনায়েত হোসেন *

প্রতিপাদ্যসার: সাম্প্রতিককালে নীতিবিদ্যার আলোচনার পরিধি কেবল তাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক নীতিবিদদের আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বরং ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক নীতিবিদ্যার আলোচনা ক্ষেত্রবিশেষ একাডেমিক পরিসরের গণ্ডি পেরিয়ে ব্যবহারিক জীবনে তা অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। রাষ্ট্র, সমাজ, সরকার, রাজনীতি, জনজীবন- এসবের মতো প্রকৃতিও নিয়তই পরিবর্তিত ও বিকশিত হচ্ছে। মানুষ তার ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা দ্বারা পৃথিবীকে আরও অনেক সমৃদ্ধ ও সুন্দর করে তুলছে। মানুষের জীবনে আছে অন্তহীন সম্ভাবনা, সম্ভাবনা বাস্তবায়নের পথও আছে অধিক প্রসারিত। সে পথে চলতে হলে রাষ্ট্রব্যবস্থার সর্বাঙ্গকরণে নীতিশিক্ষার প্রয়োগ ঘটাতে হবে। পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রেই বিবেকবান চিন্তাশীল ব্যক্তিদের অপরিহার্য কর্তব্য হলো উন্নততর নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বিশ্বব্যবস্থার রূপ ও প্রকৃতি নিয়ে চিন্তা করা এবং তার জন্য যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক আন্দোলন (Logical and Intellectual movement) গড়ে তোলা। ন্যায়-নীতি অবলম্বন করে দুর্নীতি সমস্যার সমাধান করে সমাজের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতির মধ্যে মানুষ কীভাবে অধিকতর ভালো জীবন যাপন করতে পারে, তা উদ্ঘাটন করাই একজন নীতিবান ব্যক্তি এমনকি শাসকের মূখ্য কাজ। এছাড়াও, জীবিকা অর্জন ও আর্থ-সামাজিক সমস্যার যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক সমাধানও নীতিশিক্ষার অওতাভুক্ত। ন্যায়নীতি অবলম্বন করে জীবনযাপনে ব্যক্তি মানুষ সময়ে সময়ে ব্যর্থ হয় বটে, কিন্তু তারপরও ন্যায়নীতির প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাশীল থাকার প্রয়োজনীয়তা নীতিশিক্ষার গুরুত্বকে আরও অধিক বাড়িয়ে তুলছে। জীবনযাত্রার ও শিক্ষার মধ্য দিয়ে মানুষ যেমন নিজেকে এবং নিজের পরিবেশকে সুন্দর, সমৃদ্ধ ও উন্নত করার চেষ্টা করে তারই মধ্যে নিহিত থাকে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি; যা মানুষকে সৎ, আদর্শ ও নীতিবান হতে সহায়তা করে (রহমান ৯-১৩)। স্বাভাবিক জীবনযাত্রার এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কাজকর্মের মধ্য দিয়ে মানুষের সুন্দর হবার ও সুন্দর করার, সমৃদ্ধ হবার ও সমৃদ্ধ করার এবং উন্নত হবার ও উন্নত করার যে ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা তাই হলো ব্যক্তির জীবনদর্শন। আর, এর মধ্য দিয়ে কীভাবে ব্যক্তি ও সমষ্টির কর্মোন্দিয়, জ্ঞানোন্দিয়, অন্তঃইন্দ্রিয়সহ পরিবেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রের সংস্কার, রূপান্তর ও নবজন্ম ঘটে তা এ প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে।

১.১ ভূমিকা:

ব্যক্তির জীবনমান উন্নয়নের সাথে সাথে নৈতিক মান উন্নয়ন করাও একান্ত জরুরি। এক্ষেত্রে শিক্ষার প্রতিটি স্তরে নীতিশিক্ষার গুরুত্বকে বিবেচনায় নেয়া শিক্ষাবিদদের একান্ত কর্তব্য। মানুষ তার নিজস্ব মানবপ্রকৃতি দিয়ে কাজ করে। এখানে মানব প্রকৃতি বলতে মানুষের জীবতাত্ত্বিক দিকটির উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যা জৈব-দৈহিক প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত। অথচ, এই প্রবৃত্তিকে বিদ্যা-শিক্ষা অর্জনের মধ্য দিয়ে পরিবর্তন করা সম্ভব। এভাবে পরিবর্তনের দ্বারা মানুষের ব্যক্তিত্বকে নৈতিকভাবে গড়ে তোলার মধ্য দিয়েই মানুষ নৈতিক শিক্ষার বাস্তবায়ন ঘটায়। উল্লেখ্য, বর্তমানে অস্থিতিশীল বিশ্বের সকল মানুষ চায় স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা, শান্তি, সমস্যা থেকে মুক্তি, চায় সম্পদের সমবন্টন, সুবিচার ও আইনের শাসন। মানুষ আজ এমন একটি বিশ্ব চায় যেখানে থাকবে উন্নয়ন, কল্যাণ, প্রেম,

* অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

মানবতা, শান্তি, সৌন্দর্য ও আশীর্বাদ। দেশের মানুষকে আজ তাই নীতিশিক্ষার মৌলিক আদর্শ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আজকের দিনে মানুষ তাই অনুধাবন করছে যে, নীতিভিত্তিক শিক্ষাদর্শনই দিতে পারে জাতির কাক্ষিত মুক্তি। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষাগ্রহণ ব্যক্তির জীবন গঠনে বড় ভূমিকা রাখে। উল্লেখ্য, শুধু প্রচলিত শিক্ষা পরিপূর্ণ মানুষ হবার জন্য যথোপযুক্ত নয়, বরং এর জন্য প্রয়োজন অধিক নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ। বর্তমান সমাজব্যবস্থা অস্থিরতায় পরিপূর্ণ। খুন, গুম, ধর্ষণসহ নানা অপরাধ নিত্য-নৈমিত্তিক খবরের শিরোনাম হচ্ছে। কেন এই অবস্থা? অধঃপতন ঘটেছে আমাদের চরিত্রের; ধ্বংস হচ্ছে আমাদের মনুষ্যত্ববোধও। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যেমন নিরাপদ নয় আমাদের শিক্ষার্থীরা, তেমনি বাবা-চাচার কোলে নিরাপদ নয় সন্তানও। অন্ধকার যুগেও এ অবস্থা ছিল বলে মনে হয় না। অপরাধ করেও অপরাধীর কোনো অনুশোচনা নেই বরং হয়ে উঠছে আরও বেপরোয়া। আমাদের নৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থান একেবারে তলালিতে ঠেকেছে। ব্যক্তি ও সমাজজীবনের এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত নৈতিক শিক্ষার অনুশীলন যা এ প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও শিক্ষার্থীর নৈতিক মান উন্নয়নে জন্য এথিকস ক্লাব গঠন, সততার দোকানে ক্রয়-বিক্রয়, বিখ্যাত মনীষীর গল্প অধ্যয়ন করে নৈতিক চেতনা গ্রহণ এবং ক্ষেত্রবিশেষ দুর্নীতিবিরোধী শপথমালা আয়োজনের মধ্য দিয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নৈতিকভাবে শক্তিশালী করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

১.২. গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

যে শিক্ষার মধ্যে পর্যাপ্ত নৈতিকতার অভাব থাকে সে শিক্ষা সমাজের দীর্ঘমেয়াদী কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বয়ে আনে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিনিয়ত ধর্ষণ, খুন, গুম, সংঘর্ষসহ নানারকম সামাজিক অনাচার নির্মম নির্যাতনের কথা প্রায়শই শোনা যায়। এসব অনাকাঙ্ক্ষিত ঘণিত কর্মকাণ্ডকে দমন বা নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্র নানারকম উদ্যোগ অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও তা আশানুরূপ কমছে না। এর মূল কারণ হচ্ছে মানুষের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে নৈতিকতার বেশ অভাব। ধনসম্পদ, বিদ্যা তথা সামাজিক অবস্থান সবকিছু থাকা সত্ত্বেও মানুষের জীবন যদি সুনীতি দ্বারা চালিত না হয়, তাহলে অনেক অশুভ ঘটনাই মানুষ ঘটাতে পারে। এমনকি আইন প্রয়োগ করেও নীতিভ্রষ্ট মানুষকে সর্বদা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর হয় না। যে সমাজের সিংহভাগ মানুষের অন্তরে পর্যাপ্ত নৈতিক জ্ঞান অনুপস্থিত সেই সমাজে বৈষয়িক উন্নতি থাকা সত্ত্বেও কাক্ষিত শান্তি আসে না। নৈতিক চেতনা জাগ্রত না হলে মানুষ পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট কাজ করতে পারে। আর পশুবৃত্তি দ্বারা তাড়িত হয়ে মানুষ যখন কোনো কাজ করে তখন সেই সমাজকে নৈতিক সংকটপূর্ণ সমাজ বলা হয়। আমাদের দেশ শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য, অর্থনীতি, ক্রীড়া প্রভৃতি দিক থেকে প্রভূত অগ্রগতি লাভ করলেও নৈতিক দিক থেকে কাক্ষিত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে বলে মনে হয় না; বরং সমাজ দিন দিন নীতিহীনতার অন্ধ গলিতে নিপতিত হচ্ছে। এ সব থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় হলো নীতিশিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া। একথা অনস্বীকার্য যে, ব্যক্তির নৈতিকমান সুদৃঢ় হতে থাকে শৈশবকাল থেকেই। ফলে স্কুল পর্যায় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার প্রতিটি স্তরে নীতিশিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া জরুরি। একজন দর্শন অনুরাগী হিসেবে নীতিশিক্ষার ব্যবহারিক গুরুত্ব উপলব্ধি করে নীতিশিক্ষা কীভাবে আমাদের নৈতিক মূল্যবোধ, নৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন প্রভৃতিতে ভূমিকা রাখে তা উদঘাটন জরুরী বলে প্রস্তাবিত গবেষণা কাজে হাত দিই এবং ব্যক্তি ও সমাজজীবনে নীতিশিক্ষার গুরুত্ব মূল্যায়নে সচেষ্ট হই, যা এ প্রবন্ধের তাৎপর্যকে অর্থবহ করেছে। নৈতিক শিক্ষা বাস্তবায়নের ভিত্তি হবে কল্যাণমুখী কর্তব্যবাদ যা সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সাংগঠনিক, প্রাতিষ্ঠানিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের মধ্যে বিভিন্মরূপে প্রকাশ পায়। ব্যক্তি ও সমাজের নৈতিক অবক্ষয়রোধে এবং দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে নীতিশিক্ষার গুরুত্ব কতটুকু?

তাছাড়া আমাদের জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও দর্শনের বিশেষ অংশ হিসেবে নীতিশিক্ষার গুরুত্ব মূল্যায়নেরও প্রয়াস রয়েছে এ প্রবন্ধে।

১.৩. গবেষণা পদ্ধতি:

আলোচ্য প্রবন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য সংশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি (synthetic method), বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি (analytical method) ও ঐতিহাসিক পদ্ধতি (historical method) ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমে গবেষণা সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট বই, পুস্তক, জার্নাল, স্মারকগ্রন্থ, নৈতিক উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন নিবন্ধমালা ও বক্তৃতামালা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সংগৃহীত উপাত্ত বিশ্লেষণী পদ্ধতি (analytical method) এর সাহায্যে বিশ্লেষণ করে গবেষণা কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। তাছাড়াও, প্রবন্ধটিতে গুণগত (qualitative) পদ্ধতি অনুসরণেরও প্রয়াস রয়েছে।

১.৪. নীতিশিক্ষা ও সমাজজীবন

একটি সমাজের গঠন, প্রকৃতি, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের জীবতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার মাধ্যমে সামাজিক আচরণের প্রকৃতি নির্ভর করে। মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে সমাজ ছাড়া সে প্রকৃত জীবন-যাপন করতে পারে না। সামাজিক কর্মকাণ্ড ব্যতীত তার আচরণ মূল্যায়ন অর্থহীন। সমাজের বিধি-বিধানই তাকে সহজ-সরল নৈতিক জীবন-যাপনে অভ্যস্ত করে তোলে। ভালো কাজের পুরস্কার এবং মন্দ কাজের তিরস্কার সমাজেই করা হয়, কারণ মানুষ সমাজেরই অংশবিশেষ। সমাজ ছাড়া মানুষের সামাজিক জীবন ও নৈতিক আচরণ যেমন কল্পনা করা যায় না, তেমনি মানুষ ছাড়াও সমাজের কথা চিন্তা করা হবে অমূলক। তাই বলা যায়, নীতিশিক্ষা যেমন ব্যক্তির নৈতিক আদর্শকে প্রভাবিত করে তেমনি সমাজও উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে ব্যক্তির নৈতিক আদর্শ উন্নয়নে সহায়তা করে (Sidgwick ১০৫-১১১)। সমাজে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে স্বার্থসংশ্লিষ্ট নানা বিরোধ দেখা দেয় এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট জনসমষ্টি নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী কোনো না কোনোভাবে বিরোধের মীমাংসা করে। এভাবে স্বার্থে সংঘাত ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানের মধ্য দিয়ে মানুষের সামাজিক ইতিহাস বিকশিত হয়। এই প্রক্রিয়া কখনো শান্তিপূর্ণ আবার কখনো সংঘাতপূর্ণ হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, নীতিশিক্ষা ব্যক্তির নৈতিকমান উন্নত করে সমাজের অনিষ্টকর কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে বিরত রাখে এবং সে ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে প্রকৃতি ও সমাজকে প্রভাবিত করে আত্মশক্তিকেও ইচ্ছানুযায়ী পরিমার্জিত, পরিশীলিত ও উন্নত করতে পারে। প্রত্যেক জাতির অভ্যন্তরে জাতিগত স্বার্থসংশ্লিষ্ট নানা বিরোধ থাকে। সে বিরোধ মীমাংসা করে জাতিকে এগুতে হয়। যত দীর গতিতেই হোক, জেনারেশনের পর জেনারেশন ধরে উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে মানুষের নৈতিক চেতনা বিকশিত হয়। প্রাচীন, মধ্য এবং আধুনিকযুগে মানুষের নৈতিক চেতনা সমানভাবে বিকশিত না হলেও এ কথা অনস্বীকার্য যে, বর্তমান সময়ে নীতিশিক্ষার ব্যাপক প্রচার এবং প্রসার মানুষকে প্রশান্তি এনে দিচ্ছে যা ভুলার নয়।

মানুষের চেতনায় আর একটি শক্তির সন্ধান পাওয়া যায়, যাকে বলা হয় বিবেক। বিবেক হলো মানুষের চেতনার অন্তর্গত সেই শক্তি যা মানুষকে তাড়িত করে অসত্য, অন্যায়, অকল্যাণ, অপ্রেম, নিষ্ঠুরতা ও কুৎসিতের পথ পরিহার করে সত্য, ন্যায়, কল্যাণ, সম্প্রীতি ও সুন্দরের পথ ধরে চলতে শেখায়। বিবেক চালিত বিচারবোধই হলো নৈতিক চেতনা। বাস্তবের স্পর্শে আপন সভায় জাহ্নত প্রবৃত্তি, আবেগ, আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা, ক্ষোভ, ক্রোধ, লোভ, ভয় ইত্যাদি দ্বারা তাড়িত হয়ে মানুষ যখন কোনো কর্মে ধাবিত হয়, তখন সেই কর্মের ঔচিত্য-অনৈচিত্য, ভালো-মন্দ ফলাফল সম্পর্কে এবং উদ্দেশ্য সাধনের প্রকৃত উপায় সম্পর্কে তার মনে প্রশ্ন জাগে। প্রশ্নের পর উত্তর, উত্তরের পর প্রশ্ন, আবার উত্তর, আবার প্রশ্ন..... এভাবে চলতে চলতে একসময় হয় এর মীমাংসা। এ ধরনের প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্ন ও উত্তর-প্রতিউত্তরই হলো যুক্তি। যুক্তির মধ্য দিয়ে মানুষের নৈতিক চেতনা

বিকশিত হতে পারে। ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত জীবনে নানা পরিস্থিতিতে নানাভাবে মানুষকে যুক্তি অবলম্বন করে চলতে হয়। বিশ্বে অপশক্তির জন্য যারা মূল দায়ী তারাও তাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যুক্তি অবলম্বন করে। সমাজে অপশক্তির যুক্তি ও শুভমুক্তির যুক্তি ভিন্ন প্রকৃতির। যুক্তির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সিদ্ধান্তে অটল থেকে মানুষকে কাজ করতে হয়। তবে মানুষ যখন বদ্ধ, অচল, অন্ধ, বিকাশহীন বিশ্বাসে স্থিত হয়, তখন সে তার বিবেক ও যুক্তিবোধকে সচেতন চেষ্টা দ্বারা বিশ্বাসের অনুকূলে একমুখী করে তোলে; স্থান-কাল-পাত্রের পার্থক্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলে; তার নৈতিক চেতনা বিকারপ্রাপ্ত হয়। ফলে, বিশ্বজগত বিকাশমান থাকলেও তার নৈতিক চেতনা বিকাশহীন বিশ্বাসে বন্দি থাকে। গঠনমূলক-দৃষ্টিভঙ্গিহীন, বিচার-বিবেচনাহীন মুক্তবুদ্ধির চর্চা (nihilist exercise of free thinking) দ্বারা এ সমস্যার সমাধান হয় না। বরং, সার্বিক কল্যাণের জন্য যুক্তির পরিচায়ক হিসেবে নীতি-নৈতিকতার যথার্থ প্রয়োগ ও এর প্রয়োজন অপরিহার্যতায় রূপ নেয়।

নীতিশাস্ত্র কিছু স্বীকার্য সত্যের সন্ধান দিয়ে মানুষকে ন্যায় কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে ও অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখে। এভাবে মানুষ ন্যায়, সুন্দর, শুভ, শ্রেয় ও কর্তব্য নির্ধারণ করে মীমাংসায় পৌঁছার চেষ্টা করে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, গোষ্ঠীগত, দলীয়, প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক, জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নীতিশিক্ষাকে যথাসম্ভব পরিচালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ করে; যুক্তির দ্বারা আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে চিন্তা ও কাজ করার পদ্ধতিই হলো নৈতিক অনুশীলন (বেগম ১২-১৯)। ব্যক্তি জীবনের মতো সামষ্টিক জীবনেও নৈতিক অনুশীলন অপরিহার্য। ব্যক্তিগত সাফল্য, সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য আর্থ-সামাজিক- রাষ্ট্রীয় সকল কাজে নৈতিক অনুশীলনের কোনো বিকল্প নেই। বিবেকবান মানুষ কোনো অন্ধ বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করা কিংবা অন্যকে পরাজিত করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য নীতি-নৈতিকতাকে ব্যবহার করে না, বরং সমাজে যা কিছু সত্য, সুন্দর ও কল্যাণকর এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত প্রয়াসে ন্যায়, সুন্দর, শুভ কর্তব্য নির্ধারণ করা; প্রকৃষ্ট সাধন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা এবং তা অবলম্বন করে কর্তব্য সম্পাদন করে। মানুষের জেগে ওঠা চেতনায় নীতি-নৈতিকতা নামক যে প্রবণতা প্রকাশ পায় তাই মানুষকে চালিত করে ন্যায়, সুন্দর, শুভ ও কর্তব্যের পথে। স্বাভাবিক অবস্থায় নীতিশিক্ষা ব্যক্তির কর্মকাণ্ডের দিকনির্দেশক হিসেবে কাজ করে। সামাজিক, সাংগঠনিক, প্রাতিষ্ঠানিক, দলীয় প্রভৃতি সমষ্টিগত কর্মকাণ্ডে ক্রিয়াশীল থাকে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি যা নীতিশিক্ষা অধ্যয়নের মাধ্যমে জানা যায়।

১.৫. সমাজ, সংস্কৃতির উন্নয়নে নীতিশিক্ষা

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলনের সাথে নৈতিক উন্নয়ন আন্দোলনের বিষয়গুলোকে বিচারমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না যে, উন্নত জাতিসমূহের নৈতিক চেতনা ও নৈতিক বাস্তবতা তুলনামূলকভাবে অনুন্নত জাতির তুলনায় অনেক বেশি উন্নত। অবক্ষয়ক্রিষ্ট সমাজে দুর্নীতির সমস্যা সমাধানের জন্য নৈতিক জাগরণ ও রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন উন্নত করার প্রয়োজন সর্বমহলে স্বীকৃত। আর্থ-সামাজিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা উন্নত না করে কেবল দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রচারকার্য ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন দ্বারা সমাজের সামগ্রিক কাঠামোয় কোনো উন্নতি আদৌ হবে না। আইনের পরিবর্তন দ্বারা ন্যায়বোধকে সমাজের সর্বান্তকরণে জোরদার করতে হবে, অন্যায়কে বর্জন করতে হবে অর্থাৎ অন্যায় বন্ধ করতে হবে। এছাড়াও, অর্থনীতিবিদদের রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন কৌশল চিন্তায় নৈতিক উন্নয়নের বিষয়কে সক্রিয় বিবেচনায় রাখতে হবে। শোষিত-বঞ্চিত ও নির্যাতিত মুক্তিকামী মানুষ যদি স্থায়ী সামাজিক উন্নতি অর্জন করতে চায়, তাহলে তাদের ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত সকল কাজের মর্মস্থলে নৈতিক অনুশীলন বাড়াতে হবে। নৈতিক জাগরণই পারে ব্যক্তিকে, সমাজকে, রাষ্ট্রকে কলুষমুক্ত করে সমাজে শান্তির সু বাতাস বইয়ে দিতে। তাছাড়া, রাষ্ট্রে প্রচলিত সামাজিক ব্যাধি থেকে গণমানুষকে

মুক্তি দিতে হলে যেমন দীর্ঘমেয়াদি আর্থ-সামাজিক, রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা দরকার তেমনি দরকার তা প্রণয়নের জন্য ও তা বাস্তবায়নের জন্য উন্নত নৈতিক চেতনাসমৃদ্ধ দক্ষ জনবল, যা কেবলমাত্র উন্নত নৈতিক অনুশীলনের দ্বারাই সম্ভব। এক্ষেত্রে, দেশের সরকার ও রাষ্ট্র চিন্তাবিদদেরকে এগিয়ে আসতে হবে; রাষ্ট্রের সকল পরিকল্পনায় নীতি-নৈতিকতাকে বিবেচনায় নিতে হবে। আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রীয় ও বৈশ্বিক সকল কর্মকাণ্ডের মূলে জাতিগত নৈতিক চেতনার উজ্জীবন ঘটাতে হবে।

প্রাগৈতিহাসিককাল থেকেই মানুষ দলবদ্ধভাবে বসবাস করত (রায় ৬৯)। কিন্তু সে সময়কার সমাজব্যবস্থা বর্তমান সময়ের সমাজব্যবস্থার মতো এতটা উন্নত ছিল না। আদিম সমাজে মানুষ তার নিজের খেয়াল খুশি মতো চলতো; সম্পূর্ণভাবে তার নিজের ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো, কারণ সে সময়ে জীবনধারায় কোনো সুশৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বা ধারণা গড়ে ওঠেনি। তবে এটা স্পষ্ট যে, একটি আদর্শ সমাজ কাঠামোর গভীরে যেমন সুশৃঙ্খল ও সুসংবদ্ধ রীতিনীতি থাকা দরকার তেমনি দরকার পড়ে উন্নত নীতিবান জনসমষ্টি; যা শুধু নিজের জন্য নয় বরং উন্নত জাতি গঠনের জন্যও অপরিহার্য। সমাজের এমন সমষ্টিগতরূপই হলো ব্যক্তিমানুষের জীবনধারা গঠনের ও ব্যক্তির সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট তৈরির অন্যতম ক্ষেত্র। একথা সত্য যে, মানুষের সাংস্কৃতিক বিষয়াদি হলো মানুষের প্রতিনিয়ত শিক্ষার বিষয়। কারণ, সংস্কৃতির সাথে যুক্ত দিকগুলো হলো জ্ঞান, শিল্পকলা, নৈতিকতা, আইন ইত্যাদি যা মানুষের দৈনন্দিন শিক্ষালাভের আওতাভুক্ত (ইসলাম ৬৩-৬৪; ১১১-১১৯)। এ বিষয়গুলো শিক্ষার্জনের মাধ্যমে ব্যক্তি যেমন তার নৈতিক চেতনার পরিস্ফুটন ঘটাতে পারে, তেমনি উন্নত নৈতিক চেতনাসমৃদ্ধ জাতি গঠনের মাধ্যমে নিজ দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটাতেও কার্যকর উদ্যোগ নেয়া সম্ভব বলে আমরা মনে করি।

মানুষের সাংস্কৃতিক শিক্ষা, গঠন ও চর্চা পরিপূর্ণভাবে নির্ধারিত হয় সমাজের আচার-আচরণের ভিত্তিতে তথা সামাজিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে। এই ভিত্তির ধরন, গঠন এবং গুণগততার মাত্রাই নির্ধারণ করে কোন সমাজের সংস্কৃতি কেমন হবে, সমাজের প্রগতি ও উন্নতি কোন দিকে যাবে। তাছাড়া, সমাজে ব্যক্তি মানুষের সামাজিক অবস্থানও ব্যক্তির সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে নির্ধারণ করে। পরিণামে মানুষের জীবন, তার ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, সম্ভাবনা-বাস্তবতা সবই জোরালোভাবে নির্ভর করে সমাজ-সংস্কৃতির উন্নয়নের উপর। এক্ষেত্রে, নীতিশিক্ষার গুরুত্বকে অবজ্ঞা করে সামাজিক সম্ভাবনাগুলোকে বাস্তবে জিড়িয়ে রাখা সম্ভবপর হয় না, কারণ সম্ভাবনাগুলো সামাজিক প্রথা ও ধরনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কাজেই এটা স্পষ্ট যে, সমাজের ঐতিহ্য এবং প্রথা হলো মানুষের আচরণ, অভ্যাস এবং চিন্তাধারার ভিত্তি- যার সূচনা শুরু করতে হয় শৈশব থেকেই (খালেক ৩-১১)। কাজেই বলা যায়, সমাজের ভিত্তি থেকে শুরু করে শৈশবকালের এবং কৈশোর ও যৌবনকালের শিক্ষার মধ্য দিয়ে সংস্কৃতিকে অর্জন করার এই যে বাস্তবতা তা অনস্বীকার্য। সমাজ যদি মানুষের সংস্কৃতির ভিত্তিমূল হয়, যে ভিত্তি থেকে মানুষ সাংস্কৃতিক শিক্ষাসহ বিভিন্ন নৈতিক শিক্ষাগ্রহণ করে থাকে তাহলে সভ্যতার উন্নয়নসহ সমাজ, সংস্কৃতির উন্নয়নে নীতিশিক্ষার ভূমিকা গুরুত্ব বহন করে। সাংস্কৃতিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানুষ যখন সমাজের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় মিলিত হয় তখন সেখানে ঘটে চিন্তা, আবেগ, ভালো-মন্দ, সাফল্য এবং নানান দিক। উল্লেখ্য, ব্যক্তির এ বোধগুলো চালিত হয় মানুষের আদর্শ ও মূল্যবোধ দ্বারা। সংস্কৃতির এ দিকটিকে সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় মূল্যবোধের দিক। কিন্তু, মূল্যবোধভিত্তিক এ দিকের জন্য প্রয়োজন আবশ্যিক কিছু নীতিমালা ও বিধিমালা, যার মধ্য দিয়ে মানুষের আচরণের ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় এবং উচিত-অনুচিতের দিকগুলো সঠিক ভাবে ফুটে ওঠে। উল্লেখ্য, সংস্কৃতির এ নীতিভিত্তিক দিকের সাথে বিশ্বাসও যুক্ত থাকে। মানুষ শিক্ষার অধিকারে বিশ্বাস করে, পরকালে বিশ্বাস করে, গণতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাস করে, এভাবে জীবন ও জগতের নানা দিক দিয়ে নানান বিশ্বাস ধারণ করে। এভাবেই মানুষের সংস্কৃতি নির্ধারিত হয়ে থাকে

বহুমাত্রিকতায় (ইসলাম ১৭-২৯)। সমাজের এমন পরিপ্রেক্ষিতে একজন ব্যক্তি তার মেধা, অধ্যবসায়, নিষ্ঠা, সততা এবং দৃঢ় আত্মবিশ্বাস দিয়ে সে নিজেকে যেমন পরিপূর্ণ করে তুলতে পারে তেমনি তার কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে গোটা পরিবার, সমাজ এমনকি দেশেও উন্নয়নের জোয়ার ছড়িয়ে দিতে পারে।

১.৬. মানব প্রকৃতিতে নীতিশিক্ষার বাস্তবায়ন

মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে তাকে সমাজবদ্ধভাবে সামাজিক বিধি-বিধান মেনে একত্রে বসবাস করতে হয়। ব্যক্তির এ বৈশিষ্ট্যের ফলে ব্যক্তি তার নিজের খামখেয়ালির পরিবর্তে অন্যের অধিকার ও কর্তব্য কাজের প্রতি অধিক শ্রদ্ধাশীল থাকে। এ শ্রদ্ধাবোধের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির নিজের সামাজিক মর্যাদা যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি সমাজে নৈতিকতা বাস্তবায়নের পথও সহজতর হয়। এটা সত্য যে, আমরা আমাদের কাজের ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত বিচার করব কল্যাণমুখী দৃষ্টিকোণ থেকে। কল্যাণ চিন্তাকে সামনে রেখে আমরা আমাদের কর্তব্য কাজ করে যাব। কারণ, নীতিবিদ্যায় নৈতিক শিক্ষা বাস্তবায়নের ভিত্তি হবে কল্যাণমুখী কর্তব্যবাদ। এখন প্রশ্ন হলো, কল্যাণমুখী কর্তব্যবাদ সমাজে বাস্তবায়নের উপায় কী? উত্তরে বলা যায়, সমাজে বসবাসকারী মানুষের নানা বৈচিত্র্য যেমন দেহ-মনের বৈচিত্র্য; শিক্ষা-সংস্কৃতির বৈচিত্র্য, কামনা-বাসনার বৈচিত্র্য প্রভৃতি দিক দিয়ে মানব প্রকৃতিকে জোরালো করে তোলে। মানব প্রকৃতির বৈচিত্র্যের এই ভিত্তি থেকে সমাজেও গড়ে ওঠে নানা মাত্রিকতা। উল্লেখ্য, বৈচিত্র্যের এই ধারাবাহিক ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়েই বর্তমান প্রজন্মের নিকট সমাজে যথার্থ ও সময়পোযোগী নৈতিক শিক্ষার ভিত মজবুত করা সম্ভব (সুলতানা ১৭-২৯)।

মানুষ কীভাবে কাজ করবে, কাজটির ভালো-মন্দের মূল্যায়ন কী হবে তা বহুলাংশে নির্ভর করে একজন মানুষের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির ওপর। একজন মানুষ বেশি কথা বলতে গিয়ে ভুল কথা বলে বেশি, যা ঐ ব্যক্তির মানব প্রকৃতির সাথে যুক্ত; ব্যক্তিটি প্রকৃতিগতভাবে একত্রটোভার্ত ধরনের এবং তার বুদ্ধির মাত্রা উচ্চস্তরের নয় অথবা ব্যক্তিটি ভুলকে ভালোবাসে। বাস্তবে এমন অনেক মানুষ আছে যারা ভুল পথে চলতে আনন্দ পায়, অন্যকে দুঃখ দিয়ে আনন্দ পায়। আবার এমনও অনেক মানুষ আছে যে সত্য বলে দুঃখকে মেনে নিবে, কিন্তু কখনোই মিথ্যা বলবে না। ভারতীয় চার্বাক দর্শনের আলোচনা ও চর্চা থেকে মনে হয় যে, এমন মানুষ আছে যারা ঋণ করে হলেও ঘি খাবার পক্ষে; কিন্তু বাস্তবে এমন মানুষও আছেন যারা অনাহারে, অর্ধাহারে দিন কাটালেও খাবার কেনার জন্য ঋণ করবেন না। তাই বলা যায় এসব বিধিবদ্ধ বিষয়াদী ব্যক্তির জীবনদর্শন ও তার নিজ প্রকৃতির সাথে যুক্ত। সব মানুষ ও তাদের বৈশিষ্ট্য এক রকম নয়। এই প্রেক্ষিতে বলা যায়, মানুষ তার নিজ প্রকৃতি দিয়ে কাজ করে। এখানে মানবপ্রকৃতি বলতে মানুষের জীবতাত্ত্বিক দিকের উপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, যা জৈব-দৈহিক প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। তবে, ব্যক্তির এ প্রকৃতিকে নৈতিক শিক্ষা বা আদর্শ শিক্ষা গ্রহণের মধ্য দিয়ে পরিবর্তন করা সম্ভব (Dasgupta ১৭-২৯)। আর এ পরিবর্তনের দ্বারা মানুষের ব্যক্তিত্বকে নৈতিকভাবে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর মধ্য দিয়েই সমাজে নৈতিক শিক্ষার সফল বাস্তবায়ন সম্ভব।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনের ক্ষেত্রে যে দিকগুলো রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম দিক হলো ব্যক্তির পারিবারিক শিক্ষা; এ শিক্ষাই ব্যক্তিকে ধীরে ধীরে অধিক মানবিক হতে সাহায্য করে। তাছাড়া সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং পরিবেশগত যেসব দিক ব্যক্তির পারিপার্শ্বিক কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করে, সমাজের সে

সব ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে নৈতিক ও মানবিক শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রেও উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নিজস্ব অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও সঠিক পাঠ্যক্রম প্রণয়নের মাধ্যমে নীতিশিক্ষার সঠিক

বাস্তবায়নের পথ সুপ্রশস্ত করতে পারে। মানুষ কী কাজ করে; কেমন কাজ করে; কাজটি করা উচিত কি-না এসব প্রশ্নের সাথে নীতি-নৈতিকতার বিষয়টি আবশ্যিকভাবে যুক্ত (Dasgupta ৯-১৭)। দৈহিক শক্তি মানুষকে অনেক সময় খ্যাতি অর্জনে প্রেরণা যোগায় বটে, কিন্তু নৈতিক ভিত মজবুত না হলে ব্যক্তির সেই খ্যাতি স্থায়ী হয় না। এককথায়, খ্যাতির চেয়ে অপবাদই বেশি হয়। নৈতিক শিক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দেহ-মনের সম্পর্কে অস্বীকার করা যাবে না। কারণ, ব্যক্তির আচরণের দৈহিক প্রকাশ এবং গঠনের জন্য মানসিক দিককে নিয়ন্ত্রণ করে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। মানসিক দিকের নিয়ন্ত্রণ এবং গঠন মূলত শিক্ষার মধ্য দিয়েই হয়ে থাকে। নৈতিক শিক্ষার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মনের ভূমিকা থাকবে মূখ্য, অথচ নৈতিক শিক্ষার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে দেহ-মন উভয়েরই জোরালো ভূমিকা থাকবে এবং এটা হবে দেহ-মনের নিম্নপর্যায়ের গুণগত মান নিয়ে। যে ব্যক্তি জৈব-দৈহিক প্রবৃত্তি দিয়ে চলবে বা যে ব্যক্তির মন সংকীর্ণতার বেড়ালালে আবদ্ধ তারা নৈতিক শিক্ষা গ্রহণে অনেকটাই উদাসীন থাকে। অথচ, আমাদের উচিত শিক্ষাকে গ্রহণ এবং ধারণ করা মন ও মননশীলতার মাধ্যমে। এদিক থেকে বলা যায় পরিবার, সমাজ এবং দেশে নৈতিক শিক্ষা বাস্তবায়নে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তেমনি এ শিক্ষাগ্রহণে ব্যক্তির ইতিবাচক মানসিকতার গুরুত্বকে একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। মানুষ মন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দেহকে সঠিক ভাবে পরিচালনা করতে পারলে একদিকে মানুষের আচরণ যেমন সুন্দর, সঠিক ও ভালো হয়; অন্যদিকে তার কর্মকাণ্ডের প্রভাব সমাজ উন্নয়নেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে (Foot ১৯-২১)।

মানব প্রকৃতিতে নৈতিক শিক্ষা বাস্তবায়নে দার্শনিক প্লেটো দু'টি দিকের কথা উল্লেখ করেছেন। একটি হলো জীবতাত্ত্বিক দিক এবং অন্যটি হলো মননশীলতার দিক। প্লেটো তার আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থায় সমাজে যে শ্রেণি-বিভক্তির কথা বলেছেন, সেখানে ব্যক্তির আত্মার তিনটি দিকের উল্লেখ আছে; সেগুলো হলো-প্রবৃত্তি, বিজ্ঞতা এবং প্রজ্ঞা। মানব প্রকৃতি অনুযায়ী একজন ব্যক্তি শিশুকালে জৈব-দৈহিক প্রবৃত্তি নিয়ে জীবন শুরু করে। এ সময়ে মানব জীবনের ভিত্তিমূলক মৌলিক শিক্ষার শুভ সূচনা হয়, যা শিশুকালে সূচিত না হলে জীবনে আর কখনোই তা আয়ত্ত করা সম্ভব হয় না। নৈতিক শিক্ষাও জীবনের ভিত্তিমূলক একটি মৌলিক শিক্ষা; এটা মৌলিক এ কারণে যে, এই শিক্ষার শূন্যতা জৈবপ্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মানুষকে অমানুষে পরিণত করতে পারে। এটা অনস্বীকার্য যে, নৈতিক শিক্ষার সূচনা শিশুকালে শুরু না হলে, পরবর্তীকালে সেটা যে আর কখনোই হয় না যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো কথা বলতে শেখা (তরফদার ১৯-২৭)। শিশুকালে যে কথা বলতে শিখতে পারে না, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় জীবনের কোনো স্তরেই সে আর কখনোই কথা বলতে পারে না, অর্থাৎ সে হয় বাকপ্রতিবন্ধী। আর একটি দৃষ্টান্ত হলো- শিশুকালে যে হাঁটা শিখতে পারেনি, সে-ও হয় এক ধরনের দৈহিক প্রতিবন্ধী। স্বাভাবিক হাঁটা-চলা করা কখনোই তার পক্ষে আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। যুক্তির ধারাবাহিকতায় এ কথা বলা যায় যে, শিশুকালে যে স্কুলের প্রাথমিক শিক্ষা পায় না, প্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় তার সেই শিক্ষা গ্রহণ আর কখনোই হয়ে ওঠে না। কাজেই, আদব-কায়দা, রুচি-সংস্কৃতি, ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দেরবোধ এগুলোও এক ধরনের মৌলিক শিক্ষা যা শিশুকালেই আরম্ভ করতে হয় এবং বয়স বাড়ার সাথে সাথে তা আরও অধিক পরিপক্ব হয়ে ওঠে। শিশুকালে যাকে চেষ্টা করেও আদব-কায়দা, ন্যায়-অন্যায়, নীতি-নৈতিকতা শেখানো যায় না, প্রকৃতিগতভাবেই সে হয় আদব-কায়দা বর্জিত, নীতিবিমুখ একজন মানুষ; যে পরিবার, সমাজ, জাতি তথা দেশের কোনো উপকারেই আসে না বরং এরা জাতির জন্য হয়ে ওঠে বোঝাস্বরূপ।

সমাজের এমন ব্যতিক্রমী কিন্তু স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তির কথা না বলে যদি সমাজের বৃহত্তর শ্রেণির কথা বলি, তাহলে বলব যে, তাদের জীবন পরিপূর্ণভাবেই নির্ধারিত হয় সমাজ, সমাজের প্রথা, বিধিমালা, সমাজে প্রচলিত রীতি-

নীতি, নৈতিকতা ইত্যাদি দিয়ে। এমন বাস্তবতায় সমাজের সকল সাধারণ মানুষই বাস করে প্রচলিত প্রথা, রীতি-নীতি, নৈতিকতা ইত্যাদির সংস্পর্শে যার মধ্য থেকে ব্যক্তি প্রতিনিয়ত নৈতিক বিধি-বিধান আয়ত্ত্ব করে। একইভাবে ধর্মীয় গণ্ডি, রাজনৈতিক গণ্ডি, প্রাতিষ্ঠানিক গণ্ডি প্রভৃতির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে মানুষ বসবাস করে এবং সে মূল্যবোধের শিক্ষা নিয়ে থাকে, যা তাকে ন্যায়বান হতে সহায়তা করে (বটোমোর ৯৯-১০৭)। সমাজের প্রতিটি মানুষই এমন গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের অধিকারী; স্বল্পসংখ্যক কিছু মানুষ ব্যতিত অধিকাংশ মানুষই বাস করে সংকট ও সমস্যার অন্তহীন পরম্পরার হতাশা নিয়ে। এতদসত্ত্বেও এ কথা অনস্বীকার্য যে, ব্যক্তির জীবনে নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি একাডেমিক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের গুরুত্বকে খাটো করে দেখা চলে না। তাইতো এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মানব প্রকৃতিতে নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ শিশুকালে শুরু হলেও এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন হয় যৌবনকাল অর্থাৎ একাডেমিক পরিসরে।

১.৭. ব্যক্তিত্ব গঠনের মূল ভিত্তি শিক্ষা: প্রসঙ্গ জন ডিউই

শিক্ষার লক্ষ্যের সাথে মূল্যবোধের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। জন ডিউই বলেন, শিক্ষার লক্ষ্যের একটি অংশ হলো মূল্যবোধ। এ কথা অনস্বীকার্য যে, একটি সমাজের সংহতি ও স্থায়িত্ব এবং সমাজস্থ মানুষের উন্নতি, প্রগতি ও অগ্রগতি নির্ভর করে সমাজের মূল্যবোধ কাঠামোর উপর। এই মূল্যবোধ কী প্রকারের এবং তা ভালো কী মন্দ তা বড় কথা নয়, বরং বড় কথা হলো সেই মূল্যবোধের কাঠামোটি কতটা সুদৃঢ় ও সুসংহত। উল্লেখ্য, এ ক্ষেত্রে শিক্ষা কাঠামোর তাত্ত্বিক ভিত্তির ভূমিকা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। যথাযথ শিক্ষা পদ্ধতি এবং তা বাস্তবায়ন দ্বারাই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ সম্ভব বলে ডিউই মনে করেন। নীতিশিক্ষা কেবলমাত্র মসজিদ, মন্দির, চার্চ, প্যাগোডা অর্থাৎ শুধুমাত্র উপাসনালয়ের বিষয় নয়, বরং এটি আমাদের ব্যবহারিক জীবনেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ (দাশ ১৯-২৩)। অর্থাৎ, উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নিয়মিত কার্যক্রমের সমন্বিত অংশ হিসেবে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়াবলীর প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব দিলে শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক, শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিকতার বিকাশ সম্ভব। মূল্যবোধের সাধারণ ধারণার মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকলেও কিছু কিছু মূল্যবোধ রয়েছে যার আবেদন, প্রয়োজন ও ভূমিকা সকল সমাজে সমানভাবে স্বীকৃত। এগুলোকে শাস্ত্র মূল্যবোধও বলা হয়। এগুলো শাস্ত্র এ জন্য যে, মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন-যাপনের মৌলিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াগুলির সুষ্ঠু ও সন্তোষজনক কার্যাবলী এ মূল্যবোধগুলির উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। সকল সমাজের মানুষ এ সত্যটি উপলব্ধি করেছে যে, তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে অধিক সুন্দর ও অর্থবহ করার জন্য নৈতিক মূল্যবোধ অনুযায়ী আচরণ ও কর্ম করা আবশ্যিক। ব্যক্তির এ মূল্যবোধগুলির মধ্যে অন্যতম হলো- সত্যবাদিতা, সততা, সৌন্দর্যবোধ, কৃতজ্ঞতা, দয়া ইত্যাদি। পৃথিবীর সকল যুগে সকল সমাজে এ মূল্যবোধগুলিকে মানবজীবনের নীতি-নির্ধারক হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও, আরও অনেকগুলো মূল্যবোধের উল্লেখ করা যায় যেগুলো শাস্ত্র মূল্যবোধের মতো স্থায়ী না হলেও উন্নত জীবন যাপনের সাথে তা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: দেশপ্রেম, গণতান্ত্রিক আদর্শ, সমাজচেতনা, জাতীয়তাবোধ, আন্তর্জাতিকতাবোধ ইত্যাদি যা উন্নত নৈতিক চেতনা গঠনের মাধ্যমে সম্ভব (দাশ ৫৯)। সমাজ অনুমোদিত মূল্যবোধগুলোর অনুশীলন এবং ব্যবহারিক ও কর্মজীবনে সেগুলির যথাযথ প্রতিষ্ঠার উপর নির্ভর করে একটি সমাজের সামাজিক অগ্রগতি ও উন্নতি। এজন্য, নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের মূল্যবোধের শিক্ষা দেবার প্রয়োজনীয়তা সকল মহলেই সমানভাবে স্বীকৃত। উল্লেখ্য, এ শিক্ষা শুরু করা প্রয়োজন প্রাথমিক স্তর থেকেই; কেননা এ স্তরই একজন শিক্ষার্থীর মূল্যবোধ আহরণের এবং গঠনের উপযুক্ত সময়, কেননা

এ সময়ই শিশুর মন থাকে সাদা কাগজের মতো। আর এই উপযোগী মানসিক সংগঠন বা মনোভাব শিক্ষার্থীর সুসংহত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমেই সম্ভব।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, মূল্যবোধের শিক্ষাই যে কেবলমাত্র মূল্যবোধের সংকট নিরসনের জন্য একমাত্র উপায় তা-ই নয় বরং একাডেমিক শিক্ষাগ্রহণের মাধ্যমে মূল্যবোধ অর্জনের পাশাপাশি পারিবারিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও একেবারে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু, তাই বলে এ সংকট নিরসনে শিক্ষা সহায়ক ভূমিকা পালন করে না তা বলা অনুচিত। বর্তমান সমাজে বিদ্যমান মূল্যবোধের সংকট দূর করতে হলে শিক্ষাকে সমাজ বিনির্মাণের হাতিয়ার হিসেবে যুগোপযোগী করতে হবে অর্থাৎ এক্ষেত্রে বলা যায় উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহকে এ দায়িত্ব নিতে হবে। মানুষের জীবনের মূল্যবোধগুলি যদি সমাজে বিদ্যমান সমস্যার অনুরূপ হয়, তাহলে সমাজজীবন ও মূল্যবোধগুলির মধ্যকার দ্বন্দ্বের অবসান ঘটানো সম্ভব। এ জন্য উপযুক্ত শিক্ষানীতি প্রণয়নের মাধ্যমে শিক্ষাজগৎ গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করে শিক্ষার্থীদেরকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি অধিক শ্রদ্ধাশীল করে তোলা সম্ভব। অর্থাৎ, শিক্ষায় আবশ্যিকভাবে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা থাকতে হবে (রবীন্দ্র রচনাবলী ৭০০-৭০৭)। এসকল কাজে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি শিক্ষকের ভূমিকাকেও বিবেচনায় নিতে হবে। শিক্ষককে সমাজে বিবেচনা করা হয় সমাজের নৈতিক মানদণ্ড হিসেবে। কাজেই, উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রদানের পাশাপাশি নৈতিক ও আদর্শিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে মূল্যবোধের ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত করা। বর্তমানে আমাদের জাতীয় জীবনের একটি বড় সংকট হলো অধিকাংশ শিক্ষার্থী তথা যুব সমাজের মধ্যে স্থায়ী ও অনুসরণযোগ্য আদর্শের বড়ই অভাব। অথচ, জাতীয় জীবনে জাতীয় ঐক্যের সংকটের কারণে জাতীয় আদর্শের এমন কোনো প্রতিষ্ঠিত মডেল নেই যাকে শিক্ষার্থীরা অনুসরণ করতে পারে। রাষ্ট্রের এ অবস্থায় শিক্ষার্থীদের বড় প্রয়োজন এমন আদর্শ যাকে শিক্ষার্থীরা অনুসরণ করবে, যাদের প্রেরণায় নতুন প্রজন্ম গঠন করবে বাসযোগ্য একটি আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র। যে রাষ্ট্রে সাধারণের কর্মকাণ্ডে, জীবন-জীবিকায় ন্যায়, সততা, ধর্মপরায়ণতা, অহিংসা, দৃঢ়চেতা, সাহস, সেবা করার মনোভাব, মানবকল্যাণ প্রভৃতি সংগঠনাবলি শিক্ষার্থীরা সঠিক শিক্ষাক্রম প্রণয়নের মাধ্যমে অর্জন করতে পারে। এভাবে এ শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীর মূল্যবোধ শিক্ষার সঠিক বুনিয়াদ রচনা করতে পারে।

জন ডিউই বলেন, শিশুকালে নৈতিক শিক্ষার শুরু হবে একজন শিশুর আচরণ এবং ব্যক্তিত্ব গঠনের মধ্য দিয়ে এবং ধীরে ধীরে উচ্চতর শিক্ষার মধ্য দিয়ে তা পরিপূর্ণতা লাভ করে (Dewey ৩৩-৩৪)। আচরণ এবং ব্যক্তিত্বের গঠন যেমন শিশুকাল থেকে শুরু হয়, একইভাবে আচরণের ও ব্যক্তিত্বের মূল্যবোধের দিকটির গঠনও শিশুকাল থেকে শুরু হয়। জন ডিউই-এর শিক্ষা ভাবনা বিংশ শতাব্দীতে আমেরিকায় ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। তাঁর এ নীতি এতটাই বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছিল যে তিনি তুরস্ক, রাশিয়া, চীন এবং জাপানে শিক্ষার সংস্কারমূলক কাজে উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনের মূল ভিত্তিই হলো শিক্ষা (ওয়াহাব ১১১-১১৯) ; তবে এ শিক্ষা হতে হবে আধুনিক, যুগোপযোগী ও নীতিভিত্তিক; যাতে করে শিক্ষার্থীরা তাদের অর্জিত জ্ঞান দেশ মাতৃকার কাজে ব্যবহার করতে পারে। ভালো সমাজ গঠনের জন্য মানুষের মধ্যে যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার প্রয়োজন হয়, তা নৈতিক শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে সম্ভব। শিশুকালে যদি আমরা শিশুদেরকে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে পারি তাহলে পরবর্তী জীবনে তারা তাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সঠিক নীতি ও আদর্শ প্রয়োগ করে দেশ ও জাতির কল্যাণে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখতে পারবে, এভাবে তাদের পুরো জীবনই গড়ে উঠবে নৈতিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে। মনোবিজ্ঞানের চিরায়ত সাপেক্ষীকরণতত্ত্ব বা ক্ল্যাসিক্যাল কন্ডিশনিং তত্ত্ব অনুযায়ী যদি নৈতিকভাবে শিক্ষার্থীদেরকে নীতিশিক্ষা গ্রহণের জন্য কন্ডিশন করে দেয়া যায়, তাহলে সেটাই হবে তাদের দেহ-মন গঠন এবং ভবিষ্যৎ জীবন পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ

ক্ষেত্র। নৈতিক সাপেক্ষীকরণ তখন চলবে চিরায়তভাবে। ‘রিপাবলিক’ গ্রন্থে প্লেটো যে শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলেছেন, সেখানেও এই আদর্শই প্রতিফলিত হয়েছে। সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশের জন্য রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা ও বিশ্বব্যবস্থায় ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রশ্নে মতপার্থক্য ও বিতর্কের অন্তহীন সুযোগ থাকলেও এ কথা অনস্বীকার্য যে, পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় অন্যায় ও অ-বিবেচনা যেমন ক্রমবর্ধমান, তেমনি প্রত্যেক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেও অন্যায় ও অ-বিবেচনা ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর রূপ পরিগ্রহ করছে। কোথাও মোটামুটি সামঞ্জস্যপূর্ণ রাষ্ট্রযন্ত্র চোখে পড়লেও শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে পুরোপুরি নীতিশিক্ষার চর্চা করা হচ্ছে বলে মনে হয় না। তাইতো বলা যায়, জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে উৎকৃষ্ট জীবনযাত্রার জন্য মানবজাতির নৈতিক চেতনার জাগরণ আজ সময়ের দাবীতে পরিণত হয়েছে। সেই সাথে দরকার বিশ্বব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থার আইন-কানুন, রীতিনীতি, প্রথা ও পদ্ধতির বিস্তৃত উন্নয়ন। উন্নত আর্থিক জীবনের সাথে চাই উন্নত মানসিক জীবনব্যবস্থা, যা টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। তাই বলা যায়, নৈতিক অনুশীলনে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টার সাথে সাথে সংগঠিত ও সম্মিলিত প্রচেষ্টারও প্রয়োজন পড়ে (হক ৯)। চিন্তা ও কাজের মধ্য দিয়ে বিকাশমান সুস্থ নৈতিক চেতনাসম্পন্ন মানুষকে ন্যায়স্বার্থ ও হীনস্বার্থের পার্থক্য সম্পর্কে সজাগ করে এবং বাঁধা-বিপত্তি অতিক্রম করে ন্যায়ের পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করে। কেবল নিজের সুখ নয়, বরং সকলকে নিয়েই সুখী হতে হয়, সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে হয়- উপযোগবাদীদের এ নীতিও সঠিক এবং তা আদর্শিক শিক্ষার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। এটা সত্য যে, সার্বজনীন কল্যাণের মধ্যেই নিহিত থাকে ব্যক্তিগত কল্যাণের যাবতীয় আদর্শ। মানুষের কল্যাণের জন্য আর্থ-সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিবর্তনে সীমাহীন গুরুত্ব দিয়েছেন ফ্রয়েড, এডলার প্রমুখ। এঁরা মানুষের স্বরূপ ও চেতনার উন্মোচন ঘটিয়েছেন। মহাত্মা গান্ধী মানুষকে মহৎ সব সম্ভাবনার আকার হিসেবে দেখেছেন। তিনি মনে করেন, অহিংসার দর্শন অবলম্বন করে মানুষ সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পৃথিবীকে শান্তির আবাসস্থলে উন্নীত করার সামর্থ্য রাখে। কারণ, মানুষ মনুষ্যত্ব নিয়ে জন্মে না, বরং মনুষ্যত্ব নামক গুণটি সে অর্জন করে। মানুষ ধর্ম কিংবা যুক্তি নিয়ে জন্মে না, জৈবিক সামর্থ্য কিংবা এর অন্তর্গত সম্ভাবনা অবলম্বন করে ধর্ম, আদর্শ, যুক্তি তাকে অর্জন করতে হয়। মানুষকে মানুষ হতে হয় মানবিকীকরণের মধ্য দিয়ে, মনুষ্যত্ব অর্জন করে। এই অর্জনে মানুষের অন্তর্গত ইচ্ছাশক্তির, চিন্তাশক্তির, শ্রমশক্তির এমনকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। উন্নত জীবন, উন্নত সমাজ, উন্নত রাষ্ট্র ও উন্নত বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে তার ভিত্তিভূমি হিসেবে নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন অনস্বীকার্য (Brubachr ২২১-২২৯)।

১.৮. নীতিশিক্ষা অর্জনের বাস্তব ক্ষেত্রসমূহ

ব্যবহারিক জীবনে অন্যান্য শিক্ষার ন্যায় নীতিশিক্ষা গ্রহণেরও বিভিন্ন ক্ষেত্র রয়েছে (বিশ্বকোষ, খন্ড-৩, ৭, ১১-১৯; ১১৩-১১৯)। এ শিক্ষা মূলত স্কুল পর্যায় থেকেই শুরু হয় এবং তা জীবনব্যাপি চলমান থাকে। শিশুকাল থেকেই এ শিক্ষা শিক্ষার্থীর মনে গ্রথিত করা প্রয়োজন। যদিও প্রতিটি শিশুই প্রারম্ভিক পর্যায় থেকেই অনানুষ্ঠানিকভাবে এ শিক্ষা লাভ করে। স্কুল পর্যায় থেকে তাদের মধ্যে নৈতিক সত্য ও ধর্মীয় অনুশাসনের বিষয়টি অধিক জাগ্রত করা প্রয়োজন। শিশুদের নৈতিক নিয়মাবলি ও মূলনীতি সম্পর্কে সচেতন করা উচিত। যাতে তারা আচরণের যৌক্তিকতা বুঝতে সমর্থ হয়। নৈতিক মূল্যবোধ শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর জন্য কিছু ব্যবহারিক অনুশীলনও শিক্ষাক্রমের সাথে যুক্ত করা উচিত। শ্রেণিকক্ষের ভেতরে ও বাইরে সদাচার ও শিষ্টাচার শেখার পাশাপাশি প্রতিবন্ধী সহপাঠীদের প্রতি সহমর্মিতা; কনিষ্ঠ, বয়োজ্যেষ্ঠ, অসুস্থ, অনাথ ও পীড়িত মানুষের প্রতি সহযোগিতামূলক মনোভাব জাগ্রত করা নৈতিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বৈষম্যহীন

শিক্ষা দেয়া ও তা গ্রহণ আমাদের একান্ত কর্তব্য কারণ এটি আমাদের আদর্শিক করতে প্রেরণা যোগায়। একটি শিশু জন্মের পর পরিবারের মধ্যে বেড়ে ওঠে। পরিবারই হচ্ছে শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র। পারিবারিক শিক্ষার একটি শিশুর ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডের ভুলের কারণ হতে পারে। তাছাড়া, শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা না থাকলে শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের সৃজনশীল বিকাশ সম্ভব নয়; এমনকি পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করাও হয় দুরূহ। ফলে, মানুষ পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে উঠতে পারে না। সমাজের এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন তরুণ প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের অন্তরে নৈতিক শিক্ষার জাগরণ ঘটানো (বিশ্বকোষ, খণ্ড-৪, ৬৯-৭৭)।

গবেষণার এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীর অন্তরে নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে কতিপয় ধাপ নিম্নে তুলে ধরা হলো-

১.৮.১. প্রাথমিক পর্যায়: দেশের সকল শ্রেণির মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও তার সাফল্য নির্ভর করে একটি সুষ্ঠু গতিশীল প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার উপর। কাজেই, এ পর্যায়ের শিক্ষার ভিত্তিভূমিকে দৃবল রেখে শিক্ষার উচ্চতর স্তরকে শক্তিশালী করা সম্ভব নয়। এ স্তরের শিক্ষা শিশুর নৈতিক, মানসিক, দৈহিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করে শিশুর মনে কর্তব্যবোধ, সদাচার, ন্যায় ও নিষ্ঠা ইত্যাদি গুণাবলির পরিস্ফুটন ঘটায়। অথচ, এ স্তরে জীবনকেন্দ্রিক বাস্তবমুখী শিক্ষাসূচির অভাবে এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, উদ্যোগী শিক্ষকের অপ্রতুলতায় শিক্ষার বাস্তব ও কর্মমুখী উদ্দেশ্য এখন প্রায় শূন্যের কোঠায় এসে পৌঁছেছে। দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব পরিবেশ, সামাজিক চাহিদা, ছাত্রদের মানসিক ও দৈহিক ক্ষমতা এবং অভিরূচির সাথে সংগতি রক্ষা করে প্রাথমিক শিক্ষা পাঠ্যক্রমের ব্যাপক পুনর্বিন্যাস করা দরকার। এ বিন্যাস একদিকে যেমন শিক্ষাব্যবস্থাকে গতিশীল করবে, অন্যদিকে দেশের অগ্রগতি ও সামাজিক পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবনে আমাদের বিশেষজ্ঞ মহলকে অধিক উদ্যোগী করতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। এভাবে সমাজে নৈতিক শিক্ষা অর্জনের পথ সুগম হবে।

১.৮.২. মাধ্যমিক পর্যায়: শিক্ষার্থীদের বয়সসীমা অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষা হচ্ছে কৈশোর ও কৈশোরোত্তরকালের শিক্ষা। এ স্তরের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীকে সচেতন কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ করা; সৎ, প্রগতিশীল ও নীতিবোধসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করা; যাতে তারা সততা ও নৈতিকতা দ্বারা উচ্চ শিক্ষার্জনের উপযোগী করে নিজেকে গড়ে তুলতে পারে। ছাত্র-ছাত্রীদের নাগরিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলার সাথে সাথে তাদের জাতীয় সেবামূলক কর্মে অংশগ্রহণের জন্যও প্রেরণা দিতে হবে। এতে তাদের নৈতিক দায়িত্ববোধ যে বৃদ্ধি পাবে শুধু তাই নয়, বরং দেশের বর্তমান অবস্থায় সেবামূলক কর্মে ছাত্র সমাজের মতো একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণে রাষ্ট্রীয় অনেক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভবপর হবে। একটি শোষণমুক্ত, শ্রেণিহীন, সৎ ও মানবীয় সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হলে শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রেণি-বৈষম্য দূর করে শিক্ষার সকল পর্যায়ে নীতিশিক্ষার গুরুত্ব দিতে হবে। এ অর্থে বলা যায়, মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা নানাবিধ সামাজিক কুসংস্কার, অদৃষ্টবাদিতা, নৈরাজ্যবাদের বিরুদ্ধাচারণ করে শিক্ষার্থীদেরকে এসব মানসিকতার পরিবর্তে কর্মপোষোগী, সৎ ও নীতিবান হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এ স্তরের শিক্ষাঙ্গনে কিংবা সমমান সুবিধাপূর্ণ শিক্ষায়তনে সকল শিক্ষার্থীর নৈতিক মান উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজ ও দেশের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে অবদান রাখা সম্ভব বলে আমরা মনে করি।

১.৮.৩. উচ্চশিক্ষা পর্যায়: উচ্চশিক্ষার সব পর্যায়ে নৈতিক শিক্ষার সাথে শিক্ষার্থীর অধিক সংযোগ বাড়াতে হবে এবং বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রমকে ঢেলে সাজাতে হবে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ছাত্র-ছাত্রীদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ এবং মানবীয় মূল্যবোধের উৎকর্ষ সাধনে অধিক ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব ধর্ম পালনে বা মত প্রকাশের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা এবং নিরাপত্তাহীনতা থেকে মুক্তি পাবার যে শিক্ষা তা আমরা মূলত এ স্তরের শিক্ষা থেকে পেয়ে থাকি। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ একাডেমিক কর্মসূচি প্রণয়নে দেশের মৌলিক সমস্যার কথা বিবেচনা করে নীতিশিক্ষা বিষয়ক পাঠ্যক্রমকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা সক্রিয় বিবেচনায় নিবেন। আমরা এমন শিক্ষা চাই, যে শিক্ষা মানুষের সৃজনশীল প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ এবং মানুষকে পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত করতে সাহায্য করে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা মানুষের রুচিকে উন্নত ও মনকে শাস্ত্রানুগত্য ও কলুষমুক্ত করতে ভূমিকা রাখে। শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তিকে জাগ্রত করে নৈতিক ও মানবিক উৎকর্ষের বিকাশ ঘটে এ স্তরের শিক্ষায়। তাছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ সমাজকে দিচ্ছে বিবেকবান মানুষ এবং দেশ উন্নয়নের সহযোগী, সার্থক, নিবেদিত ও বিশ্বস্ত কর্মচারী। মূলত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ রক্ষণশীলতার ঘাঁটি হিসেবে নয়, বরং সমাজ পরিবর্তনের অনুঘটক হিসেবে দেশ ও জাতির সেবায় কাজ করবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা। সামাজিক ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা প্রদানে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে, এটাই সমাজের প্রত্যাশা।

১.৯. নীতিশিক্ষা বাস্তবায়নের ধাপসমূহ

নৈতিক কর্মকাণ্ড যখন সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত হয়, তখন তা সামাজিক নীতিমালায় পরিণত হয়। কিন্তু, সব সামাজিক নীতিমালা নৈতিক নিয়মাবলী অনুসরণ করে না। যেমন- যে সমাজ সতীদাহ প্রথাকে স্বীকৃতি দিয়েছে, সে সমাজ নৈতিক অনুশাসন বা বিবেকের রায় মেনে চলেনি। কারণ, এসব কর্মকাণ্ডে মানব প্রাণের স্বতঃমূল্যকে উপেক্ষা করা হয়েছে, যা নৈতিকতার অপরিহার্য মূলনীতি হিসেবে স্বীকৃত। সম্পূর্ণ নৈতিক ও মানবিক চেতনায় উজ্জীবিত হয়েই রাজা রামমোহন রায় এ রকম সামাজিক কু-প্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। এটাই ‘না’ বলতে পারার নৈতিক শক্তি যা অভ্যন্তরীণ প্রেরণা বা বিবেক থেকে জাগরিত। এই প্রেরণা থেকে বার্তাভাষী রাসেল রাস্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। কাজেই, প্রকৃত নৈতিক শিক্ষা তাই যা মানুষকে প্রকৃত অর্থে মানবিক করে তোলে। নীতিবিদ্যায় প্রথমত কোনো কাজের যৌক্তিকতার ধারণা দেয়া হয়, যাতে ব্যক্তি উপলব্ধি করতে শেখে কেন এটি কর্তব্য কাজ। এ শিক্ষার মাধ্যমে, শিক্ষার্থীরা নৈতিক কর্তব্যটি সহজে গ্রহণ করার পক্ষে যৌক্তিক ভিত্তি খুঁজে পায়। কাজেই, একজন শিক্ষার্থীকে নীতিশিক্ষার তিনটি ধাপ অবশ্যই অনুসরণ করতে হয় (খালেকুজ্জামান ৪৭-৪৮)। যথা-

প্রথমত- তাকে অবশ্যই নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে যাতে সে ঔচিত্য ও অনৈচিত্য, ভালো-মন্দ কাজের মধ্যে পার্থক্য করতে শেখে;

দ্বিতীয়ত- শিক্ষার্থীকে কাজের যৌক্তিকতা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে যাতে সে বুঝতে সক্ষম হয় কেনো এবং কোন বিশেষ আচরণটি তাকে আয়ত্ত্ব করতে হবে; এবং

তৃতীয়ত- তাকে সাধারণ কাজ ও নৈতিক কাজের মধ্যে পার্থক্য শেখাতে হবে, যাতে সে শুধুমাত্র শান্তির ভয়ে নয় বরং নৈতিক চেতনায় উজ্জীবিত হয়েই যথার্থ নৈতিক কাজটি করতে উদ্বুদ্ধ হয়।

উল্লেখ্য, আমার বিশ্লেষণে মনে হয়, নীতিশিক্ষার মূল তাৎপর্য তৃতীয় ধাপের মধ্যে নিহিত। এজন্যই এরিস্টটল বলেছিলেন (করিম ১১১-১১৭), মানুষ আইনের ভয়ে যা করে, দর্শন আমাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা পালন করতে শিখিয়েছে। এখন প্রশ্ন: এ স্বতঃস্ফূর্ত নৈতিক জ্ঞান ব্যক্তি কীভাবে অর্জন করবে? বিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা কারিকুলামে নীতিশাস্ত্র বলে আলাদা কোনো বিষয় নেই। যদিও, কখনো কখনো এটি অন্যান্য বিষয়ের সাথে অপরিহার্যভাবে সম্পৃক্ত থাকে। বিশেষ করে, ধর্ম শিক্ষার সাথে তা নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। সাধারণভাবে বলা যায়, অংকশাস্ত্র বা ভূগোলের তুলনায় ধর্মীয় শিক্ষা নৈতিকতার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত থাকে। ধর্ম ও নৈতিকতার প্রকৃত সম্পর্কটি এভাবে নিহিত যে, উভয় শাস্ত্রেই অন্ধ কূসংস্কারের পরিবর্তে মুক্ত যুক্তিতর্কের সুযোগ রয়েছে।

শিক্ষা দার্শনিকগণ বলেন যে, ধর্ম ও নৈতিকতা উভয়ই কোনো না কোনোভাবে শিক্ষণের সাথে সম্পৃক্ত। তাঁদের দাবি হলো, ধর্ম শিক্ষার সাথে নৈতিকতার সম্পর্ক রয়েছে; কারণ, ধর্মীয় বিধিবদ্ধ রীতি-নীতি ছাড়া নৈতিকতা অর্জন অসম্ভব। এখানে ধর্ম ও নৈতিকতাকে এমনভাবে সম্পর্কিত করা হয় যে, কেউ যদি সত্যিকার ধার্মিক হয়, তবেই সে নৈতিক হতে পারবে। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিককালে এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিকে অধিকাংশই গ্রহণ করে না। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, ধর্মতত্ত্ব ও নৈতিকতা উভয়ই সত্য, সুন্দর, বাস্তবতা ও মূল্যবোধ নিয়ে আলোচনা করে। অর্থনীতি ও রাজনীতির বিভিন্ন তত্ত্বের মতো ধর্ম ও নৈতিকতার বিভিন্ন তত্ত্বও শিক্ষণ প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত। শিক্ষায় নৈতিকতার এ প্রায়োগিক গুরুত্ব উপলব্ধি করে গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে এটিকে বেছে নিয়েছি। কেউ কেউ ধর্মকে বৃহত্তর মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে, কেউ আবার অতিপ্রাকৃত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ধর্মকে গ্রহণ করে। সবার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য একই তা হলো যা কিছু সত্য, সুন্দর এবং কল্যাণকর তা গ্রহণ করার মানসিকতা নিজের মধ্যে আয়ত্ত্ব করা এবং অন্যকে তা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।

নৈতিক শিক্ষার বাস্তবায়ন যেহেতু আচরণ এবং ব্যক্তিত্ব গঠনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়, তাই শিশুকালে এটা শুরু হবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এবং বয়োঃসন্ধিকালে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি থাকবে নৈতিক শিক্ষার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষা কারিকুলামে পর্যাপ্ত নৈতিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ রাখতে হবে। নৈতিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর মন ও মননশীলতার পরিশুদ্ধি ঘটে। ব্যক্তির দৈহিক আচরণের গঠন ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানসিক বিকাশপ্রাপ্ত হয় (এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, খন্ড-৭, ১১: ১৯, ২৭)। এভাবেই, মানব প্রকৃতির জীবতাত্ত্বিক দিক ও মানবিক (যা মননশীলতার ও মনুষ্যত্ববোধের প্রকাশ) দিক নৈতিকভাবে বেড়ে ওঠে। এ স্তরে শৃঙ্খলা, সংযম, শিষ্টাচার, অধ্যবসায় ও সততা প্রাধান্য পায়। যারা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী নয় কিংবা অর্থ সংকটের কারণে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে না তাদেরকে কীভাবে উঁচু নীতিবান মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা যায় তা-ও সংশ্লিষ্ট মহলের বিবেচনায় রাখতে হবে। প্রচলিত শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে রয়েছে বটে, কিন্তু সেখানেও শিক্ষা ব্যবস্থাপনার ত্রুটির কারণে সার্টিফিকেটধারী উচ্চ শিক্ষিতের হার বেড়েছে সত্য, কিন্তু প্রকৃত নৈতিক ও মানবিক শিক্ষায় শিক্ষিতের হার কমেছে আশংকাজনক হারে। যেসকল মেধাবী তরুণরা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে তাদের অধিকাংশেরই উদ্দেশ্য বি.সি.এস. পরীক্ষা দিয়ে প্রশাসন, পুলিশ, কাষ্টমস ইত্যাদি ক্যাডারে চাকুরী পাওয়া-যা তারা সোনার হরিণ মনে করে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৯০ শতাংশেরও অধিক ভর্তি হয় পড়ালেখা করে একটি ভালো চাকুরীর জন্য; ফলে দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক শিক্ষার প্রতিও তাদের আগ্রহ কম। এতে তারা না শেখে নিজের পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তুসমূহ, না শেখে মানবিক আচরণসমূহ (ওয়াহাব ২১-৩৯)। যে শিক্ষা মানুষকে মুক্তভাবে চিন্তা করতে শেখায় না, মুক্তচিন্তার প্রেরণা

দেয় না, সে শিক্ষা মানুষের মানবিক বিকাশে কোনো কাজে আসে না। এজন্য বার্ত্তাভ রাসেল বলেন, আমাদের উচিত মানবতা অর্জনের জন্য জ্ঞান, আবেগ ও ক্ষমতাকে যতদূর সম্ভব সম্প্রসারিত করা। নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ মানবীয় গুণাবলি অর্জন করে মানবিক আচরণ করতে উৎসাহী হয় এবং মানবকল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে ব্রতী হয়।

১.১০ উপসংহার:

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, নীতিশিক্ষা মানব আচরণের পরিবর্তনের সাথে সাথে তার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানবতাবোধ জাগরণের এক মহানিয়ামক হিসেবে কাজ করে। মানুষের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে নৈতিকতা ও মানবতাবোধ জাগ্রত হওয়া এবং ব্যবহারিক জীবনে তার বাস্তব প্রতিফলন বর্তমান সভ্যতার অন্যতম প্রায়োগিক দিক। উল্লেখ্য, নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ শুরু হয় শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে এবং তা শেষ হয় কর্মজীবনে। তাছাড়া, আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সে সব শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন যা তার মূল্যবোধ গঠনে সহায়ক হবে। এক্ষেত্রে ব্যক্তির পেশাগত মনোভাব তা বাস্তবায়নের পথকে সুগম করে। উল্লেখ্য, বিভিন্ন নৈতিক উন্নয়ন কেন্দ্রও নৈতিক শিক্ষা বাস্তবায়নের নিয়ামক হিসেবে কাজ করতে পারে। এটা সত্য যে, অনেক সময় চিকিৎসা নিয়েও আমরা সুস্থ হতে পারি না, ঔষধ সেবন করেও সব সময় সব রোগ নিরাময় হয় না। কিন্তু, তাই বলে চিকিৎসা গ্রহণ বা ঔষধের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা হবে অমূলক। একইভাবে নৈতিক শিক্ষা হয়তো কখনো কোনো প্রতিকূল পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে, একজন ব্যক্তিকে নীতিবান করার ক্ষেত্রে বিফল হলেও এর গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তাকে বাস্তবিক অর্থে অস্বীকার করা যাবে না। তাছাড়া একটি রাষ্ট্রের সকল সেক্টরকে দূর্নীতিমুক্ত করত: সর্বত্র নৈতিকতার অনুশীলনের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা প্রয়োজন। আমরা পারিবারিকভাবে এমনকি প্রাতিষ্ঠানিক পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়নের মাধ্যমে যতই নৈতিকশিক্ষা গ্রহণ করি না কেন, বাস্তব কর্মক্ষেত্রে তা যথাযথভাবে প্রয়োগ ঘটাতে না পারলে নৈতিক সমাজ গঠন করা হবে অসম্ভব। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সকলস্তরে নীতি-নৈতিকতার অনুশীলন একান্তই প্রয়োজন। তবে এর জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারকদেরকে এ ব্যাপারে অধিক যত্নবান হওয়া এবং সর্বত্র সফলভাবে আইনের প্রয়োগ ঘটানো। একজন মানুষ দেহ ও মনের দিক থেকে যতই নৈতিকতাসম্পন্ন হোক না কেন দৈনন্দিন বাস্তব কর্মক্ষেত্রের প্রতিটি সেক্টর যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে দূর্নীতিমুক্ত না হয় তবে কখনোই নৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে না। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, রাষ্ট্রের সর্বত্র শক্তিশালী গণতন্ত্রের চর্চা আমাদের এ সংকট উত্তরণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। কাজেই, এক্ষেত্রে বলা যায় যে, নৈতিকতা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাজনীতির ভূমিকাও একেবারে নগণ্য নয়, কারণ রাজনীতি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এমনকি রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করে। আর, একটি সমাজের গঠন, প্রকৃতি ও স্বরূপের উপরই নির্ভর করে কোন সমাজের নৈতিক মানদণ্ড কেমন হবে এবং কীভাবে তা বাস্তবায়িত হবে। একটি আদর্শ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ধারা হবে গণতান্ত্রিক; আর গণতন্ত্র বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নৈতিকতার ভূমিকাকে খাটো করে দেখা সমীচীন নয়।

তথ্যসূত্র

রহমান, আবু তাহা হাফিজুর। ধর্ম ও নৈতিকতা। স্মারক সংকলন, বাংলাদেশ দর্শন সমিতির পত্রিকা, চতুর্থ সংখ্যা, বাংলাদেশ দর্শন সমিতি, ঢাকা, ১৯৭৯।

Sidgwick, Henry. *Outline of the History of Ethics*. London: Macmillan Co. & Ltd., 1954।

বেগম, হাসনা (অনুদিত)। নীতিবিদ্যার মূলনীতি। বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫।

রায়, আনন্দাশংকর। আধুনিকতা। ডি.এম. লাইব্রেরি, ১৯৫৩।

ইসলাম, আমিনুল। নীতিবিজ্ঞান ও মানবজীবন। মাওলা ব্রাদার্স, ২০০২।

খালেক, এ.এস.এম. আবদুল। প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা। অনন্যা প্রকাশন, ২০০৩।

সুলতানা, আয়েশা। বাংলাদেশে নারী সমাজ ও নৈতিক সংকট। স্মারক সংকলন, বাংলাদেশ দর্শন সমিতির পত্রিকা, প্রথম খন্ড, বাংলাদেশ দর্শন সমিতি, ঢাকা: ১৯৮৫।

Dasgupta, S.N. *Obscure Religions Cults*. Calcutta: Firma K.L.M. Ltd. 1946।

Foot, Philippa (ed.). *Theories of Ethics*. London: Oxford University Press, 1968।

তরফদার, মমতাজুর রহমান। বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বরূপ ও সম্ভাবনা। বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪।

বটোমোর, টম. (অনুবাদক-হিমাচল চক্রবর্তী)। সমাজবিদ্যা, তত্ত্ব ও সমস্যার রূপরেখা। সাফা পাবলিকেশন্স, ২০০১।

দাশ, সত্যনারায়ন। বঙ্গদর্শন ও বাঙালির মনন সাধনা। জিজ্ঞাসা, ১৯৭৪।

রবীন্দ্র রচনাবলী। লক্ষ্য ও শিক্ষা। বিশ্বভারতী, ১৩৯৮।

Dewey, John. *Philosophy of Education*. New York: Pappya, 1959।

ওয়াহাব, শেখ আবদুল। কান্টের নীতিদর্শন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১৯৮২।

হক, আবুল কাশেম ফজলুল। জাতীয় শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য কিছু জরুরী বিবেচ্য। গণতান্ত্রিক ছাত্র কেন্দ্র, ঢাকা, ২০১৭।

Brubachr, John S. *Modern Philosophy of Education*. New York: MacGraw Hill Book Company, 1950।

দর্শন বিশ্বকোষ। খণ্ড-৩, ৪, ৭,।

The Chittagong University Journal of Arts and Humanities

খালেকুজ্জামান। *শিক্ষানীতি ও শিক্ষা সংকট প্রসঙ্গে*। শিক্ষা সম্মেলন স্মারক গ্রন্থ, সমাজচিন্তা ছাত্র ফ্রন্ট, ঢাকা, ২০০১।

করিম, সরদার ফজলুল। *দর্শন কোষ*। বাংলা একাডেমি, ১৯৭৩।

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা। খণ্ড-৭, ১১।

দা'ওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে 'হিকমত' অবলম্বনের তাৎপর্য: একটি প্রায়োগিক বিশ্লেষণ

ড. মুহাম্মদ নূরুল আমিন নূরী *

প্রতিপাদ্যসার: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোটা দা'ওয়াত বিশ্লেষণ এবং গবেষণা করলে এমন কতিপয় দা'ওয়াতের পদ্ধতি বেরিয়ে এসেছে যা একজন দা'ঈর জন্যে দা'ওয়াতের ময়দানে মাইলফল হিসেবে কাজ করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক দা'ওয়াতের ময়দানে 'হিকমত' অবলম্বনের তাৎপর্য এবং যে পদ্ধতিগত ধরণ ও প্রকৃতির অনুসরণ-অনুকরণ করে মানুষকে আল্লাহ তা'আলার দিকে আহ্বান করেছিলেন তা দলিলসহকারে সবিস্তারে আলোচনা করা হবে। যা একজন দা'ঈ নিজ দা'ওয়াতের ময়দানে এ গুলোর অনুসরণ করে দা'ওয়াত দিতে পারেন যার মাধ্যমে মানুষের চিন্তাশক্তিপিকরণে সহায়তা করবে। দা'ওয়াতের ময়দানে রাসূল মুহাম্মদ ﷺ-এর দা'ওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে 'হিকমত' অবলম্বনের তাৎপর্য ও প্রায়োগিক বিশ্লেষণ নিয়ে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আলোচনা-পর্যালোচনা করাই অত্র প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য।

ভূমিকা

আল্লাহ তা'আলার দিকে আহ্বানের ক্ষেত্রে অপরিহার্য বিষয় হিসেবে হিকমত তথা বৈজ্ঞানিক নীতিমালা ও দা'ওয়াতী কলা-কৌশল অবলম্বন করা অতীব জরুরি। তবে হিকমত তথা বৈজ্ঞানিক নীতিমালা ও দা'ওয়াতী কলাকৌশল ব্যবহারের ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করা দরকার। এক. দা'ওয়াতী তৎপরতায় হিকমতের অপরিহার্য বিষয়াবলিকে অনুসন্ধান করা। দুই. দা'ওয়াতী কর্মে হিকমত বিরোধী বিষয়াবলিকে বের করে নিয়ে আসা। যাতে দা'ওয়াতের বেলায় অপরিহার্য বিষয়াবলির বাস্তবরূপ দেওয়া এবং হিকমত বিরোধী বিষয়াবলিকে পরিহার করা সম্ভব হয়। দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত অবলম্বন করার মৌলিক ছয়টি উপাদান রয়েছে। যেমন, ভবিষ্যৎ ভালো পরিণতির প্রতি উত্তমরূপে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করে দা'ওয়াত পন্থা অবলম্বন করা। সুসংবাদের মাধ্যমে উৎসাহ দেওয়া এবং আতঙ্কিতকরণ পরিহার করা। সহজতর পথ অবলম্বন করা এবং কঠোরতা পরিহার করা। উপকরণসমূহ অবলম্বনসহ ক্রমধারা পদ্ধতি অবলম্বন করার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া। অত্র প্রবন্ধে হিকমতের অর্থগত ব্যবহার ও তাৎপর্য, হিকমতের পরিধি ও উপাদান এবং দা'ওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে হিকমত অবলম্বন করার মৌলিক উপাদানের প্রায়োগিক বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ এবং তাফসীরসমূহের আলোকে আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয়েছে।

হিকমত-এর আভিধানিক অর্থ

হিকমত (حِكْمَة) শব্দটি একবচন, বহুবচন-حِكْمَات হিকমাত, حِكْم হিকাম। অর্থ, জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, পাকা কথা, তদবির, বিচক্ষণতা, বিজ্ঞতা, সারগর্ভ উক্তি, তাৎপর্য, দর্শন, জ্ঞান-বুদ্ধির দ্বারা সত্য উপলব্ধি করার নাম হিকমত। অথবা হিকমত শব্দটি বাবে (مُكْرَمٌ مُكْرَمٌ) কারুমা-ইয়াকরুমু-এর মাসদার বা ক্রিয়া বিশেষ্য (মুখতার ১ : ৫৪০)।

* প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ফায়রুয আবাদী বলেন, হিকমাত যের যোগে হলে অর্থ, ন্যায়, জ্ঞান, ধৈর্য, নুবুওয়াত, কুরআন, ইনজিল (আল-ফায়রুয আবাদী ১ : ১০৯৫)।

হিকমত শব্দটি অভিধানে কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা-

এক. সঠিকতা ও দৃঢ়তা। যেহেতু কাজে-কর্মে সঠিকতার সাথে সুদৃঢ়তা অবলম্বনকারীকে হাকীম বলা হয়। যেমন শিল্পকলায় ভালো দক্ষতার পরিচয়ীর ক্ষেত্রেও হাকীম শব্দটি ব্যবহার করা হয় (ইবন মানজুর ১২ : ১৪০)। কুফবী বলেন, وَضْعُ الشَّيْءِ فِي مَوْضِعِهِ، وَصَوَابُ الْأَمْرِ وَسَدَادُهُ হিকমত হলো, প্রত্যেক বস্তুকে তার নির্দিষ্ট স্থানে রাখা এবং কাজের সঠিকতা ও দক্ষতা (আল-কুফবী তাবি ৩৮২)।

দুই. হিকমত অর্থ, বারণ করা, নিষেধ করা। আরবরা বলেন, হাকামতু, 'আহকামতু, হাক্কামতু-অর্থ, আমি বারণ করেছি, প্রতিরোধ করেছি, প্রত্যাখ্যান করেছি। যার কারণে মানুষের মধ্যে ফয়সালাকারীকে হাকিম বলা হয়; যেহেতু সে জালিমকে জুলুম থেকে বিরত রাখে (ইবন মানযূর ১২ : ১৪১)। বলা হয়, “হাকামাহ আনিল আমরি” অর্থ, তাকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে, অতঃপর রায় দিয়ে তাকে উদ্ভিষ্ট বিষয় হতে বারণ করা হয়েছে (আল-ফায়রুয আবাদী ১ : ১০৯৫)।

তিন. শিষ্টাচার সম্বলিত উপকারী বাক্য। ইবন দুরাইদ বলেন, “প্রত্যেক বাক্য যা তোমাকে উপদেশ দেয় বা ভর্ৎসনা করে অথবা তোমাকে সম্মানের দিকে আহ্বান করে কিংবা তোমাকে মন্দ থেকে বারণ করে তাই হলো হিকমত” (ইবন দুরাইদ ১ : ৫৬৪)।

চার. উত্তম জ্ঞানের মাধ্যমে উত্তম বিষয়ের পরিচয় পাওয়া অথবা আমল করার নিমিত্তে সর্বোত্তম কল্যাণের পরিচয় জানা।

পাঁচ. জ্ঞান ও সঠিক বুঝের অনুধাবন শক্তি। বলা হয়, হিকমত হলো، **الْكَلِمَةُ الْحَكِيمَةُ صَالَةُ الْمُؤْمِنِ** “মু’মিনের হারানো মূল্যবান সম্পদ” (আত-তিরমিযী ৫ : ২৬৮৭, ৫১; ইবন মাজাহ ৫ : ৪১৬৯, ২৬৯)।

ছয়। গুড়রহস্য ও কারণ: বলা হয়, "مَا الْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ؟" এর মধ্যে রহস্য কি? (মুখতার ১ : ৫৪০)। তবে প্রথম উক্তিটি আমার নিকট গ্রহণযোগ্য মত।

আল-কুরআনে হিকমতের বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার। আল-কুরআনে হিকমত শব্দটি সাতটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন-

﴿وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ﴾ يعني, (এক) হিকমত অর্থ উপদেশ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, “আর যে কিতাব ও জ্ঞানের কথা তোমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে যার হুদা তোমাদেরকে উপদেশ দান করা হয়” (সূরা তুল বাকারাহ, ২ : ২৩১)। অর্থাৎ-আল-কুরআনে আদেশ-নিষেধ সম্পর্কিত যে উপদেশ রয়েছে।

﴿يَا حَيُّ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتِنَاهُ الْحُكْمَ﴾ (দুই) হিকমত অর্থ বুঝা শক্তি ও বিশেষ জ্ঞান। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, **يَا حَيُّ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتِنَاهُ الْحُকْمَ**। **يَا حَيُّ** হে ইয়াহইয়া দৃঢ়তার সাথে এই গ্রন্থ ধারণ কর। আমি তাকে শৈশবেই বিচারবুদ্ধি দান করেছিলাম” (সুরাত মারইয়াম, ১৯ : ১২)। অর্থাৎ-বুঝা শক্তি ও বিশেষ জ্ঞান।

দাওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে 'হিকমত' অবলম্বনের তাৎপর্য: একটি প্রায়োগিক বিশ্লেষণ

(তিন) হিকমত অর্থ নুবুওয়াত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ يعني النبوة مع “আবশ্যই আমি ইব্রাহীমের বংশধরকে কিতাব ও হিকমত দান করেছিলাম” (সূরা তুন নিসা', ৪ : ৫৪)। অর্থাৎ-যাবুরসহ নুবুওয়াত।

(চার) হিকমত অর্থ আল-কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ﴾ يعني تفسیر “তিনি যাকে ইচ্ছা বিশেষ জ্ঞান দান করেন এবং যাকে বিশেষ জ্ঞান দান করা হয়, সে প্রভূত কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়” (সূরা তুল বাকারাহ, ২ : ২৬৯)। অর্থাৎ-আল-কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ।

(পাঁচ) হিকমত অর্থ পবিত্র কুরআন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ يعني “আপনি পালনকর্তার পথের প্রতি আহ্বান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিতে উত্তমরূপে” (সূরা তুন নাহল, ১৬ : ১২৫)। অর্থাৎ-পবিত্র কুরআন ও অন্যান্যের দ্বারা (আদ-দামগানী ১৪২)।

(ছয়) হিকমত অর্থ ইনজিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ﴾ “ঈসা যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ আগমন করল, তখন বলল, আমি তোমাদের কাছে প্রজ্ঞা নিয়ে এসেছি (সূরা তুয যুখরুফ, ৪৩ : ৬৩)। অর্থাৎ-ইনজিল নিয়ে এসেছি (মুখতার ১ : ৫৪০)।

(সাত) হিকমত অর্থ সুন্নাতে নববী। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ﴾ “যে কিতাব ও জ্ঞানের কথা তোমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে (সূরা তুল বাকারাহ, ২ : ২৩১)। অর্থাৎ-কিতাব ও সুন্নাতে নাবাবী (মুখতার ১ : ৫৪০)।

হিকমত-এর পারিভাষিক অর্থ

পরিভাষায় হিকমতের অসংখ্য অর্থ পাওয়া যায়। তবে নিম্নে প্রসিদ্ধ কয়েকটি অর্থ উল্লেখ করা হলো।

ইমাম রাগিব (র.) বলেন, হিকমত হলো, إصَابَةُ الْحَقِّ بِالْعَقْلِ وَالْعَمَلِ “জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা সঠিকতায় পৌঁছে যাওয়া।” আর হিকমত শব্দটি আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত করা হলে এর অর্থ হবে, مَعْرِفَةُ الْأَشْيَاءِ وَإِجَادُهَا عَلَى غَايَةٍ “সমগ্র বস্তুর পূর্ণ জ্ঞান এবং তাকে সঠিক ভাবে সৃষ্টি করা। মানুষের ক্ষেত্রে হিকমত ব্যবহার হলে এর অর্থ হবে, বস্তুসমূহের জ্ঞান লাভ করা এবং ভালো কাজে তার ব্যবহার করা (রাগিব ২৪৯)। ইবন জাযী বলেন, الْحِكْمَةُ هِيَ الْكَلَامُ الَّذِي يَظْهَرُ صَوَابُهُ “ঐ কথা যার সঠিকতা সুস্পষ্ট” (ইবন জাযী ১ : ৪৩৮)। আলুসী ও আবু হায়ান (র.) বলেন, “ঐ বিশুদ্ধ বাক্যকে হিকমত বলা হয়, যা মানুষের মনে আসন করে নেয়” (আল-আলুসী ৭ : ৪৮৭; আবু হায়ান ৬ : ৬১২-৬১৩)।

যামাখশারী (র.) বলেন, হিকমত হলো, বিশুদ্ধ দৃঢ় বাক্য তথা সত্য সুস্পষ্টকারী দলীল যা সন্দেহ দূরীভূত করবে। আলুসী, বায়দাবী ও আবুস সাউদও এ মত অবলম্বন করেছেন (আয-যামাখশারী ২ : ৬৪৪; আল-আলুসী, ৭ : ৪৮৭; আবুস সা'উদ তাবি ৫ : ১৫১)। 'ইসমাঈল হক্কী (র.) বলেন, হিকমত বলে সে অন্তর্দৃষ্টিকে বুঝানো হয়েছে, যার সাহায্যে মানুষ অবস্থার তাগিদ জেনে নিয়ে তদনুযায়ী কথা বলে। এমন সময় ও সুযোগ খুঁজে নেয়, যা প্রতিপক্ষের উপর বোঝা হয় না। নশতার স্থলে নশতা এবং কঠোরতার স্থলে কঠোরতা অবলম্বন করে। যেখানে মনে করে যে, স্পষ্টভাবে বললে প্রতিপক্ষ লজ্জিত হবে সেখানে ইঙ্গিতে কথা বলে কিংবা এমন ভঙ্গি অবলম্বন

করে, যদ্বরূপ প্রতিপক্ষ লজ্জার সম্মুখীন হয় না এবং তার মনে একগুঁয়েমিভাবও সৃষ্টি হয় না (আল-খুলুতী তাবি ৫ : ৯৮)। ইবন ‘আতিয়াহ্ (র.) বলেন, নশ্তা অবলম্বন করে আল্লাহ্র দীন ও শরী‘আতের দিকে সহজতর বিশুদ্ধ বাক্য শুনাইয়ে দা‘ওয়াত দেওয়া যা অস্তুরে সুন্দররূপে জায়গা করে নেয় (ইবন ‘আতিয়াহ্ ৩ : ৪৩২)। ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, কোমলতা ও নমনীয়তা অবলম্বন এবং কঠোরতা, অমসৃণতা ও রুঢ় ভাষা পরিহার পূর্বক আল্লাহ্র দীন ও শরী‘আতের দিকে আহ্বান করা (আল-কুরতুবী ১০ : ২০০)।

এককথায় প্রত্যেক বস্তুকে তার নির্দিষ্ট স্থানে রাখা এবং কাজের সঠিকতা ও দক্ষতা এবং বিশুদ্ধ বাক্যকে হিকমত বলা হয়, যা মানুষের মনে আসন করে নেয়। নশ্তা, কোমলতা ও নমনীয়তা অবলম্বন এবং কঠোরতা, অমসৃণতা ও রুঢ় ভাষা পরিহার পূর্বক আল্লাহ্র দীন ও শরী‘আতের দিকে আহ্বান করা। মূলত হিকমত বলে সে অন্তর্দৃষ্টিকে বুঝানো হয়েছে, যার সাহায্যে মানুষ অবস্থার তাগিদ জেনে নিয়ে তদনুযায়ী কথা বলে।

হিকমত-এর তাৎপর্য

আল-কুরআনে বর্ণিত হিকমত সম্বলিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আয়াতের বিশ্লেষণের মাধ্যমে হিকমতের তাৎপর্য আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।

আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾ “আল্লাহ্র আয়াত ও জ্ঞানগর্ভ কথা, যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয় তোমরা সেগুলো স্মরণ করবে” (সূরাতুল ‘আহযাব, ৩৩ : ৩৪)।

এখানে হিকমত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল-কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। ইবন ‘আব্বাস (রা.) বলেন, এখানে হিকমত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল-কুরআনের জ্ঞান, নাসিখ-মানসূখ, মুহকাম-মুতাশাবিহ, হালাল-হারাম ইত্যাদি (ইবন কাছীর তাফসীরুল কুরআনিল আজীম ১ : ৩১৫)। ইবন দুরাইদ (র.) বলেন, হিকমত হলো, আল-কুরআনের আয়াতের জ্ঞান ও এর হুকুম। সুদী (র.) বলেন, হিকমত হলো, নুবুওয়াত। কেউ কেউ বলেন, হিকমত হলো, আল-কুরআনের বাস্তবতা অনুধাবন করা (রাগিব ২৫০)।

আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ “তিনি যাকে ইচ্ছা বিশেষ জ্ঞান দান করেন এবং যাকে বিশেষ জ্ঞান দান করা হয়, সে প্রভুত কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়। উপদেশ তারাই গ্রহণ করে, যারা জ্ঞানবান” (সূরাতুল বাকারাহ্, ২ : ২৬৯)।

হিকমত এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারকগণের অসংখ্য উদ্ধৃতি রয়েছে। নিম্নে প্রসিদ্ধ উক্তিগুলো পেশ করা হলো।

ইবন ‘আব্বাস (রা.) বলেন, এর অর্থ, কুরআনের তাফসীর, আবু মালিক (র.) বলেন, সুন্নাহ। মুজাহিদ (র.) বলেন, মতামতের নির্ভুলতা, জ্ঞান, সুস্থ বুদ্ধি, কুরআন ও লিখনি শক্তি। মালিক (র.) বলেন, ধর্মের বোধশক্তি। আবুল ‘আলিয়া (র.) বলেন, কিতাব ও বোধশক্তি। ইব্রাহিম (র.) বলেন, হিকমত ও বুঝ। যায়দ (র.) বলেন, বুদ্ধি-বিবেক। কেউ বলেন, ধর্মের বোধ। সুদী (র.) বলেন, নুবুওয়াত, আবুল ‘আলিয়া (র.) বলেন, আল্লাহ্র ভয়। হাদীছে এসেছে, رأس الحكمة محافة الله, আল্লাহ্র ভয়ই প্রকৃত হিকমত (ইবন কাছীর তাফসীরুল কুরআনিল আজীম, ১ : ৩১৫-৩১৬)। ইব্রাহীম, কাতাদাহ্ (র.) বলেন, হিকমত হলো, পবিত্র কুরআন বুঝা। ইবন নাজীহ (র.) বলেন, কথা ও কর্মে সঠিকতায় পৌছা। হাসান (র.) বলেন, আল্লাহ্র ধর্মে পরহেযগারী অবলম্বন করা। যায়দ (র.) বলেন, আল্লাহ্র নির্দেশের ক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তা। শরীক (র.) বলেন, বিশুদ্ধ জ্ঞান। ইবন কুতায়বা (র.) বলেন, জ্ঞান ও আমলের সমন্বয়। ইবনুল মুকাফ্ফা (র.) বলেন, যার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে বিবেক সাক্ষ্য দেয়। ইবনুল কাসিম (র.) বলেন, আল্লাহ্র বিষয়ে গবেষণা করা এবং এর অনুসরণ করা। আবু ‘উছমান বলেন, এমন

আলো যার মাধ্যমে আসল বিষয় ও কুমন্ত্রণার মধ্যে পার্থক্য করা যায়। বুনদার (র.) বলেন, সঠিক ভাবে দ্রুত উত্তর দেওয়া। কেউ বলেন, সৎকর্ম ও সত্য কথা। কেউ বলেন, এমন বিষয় যার উপর অন্তর সম্ভুষ্ট হয়। কেউ বলেন, আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান কিংবা দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ। কেউ বলেন, সর্বাবস্থায় সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে এগুলোর মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। অভিব্যক্তির পার্থক্য মাত্র। যেহেতু হিকমত শব্দটি **حكمة**-এর ধাতুগত শব্দ। এর অর্থ, কোনো কর্ম অথবা উক্তিকে তার গুণাবলিসহ পূর্ণ করা। একারণেই আবু হায়ান বলেন, হিকমত হলো, প্রত্যেক বস্তুকে যথাস্থানে স্থাপন করা (আবু হায়ান ১৪২০, ২ : ৬৮৩-৬৮৪)। ইবন জরীর বলেন, কথা ও কর্মের বিশুদ্ধতা। এটিই বিশুদ্ধ মত (আত-তাবারী ৩ : ৮৭)।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, **ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ** “আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহ্বান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে” (সূরা তুন নাহ্ল, ১৬ : ১২৫)।

উক্ত আয়াতে বর্ণিত হিকমতের ব্যাখ্যায় উলামায়ে কিরামের উক্তি নিম্নরূপ,
ইবন কাছীর ইমাম ইবন জারীর তাবারী (র.)-এর বরাতে দিয়ে বলেন, অত্র আয়াতে হিকমত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ঐ সমস্ত বিষয় যা রাসূলুল্লাহ **ﷺ**-এর উপর কিতাব ও সুন্নাতের মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে (ইবন কাছীর তাফসীরুল কুরআনিল আজীম ১ : ৩১৫; আত-তাবারী ৩ : ৮৭)।

ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, **أَنَّ الْحُكْمَةَ الْقُرْآنُ** হিকমত হলো, পবিত্র কুরআন (আবু হায়ান, ৬ : ৬১৩)। হিকমত সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের ব্যাখ্যা বিভিন্ন হলেও মূলত সবগুলো কাছাকাছি অর্থবোধক। তবে আমার নিকট সর্বোৎকৃষ্ট মত হলো 'ইমাম তাবারীর মতটি। অর্থাৎ কথা ও কাজে সঠিকতায় পৌছাই হলো হিকমত (আত-তাবারী ১৪২০ : ২০০০, ৩ : ৮৭)। তবে মূলত সঠিকতা হলো, যা কিতাব ও সুন্নাতে মোতাবেক হবে। সেটি হলো, আল্লাহর ভয় অন্তরে পোষণ করে ইখলাসের সাথে কুরআন ও সুন্নাহর শক্তিশালী দলীল অনুযায়ী কথার বিশুদ্ধ ব্যবহারের নাম হিকমত।

হিকমতের পরিধি ও উপাদান

একজন দা'ঈর জন্য দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে অপরিহার্য বিষয় হিসেবে হিকমত অবলম্বন করার ক্ষেত্রে কয়েকটি দায়িত্ব রয়েছে।

১. দা'ওয়াতী তৎপরতায় হিকমতের অপরিহার্য বিষয়াবলিকে অনুসন্ধান করা।
২. দা'ওয়াতী তৎপরতায় হিকমত বিরোধী বিষয়াবলিকে বের করে নিয়ে আসা। যাতে দা'ওয়াতের বেলায় সেগুলো পরিহার করা সম্ভব হয় এবং বিজ্ঞ দা'ঈ আল্লাহ তা'আলার দিকনির্দেশনার বিপরীতে না পড়ে যায়।

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত অবলম্বন করার মৌলিক ছ'টি উপাদান রয়েছে। যেমন-

এক. ভবিষ্যৎ ভালো পরিণতির প্রতি উত্তমরূপে চিন্তা-ফিকর করে হিকমত পস্থা অবলম্বন করা।

দুই. সুসংবাদে মাধ্যমে উৎসাহ দেওয়া এবং আতঙ্কিতকরণ পরিহার করা।

তিন. সহজতর পথ অবলম্বন করা এবং কঠোরতা পরিহার করা।

চার. উপকরণ ও উপাদান এবং মাধ্যম অবলম্বন করা।

পাঁচ. আমন্ত্রিতদের সার্বিক এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার রেয়াতপূর্বক দা'ওয়াতী কর্ম পরিচালনা করা।

ছয়. ক্রমাগতধারা পদ্ধতি সুন্দররূপে বাস্তবায়ন করা এবং গুরুত্বপূর্ণটি সর্বপ্রথম অগ্রাধিকার দিবে এরপর কম গুরুত্বপূর্ণটি গ্রহণ করবে।

দা'ওয়া ও তাবলীগের ক্ষেত্রে হিকমত অবলম্বনের প্রায়োগিক বিশ্লেষণ

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত অবলম্বন করার মৌলিক ছ'টি উপাদানের ব্যাখ্যা করলেই দা'ওয়া ও তাবলীগের ক্ষেত্রে হিকমত অবলম্বনের প্রায়োগিক বিশ্লেষণ আমাদের সামনে প্রস্ফুটিত হবে ইনশাআল্লাহ তা'আলা।

এক. ভবিষ্যৎ ভালো পরিণতির প্রতি উত্তমরূপে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করে হিকমত পছন্দ অবলম্বন করা

একজন দা'ঈ আল্লাহ তা'আলার দিকে আহ্বান করার ক্ষেত্রে অন্যতম হিকমত হলো, প্রতিটি কর্ম সম্পাদন, ও কথার ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্পর্কে গভীর চিন্তা-গবেষণা পূর্বক সামনের দিকে অগ্রসর হবে। দা'ঈ নিজেই দা'ওয়াতী কর্ম সম্পাদনের দূরদর্শীতার পরিচয় দিবে এবং যে-কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করবে না বরং এই পদক্ষেপ গ্রহণ করলে ভবিষ্যতে কি কি সমস্যা হতে পারে সে বিষয়ে সুদূরপ্রসারী চিন্তা-ভাবনা করবে। আর এই পরিকল্পনা গ্রহণ করলে কি ফলাফল বের হবে এর উপর তুলনামূলক পর্যালোচনা করবে। এটি এই জন্য যে, যাতে করে ইসলামী দা'ওয়াতের স্বার্থ সংরক্ষণ থাকে ও আল্লাহ তা'আলার দীন প্রচারের ক্ষেত্রে সফলতাও স্থায়ী হয় এবং দা'ওয়াতী কর্ম ও দা'ঈকে যে-কোনো প্রকার ক্ষতি থেকে নিরাপদ রাখা যায়। সুতরাং দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত হলো, দা'ওয়া কার্যক্রম, দা'ঈ এবং সাধারণ মুসলমানদেরকে এমন বিষয়সমূহ পরিহার করা অপরিহার্য যা দা'ওয়াতী কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টি করতে পারে অথবা দা'ওয়াতের মিশনকে সম্পূর্ণ বিফল করে দিতে পারে।

এ পর্যায়ে আল-কুরআনের দিকনির্দেশনা রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি কর্ম ও কথার ভবিষ্যৎ পরিণতির রেয়াত করে কর্ম ও কথা পরিচালনার নিয়মনীতি সম্পর্কে বলেন, ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ﴾ “তোমরা তাদেরকে মন্দ বলো না, যাদের তারা আরাধনা করে আল্লাহকে ছেড়ে। তাহলে তারা ধৃষ্টতা করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে মন্দ বলবে” (সূরা তুল 'আন'আম, ৬ : ১০৮)।

আয়াতের শানে নুযূল: ইবন 'আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিতৃব্য আবু তালিব যখন অস্তিম রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন, তখন মক্কার মুশরিক সর্দাররা আবু তালিবকে বলল, আপনি জানেন, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ আমাদের এবং আমাদের উপাস্যদের ভীষণ কষ্টে ফেলে রেখেছেন। আমাদের অনুরোধ এই যে, তিনি যদি আমাদের উপাস্যদের মন্দ না বলেন, তবে আমরা তাঁর সাথে সন্ধি স্থাপন করব। তিনি যেভাবে ইচ্ছা নিজ ধর্ম পালন করবেন। আমরা কিছুই বলব না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বললেন, যদি আমি আপনাদের কথা মেনে নেই, তবে আপনারা কি এমন একটি বাক্য উচ্চারণ করতে সম্মত হবেন, যা উচ্চারণ করলে আপনারা সমগ্র আরবদের প্রভু হয়ে যাবেন। আবু জাহাল বলল, বলুন বাক্যটি কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। একথা শুনতেই তারা উত্তেজিত হয়ে উঠল। আবু তালিবও রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, ভ্রাতুষ্পুত্র এ বাক্য ছাড়া অন্য কোন কথা বলুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, চাচাজান, আমি এ কালিমা ছাড়া অন্য কোন কালিমা বলতে পারি না। যদি তারা আকাশ থেকে সূর্যকে নিয়ে আসে এবং আমার হাতে রেখে দেয়, তবুও আমি এ কালিমা ছাড়া অন্য কিছু বলব না। এতে তারা অসন্তুষ্ট হয়ে বলতে লাগল। হয় আপনি আমাদের উপাস্য প্রতিমাদের মন্দ বলা থেকে বিরত হবেন^১, না হয় আমরা আপনাকে গালি দেব এবং ঐ সত্তাকেও, আপনি

নিজেকে যার রাসূল বলে দাবী করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য 'আয়াত অবতীর্ণ হয় (আত-তাবারী ১২ : ৩৪; আল-কুরতুবী ৭ : ৬১)।

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, উলামায়ে কিরাম বলেন, অত্র 'আয়াতের হুকুম এই উম্মতের উপর সার্বক্ষণিক বহাল রয়েছে। যখনই কাফিরদের পক্ষ থেকে এই আশংকা থাকবে যে, তারা ইসলাম অথবা নবী করীম ﷺ কিংবা আল্লাহ তা'আলাকে মন্দ ও গালিগালাজ করবে, তখন কোন মুসলমানদের জন্য তাদের ক্রুশ বা তাদের ধর্ম কিংবা তাদের গীর্জাকে উদ্দেশ্য করে গালি দেওয়া বৈধ নয়। আর তাদের ব্যাপারে এমন কোন কাজও করা যাবে না যা তাদেরকে এই অপকর্মে লিপ্ত হতে বাধ্য করবে (আল-কুরতুবী, ৭ : ৬১)। 'আবু হায়ান বলেন, আয়াতে সম্বোধনকে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে ঘুরিয়ে সাধারণ মুসলমানদের দিকে করে দিয়ে لَا تَسُبُّوا (বহুবচনের রূপ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে এ দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তো কখনও কাউকে গালি দেননি। কাজেই সরাসরি তাঁকে সম্বোধন করলে তাঁর মনোকষ্টের কারণ হতে পারে। তাই ব্যাপক সম্বোধন করা হয়েছে। ফলে সব সাহাবায়ে-কিরামও এ ব্যাপারে সাধারণ হয়ে যান (আবু হায়ান ৬ : ৬১০-৬১১)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনীতে ভবিষ্যত পরিণতি ও ফলাফলের উপর উত্তমরূপে চিন্তা-গবেষণা করে কাজ করার অসংখ্য উদাহরণ ও উপমা পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

প্রথম. মক্কী জীবনে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদেরকে কাফিররা কষ্ট দেওয়ার মুকাবেলায় বস্তুগত শক্তি ব্যবহার নিষেধ করলেন এবং কাফিরদের সম্মুখে সরাসরি তলোয়ার ব্যবহারের অনুমতি কাউকে প্রদান করেননি। অথচ মুসলমানদের মধ্যে 'উমর (রা.) এবং হামযা (রা.) এর মত বীর পুরুষও বিদ্যমান ছিলেন। কাফিরদের পক্ষ থেকে কঠিন নির্যাতন ও বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি কাউকে যুদ্ধ করার অনুমিত প্রদান করেননি। মুশরিকরা মুসলমান এবং তাদের সহযোগীদেরকে শি'আবে আবী তালিবে তিন বছর অবরুদ্ধ করে রেখে ছিল। খাদ্যসামগ্রীর সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে অবরুদ্ধদের অবস্থা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। গাছের পাতা এবং চামড়া খেয়ে তাদের জীবন ধারণ করতে হয়। ক্ষুধার কষ্ট এতো মারাত্মক ছিলো যে, নারী ও শিশুদের কাতর কান্নার শব্দ শি'আবে আবী তালিবের বাইরে থেকে শোনা যায় (আল-মুবারকপুরী ১১৩-১১৩)। যদি মুসলমানরা প্রথম পর্যায়ে যুদ্ধ ও প্রতিশোধ এবং কঠোরতার পথে চলতো তাহলে তাদেরকে মুশরিকরা সমূলে বিনাশ করে দিত। পাশাপাশি এর পরিণতিতে দাওয়াত ও মুসলমানদের অনেক ক্ষতি হয়ে যেত। এটি ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কৌশলগত বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক ধারা। ভালো-মন্দের তুলনামূলক প্রাধান্য এবং বড় ক্ষতি থেকে উত্তরণের নিমিত্তে সহজতর ক্ষতিকে মেনে নেওয়া। এটিই হলো, ফকীহদের নীতি যার উপর দাঈদের প্রশিক্ষণ নেওয়া উচিত এবং দৃঢ়তা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন।

দ্বিতীয়. ভবিষ্যত পরিণতি ও ফলাফলের উপর উত্তমরূপে চিন্তা-গবেষণার আর একটি উদাহরণ হলো, “রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আয়িশা (রা.)-কে বললেন, তুমি কি জান না! তোমার সম্প্রদায় যখন কা'বা ঘরের পুনঃনির্মাণ করেছিলেন তখন ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক কা'বা ঘরের মূল ভিত্তি থেকে তা সংকুচিত করেছিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি একে ইবরাহীমী ভিত্তির উপর পুনঃস্থাপন করবেন না? তিনি বললেন, যদি তোমার সম্প্রদায়ের যুগ কুফরীর নিকটবর্তী না হত তাহলে অবশ্যই আমি তা করতাম (আল-বুখারী আস-সহীহ, ২ : ১৫০৬/৫৭৩; আল-কুশায়রী, ২ : ১৩৩৩/৯৬৯)।

তৃতীয়. ভবিষ্যত পরিণতির উপর সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনার উদাহরণ হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সালুলের বিভিন্ন মুনাফিকী কার্যকলাপের উপর ধৈর্যধারণ করেছেন। সে মুসলিম

সমাজে বিভিন্ন মিথ্যা ষড়যন্ত্র করতো এবং ফিতনা ছড়িয়ে দিতো। কিন্তু সে ছিল তার সম্প্রদায়ের নেতা। যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে হত্যা করতেন, তাহলে তার পক্ষ হয়ে অনেক লোক উত্তেজিত হয়ে আসতো। হতে পারে এরই কারণে মদীনা শরীফে ইসলামী রাষ্ট্রের মূলভিত্তি নড়বড়ে হয়ে যেতো। ইবন উবাই ইবন সালুল-এর সাথে আচরণের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুদূরপ্রসারী চিন্তাধারার ফলাফল এই ঘটল যে, এর পর ইবন উবাই যখনই কোন ষড়যন্ত্র করতো, তখন তার সম্প্রদায়ের লোকেরাই তাকে ভৎসনা করতো, তিরস্কার করতো এবং কঠোর ভাষায় গালিগালাজ করতো। তার ব্যাপারে তার নিজ সম্প্রদায়ের এই অবস্থানের খবর যখন নবী করীম ﷺ জানতে পারলেন, তখনই রাসূলুল্লাহ ﷺ ‘উমর (রা.)-কে বললেন, হে ‘উমর! তুমি এখন বুঝতে পারছো? আল্লাহর শপথ! তুমি যেদিন তাকে হত্যা করতে বলছিলে, আমি যদি হত্যা করতাম তাহলে বিরাট সমস্যা সৃষ্টি হতো। তবে আজকে তুমি যদি হত্যা করতে বলতে তাহলে আমি তাকে হত্যা করতাম। তখন ‘উমর (রা.) বললেন, আমি বুঝতে পারলাম, আমার নির্দেশের চেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ অধিক বরকতময় ছিল (ইবন হিশাম ২ : ২৯৩)। তদুপরি ইবন উবাইকে হত্যা না করার আর একটি মহান উদ্দেশ্য ছিল, যা তিনি নিজেই সুস্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন, «لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّهُ كَانَ يُقْتَلُ أَصْحَابَهُ» “যাতে জনগণ এ কথার বুলি না উড়ায় যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর সঙ্গীদেরকে হত্যা করে থাকে” (আল-বুখারী আস-সহীহ ৩ : ৩৩৩০/১২৯৬)।

দুই. সুসংবাদের মাধ্যমে উৎসাহ দেওয়া এবং আতঙ্কিতকরণ পরিহার করা

দা’ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত হলো, দা’ওয়াতের ক্ষেত্রে সুসংবাদের মাধ্যমে উৎসাহ দেওয়া এবং আতঙ্কিতকরণ পরিহার করা। দা’ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত হলো, দা’ঈ যাদেরকে আহ্বান করবে তাদের নিকট প্রিয় হওয়ার চেষ্টা করবে ও ভালোবাসা দিয়ে গ্রহণ করবে। এমন কোন কথা বা কাজ করবে না যার কারণে দা’ঈ তাদের নিকট অপ্রিয় হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁর কোন সাহাবীকে কোন কাজে প্রেরণ করতেন, তখন তাঁকে বলে দিতেন, «بَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا، وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا» “তোমরা লোকদেরকে শুভ সংবাদ দেবে; ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়াবে না, সহজ পন্থা অবলম্বন করবে; কঠিন পন্থা পরিহার করবে” (আল-কুশায়রী ৩ : ১৭৩২/১৩৫৮)।

শুভ সংবাদ দেওয়ার দুটি পদ্ধতি রয়েছে

(ক). মিষ্টি ভাষায় কথা বলা এবং নম্র পদ্ধতি অবলম্বন করা

দা’ওয়াতী কার্যক্রমে নম্রতা অবলম্বন করা পারস্পরিক সেতু বন্ধনের ন্যায়। এরকম আল্লাহ তা’আলার নির্দেশও ছিল যখন হযরত মুসা ও হারুন (আ.)-কে অবাধ্য ফিরাউনের নিকট পাঠালেন, ﴿ادْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ فَقُولَا لَهُ ۖ قَوْلًا لِّبَنَاتِهِ يَنْتَكِرُ أَوْ يَخْشَىٰ﴾ “তোমরা উভয়ে ফিরাউনের কাছে যাও, সে খুব উদ্ধত হয়ে গেছে। অতঃপর তোমরা তাকে নম্র কথা বল, হয়তো সে চিন্তাভাবনা করবে অথবা ভীত হবে” (সূরা তুহা, ২০ : ৪৩-৪৪)। ইবন কাছীর (র.) বলেন, “এই আয়াতে শিক্ষণীয় বিষয় হলো, ফিরাউন হচ্ছে চরম অহংকারী ও আত্মভরী। পক্ষান্তরে হযরত মুসা (আ.) হলেন অত্যন্ত ভদ্র ও নির্মল চরিত্রের অধিকারী। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তাঁকে তার সাথে নম্রভাবে কথা বলার নির্দেশ দিচ্ছেন। যেমন আল্লাহ তা’আলা বলেন, “হে নবী ﷺ! তোমার প্রতিপালকের পথে হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে (মানুষকে) আহ্বান কর এবং উত্তম পন্থায় তাদেরকে বুঝাতে থাকো” (সূরা তুহা নাহল, ১৬ : ২৫)। (ইবন কাছীর তাফসীরুল কুরআনিল আজীম ৩ : ১৫৯)।

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, অত্র আয়াতে যখন মুসা (আ.)-কে ফিরাউনের সাথে নম্র কথা বলার জন্য নির্দেশ দেওয়া হল, তখন অন্যান্যদের সাথেও উচিত সংকাজের আদেশ ও দা’ওয়াতের ক্ষেত্রে তাঁরই অনুরণন করা,

যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ “তোমরা মানুষের সঙ্গে উত্তম কথা বলবে” (সূরা তুল বাকারাহ, ২ : ৮৩). (আল-কুরতুবী ১১ : ২০০)। মুফতী শফী (র.) বলেন, “এতে বলা হয়েছে যে, প্রতিপক্ষ যতই অবাধ্য এবং ভ্রান্ত বিশ্বাস ও চিন্তাধারার বাহক হোক না কেন, তার সাথেও সংস্কার ও পথপ্রদর্শনের কর্তব্য পালনকারীদের হিতাকাঙ্ক্ষীর ভঙ্গিতে নম্রভাবে কথাবার্তা বলতে হবে। এরই ফলশ্রুতিতে সে কিছু চিন্তাভাবনা করতে বাধ্য হতে পারে এবং তার অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হতে পারে” (শফী ৬ : ১০৬)।

(খ). হাদিয়া ও উপহার দিয়ে মানুষের অন্তর জয় করা

বলা হয়, হাদিয়া হলো, ভালোবাসার দূত এবং প্রিয় হওয়ার মাধ্যম। এরই মাধ্যমে অন্তরের হিংসা ও দুশ্চিন্তা দূরীভূত হয়ে যায়। যার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, «مَهَادُوا نَحَابُوا» “তোমরা হাদিয়া প্রদান কর এবং পরস্পর মুহাব্বত কর” (আল-বুখারী আল-আদাবুল মুফরাদ ১ : ৫৯৪/২০৮)। নবী করীম ﷺ হুনায়েন যুদ্ধে সাফওয়ান ইবন উয়াইনাহ (রা.)-কে একশত উট প্রদান করলেন, অতঃপর একশত উট প্রদান করলেন, অতঃপর একশত উট প্রদান করলেন। সাফওয়ান বললেন, «وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَعْطَانِي، وَإِنَّهُ لَأُبْغِضُ النَّاسَ إِلَيَّ، فَمَا بَرَحَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لَأَحِبُّ النَّاسَ إِلَيَّ» “আল্লাহর শপথ করে বলছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও, তিনি আমাকে অনেক অনেক দান করার কারণে তিনি আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে গেলেন” (আল-কুশায়রী ৪ : ২৩১৩/১৮০৬)।

দাওয়াতের ক্ষেত্রে আতঙ্কিতকরণ পরিহার করা এবং ঘৃণা-বিদ্বেষ না ছড়ানো- এটি চারভাবে হতে পারে,

(ক). মানুষের সাথে সরাসরি এমন বিষয়ে কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা যা তারা অপছন্দ করবে

যেমন সরাসরি তাদের ভুল ধরে দেওয়া বা তাদের পাপের কথা প্রকাশ করা অথবা জনসমাবেশে অভিযুক্তদের নাম প্রকাশ করে দেওয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন ত্রুটি বা পাপ থেকে বারণ করার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম বলতেন না। বরং তিনি বলতেন, “তোমাদের কি হয়েছে! তোমাদের কেউ যখন তার প্রভুর সামনে দণ্ডায়মান হয়ে সামনের দিকে থুথু নিক্ষেপ করবে কেন? তোমাদের কেউ কি এটি পছন্দ করবে যে, তার মুখোমুখি হয়ে তার সামনে থুথু করবে? যখন তোমাদের কেউ থুথু করবে, তখন তার বাম পায়ে নীচে থুথু নিক্ষেপ করবে। যদি তা না কর তাহলে এভাবে করবে, নিজের কোন কাপড়ে থুথু নিক্ষেপ করবে অতঃপর এক অংশের সাথে অন্য অংশ মুড়িয়ে নিবে” (আল-কুশায়রী ১ : ৫৫০/৩৮৯)।

(খ). দাওয়াত কবুলকারীদের দুর্বলতা ও ভুলত্রুটির উপর ধৈর্যধারণ করা

প্রত্যেক কাজের তিরস্কার ও হিসাব গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা। যেহেতু প্রতিটি কর্মে হিসাব চাওয়া বিরজিকর। কেননা মানুষ বেশি বেশি ভুল করা সত্ত্বেও স্বভাবগত ভাবে হিসাব নেওয়াকে অপছন্দ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ জনগণের অনেক কষ্ট সহ্য করতেন। তাদের মধ্যে অপছন্দনীয় অনেক বিষয় দেখতে পেতেন, তবে তিনি তা উপেক্ষা করতেন এবং হিসাবও নিতেন না। আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “পর্দার ভেতরে কুমারীদের চেয়েও নবী করীম ﷺ বেশী লাজুক ছিলেন। যখন তিনি তাঁর কাছে অপছন্দনীয় কিছু দেখতেন, তখন আমরা তাঁর চেহারাতেই এর আভাস পেয়ে যেতাম” (আল-বুখারী আস-সহীহ ৫ : ২৩২০/১৮০৯)। যদি কোন সময় তিরস্কার করতে বাধ্য হতেন তাও অতি নম্রতা ও ভদ্রতার সাথে করতেন। যেমন 'আনস (রা.) বলেন, “রাসূলুল্লাহ ﷺ গালিগালাজকারী, অশালীন ও অভিশাপদাতা ছিলেন না। তিনি আমাদের কারো উপর নারায়

হলে, কেবল এটুকু বলতেন, তার কি হলো! তার কপাল ধুলাময় হোক” (আল-বুখারী আ/স-সহীহ ৫ : ৫৬৮৪/২২৪৩)।

(গ). এমন বিষয়ও পরিহার করা যা মানুষকে ফিতনায় নিমজ্জিত করার সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও তা বৈধ হয়।

অর্থাৎ হিকমত হলো, এমন বিষয়ও পরিহার করা দা’ওয়াত গ্রহণকারীদের মধ্যে ফিতনা ছড়িয়ে দিবে। ফলে তারা দা’ঈর পক্ষে-বিপক্ষে দুটি দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। একদল দা’ঈর পক্ষ অবলম্বন করবে আর একদল বিরুদ্ধে লেগে যাবে। ফলে দা’ওয়াতী কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবে এবং পরস্পর সম্পর্কে ভাটা পড়ে যাবে। এ কারণে ‘আলী (রা.) বলেন, *لَا تَعْرِفُونَ النَّاسَ، مَا يَعْرِفُونَ أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ، اللَّهُ وَرَسُولُهُ*, বলেন, “মানুষের কাছে সেই ধরনের কথা বল, যা তারা বুঝতে পারে। তোমরা কি পছন্দ কর যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হোক? (আল-বুখারী আ/স-সহীহ ১ : ১২৭/১৫৯)। ‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাস’উদ (রা.) বলেন, *مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ*, “তুমি কোন সম্প্রদায়ের নিকট এমন হাদীছ বর্ণনা করবে না যা তাদের জ্ঞান-বুদ্ধির ধারণক্ষমতার বাইরে। ফলে এ বক্তব্যের কারণে তাদের অনেকের ফিতনায় পড়ার আশঙ্কা রয়েছে” (আল-কুশায়রী তাবি ১ : ৫/১১)।

(ঘ). দা’ঈ সন্দেহমূলক কর্মকাণ্ড থেকে বেঁচে থাকা

যাতে শত্রুরা এটিকে দা’ঈ থেকে মানুষদেরকে দূরে সরিয়ে দেয়ার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে না পারে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ঐ সমস্ত পথ বন্ধ করা যার মাধ্যমে দা’ঈ বা দা’ওয়াতের ব্যাপারে অভিযোগ সৃষ্টি করতে পারে ভুল ব্যাখ্যা এবং সন্দেহমূলক ফিতনা প্রসারের মাধ্যমে। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনে সুন্দর উদাহরণ রয়েছে। ‘আলী ইবনুল হুসায়ন (রা.) বলেন, আমাকে সাফিয়্যা (রা.) বর্ণনা করে বলেন, একবার তিনি রামাদানের শেষ দশকে মসজিদে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে হাযির হন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ই’তিকাফরত ছিলেন। তিনি তাঁর সংগে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলেন। তারপর ফিরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ান। নবী করীম ﷺ তাঁকে পৌছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়ালেন। যখন তিনি (উম্মুল মু’মিনীন) উম্মে সালমা (রা.)-এর গৃহ সংলগ্ন মসজিদের দরজা পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন দু’জন আনসারী সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাম করলেন। তাঁদের দু’জনকে নবী ﷺ বললেন, তোমরা দু’জন থাম!। ইনি তো (আমার স্ত্রী) সাফিয়্যা বিনত হুয়ায়। এতে তাঁরা দু’জনে ‘সুবহানাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ’ বলে উঠলেন এবং তাঁরা বিব্রত বোধ করলেন। নবী করীম ﷺ বললেন, শয়তান মানুষের রক্ত শিরায় চলাচল করে। আমি আশংকা করলাম যে, সে তোমাদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করতে পারে (আল-বুখারী আ/স-সহীহ ২ : ১৯৩০/৭১৫)। ইবন হাজার (র.) বলেন, অত্র হাদীছে খারাপ ধারণা পোষণ করার অবকাশ স্থান পরিহার করা এবং শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ইবন দাকীকিল ‘ঈদ (র.) বলেন, ‘উলামায়ে কিরাম এবং অনুসরণকৃত দা’ঈদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরী বিষয় যে, তারা এমন কোন কর্ম সম্পাদন করবে না যাতে তাদের ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে (ইবন হাজার ৪ : ৩৮০)।

তিন. সহজপথ অবলম্বন করা এবং কঠোরতা পরিহার করা

দা’ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত হলো, দা’ওয়াতের ক্ষেত্রে সহজপথ অবলম্বন করা এবং কঠোরতা পরিহার করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, *« يَسْرُوْا وَلَا تَعْسِرُوْا »* “তোমরা লোকদের জন্যে সহজ পন্থা অবলম্বন করবে; কঠিন পন্থা

পরিহার করবে” (আল-কুশায়রী ৩ : ১৭৩২/১৩৫৮)। ইমাম নাবাবী (র.) বলেন, যদি কেবলমাত্র “সহজ পস্থা অবলম্বন করবে” বলা হতো, তাহলে কোন সময় সহজ পস্থা অবলম্বন করলে এবং অধিকাংশ সময় কঠোরতা অবলম্বন করলে হাদীছের উপর আমল হয়ে যেতো। যখন “কঠিন পস্থা পরিহার করবে” বলা হয়েছে, তখন সর্বাবস্থায় কঠিন পস্থা পরিহার করতে হবে। এটি মূলত উদ্দেশ্য (আন-নববী ১২ : ৪১)।

সহজ পস্থা অবলম্বন ধর্মের মূলনীতি। পবিত্র কুরআন ও হাদীছে এরই প্রতি আহ্বান করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ “আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না” (সূরা তুল বাকারাহ, ২ : ১৮৫)। আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ “নিশ্চয়ই দ্বীন সহজ-সরল।” তিনি আরও বলেন, «خَيْرُ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ» “নিশ্চয় তোমাদের সর্বোত্তম দ্বীন হলো, যা সহজ সরল” (আশ-শায়বানী ২৫ : ১৫৯৩৬/২৮৪)।

চার. উপকরণ ও উপাদান এবং মাধ্যম অবলম্বন করা

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে উপকরণ ও উপাদান এবং মাধ্যম অবলম্বন করা। দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত হলো, উপকরণ গ্রহণ করা ও কাজিত লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য লিখিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা এবং নিরাপদ ফলাফল অর্জনের উদ্দেশ্যে বিশুদ্ধ প্লান তৈরি করা। মূলত প্রত্যেক কাজের শুরুতে উপকরণ গ্রহণ করা ‘ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত যা আল্লাহ তা'আলারই নির্দেশ। ইবন তায়মিয়া (র.) বলেন, “প্রত্যেক উপকরণ যা গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন তাই ‘ইবাদত’ (ইবন তায়মিয়া ২০)।

আল-কুরআনে অসংখ্য আয়াত রয়েছে, যাতে উপকরণ গ্রহণের দিকনির্দেশনা রয়েছে এবং উপকরণ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উপর বড় দলীল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, “আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর” (সূরা তুল আনফাল, ৮ : ৬০)। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জীবনে উপকরণ গ্রহণের প্রতি আসক্ত ছিলেন। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ ও আনুগত্য পালন করার জন্যে এবং মানুষকে তাদের দ্বীন বর্ণনা ও শিক্ষা দেওয়ার জন্যে যে, উপকরণ গ্রহণ করা তাকদীরে উপর বিশ্বাসের পরিপন্থি নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনা হিজরতের সময় মজবুত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। খন্দকের যুদ্ধের সময় মদীনার আশপাশে তিনি পরীখা খনন করেছিলেন। সাফা পাহাড়ের পার্শ্বে দারুল আরকামে তিনি গোপনে তাঁর সাহাবীদের শিক্ষা দিতেন। এভাবে অসংখ্য ঘটনা যা প্রমাণ বহন করে যে, তিনি উপকরণ গ্রহণ করেছিলেন। অথচ তিনি তাকদীরের উপর সবারচেয়ে বেশি বিশ্বাসী ছিলেন এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সাহায্য পাওয়ার প্রতিশ্রুতিও পেয়েছিলেন। এভাবে তাঁর সাহাবীরাও তাঁর অনুসরণ করেছিলেন। অথচ তারা আল্লাহর কাযা ও কদরের উপর পূর্ণবিশ্বাসী ছিলেন এবং সর্ববিষয়ে আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভর করতেন। এটাকে তারা দ্বন্দ্ব মনে করতেন না। যেহেতু তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এক প্রশ্নকারীর উত্তরে বলতে শুনেছেন, «أَرْسِلْ نَافِي وَأَتَوَكَّلْ؟ قَالَ: "عِظْلَهَا وَتَوَكَّلْ"» “আমি আমার উটকে ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করি? তিনি বলেন, তুমি তোমার উটকে বেঁধে রাখ এবং আল্লাহর উপর ভরসা কর” (ইবন হিব্বান ২ : ৭৩১/৫১০; আল-বায়হাকী শূ'আবুল ঈমান ১৪২৩, ২ : ১১৫৯/৪২৭)। সুতরাং দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে উপকরণ ও মাধ্যম অবলম্বন করা আল-কুরআনে বর্ণিত হিকমতের অন্তর্ভুক্ত।

পাঁচ. আমন্ত্রিতদের সার্বিক এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার রেয়াতপূর্বক দা'ওয়াতী কর্ম পরিচালনা করা

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত হলো, আমন্ত্রিতদের সার্বিক এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার রেয়াতপূর্বক দা'ওয়াত দেওয়া। দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে আমন্ত্রিতদের অবস্থার রেয়াত করার অসংখ্য পদ্ধতি রয়েছে। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণগুলো উল্লেখ করা হল।

(ক). দা'ঈ আমন্ত্রিতদের বাস্তব চলমান অবস্থা এবং তাদের জীবনধারণ প্রবাহ সম্পর্কে অবহিত থাকা একান্ত জরুরী।

দা'ঈ যাদের আহ্বান করবেন, তাদের পরিবেশ-পরিস্থিতির গতিবিধি এবং সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দা'ঈ তাঁর দা'ওয়াতী পরিকল্পনা সফল বাস্তবায়নের জন্য আহ্বানকৃতদের ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং ভ্রষ্টতার মূলকেন্দ্রবিন্দু, সীমালঙ্ঘনের ক্ষেত্র ইত্যাদি সম্পর্কে গভীরভাবে জানা ও অধ্যয়ন করা একান্ত জরুরী। যেহেতু মূর্তিপূজারী মুশরিকদের পরিবেশে দা'ওয়াতের পদ্ধতি এক রকম এবং আহলি কিতাব অথবা পাপিষ্ট মুসলমানদেরকে দা'ওয়াত দেওয়ার পদ্ধতি ভিন্ন রকম। যেমনিভাবে শ্রমিক বা ক্ষেত-খামারীদের দা'ওয়াত দেওয়ার পদ্ধতি শিক্ষিত ও সাহিত্যিক এবং ছাত্রদেরকে দা'ওয়াত দেওয়ার পদ্ধতি থেকে ভিন্ন। সুতরাং একজন দা'ঈ যেন একজন চিকিৎসক স্বরূপ যিনি সমাজের রোগের চিকিৎসা করবেন।

(খ). দা'ঈ আমন্ত্রিতদের মধ্যকার যোগ্যতার পার্থক্য সম্পর্কে অবহিত থাকা একান্ত জরুরী।

যাতে আহ্বানকৃতদের অবস্থান ও বুদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যশীল পন্থা অবলম্বন করে দা'ওয়াত দেওয়া সম্ভব হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রত্যেক মানুষের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অসাধারণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এ ব্যাপারে তাঁকে সহযোগিতা করেছে। তিনি যখন ইসলামের দা'ওয়াতনামা পাঠালেন নাজরানের পাদ্রী ও ধর্মযাজকের নিকট সেখানে তিনি খ্রিস্টানদের বৈশিষ্ট্যের রেয়াত করেছেন এবং তিনি যে একজন ধর্মীয় ব্যক্তি তাও উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চিঠির মধ্যে ছিল, “ইবরাহীম ও ইসহাক এবং ইয়া'কুব-এর প্রভুর নামে আরম্ভ। নবী রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ-এর পক্ষ থেকে নাজরানের পাদ্রী বরাবর। আপনারা ইসলাম গ্রহণ করুন। কেননা নিশ্চয় আমি আপনারাই নিকট 'ইবরাহীম ও ইসহাক এবং ইয়া'কুব-এর প্রভুর প্রশংসা করছি। অতঃপর নিশ্চয় আমি আপনাদেরকে মানবের উপাসনা থেকে আল্লাহর উপাসনার দিকে আহ্বান করছি এবং বান্দাদের অধীনস্থতা থেকে আল্লাহর অধীনস্থের দিকে আহ্বান করছি। যদি আপনারা দা'ওয়াত অগ্রাহ্য করেন, তাহলে কর আদায় করতে হবে। আর যদি কর আদায় না কর, তাহলে আমি আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আহ্বান করবো। আস-সালাম” (ইবন কাছীর আস-সীরাতুন নাবাবীয়াহ ৪ : ১০১)। রাসূলুল্লাহ ﷺ- আদী ইবনু হামিতকে ইসলাম গ্রহণ করার আহ্বান করলে, “আদী বললেন, আমি তো আগে থেকে একটি ধর্মমত পোষণ করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার দ্বীন সম্পর্কে আমি তোমার তুলনায় অধিক জ্ঞান রাখি। আমি জিজ্ঞেস করলাম (আশ্চর্য হয়ে) আপনি আমার দ্বীন সম্পর্কে আমার তুলনায় অধিক জ্ঞান রাখেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ! তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি রাকুসীয়াহ ধর্মীয় গোষ্ঠীর লোক নয়? তুমি কি তোমার গোত্রের যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক চতুর্থাংশ ভোগ করো না? আমি বললাম, হ্যাঁ! তিনি বললেন, এটা কিন্তু তোমার ধর্মে অবৈধ। ‘আদী (রা.) বললেন, এটা বলার সাথে সাথে আমি বিনীত হয়ে গেলাম” (আশ-শায়বানী, ৩০ : ১৮২৬০/১৯৬-১৯৭; ইবন কাছীর তাফসীরুল কুরআনিল আজীম, ২ : ৩১৫)। অত্র ঘটনা প্রমাণ বহন করে যে, নবী করীম ﷺ আহ্বানকৃতদের আকীদা-বিশ্বাস এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অধিক অবহিত ছিলেন। যার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আদীর সামনে তার ধর্মের অসারতা প্রকাশ করে দিলেন এবং তার বিধানগত বিশ্বাসের ভুলত্রুটি ধরে দিলেন, তখন তা তাকে ইসলাম গ্রহণে আকৃষ্ট করলেন।

(গ). দাঈ যেই পরিবেশে দাওয়াতের মেহনত করবে, সেই পরিবেশের সমস্যা ও ব্যাধিসমূহের সুচিকিৎসা করা এবং সেই সমাজে বিরাজমান বিদ্‌আত এবং কুসংস্কারগুলোর বিজ্ঞতার সাথে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা একান্ত জরুরী।

যদি সেই পরিবেশে ইসলামের কোন নিদর্শনকে অবহেলা করা হয় কিংবা সামাজিক বা চারিত্রিকগত কোন সমস্যা বিরাজমান থাকে, তাহলে একজন দাঈর উচিত তাওহীদ তথা একত্ববাদের দাওয়াতের উপর গুরুত্ব দেওয়ার পর বিরাজমান সমস্যাগুলো সমাধানের আশ্রয় চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। এভাবে সমস্ত রাসূল সর্বপ্রথম তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন অতঃপর তাদের সম্প্রদায়ে প্রচলিত রোগ ও সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চালিয়েছেন। যেমনি করে হযরত শু'আযব (আ.) তাঁর জাতির মধ্যে ওযনে কম দেওয়ার প্রবণতার বিরুদ্ধে তিনি মেহনত চালিয়েছেন। আর হযরত লূত (আ.) সমাজে প্রচলিত অপরাধের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। ব্যাপারটা যখন এই রকম, তখন এটি বিজ্ঞতা ও হিকমতের পরিচয় হবে না যে, দাঈ তাঁর দাওয়াতের পরিবেশে এমন বিদ্‌আত নিয়ে বিশদ বর্ণনা দিবে, যেই বিদ্‌আত সেই সমাজে প্রচলিত নেই বা থাকলেও খুবই নগন্য। বরং এটি অবুঝ ও মূর্খতার পরিচয় হবে।

(ঘ). দাঈর উচিত আহ্বানকৃতদের সাথে কথোপকথন ও লেনদেনে নম্রতা ও কোমলতা অবলম্বন করা

প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা বজায় পূর্বক তাদের চাহিদাগুলো পূর্ণ করার চেষ্টা করা ক্রমধারা অবলম্বন করার মাধ্যমে। তবে তাদের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে মৌলিক বিষয় ও ফরযগুলোর কোনপ্রকার ত্রুটি করা যাবে না এবং যাতে শারঈ নিষেধের আওতায় না পড়ে যায় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আহ্বানকৃতদের সাথে কথোপকথন ও লেনদেনে নম্রতা ও কোমলতা অবলম্বন করার কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে পেশ করা হল। বাশীর ইবনুল খাসাসিয়াহ, (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে ইসলামের উপর বায়'আত গ্রহণ করার সময় বললেন, তাকে যেন সাদাকা ও জিহাদ থেকে পরিত্রাণ দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তরে বললেন, "قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبَايُكَ، فَبَايَعَنِي عَلَيْهِمْ كُلَّهُمْ." "সাদাকা ও জিহাদ না হলে তাহলে কিসে তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবে। তখন সে বলল, আমি আপনার হাতে বায়'আত হতে চায়। আপনি আমাকে সবগুলোর উপর বায়'আত করুন" (আল-বায়হাকী আস-সুনানুল কুবরা ৯ : ১৭৭৯৬/৩৫; আল-হাকিম ২ : ২৪২১/৮৯; আশ-শায়বানী ৩৬ : ২১৯৫২/২৮৪)।

ছাকীফ প্রতিনিধিদল যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করল, তখন তারা আবেদন করে একটি শর্ত আরোপ করল, তারা সাদাকা ও জিহাদ করতে পারবে না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের এ দাবী মেনে নিলেন। অতঃপর একটু পরে তাঁর অবস্থান থেকে সরে এসে বললেন, "سَيَصَدَّقُونَ وَيُجَاهِدُونَ إِذَا أَسْلَمُوا" "অচিরেই তারা সাদাকাহ করবেন এবং জিহাদও করবেন যখন তারা ইসলাম গ্রহণ করবেন" (আবু দাউদ ৪ : ৩০২৫/৬৩৭)। খাতাবী বলেন, সমাধানে বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে সাদাকা না করা ও জিহাদে না যাওয়ার জন্য অনুমিত দিয়েছেন, যেহেতু উভয়টি তাৎক্ষণিক অপরিহার্য বিষয় নয়; কারণ সাদাকা ওয়াজীব হয় এক বছর পরিপূর্ণ হওয়ার পর এবং জিহাদ ফরয হয় শত্রু উপস্থিত হলে (আস-সাহারানফুরী তাবি, ১৩ : ৩৬১)। নবী করীম ﷺ তাদের সাথে বিধানের ব্যাপারে ক্রমধারার পন্থা অবলম্বন করেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তা হারামে লিপ্ত হওয়ার দিকে ধাবিত না করে।

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত অবলম্বন হলো, ক্রমাগতধারা সুন্দররূপে বাস্তবায়ন করা এবং গুরুত্বপূর্ণটি সর্বপ্রথম অগ্রাধিকার দিবে এরপর কমগুরুত্বপূর্ণটি গ্রহণ করবে। দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত হলো, ক্রমাগতধারা সুন্দররূপে বাস্তবায়ন করা এবং গুরুত্বপূর্ণটি সর্বপ্রথম গ্রহণ করবে এবং কমগুরুত্বপূর্ণটি এরপর গ্রহণ করবে। এটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয় যে, দা'ওয়াতের স্বার্থ সবগুলো একই পর্যায়ের নয়। বরং কিছু বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং কিছু কমগুরুত্বপূর্ণ। শরী'আতের বিধানাবলিও একই স্তরের নয়। সুতরাং এখানে হিকমত হলো, দা'ঈ অপরিহার্য বিষয়গুলোর ক্রমধারা নির্ধারণ করবে। বেশি গুরুত্বপূর্ণগুলো কমগুরুত্বপূর্ণের উপর প্রাধান্য দিবে। আর নিষেধসমূহ যা তিনি প্রতিরোধ করবে এগুলোরও ধারাবাহিকতা রক্ষা করবে। ফলে বড় বিষয়গুলোকে ছোট বিষয়সমূহের উপর প্রাধান্য দিবে এবং বেশি তাৎপর্য বিষয়ের পিছনে বেশি সময় ও শ্রম দিবে। উদাহরণ স্বরূপ:

(ক). শাখা-প্রশাখার উপর মূল বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া। যেমন, প্রথমে তাওহীদ তথা একত্ববাদের দা'ওয়াত দিয়ে শুরু করবে। মানুষের অন্তরে ঈমান বদ্ধমূল করার চেষ্টা করবে এবং ঈমানের পরিপূরক বিষয়সমূহের সাথে মানুষকে পরিচয় করিয়ে দিবে এবং ঈমানের সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি চরিত্রসমূহের বিশদ বর্ণনা দিবে। যেমন নবীগণ সর্বপ্রথম মানুষকে তাওহীদের দা'ওয়াত দিয়েছেন। আর তাদেরকে যে সমস্ত অপরিহার্য বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন এবং যে সমস্ত মন্দকর্মসমূহের নিষেধ করেছেন সবগুলোকে তাওহীদের পরিপূরক হিসেবে চিহ্নিত করে তাওহীদের সংশ্লিষ্ট বিষয় হিসেবে জড়িয়ে দিয়েছেন।

୧୦

দেওয়া হয়েছে। যখন মানবাত্মাসমূহ তাওহীদের উপর বদ্ধমূল হয়েছে, তখনই বিধানাবলি অবতীর্ণ হয়েছে। যেহেতু মানবাত্মা স্বভাবগত প্রিয় বস্তু সহজে ত্যাগ করতে চায় না (ইবন হাজার, ৯ : ৪)। এই হাদীছটি শাখা-প্রশাখার উপর মৌলিক বিষয়সমূহ দিয়ে গুরু করার সর্বোৎকৃষ্ট দলীল।

(খ). প্রত্যেক ক্ষেত্রে যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে গুরুত্ব দেওয়া:

একজন দাঈ তাদের ব্যাপারে অন্যদের তুলনায় বেশি পরিশ্রম ও সময় দেবে। কেননা তারা দা'ওয়াতী কর্মে লিপ্ত হলে অধিক ফলপ্রসূ হবে অন্যদের তুলনায়। যেহেতু তারা তাদের দা'ওয়াতের খেদমতে তাদের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং সাধ্যসাধনা ব্যয় করতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্যান্যদের তুলনায় কুরায়শ নেতৃবৃন্দের নিকট দা'ওয়াত দেওয়াকে বেশি গুরুত্ব দিতেন। তবে এটি আল্লাহ তা'আলার 'আয়াতের বিপরীত নয়, “তিনি প্রকৃষ্টিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কারণ, তাঁর কাছে এক অন্ধ আগমন করল। আপনি কি জানেন, সে হয়তো পরিশুদ্ধ হত, অথবা উপদেশ গ্রহণ করতো এবং উপদেশ তার উপকার হত। পরন্তু যে বেপরোয়া, আপনি তার চিন্তায় মশগুল। সে শুদ্ধ না হলে আপনার কোন দোষ নেই। যে আপনার কাছে দৌড়ে আসলো এমতাবস্থায় যে, সে ভয় করে, আপনি তাকে অবজ্ঞা করলেন।” এই আয়াতের অর্থ রাসূলুল্লাহ ﷺ ধনী ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের গুরুত্ব দেওয়ার সাথে বিপরীত নয় বরং বিপরীত হতো যদি তিনি দুর্বল ও অসহায়দের অবহেলা করতেন বা শিক্ষা-দিক্ষায় তাদেরকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই তাঁর প্রতিপালকের দরবারে দু'আ করলেন, “হে আল্লাহ তা'আলা! আপনি ‘উমার ইবনুল খাতাব অথবা আবু জাহল ইবন হিশাম-এর মাধ্যমে ইসলামকে প্রবল শক্তিশালী করো। আল্লাহ তাঁর রাসূলের দু'আকে হযরত ‘উমারের ব্যাপারে কবুল করলেন। তাঁরই মাধ্যমে ইসলাম শক্তিশালী হল এবং মূর্তি উৎখাত হলো” (আত-তাবারানী *আল-মু'জামুল কাবীর* ১০ : ১০৩১৪/১৫৯)।

যোগ্যতা সম্পন্ন ও মর্যাদাবান ব্যক্তি বলতে বুঝায়, সমাজে যথেষ্ট মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ, প্রচার বা যোগাযোগ মাধ্যমের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ প্রমুখগণ। যেহেতু তাদের একজন ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের অধিনস্থ সাধারণ লোকদের আর দা'ওয়াত দিতে হবে না। বস্তুত আল্লাহ তা'আলার নিকট ঐ ব্যক্তিই সর্বোত্তম সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেয়গার। ধনীও নয়, বড় শক্তিশালীও নয়, উচ্চ পদমর্যাদাবান ব্যক্তিও নয়। তারপরেও দা'ঈদের উচিত যোগ্যতা সম্পন্ন ও মর্যাদাবান ব্যক্তিদের গুরুত্ব প্রদান করা। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও এটি করেছেন এবং দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে এটিই হলো হিকমত। একারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ বড় বড় নেতা ও বাদশাহদের নিকট ইসলামের দা'ওয়াতনামা লিখতে বেশি আসক্তি ছিলেন, তাদের ঈমান ও ইসলামের দা'ওয়াত দিতেন। যেহেতু তাদের একজন ঈমান গ্রহণ করাটাই তাদের অধিনস্থ প্রজাদের ঈমান আনার মাধ্যম এবং সেই জাতির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক শক্তি ইসলামী দা'ওয়ার খিদমতে ব্যবহার হওয়ার বড় উপকরণ।

উপসংহার

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বুঝতে পারলাম যে, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে হিকমত অবলম্বনপূর্বক দা'ওয়াতী কর্ম সম্পাদনের নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহর মধ্যে দা'ওয়াতের বৈজ্ঞানিক অনেক মূলনীতি রয়েছে। যা একজন দা'ঈর জন্য অতীব জরুরী। বর্তমান যুগে দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে কি কি হিকমত রয়েছে সে সম্পর্কে অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বিশেষ করে দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত পছা অবলম্বনে দা'ওয়াতী কার্যক্রমে অত্যন্ত ফলপ্রসূ ও সুদূরপ্রসারী হয়। উপরে বর্ণিত হিকমতের ছ'টি উপাদান ছাড়াও আরও অসংখ্য পদ্ধতি রয়েছে। যা আহ্বানকারী নিজেই পরিস্থিতি অনুযায়ী পবিত্র

কুরআন ও সুন্নাহর আওতায় তাৎক্ষণিকভাবে অবলম্বন করতে পারবে। যাতে উদ্দেশ্য সাধিত হয় এবং কোন ধরনের অনভিপ্রেত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে না হয়। সুতরাং একজন দাঈকে অবশ্যই হিকমতের প্রায়োগিক বিষয়গুলো সম্পর্কে জানা থাকা থাকতে হবে। তবে দাঈকে উৎসাহ ও ভীতি পদ্ধতি অবলম্বনপূর্বক নম্রতা ও কোমলতা পস্থা গ্রহণ করা উচিত।

টিকা:

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বভাবগত চরিত্রের কারণে শৈশব কালেও কোন মানুষকে বরং কোন জন্তুকেও কখনও গালি দেননি। সম্ভবত কোন সাহাবীর মুখ থেকে এমন কোন কঠোর বাক্য বের হয়ে থাকতে পারে, যাকে মুশরিককা গালি মনে করে নিয়েছে। কোরায়েশ সর্দাররা এ ঘটনাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে রেখে ঘোষণা করেছে যে, আপনি আমাদের প্রতিমাদের গালিগালাজ করা থেকে বিরত না হলে আমরাও আপনার আল্লাহকে গালিগালাজ করবো (শফী ৩/৩৯৩।)

তথ্যসূত্র

- আল-আলসী, মাহমূদ। *রুহুল মা'আনী*। দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়াহ, ১ম সং, ১৪১৫ হি।
- আল-ইসামী, আব্দুল মালিক। *সিমতুন নুজুম আওয়ালী ফী আন্বায়িল আওয়াইলি ওয়াত তাওয়ালী*, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়াহ, ১৪১৯ হি।
- আল-কুরতুবী, মুহাম্মদ। *আল-জামী' লিআহকামিল কুরআন*। দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, ২য় সং ১৩৮৪ হি।
- আল-কুশায়রী, মুসলিম। *আস-সহীহ*। দারুল ইহুইয়াইত তুরাছিল 'আরবী, তাবি।
- আল-কুফুবী, আইয়ুব ইবন মূসা। *আল-কুল্লিয়াত*। মু'আস্সাসাতুর রিসালাহ, তাবি, পৃ. ৩৮২।
- আল-খুলতী, 'ইসমাঈল।, *রুহুল বায়ান*, দারুল ফিকর, তাবি।
- আল-বায়হাকী, আহমদ। *শু'আবুল ঈমান*। মাকতাবাতুর রশাদ, ১ম সং, ১৪২৩ হি।
- আল-বায়হাকী, আহমদ। *আস-সুনানুল কুবরা*। দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ৩য় সং, ১৪২৪ হি।
- আল-বুখারী, মুহাম্মদ।, *আস-সহীহ*। দারুল ইবনি কাছীর, ৩য় সং, ১৪০৭ হি।
- আল-বুখারী, মুহাম্মদ। *আল-আদাবুল মুফরাদ*। দারুল বাশাইর, ৩য় সং, ১৪০৯।
- আবু সা'উদ, মুহাম্মদ। *ইরশাদুল 'আকলুস সালীম*, দারুল ইহুইয়াইত তুরাছিল 'আরবী, তাবি।
- আবু হায়ান, মুহাম্মদ। *আল-বাহরুল মুহীত*। দারুল ফিকর, ১৪২০ হি।
- আবু দাউদ, সুলায়মান। *আস-সুনান*। দারুল রিসালাহ আল-'আলামিয়াহ, ১ম সং, ১৪৩০ হি।
- আদ-দামগানী, আল-হুসায়ন। *কামূসুল কুরআন*। দারুল 'ইলম লিল-মালাঈন, ২য় সং, ১৯৭৭ খ্রি।

আত-তাবারী, মুহাম্মদ। জামি'উল বায়ান 'আন তা'বীলি আ'ঈল কুরআন। মু'আস-সাসাতুর রিসালাহ, ১ম সং, ১৪২০ হি।

আত-তিরমিযী, মুহাম্মদ। আস-সুনান। মাকতাবাতু মুস্তাফা আল-বাবী আল-হালবী, ২য় সং, ১৩৯৫ হি।

আত-তাবারানী, সুলায়মান। আল-মু'জামুল কাবীর। আল-মোসাল: মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, ২য় সং, ১৪০৪ হি।

আন-নাসা'ঈ, আহমদ।, আস-সুনানুস সুগ্গরা, মাকতাবাতুল মাতবু'আতুল 'ইসলামিয়াহ, ২য় সং, ১৪০৬ হি।

আন-নববী। শারহুন নববী 'আলা সহীহি মুসলিম। দারু ইহ'ইয়াইত তুরাছিল 'আরবী, ২য় সং, ১৩৯২ হি।

আল-ফায়রুয আবাদী, মুহাম্মদ। আল-কামুসুল মুহীত। মু'আসসাসাতুর রিসালাহ, ৮ম সং, ১৪২৬ হি।

আল-মুবারকপুরী, সাফিউর রহমান। আর-রহীকুল মাখতুম। মুয়াসসাসাতু উলিন নুহা, ১৪২২ হি।

আয-যামাখশারী। আল-কাশশাফ। দারুল কিতাবিল আরবী, ৩য় সং, ১৪০৭ হি।

আশ-শায়বানী, 'আহমদ। আল-মুসনাদ। মু'আসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম সং, ১৪২১ হি।

আস-সাহারানফুরী, খলীল আহমদ। বজলুল মাজহুদ। দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়াহ, তাবি।

আল-হাকিম, মুহাম্মদ। আল-মুস্তাদরাক। দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়াহ, ১ম সং, ১৪১১ হি।

আল-হুমায়দী। আব্দুল আজীজ। আত-তারীখুল ইসলামী, তাবি।

ইবন 'আতিয়াহ, মুহাম্মদ 'আব্দুল হক। আল-মুহাররিরুল ওয়াজীয। দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়াহ, ১ম সং, ১৪২২ হি।

ইবন কাছীর, 'ইসমা'ঈল। তাফসীরুল কুরআনিল 'আজীম। আল-মাকতাবুস সাকাফী, ১ম সং, ২০০১ খ্রি।

ইবন কাছীর, 'ইসমা'ঈল। আস-সীরাতুন নাবাবীয়াহ। দারুল মা'রিফা, ১৩৯৫ হি।

ইবন জাযী, মুহাম্মদ, আত-তাসহীল লি'উলুমিত তানযীল। শারিকাতু দারিল আরকাম, ১ম সং, ১৪১৬ হি।

ইবন তায়মিয়া, আহমদ।, আল-উবুদিয়াহ। আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৭ম সং, ১৪২৬ হি।

ইবন দারীদ, মুহাম্মদ। জামহারা'তুল লুগাহ। দারুল 'ইলম লিল মালা'ঈন, ১ম সং, ১৯৮৭।

ইবন মানযুর। মুহাম্মদ। লিসানুল 'আরব। দারু সাদির, ৩য় সং, ১৪১৪ হি।

ইবন মাজাহ, মুহাম্মদ।, আস-সুনান। দারুল রিসালাহ আল-'আলামিয়াহ, ১ম সং, ১৪৩০ হি।

ইবন হাজার, 'আহমদ। ফাতহুল বারী। দারুল মা'রিফা, ১৩৭৯ হি।

ইবন হিব্বান, মুহাম্মদ। সহীহ ইবন হিব্বান। মু'আসসাসাতুর রিসালাহ, ২য় সং, ১৪১৪ হি।

ইবন হিশাম, আব্দুল মালিক। আস-সীরাতুন নাবাবিয়াহ। শারিকাতু মুস্তাফা আল-বাবী আল-হালবী, ২য় সং, ১৩৭৫ হি।

মুখতার, ড. আহমদ। মু'জামুল লুগাতিল 'আরবিয়াহ আল-মু'আসিরাহ। দারু 'আলামিল কুতুব, ১৪২৯ হি।

রাগিব, আল-হুসায়ন। আল-মুফরাদাত ফী গরীবিল কুরআন। দারুল কলম, ১ম সং, ১৪১২।

শফী, মুফতী মুহাম্মদ। মা'আরিফুল কুরআন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৭ম সং, ২০০৩ খ্রি।

শফী, মুফতী মুহাম্মদ। মা'আরিফুল কুরআন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৬ষ্ঠ সং, ২০০৬ খ্রি।

হাসান, ড. হাসান ইব্রাহীম। তারীখুল ইসলাম। দারুল জায়ল, ১৪ সং, ১৪১৬ হি।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ২০২০ সালে প্রকাশিত বাংলাগ্রন্থের শিরোনাম পর্যবেক্ষণ ও শ্রেণিকরণ

ড. মোহাম্মদ নেয়ামত উল্লাহ ভূঁইয়া *

প্রতিপাদ্যসার: [২০২০ হলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষের বছর। বঙ্গবন্ধু হলেন বাঙালির স্বাধীনতা অর্জনের মহানায়ক এবং সমগ্র বাঙালির জাতির পিতা। এই বাংলায় তাঁর জীবনকাল মাত্র ৫৫ বছর। এ যাবত তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে প্রায় তিনহাজার গ্রন্থ এবং অসংখ্য প্রবন্ধ রচিত হওয়ার তথ্য রয়েছে। এসবের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে ২০২০ সালে। বঙ্গবন্ধু আজ বাংলাদেশে স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে পঠিত হচ্ছেন। তিনি বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়ে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও ‘বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ স্টাডিজ’ নামে পঠিত হচ্ছেন। এমন শিরোনাম একজন বাঙালির জন্য বড় গৌরবের বিষয়। উক্ত প্রবন্ধে তাঁকে নিয়ে ২০২০ সালে প্রকাশিত বাংলাগ্রন্থের শিরোনাম পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং রচিত গ্রন্থসমূহের বিষয় ভিন্নতাকে বিবেচনায় ধরে একটি সাধারণ শ্রেণিকরণ করার চেষ্টা রয়েছে। এই প্রবন্ধে অধ্যয়নে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম বিষয়ে রচিত বাংলাগ্রন্থসমূহ নিয়ে সর্বস্তরের পাঠক সমাজ একটি বিশেষ পর্যবেক্ষণ বার্তা পাবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি।]

ভূমিকা

বর্তমানে বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ প্রায় সর্বত্রই ‘বঙ্গবন্ধু কর্নার’ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বিভিন্ন শিক্ষা-কার্যক্রমের ‘বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ স্টাডিজ’ অধ্যয়নের সুযোগ সবারই রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী প্রজন্মের একজন পাঠক হিসেবে বঙ্গবন্ধুকে সামগ্রিকভাবে জানার আগ্রহ থেকে তাঁকে নিয়ে একটি ব্যক্তিগত পাঠসূচি তৈরি করতে গিয়ে দেখলাম যে, তাঁকে নিয়ে অসংখ্য গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রয়েছে। ‘২০১৪ সাল পর্যন্ত তাঁকে নিয়ে রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ছিল প্রায় ৯৬১টি’ (দেলোয়ার, ২০১৪, ৭) এবং ২০২০ সালে তাঁর জন্মশতবর্ষ উদযাপনের পূর্ব পর্যন্ত তাঁকে নিয়ে রচিত গ্রন্থের এই সংখ্যা ছিল প্রায় ২৩০০টি (দেলোয়ার, ২০২১, ৭)। বর্তমানে তাঁর জন্মশতবর্ষ উদযাপন শেষে এই গ্রন্থ সংখ্যা প্রায় তিনহাজার ছাড়িয়েছে। ২০০৮ থেকে ২০২০ পর্যন্ত সময়ে তাঁকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এই পর্যন্ত বিভিন্নভাবে তাঁকে নিয়ে রচিত অসংখ্য প্রবন্ধসহ নানামাত্রিক লেখনী লক্ষ্যধিক ছাড়িয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত বাংলা ও ইংরেজি গ্রন্থ উভয়ই ক্রমাগত বাড়ছে। তবে উক্ত প্রবন্ধে আমাদের দৃষ্টি কেবল ২০২০ সালে প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থের দিকেই ছিল, কারণ এই বছরটিতে তাঁর জন্মশতবর্ষ উদযাপিত হয়েছিলো।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বঙ্গবন্ধুর জন্মই আজ আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের গর্বিত বাঙালি। আমাদের এই গর্ববোধ আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠে যখন দেখি বাংলার প্রতিটি প্রান্তে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মকে স্মরণে রেখে তাঁকে ও তাঁর স্বপ্নকে কেন্দ্র করে তাঁরই স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে বর্তমান প্রজন্ম কাজ করে যাচ্ছে। এ কারণে আজ আমার কাছেও বঙ্গবন্ধুর জীবন, কর্ম ও স্বপ্ন মহামানব বাঙালির। এই পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম নিয়ে যত ধরনের গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও নানামাত্রিক

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

লেখনী হয়েছে; বাংলা সাহিত্যের কোনো সাহিত্যিক বা অন্য কোনো বাঙালিকে নিয়েও রচিত হয়নি। ভবিষ্যতে তরুণ প্রজন্মের হাতে এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ বঙ্গবন্ধু হলেন আমাদের সকল প্রজন্মের জন্য পথপ্রদর্শক এবং জাতির জনক। উক্ত প্রবন্ধে তাঁকে নিয়ে ২০২০ সালে রচিত বাংলা গ্রন্থের শিরোনাম পর্যবেক্ষণে নেওয়া হয়েছে। এই গ্রন্থগুলো দেশি-বিদেশি লেখকদের হাতে রচিত হয়েছে। তবে বর্তমানের তরুণ প্রজন্মও ২০২০ সালে এতে শক্তভাবে হাল ধরেছেন। ডিজিটাল দুনিয়ার কল্যাণে নানা মাধ্যমে এসব গ্রন্থের প্রকাশ-প্রামাণ্য সত্য রয়েছে।

তবে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অনেক লেখকের লেখায় গ্রন্থের শিরোনাম পরিবেশনে পুনরাবৃত্তি হয়েছে। একই নামেও একাধিক গ্রন্থ-শিরোনাম রয়েছে। তারপরও বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের মাহাত্ম্য একটুর জন্য খর্ব হয়নি। আমাদের মতে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত সব গ্রন্থের সবচেয়ে মর্যাদাবান শিরোনাম ‘বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ’ হওয়া উচিত। বঙ্গবন্ধুই আমাদের লালসবুজ পতাকা। বঙ্গবন্ধুই আমাদের বাঙালির চেতনার মননচিত্র। তিনিই আমাদের ভৌগোলিক সীমারেখা পেরিয়ে এক বৈশ্বিক মানুষ হওয়ার মননচিত্র ও মানচিত্র।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ২০২০ সালে রচিত বাংলাগ্রন্থগুলোর শিরোনামকে নানামাত্রায় পর্যবেক্ষণ করে শ্রেণিকরণ করা জরুরি। আমরা মনে করি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত সকল গ্রন্থের বিষয়ভিত্তিক শ্রেণিকরণ তাঁর জীবন ও কর্মকে জানতে আরও সহজ হবে। কারণ তিনি বাঙালি জাতির পিতা এবং বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের স্থপতি। সুতরাং পরবর্তী প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধু পাঠে অভ্যস্ত ও ধারাবাহিক রাখতে এই ধরনের শ্রেণিকরণের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে জানার আগ্রহের পরিপূর্ণতা সাধনের জন্য নবীন পাঠক ও গবেষকগণের স্বচ্ছ দৃষ্টি অর্জনে এই পর্যবেক্ষণ ও শ্রেণিকরণ সহায়ক হবে বলে আমরা মনে করি। তাছাড়া এসব গ্রন্থে পরিবেশিত বিষয়বস্তুর মাধ্যমে বহুকৌণিক দৃষ্টিকোণ থেকে বঙ্গবন্ধুর জীবন, কর্ম, দর্শন ও নানাবিধ অবদানে আগামী প্রজন্মের নিকট বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে প্রয়োজনীয় উপাদান হবে।

গবেষণার যৌক্তিকতা

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে পূর্বে এবং বর্তমানে যেসব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার সম্পূর্ণ তালিকা-সহায়ক হিসেবে এই ধরনের শ্রেণিকরণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পাশাপাশি এসব গ্রন্থ পর্যবেক্ষণ করে বঙ্গবন্ধুর জীবন, কর্ম চিন্তাদর্শন বর্তমান বাংলাদেশের অগ্রগতিতে কীভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে তা অবলোকন করার উদ্দেশ্যে এই ধরনের গবেষণার যৌক্তিকতা রয়েছে। বঙ্গবন্ধুর দর্শনকে কেন্দ্র করে বর্তমান বাংলাদেশের শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি, সংস্কৃতি ও বাঙালিয়ানার নানাবিধ অনুষ্ণ কীভাবে আমাদের জাতীয় জীবনকে প্রভাবিত করেছে এবং কীভাবে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন, বাংলাদেশ ও বাঙালি বিকশিত হচ্ছে, উক্ত গ্রন্থসমূহের শ্রেণিকরণ ও পর্যবেক্ষণ ফলাফলে তা দেখানোর বিশেষ কৌশল হিসেবে এই ধরনের গবেষণার বিশেষ যৌক্তিকতা রয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

আলোচ্য প্রবন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ সংগ্রহ করে এদের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রাপ্ত গ্রন্থকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে এদের বিষয়ভিত্তিক পরিচিতিতে স্থান দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে সংশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি, বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি ও ঐতিহাসিক পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু বিষয়ক এসব গ্রন্থ যেহেতু কেবল ২০২০ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ, এই কারণে গ্রন্থ-নাম ও লেখক নামকে গুরুত্ব দিয়ে তালিকা প্রণয়নের চেষ্টা হয়েছে। সবশেষে গ্রন্থগুলোকে গুণগত ও পরিমাণগত দিক বিবেচনায় বিশ্লেষণ করে গবেষণার কাজ সম্পন্ন

হয়েছে। শ্রেণিকরণ ও পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত গ্রন্থসমূহের বিষয়-বৈচিত্র্য, অনালেকিত অধ্যায় এবং জানা-অজানা দিক তুলে ধরার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও চিন্তার নতুন পরিচয় ফুটে উঠেছে।

বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা এবং মহান স্বাধীনতার রূপকার ছিলেন। তাঁকে নিয়ে ২০২০ সালের পূর্বে রচিত গ্রন্থগুলোতে সর্বস্তরের বিভিন্ন লেখকের লেখায় মোটাদাগে নিম্নোক্ত প্রসঙ্গগুলো উঠে এসেছিলো, যার প্রমাণ আমাদের পর্যবেক্ষণে পাওয়া গিয়েছে। কিছু কিছু গ্রন্থ কেবল বঙ্গবন্ধুর জীবন ও বেড়ে উঠার গল্প নিয়ে রচিত। কিছু গ্রন্থ বিশেষ করে তাঁর শিক্ষাজীবন ও রাজনৈতিক সংযোগসহ বিভিন্ন ঘটনাবলীর চিত্রায়ণ। বেশ কিছু গ্রন্থ পাওয়া গেছে যেগুলোতে ১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলন এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব এবং বাংলা ভাষার প্রতি বঙ্গবন্ধুর আবেগ মর্যাদাবোধের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। এছাড়াও রয়েছে ১৯৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন প্রসঙ্গ, ১৯৫৮ এর সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, ১৯৬২ এর গণবিরোধী শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৬ এর ৬-দফা, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ এর নির্বাচনসহ নানা বিষয়ের বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থ রচিত হতে দেখা গেছে। তুলনামূলক বেশি দেখা যায়, ১৯৭১ এর ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর বক্তৃকণ্ঠ ভাষণ, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা ও নেতৃত্ব প্রসঙ্গ, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ বিনির্মাণ স্বপ্ন, সোনার বাংলার স্বপ্ন নিয়েও নানামাত্রিক গ্রন্থ। বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে বঙ্গবন্ধুর আপোসহীন মনোভাব, জনগণের সংকটকালে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা, বঙ্গবন্ধুর নীতি-আদর্শ ও জীবন সংগ্রাম নিয়েও নানামাত্রিক লেখনী পাওয়া যায়। বিভিন্ন সময়ের বঙ্গবন্ধুর কারাবরণ প্রসঙ্গ, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা এবং বাঙালি জাতির ইতিহাসে ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্টের কলঙ্কজনক অধ্যায় নিয়ে নানামাত্রিক গ্রন্থ, বঙ্গবন্ধুহীন শোকাহত বাঙালির আত্ননাদ, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা বিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের কথাও বিভিন্ন গ্রন্থে উঠে এসেছে। কোনো কোনো লেখক মনোযোগ দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুর অবিসংবাদিত নেতা হওয়ার ইতিহাসের দিকে, কেউবা লিখেছেন তাঁর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হয়ে উঠার সংগ্রামী বৃত্তান্ত নিয়ে, কারো চোখে বিশ্বনেতা বঙ্গবন্ধু বা পৃথিবীর ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর মতো অতুলনীয় বিরল নেতা হয়ে উঠা প্রসঙ্গ, কারো কলমে বাঙালির প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও স্বাধীকার আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব গুণাবলীর দৃষ্টান্ত উঠে এসেছে। সবচেয়ে বেশি লেখা দেখা যায় ১৯৪৮ থেকে ১৯৭৫ সময়ের ঘটনাবলী নিয়ে। কারণ এই সময় পরিসর বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের চূড়ান্ত বছর। বিশেষ করে এসময় পরিসরে ১৯৭১ এর ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর বক্তৃকণ্ঠ ভাষণ, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা ও নেতৃত্ব প্রসঙ্গ, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ বিনির্মাণ স্বপ্ন, সোনার বাংলার স্বপ্ন, বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে বঙ্গবন্ধুর আপোসহীন মনোভাব, জনগণের সংকটকালে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা এবং এসবের জন্য বঙ্গবন্ধুর নীতি-আদর্শ ও জীবন সংগ্রাম প্রবলরূপে লেখকদের আলোড়িত ও আন্দোলিত করেছে। বাঙালির রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের জন্য বঙ্গবন্ধুর সংগ্রাম, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। বঙ্গবন্ধুকে কেন্দ্র করে বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে বাঙালির ব্যক্তি সত্তার বিশালতা, বঙ্গবন্ধুর মৌলিক গুণাবলী মেধা, সততা, দূরদৃষ্টি, দেশপ্রেম, দৃঢ়চরিত্র ও মনোভাব, দক্ষিণ এশিয়ায় ও সমগ্র বিশ্বে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের মূল্যায়ন, আন্তর্জাতিক নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধুর সংগ্রাম সাফল্য ও মূল্যায়ন ইত্যাদি বিষয়ের গ্রন্থও ব্যাপক আকারে রচিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও দেশ পরিচালনায় দক্ষতা, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় বঙ্গবন্ধু, বাঙালির আস্থা ও বিশ্বাসে বঙ্গবন্ধু, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধুর পথ চলা, তরুণ প্রজন্মের চোখে বঙ্গবন্ধু, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সংগ্রামসহ নানামাত্রিক লেখনী ২০২০ এর পূর্বপর্যন্ত রচিত গ্রন্থগুলোর সাধারণ পরিক্রমা বলা যায়। কিন্তু ২০২০ সালের গ্রন্থগুলোতে এসব বিষয়সহ নতুন নতুন বিষয়েরও সন্ধান মিলেছে। মুজিব বর্ষের এই বিশেষ বছরটিতে বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠন, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মুজিব বর্ষে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলিপনমূলক

নানা ধরনের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ বিনির্মাণ স্বপ্ন, সোনার বাংলার স্বপ্ন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে কেন্দ্র করে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে বাংলাদেশকে পৌঁছানো এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার নানামাত্রিক মূল্যায়ন করে কতগুলো গ্রন্থ রচিত দেখা যায়। কেউবা ২০২০ সালে নতুন করে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মকে বহুমাত্রিকতায় বিশ্লেষণের প্রয়াস পেয়েছেন। কারণ ২০২০ এর বছর আটকে আগে অর্থাৎ ২০১২ সালে বঙ্গবন্ধুর ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ প্রকাশিত হয়েছিলো। এই ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন সংগ্রামের দীর্ঘ পরিক্রমা উঠে এসেছে। যার নির্যাস মূল্যায়নে নানামাত্রিক লেখনী ও নবআঙ্গিকে বঙ্গবন্ধু চর্চায় জোয়ার আসে। এরপর পর্যায়ক্রমে বঙ্গবন্ধুর নিজের লেখা বিভিন্ন প্রসঙ্গ ও দেশ-বিদেশ থেকে বঙ্গবন্ধুকে কেন্দ্র নানামাত্রিক ডকুমেন্ট লেখক, গবেষক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ ও সর্বস্তরের জনগণের হাতে এলে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখনীর মাত্রায় আরও তীব্র গতি পরিলক্ষিত হয়। বঙ্গবন্ধুর ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’, ‘কারাগারের রোজনামচা’, ‘আমার দেখা নয়াচীন’ এবং দেশ-বিদেশের বিভিন্ন দলিলপত্র হাতে এলে ২০২০ এর পুরো বছর জুড়ে বিভিন্ন বিষয়ে নতুন নতুন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, যা আমাদের দৃষ্টিতে এসেছে। মূলত সেসবের পর্যবেক্ষণ ও শ্রেণিকরণই এই প্রবন্ধের কেন্দ্রবিন্দু হয়েছে। এই ২০২০ সালে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপকতা যেমন রয়েছে, তেমনি তাঁকে নিয়ে লেখনীর বৈচিত্র্যও রয়েছে। এবার সেসব কিছু নতুন ও বৈচিত্র্যময় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া যাক। যেমন- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিজের লিখিত ‘আমার দেখা নয়াচীন’ এবছরই প্রকাশিত হয়। নাছিমা খান লিখেছেন ‘রেনু থেকে বঙ্গমাতা’ যা কিনা বঙ্গবন্ধুকে কেন্দ্র করে বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছার বৃত্তান্ত। হারুন-অর-রশিদের ‘বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব: কী ও কেন’, মোহাম্মদ আলী খানের ‘ডাকটিকিট ও মুদ্রায় বঙ্গবন্ধু’, কামরুল হকের ‘বঙ্গবন্ধু ও সংবাদপত্র ছয়দফা থেকে গণঅভ্যুত্থান’, পিয়াস মজিদের ‘মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলা একাডেমি’, সায়মন জাকারিয়ার ‘সাধক কবিদের রচনায় বঙ্গবন্ধুর জীবন ও রাজনীতি’, আবুল কাসেম লিখেছেন ‘বঙ্গবন্ধু ও চা-শিল্প’, অনুপম হায়াৎ এর ‘বঙ্গবন্ধু ও চলচ্চিত্র’, মিল্টন বিশ্বাস লিখেছেন ‘উপন্যাসে বঙ্গবন্ধু’, বঙ্গবন্ধুর ‘ভাষণসমগ্র’ সম্পাদনা করেছেন এ কে আব্দুল মোমেন, দিব্যদ্যুতি সরকারের ‘বঙ্গবন্ধুর কারাজীবন’, এম আবদুল আলীমের ‘বঙ্গবন্ধু ও ভাষা-আন্দোলন’, নূর-উল-আলম লেলিন এর ‘রাজনীতিতে হাতেখড়ি ও কলকাতায় শেখ মুজিব’, অজয় দাশগুপ্ত লিখেছেন ‘বঙ্গবন্ধুর আন্দোলন কৌশল ও হরতাল’, মুর্শিদা বিন্তে রহমান লিখেছেন ‘স্বাধীনতার পথে বঙ্গবন্ধু পরিপ্রেক্ষিত ১৯৭০-এর নির্বাচন’, সমীর কুমার বিশ্বাসের ‘বঙ্গবন্ধু ও সমবায়-ভাবনা’ ইত্যাদি গ্রন্থ সম্পূর্ণ নতুন ও নানাদিক থেকে বৈচিত্র্যময়। এবার কেবল ২০২০ সালে রচিত আরও গ্রন্থের দিকে শ্রেণিকরণভিত্তিক মনোযোগ দেওয়া হলো, তবে প্রবন্ধ-পরিসর বিবেচনায় রেখে এই অংশকে সংক্ষিপ্তকরণের মাধ্যমে সাজানো হয়েছে। আলোচ্য শ্রেণিকরণ ও পর্যবেক্ষণে উঠে আসা ২০২০ রচিত গ্রন্থসমূহের নমুনামাত্র। এখানে যাঁদের গ্রন্থ আমাদের পর্যবেক্ষণ ও শ্রেণিকরণে প্রবন্ধ-পরিসর সংক্ষিপ্তজনিত কারণে উঠে আসেনি তাঁদের গ্রন্থ নিয়ে ভবিষ্যৎ গবেষক, পাঠক ও বঙ্গবন্ধু অনুরাগীগণ ভাববেন, লিখবেন এবং আরও ব্যাপকভাবে বঙ্গবন্ধুকে তুলে ধরবেন বলে আমাদের প্রত্যাশা। কারণ বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর চেতনাই হলো বাঙালির প্রদীপ্ত সূর্যের চিরায়ত আলো। এই আলোয় সেজে উঠছে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ, আমাদের সোনার বাংলা এবং আমাদের স্মার্ট বাংলাদেশ।

১

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ২০২০ সালে প্রকাশিত কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, ছড়া, গান ও জীবনীগ্রন্থ: বাংলা সাহিত্য হাজার বছরের ঐতিহ্য নিয়েই বেগবান সাহিত্য। আর এই প্রজন্মের সাহিত্যিকদের নিকট বঙ্গবন্ধু হলেন মণি-মুক্তায় খচিত এক মর্যাদাবান বাঙালি সন্তান। তাঁরা তাঁকেও বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের যাত্রাপথের

মতোই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বলে স্বীকৃতি দিয়েই তাঁকে নিয়ে লেখনী ধারা অব্যাহত রেখেছেন। আমাদের পর্যবেক্ষণে দেখেছি, সর্বস্তরের মানুষ বঙ্গবন্ধুর প্রতি ভালোবাসায় অনন্য, তবে বঙ্গবন্ধুকে সবচেয়ে বেশি মর্যাদায় অভিষিক্ত করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন এদেশের কবি, সাহিত্যিক, লেখক ও বুদ্ধিজীবী মহল। এজন্য তাঁরা বঙ্গবন্ধুকে তাঁদের লেখনীর প্রধান বিষয় হিসেবে নিয়েছেন। এর বহিঃপ্রকাশ ২০২০ সালে রচিত সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় যেমন রয়েছে, তেমনি নানামাত্রিক লেখনী ধারায়ও তা অব্যাহত রয়েছে। বঙ্গবন্ধুর প্রতি অফুরন্ত ভালোবাসায় তাঁর জন্মশতবর্ষের প্রারম্ভিক বছর ২০২০ সালে করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাব সংকটের মধ্যেও সবচেয়ে বেশি গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে। এমন কয়েকটি গ্রন্থের শিরোনাম ভিত্তিক শ্রেণিকরণে সংক্ষিপ্ত পর্যবেক্ষণসহ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

কবিতা, ছড়া ও অন্যান্য গ্রন্থ

বঙ্গবন্ধু শতফুলের কোরাস। আনোয়ার কবির
ছন্দে ছড়ায় বঙ্গবন্ধু। আবু রায়হান (সম্পাদিত)
বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীমূলক কাব্যগ্রন্থ। আসাদুজ্জামান
ছন্দ ছড়ায় বঙ্গবন্ধু। ইমতিয়াজ সুলতানা ইমরান
শত ছড়ায় বঙ্গবন্ধু। তৌহিদুল ইসলাম কনক
ছবি ও ছন্দে বঙ্গবন্ধু। নাজির হোসেন
ছন্দে ছড়ায় স্বাধীনতা ও শেখ মুজিব। নিতাই চন্দ্র রায়
মুজিব সমগ্র। নির্মলেন্দু গুণ
বঙ্গবন্ধু ও মহান স্বাধীনতায়ুদ্ধের কালজয়ী কবিতা। ফারুক আহমেদ জীবন
বঙ্গবন্ধু গীতিকাব্য। মনোরঞ্জন বাল্লা
বঙ্গবন্ধু ও বিচিত্র কবিতা। মজেন্দ্রাতুন নূর
কবিতায় বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ। মুহম্মদ আলী মানিক
বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতার মহাকাব্য। মুহাম্মদ সোহের চৌধুরী
মহাকাব্য মুজিবনামা (১ম খণ্ড)। মোহাম্মদ আহসান উল্লাহ
বঙ্গবন্ধু : শতবর্ষে শত কবিতা। মোনায়েম সরকার, আসাদ মান্নান
সনেটের পাতায় বঙ্গবন্ধু। মো. মাসুম বিল্লাহ
বঙ্গবন্ধুর জীবনকাব্য। রবীন্দ্র গোপ
বঙ্গবন্ধু আমার দেশ। রাজ্জাক দুলাল
বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষের কবিতা। রেজন খান
শেখ মুজিবের ছড়া। লুৎফর রহমান রিটন
ছড়ায় শেখ মুজিব। সরকার জসীম
বঙ্গবন্ধু : ১০০ কবির ১০০ কবিতা। সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল
শেখ মুজিব প্রবচন। সৈয়দ জাহিদ হাসান (সম্পাদিত)
বঙ্গবন্ধু একাত্তরের পদাবলী। সোহরাব পাশা। ইত্যাদি
বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কেবল ২০২০ সালে রচিত ও প্রকাশিত উল্লিখিত ‘কবিতা, ছড়া ও অন্যান্য বিষয়ক গ্রন্থগুলো’কে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, এখানে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম কবিতার বিভিন্ন প্রকরণে ফুটিয়ে তুলেছেন। কেউ লিখেছেন সনেট, কেউ লিখেছেন শোকের কবিতা, বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনকে কেন্দ্র করে কবিতা, বঙ্গবন্ধুকে

হত্যাকারী শত্রুদের প্রতি ঘৃণা ব্যক্ত করে ছড়া ও কবিতা, ইত্যাদি। এসব কবিতা ও ছড়ায় কবিগণ কখনো বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের সময় উচ্চারিত প্রতিবাদী বাক্য ব্যবহার, বঙ্গবন্ধুর বক্তব্যের গুরুত্বপূর্ণ শব্দ, বাক্য ও ভাষণের উক্তি ইত্যাদি সরাসরি ব্যবহার করে বঙ্গবন্ধুকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। কবিতার প্রতিষ্ঠিত কাঠামো ব্যবহার করে পুরনো কবিগণের পাশাপাশি অনেক নবীন কবিও সাক্ষাৎ মিলেছে। কেউ হয়তো জাত কবি বা ছড়াকার নন, তবুও বঙ্গবন্ধু চেতনায় ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিসংবাদিত ইতিহাস জেনে তাঁর প্রবল দেশপ্রেম তাঁদের কবিতায় ও ছড়ায় তুলে এনেছেন নিজেদের দেশপ্রেমের বৃত্তান্ত। তাঁরা এই মুজিব বর্ষে বঙ্গবন্ধুকে সম্মান জানাতে করোনাকালীন এই বিপর্যয়েও মহামানব বঙ্গবন্ধুকে ভুলেননি। বেশির ভাগ কবি ও ছড়াকারের ছড়ায় বঙ্গবন্ধুর এই মার্চের ভাষণের বক্তৃকণ্ঠ ঘোষণার তীব্র আওয়াজ ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ বারবার ধ্বনিত হয়েছে। আরও ধ্বনিত হয়েছে দেশের কথা, ভাষার কথা, শাসকের কথা, শোষকের কথা। কখনো জয় বাংলা ধ্বনিত কথায়, কখনো জয় বঙ্গবন্ধু কথায়, কখনো বাংলাদেশ চিরজীবী হওয়ার কথায় তাঁদের কবিতা ও ছড়ায় বঙ্গবন্ধুর অনন্যতা ঘোষিত হয়েছে। নতুন যুগের পাঠক, গবেষক কেবল এই একটি বছরে রচিত বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত কবিতা ও ছড়া নিয়ে ভাবলে আমরা মনেকরি বঙ্গবন্ধুর দর্শনের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন এখানে আরও গভীরভাবে বুঝে উঠতে পারবেন। বঙ্গবন্ধুকে সম্মানিত করে তাঁদের লিখিত এক-একটি কবিতার লাইনে ও ছড়ায় যেভাবে বঙ্গবন্ধু সম্মানিত হয়েছেন, এককথায় তা অনন্য শিল্পগুণ সমৃদ্ধির জানান দেয়।

গল্পে বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্য

বঙ্গবন্ধুর গল্প। আনোয়ারা সৈয়দ হক

সাহিত্যে বঙ্গবন্ধু। ইমন সালাউদ্দিন

মুজিবের গল্প শোন-১। শামস সাঈদ

মুজিবের গল্প শোন-২। শামস সাঈদ

বঙ্গবন্ধু, একুশ ও মুক্তিযুদ্ধের গল্প। শাহনেওয়াজ চৌধুরী

বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ও যুদ্ধদিনের গল্প। সাইফুল্লাহ নবীন

নির্বাচিত গল্পে বঙ্গবন্ধু। সেলিনা হোসেন (সম্পাদিত)

মুক্তিযুদ্ধের গল্প : জনকের সঙ্গে ইহজনম। হুমায়ূন মালিক

পূর্ববঙ্গ থেকে বাংলাদেশ : বরীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শেখ মুজিবুর রহমান। সেলিনা হোসেন

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে প্রথম অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস লাহোর টু গোপালগঞ্জ। আহমেদ রিয়াজ;

ইত্যাদি শিরোনামে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত গল্পেও বিস্তারিতভাবে উঠে এসেছে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের নানা সংগ্রামী দিক। কখনো ছোটগল্পের শিল্পকুশলতায় মহানায়ককে নতুন প্রজন্মের সংগ্রামী নায়ক, মহানায়কের অতীত জীবন-স্মৃতিচারণ, কখনো যুদ্ধের গল্পের ক্যানভাসে, কখনো স্বাধীনতার কথায়, কখনো টুঙ্গিপাড়ার খোকা, কখনো বঙ্গবন্ধু, কখনো বাঙালি জাতির পিতা, কখনো আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বিশ্বনেতার গুণাবলীতে বঙ্গবন্ধুকে তাঁদের গল্পের তুলে এনেছেন ইতিহাসের পটভূমিকায়। গল্পকারগণ বাংলাদেশ, বাঙালি জাতি, বাংলা ভাষা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে তুলে এনে মুজিবীয় চেতনার এক আদর্শ দলিল নির্মাণ করে গেছেন। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এই একটি বছরে রচিত গল্পগুলো পূর্বের বছরগুলোতে রচিত গল্পের তুলনায় ভিন্নতা এখানে যে, পূর্বের গল্পকারগণ বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু হত্যা পরবর্তী দেশে সামরিক শাসন ও বিভিন্ন অপশাসনের কারণে যা সরাসরি বলতে পারেননি, এই একটি বছরে অনেক স্পষ্ট সুর ও স্বরে তা ব্যক্ত করেছে পেরেছেন। তার প্রধান

কারণ বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অত্যন্ত সাহসী ভূমিকায় দীপ্তকণ্ঠে এদেশের কবি সাহিত্যিক লেখক বুদ্ধিজীবীসহ সব শ্রেণির মানুষকে মুক্তভাবে মত প্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছেন। সচেতন ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উদ্বুদ্ধ গল্পকারগণ এই পর্বে তাই তাঁদের লেখনীতে সাহসী ভূমিকায় নিজের প্রাণের থেকে উৎসারিত সত্য বচনে অত্যন্ত যত্নে মনের সব মাধুরী মিশিয়ে বাঙালির ইতিহাসের মহানায়কে তাদের প্রিয় মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ধরনের ঘটনায়, প্রেক্ষাপটে, গল্পের আখ্যানে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গল্প লিখে তাঁর জীবন ও কর্মকে যেমন সমৃদ্ধ করেছেন, বাংলা সাহিত্য তথা বিশ্বসাহিত্যে বঙ্গবন্ধুকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এসব গল্প বাংলাদেশের বিভিন্ন বঙ্গবন্ধু কর্নার ও পাঠ্যবইয়ের সিলেবাসে স্থান করে দেওয়া অত্যন্ত জরুরী। কারণ এই সব গল্পে বঙ্গবন্ধুর দেশপ্রেম, সততা, আদর্শ, রাজনীতি, মানবিক নীতি, তার মনন ও সামগ্রিক জীবন একটি গাল্পিক প্রেক্ষাপটে উঠে এসেছে, যার মূলশ্রোত স্বাধীন বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার দিকেই স্পষ্টত প্রবাহমান, যা ভবিষ্যত অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ নির্মাণের প্রধান দর্শনকেই ধারণ করে। তীব্রভাবে বঙ্গবন্ধুকে জানার বুঝে উঠার জন্য এসব গল্প পরবর্তী যুগে তরুণ প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধুর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনে জাগ্রত থাকবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ২০২০ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধগ্রন্থ

বঙ্গবন্ধুর আন্দোলন কৌশল ও হরতাল। অজয় দাশগুপ্ত
বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। অলকা ঘোষ
খোকা থেকে বঙ্গবন্ধু। আতিকুর রহমান (সম্পাদিত)
আয় বাঙালি আয় মুজিবের নৌকায়। ড. আনিসুজ্জামান, আসলাম সানী
দ্যোতনায়-দ্রোহে শিল্প- সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ। আনিসুর রহমান
বাঙালির অবিসংবাদিত মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আনোয়ার খান
বাঙালির নয়ন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আফজালুর রহমান
বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-৩ শেখ হাসিনা। আবদুল গাফফার চৌধুরী
বঙ্গবন্ধু শতবর্ষে শত প্রবন্ধ। আবদুল গাফফার চৌধুরী, মোনায়েম সরকার (সম্পাদিত)
বঙ্গবন্ধু ও চা শিল্প। আবুল কাসেম
বঙ্গবন্ধুর জীবন : কালপঞ্জি। আয়েশা হক
আমি বঙ্গবন্ধুর রাসেল। আলী আসকর
অন্য আলোয় বঙ্গবন্ধু। আলী হাবিব (সম্পাদিত)
আমার নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আহমেদ ফিরোজ
মহাকালের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আহমেদ ফিরোজ
বঙ্গবন্ধু ও ফজিলাতুননেছা। আহসানুল কবীর
বাঙালির বঙ্গবন্ধু : বিশ্ববন্ধু শেখ মুজিব। প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী
বঙ্গবন্ধুর বাড়ি। ইমরুল ইউসুফ
বঙ্গবন্ধুর ‘অসমাণ্ড আত্মজীবনী’। এ. এস. এম. বোরহান উদ্দিন
বাঙালির নয়নমনি শেখ মুজিবুর রহমান। এম. এ. মান্নান
বাঙালির মুক্তির ইতিহাস : বঙ্গবন্ধু থেকে বঙ্গবন্ধুকন্যা। অধ্যাপক ড. কামরুল হাসান খান
আমাদের জাতির পিতা। খায়রুল আলম মনির
বাঙালির হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু। খায়রুল আলম মনির

বাংলার মুজিব বাঙালির মুজিব। খালেদ বিন জয়েনউদ্দিন, রহমান মতিন (সম্পাদিত)
রক্তধারায় বঙ্গবন্ধু। জয়িতা শিল্পী
বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বিচিত্র রচনা সম্ভার। জি. এম. তারিকুল ইসলাম
স্মৃতিতে ভাস্বর বঙ্গবন্ধু। জি. এম. তারিকুল ইসলাম
অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও জাতি গঠনে বঙ্গবন্ধু। জি. এম. তারিকুল ইসলাম
তারুণ্যের চোখে বঙ্গবন্ধু। জুবায়ের আহমেদ
রাজনীতির মহাকবি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। তপন দেবনাথ
বঙ্গবন্ধু কী চেয়েছিলেন কী অপপ্রচার হয়েছে। নওশের আলী হিরা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির প্রাণ। ড. পারভীন সুলতানা
বাঙালির বিস্ময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ড. পারভীন সুলতানা
মুজিববর্ষ। প্রণব কুমার চৌধুরী
পিতা তুমিই বাংলাদেশ। বাপ্পু সিদ্দিকী
বাঙালির অপর নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ড. মাহবুবুর রহমান
স্মৃতির মণিকোঠায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মিজানুর রহমান
শেখ মুজিব একটি লাল গোলাপ। মিনার মনসুর ও দিলওয়ার চৌধুরী (সম্পাদিত)
উপন্যাসে বঙ্গবন্ধু। মিল্টন বিশ্বাস
বঙ্গবন্ধু শেখ হাসিনা ও সাম্প্রতিক বাংলাদেশ। অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান
তোমার নাম নিষিদ্ধ ছিল। মীর আবদুর রাজ্জাক
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : শততম জন্ম স্মারকগ্রন্থ। মীর মোশারফ হোসেন
বঙ্গবন্ধু সমগ্র। মুনতাসীর মামুন
বঙ্গবন্ধু মানেই বাংলাদেশ। মুহম্মদ নুরুল আবসার (সম্পাদিত)
ইসলাম প্রসারে বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনা। মুহম্মদ মাহবুবুর রহমান
বহুমাত্রিক শেখ মুজিব। মো. আবদুর রউফ, ড. রকিবুল হাসান (সম্পাদিত)
বঙ্গবন্ধুর কর্মদর্শন। মো. আরিফ উদ্দিন খান
বঙ্গবন্ধুর-জন্মশতবর্ষ ইতিহাসের পুনর্পাঠ। মোনায়েম সরকার
মুজিব মানেই বাংলাদেশ। মো. রুহুল কবির বাবুল
বাঙালির অমৃত অনুভব। রওশন জাহিদ
বঙ্গবন্ধু ও শেখ রাসেল। রঞ্জনা বিশ্বাস
দাবায়ে রাখতে পারবা না। রামচন্দ্র দাস
শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। লায়লা নাজনীন হারুন
জন্মশতবর্ষের উৎসারিত আলোয় শেখ মুজিব। লুৎফর চৌধুরী
বঙ্গবন্ধু অযুত প্রাণের নাম। শঙ্কা পঞ্চমী
শতাব্দীর মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অজানা অধ্যায়। শহিদুল ইসলাম মিন্টু (সম্পা.)
বঙ্গবন্ধু ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। শান্তা পত্রনবীশ
বঙ্গবন্ধুর ৭৫ মার্চের ভাষণ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ। শামসুজ্জামান খান (সম্পাদিত)
শেখ মুজিব বুকের রক্তে লেখা নাম। শাহনেওয়াজ চৌধুরী
অসমাপ্ত আত্মজীবনীর শেখ মুজিব। শাহনেওয়াজ চৌধুরী

টুঙ্গিপাড়ায় মুজিবের বুকের কাছে। শাহনেওয়াজ চৌধুরী
বঙ্গবন্ধু তোমার জন্য। শাহনেওয়াজ চৌধুরী
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। শাহাদাত হোসেন নিপুণ
ক্রীড়াঙ্গনে বঙ্গবন্ধু। শেখ মনিরুল ইসলাম আলমগীর
বঙ্গবন্ধু অভিধান। শেখ সাদী
বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন। সজীব কুমার বণিক
বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ। সনৎকুমার সাহা
বঙ্গবন্ধু হৃদয়ের গহীনে। সিরাজুল ইসলাম মুনির
বত্রিশ অথবা বাঙালির ঠিকানা। সুজাত মনসুর
বাংলাদেশের প্রাণ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সেলিনা হোসেন, আসলাম সানী
বঙ্গবন্ধু ও স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ। সৈয়দ শামসুল হক
জাতির পিতার জন্মদিন আজ। সোহেল আমিন বাবু
বাঙালির অন্ত মহান মুজিবুর। হাবীবুল্লাহ সিরাজী, আসলাম সানী (সম্পাদিত)
৭ই মার্চের ভাষণ কেন বিশ্ব ঐতিহ্য সম্পদ। হারুন-অর-রশীদ।

উক্ত পর্যবেক্ষণ ও শ্রেণিকরণকৃত প্রবন্ধে পাওয়া সবচেয়ে বেশি গ্রন্থ হলো প্রবন্ধগ্রন্থ এবং তাঁকে নিয়ে রচিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নানা বিষয়ক প্রবন্ধ। বিভিন্ন সংবাদপত্র পুরো মুজিব বর্ষেই তাদের নিয়মিত প্রকাশিত পত্রিকায় ও বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনা অব্যাহত রেখেছিলেন। বাংলাদেশের প্রায় সব ধরনের পত্রিকায় বঙ্গবন্ধু ও মুজিব বর্ষের লোগো সমৃদ্ধ ছবি সারা বছর পত্রিকার অত্যন্ত মর্যাদাবান স্থানে ছাপিয়ে বঙ্গবন্ধুকে যেমন সম্মানিত করেছেন, তেমনি সম্মানিত করেছেন ভেতরের পৃষ্ঠাগুলোতে তাঁকে নিয়ে নানান প্রবন্ধ, কবিতা, ছড়া, সম্পাদকীয় কলাম, বিশেষ ক্রোড়পত্রসহ ইত্যাদি প্রকাশনা। আমাদের এই পর্যবেক্ষণের পরিসর অত্যন্ত সীমিত তাই সব ধরনের পত্রিকা ও নানা ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত সব ধরনের প্রকাশিত প্রবন্ধগ্রন্থ বা প্রবন্ধসমূহকে স্থান দেয়া সম্ভব নয় বলে আমরা কেবল এই কথা বলতে চাই, আগামী যুগের স্মার্ট বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু গবেষকগণ এর মাধ্যমে নিবিড়ভাবে গবেষণা করলে কয়েকশত নতুন অভিসন্দর্ভ হয়ে যাবে। আশাকরি, আগামী দিনের গবেষকগণ শুধু ২০২০ সাল নিয়ে এবং বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে প্রকাশিত প্রবন্ধ নিয়ে ভাববেন এবং লিখবেন, তাহলে দেখতে পাবেন, হাজারো গুণের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কীভাবে একটি দেশের জাতির পিতা হয়ে উঠলেন। কীভাবে তিনি শত বাধা পেরিয়ে একটি স্বাধীন বাংলাদেশ আপনাদের উপহার দিলেন। আসলে প্রবন্ধের বঙ্গবন্ধু মানেই প্রাবন্ধিকদের কাছে একটি লাল সবুজের রঙে পাওয়া বাংলাদেশ, কীভাবে বঙ্গবন্ধুর রঙে রঞ্জিত হলো তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা। প্রবন্ধের বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক নেতা বঙ্গবন্ধু, ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু, খোকা থেকে মহামানব বঙ্গবন্ধু, বাংলা ভাষার বঙ্গবন্ধু, রাজনীতির মহানায়ক বঙ্গবন্ধু, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু, বাঙালির ইতিহাসের বঙ্গবন্ধু। আমাদের প্রাবন্ধিকগণের কলমে বঙ্গবন্ধু জীবন-কর্ম ও দর্শনের এমন কোনো বিষয় নেই, যা প্রাবন্ধিকগণ তাঁদের কলমে তুলে আনেননি। বঙ্গবন্ধুর মুখ থেকে উচ্চারিত হওয়া এক একটি বাক্যই এক-একটি প্রবন্ধ হয়েছে, এক-একটি গ্রন্থের নাম হয়েছে। আমাদের শ্রেণিকরণ ও পর্যবেক্ষণের জন্য উল্লিখিত প্রবন্ধগ্রন্থগুলোর নাম দেখলে যেকোনো সচেতন পাঠক বিষয়টি বুঝে নিতে পারেন। বাংলাদেশের এবং বাংলাদেশের বাইরে যেসব বিশ্ববিদ্যালয় মুজিব বর্ষে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে প্রকাশনা করেছেন, এদের প্রত্যেকটিতে বঙ্গবন্ধুর প্রতি চিরায়ত সম্মান প্রদর্শন করে যেসব প্রবন্ধ রচিত হয়েছে, সেগুলোতেও বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মকে স্পষ্টভাবে মূল্যায়িত হয়েছে। বাংলাদেশ স্টাডিজ বিভাগ, বঙ্গবন্ধু অধ্যয়ন ও বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্র, বিভিন্ন

প্রতিষ্ঠানের গবেষক ও আগ্রহীগণ এই বিষয়ে একটু নজর দিলে দেখবেন এবং সংগ্রাহক নিয়োগ করে এসব প্রকাশনা ও প্রকাশক প্রাবন্ধিকগণের তালিকা সংগ্রহ করলে আরো দেখতে পাবেন, এই একটি বছর কেবল প্রবন্ধের চিন্তাশীল ও মননশীল এবং যুক্তিবাদী কাঠামোয় বঙ্গবন্ধু কীভাবে তাদের ভাবজগতে মূল্যায়িত হয়েছেন। ২০২০ এর পূর্বের প্রাবন্ধিকগণের সঙ্গে মূল্যায়নের তুলনায় দেখতে পাবেন, কত স্পষ্টতায়, কতো স্বচ্ছ লেখায় একালের প্রাবন্ধিকদের কলম বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গতিশীল হয়েছে। তরুণ প্রজন্মের প্রাবন্ধিকগণ মূলত স্বচ্ছ স্মৃতিতে বঙ্গবন্ধুকে নির্মাণ করছেন যুগের মহানায়কের ভূমিকায়। জাতির পিতার শ্রেষ্ঠ সন্তানগণ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায় বঙ্গবন্ধুর চিন্তাকে যেভাবে প্রবন্ধের মাধ্যমে সারা বাংলায় এবং সমগ্র বিশ্বে তুলে ধরেছেন, এক কথায় তা পরম শ্রদ্ধার ও গৌরবের।

সংগীতগ্রন্থ-২০২০

বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত সঙ্গীতমালা। খালেক বিন জয়েন উদ্দিন
গানের কবিতায় বঙ্গবন্ধু। তপন বাগচী
গানের মাঝে শেখ মুজিব। ড. মো. জসীম উদ্দিন শেখ

বঙ্গবন্ধুর জীবনীগ্রন্থ- ২০২০

বাংলার স্থপতি (৬ষ্ঠ খণ্ড)। অ্যারভিন দীলিপ বাগচী
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অজানা কথা। আহমদ মতিউর রহমান
ফাদার অব দ্য নেশন। এমরান চৌধুরী
চট্টগ্রামের বঙ্গবন্ধু। কালাম চৌধুরী
চিরঞ্জীব শেখ মুজিব। খায়রুল আলম মনির
আমাদের জাতির পিতা। খায়রুল আলম মনির
বাঙালির হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু। খায়রুল আলম মনির
বঙ্গবন্ধু এবং শেখ পরিবারের ইতিহাস। খালেক বিন জয়েনউদ্দিন
বঙ্গবন্ধুর কলকাতা জীবন। তাসনীম আলম
মুজিব সূর্য। ডা. প্রণব কুমার
বঙ্গবন্ধু পিতা মুজিব। বশিরজ্জামান বশির
ইতিহাসের কিংবদন্তি বঙ্গবন্ধু। বিপ্লব মোহন চৌধুরী
হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। ভীম চন্দ্র সানা
৩২ নম্বর পাশের বাড়ি ২৫ মার্চ ১৫ আগস্ট। মহি উদ্দিন আহমদ
গুরু-শিষ্য-ভাসানী বঙ্গবন্ধু। মাসুদ রানা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছাত্রজীবন ও তাঁর রাজনীতি। মাসুদ রানা
বঙ্গবন্ধুর জীবন জেল থেকে জেলে ১৯৫০-১৯৫৫। মুনতাসীর মামুন
বঙ্গবন্ধুর জীবন দল ক্ষমতা ও সংকট। মুনতাসীর মামুন
বঙ্গবন্ধুর সংসার জীবন। মোতাহার হোসেন মাহবুব
মিয়া ভাই। মো. মুজিবুর রহমান
খোকার জীবনে রেনু। মো. শাখাওয়াত হোসেন

এক নজরে বঙ্গবন্ধু। ড. মোহাম্মদ আমীন
বঙ্গবন্ধুর জীবনকথা। সুব্রত বড়ুয়া
বঙ্গবন্ধু। সুমন্ত গুপ্ত
বঙ্গবন্ধুর বীরগাথা। সৈয়দ শামসুল হক
আমাদের বঙ্গবন্ধু আমাদের জাতির পিতা। হুমায়ুন কবির ঢালী

উল্লিখিত গ্রন্থগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যে, এগুলোতে বঙ্গবন্ধুর জন্ম ও বংশ পরিচয়, শৈশব ও কৈশোর জীবনের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষাগ্রহণের সঙ্গে নানা ধরনের অর্জনের কথা উঠে এসেছে। বঙ্গবন্ধুর মানস গঠনে সে সময়ের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট গ্রন্থগুলোতে স্পষ্টভাবে তুলে ধরার পাশাপাশি সে সময়ে বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশবিভাগ পরিস্থিতি, পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক চিত্র, ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট গঠন, আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সংযোগ ঘটনা প্রবাহ উঠে এসেছে। এসবের নানামাত্রিকতায় তাঁর জীবনীগ্রন্থগুলো ২০২০ সালেও রচিত হতে দেখা গেছে। ২০১২ সালে প্রকাশিত বঙ্গবন্ধুর ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’র দিকে তাকালেও দেখা যায় এই ধরনের বিষয়গুলো বঙ্গবন্ধু নিজেই তাঁর কলমে জানিয়ে গেছেন। তাঁর সেই আত্মজীবনীর সূত্রে আমরা যেসব বিষয় জেনেছি যেমন, তাঁর কারাজীবন, পিতা-মাতা, সন্তান ও সহধর্মিণীর বৃত্তান্ত। সামগ্রিক দিক বিবেচনায় দেখা যায়, ২০২০ সালে রচিত গ্রন্থগুলোতে সেসব বিষয়ের সঙ্গে নানান নতনত্ব রয়েছে। যেমন— কিছু গ্রন্থে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের অজানা কথা যা ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’তে নেই, কিন্তু কর্মের গুণে তিনি স্বাক্ষর রেখে গেছেন, যা এতদিন অগোচরে ছিল। ২০২০ সালের গ্রন্থগুলোতে তাঁর জীবন ও কর্মের মূল্যায়নে তাঁকে জীবনীকারগণ ‘ফাদার অব দ্য নেশন’, ‘চিরঞ্জীব শেখ মুজিব’, ‘মুজিব সূর্য’, ‘ইতিহাসের কিংবদন্তি বঙ্গবন্ধু’, ‘মিয়া ভাই’ প্রভৃতি পুরনো গ্রন্থের নাম ও বিশেষণে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের মূল্যায়ন করে গিয়েছেন। জীবনীগ্রন্থগুলোতে বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শন কেন্দ্রিক নানা উক্তি উঠে এসেছে যা তার বিভিন্ন ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ অংশের কোনো পরিষ্কার দর্শনকে স্পষ্ট করেছে। যেমন— কেউ কেউ অনুদাশঙ্কর রায়ের ‘যতকাল রবে পদ্মা, মেঘনা/ গৌরী, যমুনা বহমান/ ততকাল রবে কীর্তি তোমার / শেখ মুজিবুর রহমান।’ অথবা, কেউ তুলে এনেছেন বঙ্গবন্ধুর সরাসরি উক্তি, ‘বিশ্ব আজ দুইভাগে বিভক্ত- শোষক আর শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে।’ তাঁর জীবনের বিখ্যাত উক্তির মধ্যে ‘আমার সবচেয়ে বড় শক্তি আমার দেশের মানুষকে ভালোবাসি, সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো আমি তাদের খুব বেশী ভালোবাসি’ ইত্যাদি বিষয় ও বক্তব্য তাঁর জীবনীগ্রন্থে ব্যাপকভাবে নবমূল্যায়নে ব্যবহৃত হয়েছে।

শিশু সাহিত্যে বঙ্গবন্ধু -২০২০

ছোটদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আলী ইমাম
ছোটদের বঙ্গবন্ধু। আসলাম সানী
বঙ্গবন্ধুর বাড়ির উঠোন। ইমরুল ইউসুফ
বঙ্গবন্ধু ও শেখ রাসেল। খালেক বিন জয়েনউদ্দিন
তারুণ্যের চোখে বঙ্গবন্ধু। জুবায়ের আহমেদ
অনু ও ছয় দফা খাতা। প্রব এষ
আমাদের জাতির জনক। পাশা মোস্তফা কামাল
তোমার নেতা আমার নেতা। ফরিদুর রেজা সাগর (সম্পাদিত)
বঙ্গবন্ধুর কিশোর জীবনী। মিলন নাথ

ছোটদের বঙ্গবন্ধু : জীবন ও কর্ম। মেরিনা সাঈদ
অগ্নিঝরা ৭ মার্চ এবং এক কিশোরের একান্তর। মো. ফজলুল হক
দ্যা অ্যাডভেঞ্চার অব খোকা দ্যা থ্রেট। সায়েক আহমেদ
খোকা মানেই বাংলাদেশ। সারওয়ার-উল ইসলাম
বঙ্গবন্ধু ও একটি বাঘের গল্প। সৈয়দা নাজমুন নাহার

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে শিশুদের জন্য রচিত উল্লিখিত গ্রন্থগুলোর বিশেষত্ব রয়েছে। মূলত গ্রন্থগুলো শিশুদেরকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ অনুসরণে শিক্ষা, সংস্কৃতি, অসাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়ে দেশ ও মানুষকে ভালোবাসার মানসিকতা বিকাশে এবং নিজেদের সূনাগরিক হিসেবে বেড়ে উঠার প্রেরণামূলক গ্রন্থ। বঙ্গবন্ধু তাঁর সমগ্র জীবনে মানুষকে ভালোবেসেছেন এবং এই ভালোবাসায় বাঙালির হৃদয়ে তিনি সৃষ্টি করেছেন মানবীয় প্রেম, অহিংসা ও উদারতা। ভালোবাসা দিয়ে তিনি বাঙালি সমাজে যে অনন্য আদর্শ তৈরি করে গেছেন তা আজও অমর হয়ে রয়েছে। আমাদের পর্যবেক্ষণে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে শিশুদের রচিত গ্রন্থগুলোতে বঙ্গবন্ধুর ছেলেবেলা, বাবা-মায়ের প্রসঙ্গ, সে সময়ের সামাজিক জীবন, প্রাকৃতিক পরিবেশ, স্কুলজীবন, কৈশোরের মানবিক ও মহৎ কাজসহ ছেলেবেলার নানা আদর্শিক দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে। বেশিরভাগ গ্রন্থে বঙ্গবন্ধুর মহামানবিক দর্শনকে তুলে ধরা হয়েছে। কয়েকটি গ্রন্থে ৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে আলোচনা রয়েছে। কিছু গ্রন্থে বঙ্গবন্ধু ও রাসেলের প্রসঙ্গ রয়েছে। গ্রন্থগুলোর মধ্যে আলী ইমাম রচিত ‘ছোটদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান’, মিলন নাথ রচিত ‘বঙ্গবন্ধুর কিশোর জীবনী’ এবং মো. ফজলুল হকের ‘অগ্নিঝরা ৭ মার্চ এবং এক কিশোরের একান্তর’ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২

বঙ্গবন্ধু, ভাষান্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গ নিয়ে ২০২০ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ: ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত গ্রন্থাকারে পরিবেশিত বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে জানার পরিধি একেবারে কম ছিলো। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখালেখি মূলত বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পরেই শুরু হয়। এদেশের প্রধান প্রধান সাহিত্যিকগণ তাঁর মৃত্যুর পরে এই লেখনীর ধারা সূচনা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩), শওকত ওসমান (১০১৭-১৯৯৮), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২), রাহাত খান (১৯৪০-২০২০), শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬), জসীমউদ্দীন (১৯০৩-১৯৭৬), সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯), কবি আবুল হোসেন (১৯২২-২০১৪), অন্নদাশংকর রায় (১৯০৪-২০০২), আসাদ চৌধুরী (১৯৪৩-), আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (১৯৩৪-২০০১), হুমায়ুন আজাদ (১৯৪৭-২০০৪), ময়হারুল ইসলাম (১৯২৩-২০১২), আবুবকর সিদ্দিক (১৯৩৬-), ইমদাদুল হক মিলন (১৯৫৫-), নির্মলেন্দু গুণ (১৯৪৫-), পান্না কায়সার (১৯৫০-২০২৩), কামাল চৌধুরী (১৯৫৭-) প্রমুখ। বর্তমানে এই লেখনী কেবল কবি-সাহিত্যিকগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই সমাজের সর্বস্তরের শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা এক পরম গৌরবের বিষয় হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। ২০২০ সালে প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর শিরোনামে এবং লেখক নামেও এর প্রমাণ রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু ও ভাষা আন্দোলন। এম. আবদুল আলীম
বঙ্গবন্ধু ও সোহরাওয়ার্দী। আজরিন আফরিন
জাতি রাষ্ট্রের জনক বঙ্গবন্ধু। আনু মাহমুদ
বঙ্গবন্ধু ও যুক্তফ্রন্ট সরকার। আনোয়ার আহমেদ
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যার নামে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিলো। প্রকৌশলী আনোয়ার হোসেন
বঙ্গবন্ধু ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ। আবদুল্লাহ আল মোহন

বাঙালি জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান। আবুল হাসান
বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা। এম. এ. হান্নান
বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের রিপোর্ট। কানাই চক্রবর্তী
বঙ্গবন্ধু ও বাঙালির ইতিহাস। কুমকুম কবির
বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ। তোফায়েল আহমেদ
বঙ্গবন্ধু ও সাত বীরশ্রেষ্ঠ কথা। নূর মোহাম্মদ সিরাজী
বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের স্বাধীনতায়ুদ্ধ। নূরু কাওসার তালুকদার অনুপা
মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ও বাংলা একাডেমি। পিয়াস মজিদ
বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ। মহসীন চৌধুরী
৬ দফা : স্বাধীনতার অভিযাত্রায় বঙ্গবন্ধু। মুনতাসীর মামুন
বঙ্গবন্ধু ও বাঙালি জাতি রাষ্ট্রের অভ্যুদয়। মো. নূর নবী
বঙ্গবন্ধু সংগ্রাম ও স্বাধীনতা। প্রফেসর মো. মোজাম্মেল হক
ঐতিহাসিক মুজিবনগর সরকার ও বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা সংগ্রাম। মোহাম্মদ আনোয়ার খান
বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মোহাম্মদ আবদুর রশীদ
বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ। রেজাউল করিম
বঙ্গবন্ধু ও অসহযোগ আন্দোলন। রেজিনা বেগম
বঙ্গবন্ধু ও আগরতলা মামলা। সুমী আক্তার
বাঙালির আন্দোলন পরিপ্রেক্ষিত ও বঙ্গবন্ধু। শফিক আফতাব
মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ঘোষণা। সৈয়দ মোজাম্মেল হক মিলন
জাতির পিতা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। হাফিজ রশিদ খান
বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ। ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন
বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা বঙ্গকন্যা। ড. এম. এ. মান্নান। ইত্যাদি

ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা তাঁর রাজনৈতিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব যেমন ছিলো পরোক্ষ নেতৃত্বও গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। ‘ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা’ বিষয়ে নানা তথ্য প্রমাণসহ অসংখ্য গ্রন্থ ইতিপূর্বে রচিত হয়েছে। এসব গ্রন্থে প্রমাণিত হয়েছে বাংলা ভাষার জন্য বঙ্গবন্ধু নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। আন্দোলনের সময় জেলে থেকেও তিনি বার বার ফুঁসে উঠেছেন। জেলে থেকে কখনো পরিকল্পনা করেছেন, কখনো অনশন করেছেন। বঙ্গবন্ধু সে সময়ে বিরাজমান অবস্থা, প্রেক্ষাপট, আর্থসামাজিক বাস্তবতার সামগ্রিকতায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের অন্তর্নিহিত শক্তিকে বাঙালির জাতীয়তাবাদের খাতে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর পরিকল্পনা ও সুস্পষ্ট ভূমিকায় এই ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই বাঙালি জাতীয়তাবাদ একটি সুদৃঢ় ভিত্তি পায়। ২০২০ সালে রচিত ‘বঙ্গবন্ধু ও ভাষা আন্দোলন’ বিষয়ক গ্রন্থগুলোতেও বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা ও অবদান স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে।

২০২০ সালে রচিত মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু কেন্দ্রিক গ্রন্থগুলো বঙ্গবন্ধুর নানামাত্রিক রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার কথায় ভরপুর। ১৯৭১ সালে বিজয় অর্জনসহ তাঁর রাজনৈতিক সংগ্রামের নানা উত্থান-পতনের কথায় এই পর্বের গ্রন্থগুলো নানাদিক থেকে মর্যাদাবান।

৩

বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি, প্রশাসনিকনীতি, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, অর্থনৈতিক দক্ষতা, সমবায়, শিক্ষা, নারী উন্নয়ন ভাবনা নিয়ে ২০২০ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ: জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ। গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও সুসম সমাজব্যবস্থার ভাবাদর্শে তিনি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা তাঁর জীবনের মহত্তম অর্জন। উদার গণতান্ত্রিক, জাতীয়তাবাদী, অসাম্প্রদায়িক ও সমাজবাদী আন্দোলন-সংগ্রামে তিনি বাঙালির অসাধারণ মুক্তিনায়কে পরিণত হয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু জীবনব্যাপী রাষ্ট্র, সমাজ ও সংস্কৃতির নানা পর্যায়ে বহুবিধ নীতি ও আদর্শ গ্রহণ করে সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন এক সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও চিন্তাধারাকে সমাজ রাষ্ট্রে বাস্তবায়ন, বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধের ভাবধারায় নির্মাণ এবং সুখী ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ সৃষ্ণের সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়নের পথে ২০২০ সালে রচিত হয়েছে অনেক গ্রন্থ। নিম্নে ২০২০ সালে প্রকাশিত বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি, প্রশাসনিকনীতি, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, অর্থনৈতিক দক্ষতা, সমবায়, শিক্ষা, নারী উন্নয়ন ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থের শিরোনাম তুলে ধরা হলো—

বঙ্গবন্ধুর নারী উন্নয়ন ভাবনা। আফসানা ইসলাম
বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি। এস. এম. তানভীর আহমদ
বঙ্গবন্ধুর অর্থনীতি। জীবন ইসলাম
রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধু। জুলফিকার নিউটন
রাজনীতির মহাকবি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। তপন দেবনাথ
বাঙালির জাগরণ ও উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সুযোগ্য কন্যা। নারগিস বেগম মোস্তফা
রাজনীতিতে হাতেখড়ি ও কলকাতায় শেখ মুজিব। নূহ-উল আলম লেলিন
বঙ্গবন্ধুর পরমত সহিষ্ণুতা। প্রফেসর নৌশাদ কামাল
বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন ভাবনা। মিঠুন সাহা
বঙ্গবন্ধুর সমাজতান্ত্রিক ভাবনা। মীর মোশারফ হোসেন
বঙ্গবন্ধু ও মুসলিম বিশ্ব। মামুনুর রশীদ
বঙ্গবন্ধুর মানবাধিকার দর্শন। মুনিরা জাহান সুমি
বঙ্গবন্ধু ও ইন্ধিরা গান্ধী। রেহানা পারভীন
বঙ্গবন্ধুর চিঠিপত্র। সত্যজিত রায় মজুমদার
বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা। সমীর কুমার বিশ্বাস
বিশ্বশান্তি জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু। সুভাষ দে
বাংলাদেশের রাজনীতি বঙ্গবন্ধুর সময়কাল। হালিম দাদ খান
বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনা। মো. জাকির হোসেন
বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা বাংলাদেশের উন্নয়ন ভাবনা ও আমাদের কূটনীতি। ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন
টেকসই উন্নয়নের পথে অভিযাত্রা বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা। ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন; ইত্যাদি।

উল্লিখিত গ্রন্থগুলোতে বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি, প্রশাসনিকনীতি, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, অর্থনৈতিক দক্ষতা, সমবায়-দর্শন, শিক্ষা-দর্শন, নারী উন্নয়ন ভাবনা অত্যন্ত চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি ছিলো আত্মমর্যাদার, সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব ও মৈত্রীর। এছাড়াও তিনি জোটনিরপেক্ষনীতি, আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিকরণের কূটনীতিসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ভাবনায় তাঁর পররাষ্ট্রনীতি আবর্তিত হয়েছে। ২০২০ সালে

রচিত গ্রন্থগুলোতে তাঁর সমুন্নত ভাবনার পররাষ্ট্রনীতির বিভিন্ন দিকের বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি তাঁর সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে যেসব প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সেগুলোই আজকের প্রশাসন ব্যবস্থার ভিত্তি রচনা করেছে। তাঁর প্রশাসনিক দূরদর্শিতার বিস্তারিত বৃত্তান্ত নিয়ে ২০২০ সালে নানামাত্রিক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তিনি সত্যিকার অর্থে জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি আনয়নে সমবায়কেই একমাত্র উপায় হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেন। এই বছর তাঁর সমবায় দর্শন নিয়ে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা দর্শন ছিলো উন্নত জাতিবোধের এবং গৌরবের। তাঁর শিক্ষাভাবনায় অন্তর্ভুক্ত ছিলো বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা। এই বছর তাঁর শিক্ষা দর্শনের নানাদিক নিয়ে গ্রন্থ রচিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর সময়ে তিনি নারীদের জন্য জাতীয় সংসদে ১৫টি আসন সংরক্ষিত করেন এবং নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত করেন। তারই ফলে আজকের বাংলাদেশে নারীর অগ্রগতি দৃশ্যমান। এই বছর তাঁর নারী উন্নয়ন ও অগ্রগতি ভাবনায় বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

৪

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড, স্মৃতিচারণ ও মূল্যায়ন নিয়ে ২০২০ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ: বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড নিয়ে তৎকালীন সরকার নানা অপপ্রচার চালিয়েছে। সে কারণে সামরিক শাসনের বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে তাত্ক্ষণিকভাবে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের প্রকাশ্য প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়া দেখা না গেলে আশির দশকে এসে প্রকাশ্যে এবং লেখনীর মাধ্যমে এর প্রতিবাদ অব্যাহত থাকে। সে থেকে এই হত্যাকাণ্ডের যতই রহস্য উদঘাটন হয়েছে ততই এর উপর নানামাত্রিক গ্রন্থ রচনা অব্যাহত রয়েছে। পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে স্মৃতিচারণ, তাঁর শাসনকাল ও স্বাধীনতা অর্জনের দীর্ঘ যাত্রাপথে তাঁর অবদান মূল্যায়ন করে রচিত হতে থাকে নানামাত্রিক গ্রন্থ। ১৯৭৫ থেকে ২০২০ পর্যন্ত উক্ত বিষয়গুলোকে উপজীব্য করে অসংখ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তবে কেবল ২০২০ সালে প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থের নমুনা নিম্নরূপ—

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড নিয়ে গ্রন্থ

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড মার্কিন দলিল থেকে। আনু মাহমুদ

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড। আবদুর বাছির

১৫ আগস্ট ট্র্যাজেডি। আসলাম সানী

বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার। জাকিয়া সুলতানা

রক্তাক্ত সিঁড়ি। মইন উদ্দিন (সম্পাদিত)

স্মৃতিচারণমূলক ও মূল্যায়নধর্মীগ্রন্থ

বঙ্গবন্ধু : অনুদাশংকর রায়ের স্মৃতি অনুধ্যানে। আবুল হাসান চৌধুরী

আমার দেখা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ড. আব্দুল মান্নান

লাহোর টু গোপালগঞ্জ। আহমেদ রিয়াজ

বঙ্গবন্ধু, তরুণ প্রজন্মের চোখে। চৌধুরী শহীদ কাদের

বঙ্গবন্ধুর ভাষণের ডিসকোর্স বিশ্লেষণ। মিথুন ব্যানার্জী

মুক্তি তথ্য প্রমাণ প্রেক্ষাপট : বঙ্গবন্ধুই স্বাধীনতার ঘোষক। মুহম্মদ শামসুল হক

চট্টগ্রামে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সঙ্গীরা। মুহম্মদ শামসুল হক

বঙ্গবন্ধু : শতবর্ষে ফিরে দেখা। শরীফ আতিক-উজ-জামান, শংকর মল্লিক (সম্পাদিত)

সাধক কবিদের রচনায় বঙ্গবন্ধুর জীবন ও রাজনীতি। সাইমন জাকারিয়া
চেতনায় চিরঞ্জীব শেখ মুজিবুর রহমান। সৈজুতি রহমান

৫

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ২০২০ সালে আলোকচিত্র, দলিলপত্র জাতীয় গ্রন্থ: উক্ত শিরোনামগুলোতে বঙ্গবন্ধুর নিজের লেখা, তাঁর প্রদত্ত ভাষণ অন্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁকে নিয়ে সরকারী দলিলপত্র, বিবৃতি প্রামাণ্য বক্তব্য ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রকাশ করে যাচ্ছেন আমাদের অনুসন্ধানী লেখকগণ। এই বিষয়ে পূর্বেও বহুগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তবে কেবল ২০২০ সালে নতুনরূপে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলো প্রকাশের খবর রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু ও চলচ্চিত্র। অনুপম হায়াৎ

দিনলিপি : বঙ্গবন্ধুর শাসন সময়। অধ্যাপক ড. আবু সাইয়িদ

আইনসভায় বঙ্গবন্ধু। আসাদুজ্জামান সশাট (সম্পাদিত)

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ। আহমেদ শরীফ

ভাষণসমগ্র। ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন

কলকাতায় বঙ্গবন্ধু। এস.এম. সরওয়ার মোর্শেদ

বঙ্গবন্ধুর বিখ্যাত ভাষণ। কামরুজ্জামান লিটন (সম্পাদিত)

বঙ্গবন্ধুর গণপরিষদ সংবিধান। ড. জালাল ফিরোজ

বঙ্গবন্ধুর ভাষণসমগ্র। তারেক হাসান

রেসকোর্স থেকে ইউনেস্কো। তোফায়েল আহমেদ, দিন ইসলাম রুবেল (সম্পাদিত)

তর্জিনীর গর্জন। বদরুল বোরহান

মুক্তির মহানায়ক। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

আত্মস্মৃতি ১৯৭৫ : সেই অন্ধকার সেই বিভীষিকা। মহাদেব সাহা

বঙ্গবন্ধুর বাণী। ড. মাজেদুল ইসলাম

সাংবাদিকদের মুখোমুখি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মোশারফ হোসেন

শতবর্ষে বঙ্গবন্ধুর শতভাষণ। মোনায়েম সরকার (সম্পাদিত)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ। মোস্তাক আহমাদ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অমর বাণী। মোস্তাক আহমাদ

আমার দেখা নয়াদীন। শেখ মুজিবুর রহমান

উপসংহার

১৯৭৫ থেকে ২০২০ পর্যন্ত সময় পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রথমদিকে ১৯৭৫ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গ্রন্থ রচনার পরিমাণ এবং গবেষক, লেখক ও পাঠকদের মধ্যে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আগ্রহ অনেক কম ছিলো। এর প্রধান কারণ কেবল সামরিক শাসন নয়; বরং ইতিহাস থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলার নানা অপতৎপরতা। তারপর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে ১৯৯৬ থেকে ২০০০ পর্যন্ত এই আগ্রহ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। এরপর ২০০১ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত তাঁকে নিয়ে গ্রন্থ রচনার ধারা নামে মাত্র সচল ছিলো। মূলত, ২০০৮ সালে পুনরায় আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গ্রন্থ রচনার জোয়ার সৃষ্টি হয়। এই জোয়ারে আরও গতি আসে ২০১২ সালে বঙ্গবন্ধুর নিজের লিখিত আত্মজীবনী ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ নামে শেখ হাসিনা কর্তৃক প্রকাশের পর। এই জোয়ারে তীব্র গতি আসে তাঁর জন্মশতবর্ষ উদযাপনের খবরে। ২০২০ সাল তাঁর জন্মশতবর্ষের লগ্নে বাংলাদেশের

সুবর্ণজয়ন্তী পালনের ঘোষণাও যুক্ত হলো। আমাদের পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, ২০২০ সালের করোনা পরিস্থিতিতেও বঙ্গবন্ধুপ্রেমী লেখকগণ থেমে থাকেননি। এই একটি বছরেই বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নানা মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে। নতুন নতুন শিরোনামে বঙ্গবন্ধুকে নতুনভাবে আবিষ্কার করে জাতির জনকের প্রতি সর্বস্তরের জনতার সম্মান প্রদর্শন করেছেন। বঙ্গবন্ধু আজ কেবল বাঙালির হৃদয়ে নন; বাংলা ভাষার গ্রন্থবুননেও অমর হয়ে আছেন। আমরা আরও দেখেছি যে, একটি দেশের একজন নেতার উপর একটি বছরে এত অধিক সংখ্যক বই প্রকাশের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই। আমাদের উল্লিখিত তালিকা তাঁকে নিয়ে ২০২০ সালের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের রেকর্ডকৃত নমুনামাত্র। সরেজমিনে আরও অনুসন্ধান চালালে এর সংখ্যা আরও বেশি হবে। আমি কেবল প্রবন্ধ প্রয়োজনে যেসব গ্রন্থের নাম সংগ্রহ করতে পেরেছি তাদেরকে উল্লেখ করে গেছি। এর বাইরেও তাঁকে নিয়ে অসংখ্য গ্রন্থ-প্রকাশনা ২০২০ সালে হয়েছে এবং তা বিভিন্ন উৎসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এরপর আর অনুসন্ধান হোক বা না হোক স্পষ্টভাবে বলা যায়, ২০২০ সালে বঙ্গবন্ধু নিয়ে রচিত ও প্রকাশিত বাংলাগ্রন্থ অন্য সকল বছরের তুলনায় বেশি এবং তা কেবল মুজিব শতবর্ষ সফলভাবে সম্পন্নের কারণে সম্ভব হয়েছে। জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু।

তথ্যসূত্র

ক. ২০২০ সালে প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা সংগ্রহে ব্যবহৃত উৎস

১. জাতীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা।
২. বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
৩. বাংলাদেশ প্রেস ইনিস্টিউট, ঢাকা।
৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ঢাকা।
৫. বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।
৬. মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর লাইব্রেরি, ঢাকা।
৭. বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা।
৮. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, চট্টগ্রাম।
৯. চট্টগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরি, চট্টগ্রাম।
১০. চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন লাইব্রেরি, চট্টগ্রাম।
১১. ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা।

খ. সহায়ক গ্রন্থ তালিকা

রহমান, শেখ মুজিবুর। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*। দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ- ২০১২।

রহমান, শেখ মুজিবুর। *আমার দেখা নয়াচীন*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি-২০২০, পরিমার্জিত সংস্করণ ফেব্রুয়ারি, ২০২০।

ভাষণসমগ্র ১৯৫৫-১৯৭৫ শেখ মুজিবুর রহমান, এ কে আব্দুল মোমেন(সম্পাদ.), চারুলিপি, ঢাকা, ২০২০।

শেখ মুজিব একটি লাল গোলাপ, মিনার মনসুর ও দিলওয়ার চৌধুরী (সম্পা.), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৯, পরিমার্জিত প্রকাশ ফেব্রুয়ারি, ২০২০।

মজিদ, পিয়াস। মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলা একাডেমি। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০২০।

সরকার, দিব্যদুতি। বঙ্গবন্ধুর কারা জীবন। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি-২০২০।

কিবরিয়া, শাহজাহান। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ- ১৯৭৪, পরিমার্জিত প্রকাশ ফেব্রুয়ারি, ২০২০।

হক, সৈয়দ শামসুল। বঙ্গবন্ধুর বীরগাথা। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ- ১৯৭৯, পরিমার্জিত প্রকাশ ফেব্রুয়ারি, ২০২০।

হায়াৎ, অনুপম। বঙ্গবন্ধু ও চলচ্চিত্র। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি-২০২০।

লেলিন, নূহ-উল- আলম। রাজনীতিতে হাতে খড়ি ও কলকাতায় শেখ মুজিব। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি-২০২০।

দাশগুপ্ত, অজয়। বঙ্গবন্ধুর আন্দোলন কৌশল ও হরতাল। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি-২০২০।

বিশ্বাস, মিল্টন। উপন্যাসে বঙ্গবন্ধু। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি-২০২০।

বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত ছড়া, সম্পাদক হাবিবুল্লাহ সিরাজী এবং তপন বাগচী (সম্পা.), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি-২০২০।

বড়ুয়া, সুব্রত। বঙ্গবন্ধুর জীবনকথা। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৪, পরিমার্জিত প্রকাশ ফেব্রুয়ারি, ২০২০।

হক, কামরুল। বঙ্গবন্ধু ও সংবাদপত্র ছয় দফা থেকে গণঅভ্যুত্থান। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি-২০২০।

বেগম, নাছিমা। রেণু থেকে বঙ্গমাতা। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি-২০২০।

শেখর, সৌমিত্র। বঙ্গবন্ধু আদর্শের সুবর্ণরেখা। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, আগস্ট-২০২১।

আলীম, এম আবদুল। বঙ্গবন্ধু ও ভাষা-আন্দোলন। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি-২০২০।

জাকারিয়া, সাইমন। সাধক কবিদের রচনায় বঙ্গবন্ধুর জীবন ও রাজনীতি। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি-২০২০।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ, শামসুজ্জামান খান এবং মোবারক হোসেন (সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি-২০১৮, পরিমার্জিত সংস্করণ ফেব্রুয়ারি, ২০২০।

রশিদ,হারুন-অর। ৭ই মার্চের ভাষণ কেন বিশ্ব-ঐতিহ্য সম্পদ বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি-২০১৮, পরিমার্জিত সংস্করণ ফেব্রুয়ারি, ২০২০।

হোসেন, আবু মো. দেলোয়ার। বঙ্গবন্ধু-বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জি। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি-২০১৪, পরিমার্জিত সংস্করণ- ২০২১।

বিশ্বাস, সমীর কুমার। বঙ্গবন্ধুর সমবায়-ভাবনা। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ২০২০।

রহমান, মুর্শিদা বিন্তে। স্বাধীনতার পথে বঙ্গবন্ধু পরিপ্রেক্ষিত ১৯৭০ এর নির্বাচন। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ২০২০।

আরবি নাট্যসাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ: একটি পর্যালোচনা

ড. মোহাম্মদ আমির হোসাইন *

[প্রতিপাদ্যসার : আরবি সাহিত্যের নতুন সংযোজন নাট্যসাহিত্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে বিদেশী সাহিত্যের প্রভাবে আরবি নাট্যসাহিত্যের সূত্রপাত হয়। ১৮৪৭ সালে মারুন আন-নাক্বাশ (১৮১৭-১৮৫৫ খ্রি.) এর ‘আল-বখিল’ নাটকের মাধ্যমে আরবি নাট্যশিল্পের গোড়াপত্তন হয়। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে নাটক রচনা ও মঞ্চায়ন করেন সালীম আন-নাক্বাশ (মৃত. ১৮৮৪ খ্রি.), ইব্রাহিম আহদাব (১৮২৬-১৮৯১ খ্রি.), আহমদ আবু খলিল কাক্বনি প্রমুখ। পরবর্তীতে মোস্তফা কামিল (১৮৭৪-১৯০৮ খ্রি.), মুহাম্মদ তায়মূর (১৮৯২-১৯২১ খ্রি.), ফরাহ আনতুন (১৮৭৪-১৯২২ খ্রি.), জর্জ আবইয়াজ (১৮৮০-১৯৫৯ খ্রি.), আহমদ শাওকী (১৮৬৮-১৯৩২ খ্রি.), মাহমুদ তাইমূর (১৮৯৪-১৯৭৩ খ্রি.), আলী আহমদ বাকাসীর (১৯১০-১৯৬৯ খ্রি.) তাওফীক আল-হাকিম (১৮৯৮-১৯৮৭ খ্রি.), ওমর আবু রিশা (১৯১০-১৯৯০ খ্রি.) প্রমুখ নাট্যকারের হাতে আরবি নাটক পরিপক্বতা লাভ করে। আরবি অনেক নাটক ইংরেজি, উর্দু, ফরাসি, বাংলা ইত্যাদি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। শিল্পমান ও মননশীলতার দিক থেকে আরবি নাটক উঁচু স্থান দখল করতে সক্ষম হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে আরবি নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা করা হয়েছে।]

ভূমিকা

নাটক আরবি সাহিত্যের একটি নতুন সংযোজন। ঊনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে লেবানানে ইউরোপীয় নাটক অনুবাদের মাধ্যমে আরবি সাহিত্যে নাটকের উৎপত্তি হয়। মারুন আন-নাক্বাশ আরবি সাহিত্যের প্রথম নাট্যকার। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেননি, তথাপি তিনি নাটক রচনা করে আরবি নাট্যসাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর হাত ধরে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সলীম আন-নাক্বাশ নাটক রচনায় এগিয়ে আসেন। পরবর্তীতে মিখাইল নু'আইমা (১৮৮৯-১৯৮৮ খ্রি.), আহমদ শাওকী (১৮৬৮-১৯৩২ খ্রি.), তাওফীক আল-হাকিম (১৯০৩-১৯৮৭ খ্রি.) প্রমুখ নাট্যকারের মাধ্যমে আরবি নাট্যসাহিত্য যৌবনে পদার্পন করে। তাওফীক আল-হাকিম পবিত্র কুরআনের কাহিনি, গ্রীক পুরাণ, আরব্য উপন্যাস, চলমান সামাজিক জীবন ও পরিবেশ থেকে নাটকের প্লট খুঁজে নাটক রচনা করে বিখ্যাত হয়ে আছেন। বর্তমানে এটি একটি জনপ্রিয় সাহিত্য।

নাটকের সংজ্ঞা

নাটকের আরবি প্রতিশব্দ مسرح (মাসরাহ) বা مسرحية (মাসরাহিয়াহ)। এর মূল অক্ষর س-ر-ح যা বাবে فتح এবং سم থেকে ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ বেরিয়ে যাওয়া, চলে যাওয়া, বিচরণ করা প্রভৃতি (বলিয়াভী, ১৯৮১ : ৩৭২; ইব্রাহিম মাদকুর ও অন্যান্য: ৪২৬)। স্থানবাচক বিশেষ্য المسرح বহুবচনে مسارح আসে, যার অর্থ বিচরণস্থল, চারণভূমি, রঙ্গমঞ্চ বা নাট্যশালা (বলিয়াভী: ৩৭২)।

মাজদী ওয়াহাবা^১ নাটকের দুটি সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যথা:

(১) “সাহিত্যের যে শাখায় মহাকাব্য কিংবা গীতিকাব্যের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কোনো গল্প বা কাহিনি মঞ্চোপযোগী করে রচিত, তাকে নাটক বলে (মাজদী ওহাবাহ, ১৯৭৪: ১২১)।”

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

(২) “সাহিত্যের যে শাখায় কতিপয় চরিত্র বা কোনো কাহিনির ঘটনাপ্রবাহ গদ্য কিংবা পদ্যের ভাষায় সংলাপাত্মক ভঙ্গীতে উপস্থাপিত হয়, তাকে নাটক বলা হয় (মাজদি ওহবাহ: ১২১)।”

ড. মুহাম্মদ আবুল কাসেমের মতে, “নাটক একটি যৌথ শিল্প- যেখানে সাহিত্য, সংগীত, অভিনয়, দৃশ্যপট, রূপসজ্জা, আলোক সম্পাত, শব্দ প্রয়োগ ও আঙ্গিকের বিভিন্ন উপকরণ একীভূত হয়ে এক সুসমন্বিত নান্দনিক অনুভূতির সৃষ্টি করে (আবুল কাসেম: ৩)।”

শ্রীশচন্দ্র দাস বলেন, “নাটক দৃশ্য ও শ্রব্যকাব্যের সমন্বয়ে রঙ্গমঞ্চের সাহায্যে গতিমান মানজীবনের প্রতিচ্ছবি (শ্রীশচন্দ্র দাস: ৫৯)।” উল্লেখ্য, সংস্কৃত আলংকারিকগণ নাট্যসাহিত্যকে কাব্যসাহিত্যের মধ্যে স্থান দিয়েছেন। তাঁদের মতে কাব্য দুই প্রকার- দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্য। নাটক প্রধানত দৃশ্যকাব্য এবং সকল প্রকার কাব্যসাহিত্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

শ্রীশচন্দ্র দাস Elizabeth Drew কর্তৃক রচিত Discovering Drama গ্রন্থের উদ্ধৃতিও দিয়েছেন। তা হলো: Drama is the creation and representation of life in terms of the theatre (শ্রীশচন্দ্র দাস: ৫৯)। কারো কারো মতে, মঞ্চ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সাহায্যে মানবজীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা যখন সংলাপের আশ্রয়ে দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করা হয়, তাকে নাটক বলা হয়। আবার কেউ কেউ বলেন, রঙ্গমঞ্চের সাহায্যে অভিনয়ের উপযোগী করে যে সাহিত্য রচিত হয় তাকে সাধারণত নাটক বলে।

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায় যে, নাটক এমন একটি সাহিত্য যা জীবন থেকে নেয়া কোনো কাহিনি বা ঘটনাপ্রবাহ কতিপয় অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সংলাপাত্মক ভঙ্গীতে মঞ্চের সাহায্যে উপস্থাপিত হয়। মঞ্চ ছাড়া নাটকের বিষয় পরিস্ফুটি হয় না। নাট্যোল্লিখিত কুশীলবগণ তাদের অভিনয় নৈপুণ্যে নাটকের কঙ্কালদেহে প্রাণসঞ্চার করেন এবং তাকে রূপৈশ্বর্য দান করেন। এর মাধ্যমে নাট্যকার ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্রের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেন।

নাটক সাহিত্য জগতের অন্যান্য মাধ্যমের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান দখল করেছে। কারণ নাটক একাধারে শ্রাব্য ও দৃশ্য এবং একই সঙ্গে দুটি ইন্দ্রিয়ের আনন্দ দানে সক্ষম। তাই নাটকের ব্যাপ্তিও অনেক। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে নাটক সব মানুষের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম (দুলাল ভৌমিক: ১)। নাটকের স্বরূপ সম্পর্কে আচার্য ভরত বলেন, “লোকবৃত্তানুকরণং নাট্যম” অর্থাৎ লোক চরিত্রের অনুরণনই হচ্ছে নাটক (দুলাল ভৌমিক: ১)। আবার দশরূপকার ধনঞ্জয়ের মতে, “অবস্থানুকৃতি নাট্যম” অর্থাৎ অবস্থার অনুকরণই হচ্ছে নাটক (দুলাল ভৌমিক: ১)।

উপরিউক্ত সংজ্ঞা থেকে স্পষ্ট যে, অনুকরণ করার সহজাত প্রবৃত্তি থেকেই নাটকের উৎপত্তি। মানুষ অনুকরণ প্রিয়। সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে মানুষ একজন অন্যজনের ভাব-ভঙ্গি পর্যবেক্ষণ করত এবং পরবর্তী সময়ে তা নকল করে দেখাতে চেষ্টা করত। তাদের মধ্যে অভিনয় কলা সম্পর্কে কোনো জ্ঞান না থাকলেও তারা সংঙ্গীত ও নৃত্যকলার মধ্য দিয়ে তাদের অনুকরণকে অন্যের সামনে তুলে ধরত (অজিতকুমার ঘোষ: ১)। প্রাচীনকালের ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে দিয়ে নাট্যকলার উদ্ভব ঘটে।

নাটকের শ্রেণিবিভাগ

নাটকের বিষয়বস্তু ও পরিণতি অনুযায়ী নাটককে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা:

- ১। বিয়োগাত্মক (Tragedy)
- ২। মিলনাত্মক (Comedy)
- ৩। প্রহসনমূলক (Farcical)

১। **বিয়োগাত্মক (Tragedy) নাটক:** যে নাটকে কোনো অসাধারণ গুণসম্পন্ন নায়কের নিয়তির প্রভাবে বা চরিত্রের অন্তর্নিহিত কোনো ত্রুটির জন্য পরাজয় ঘটে তাকে বিয়োগাত্মক (Tragedy) নাটক বলে। শ্রীশচন্দ্র দাসের মতে, আত্মদ্বন্দ্বে পরাভূত বা অভিভূত মানবজীবনের করুণ কাহিনিকে সাধারণত (Tragedy) বলা হয় (শ্রীশচন্দ্র দাস: ৬৩)। এতে কোনো খ্যাতিমান, বিশিষ্ট ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির পতন দেখানো হয়। নায়ক অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্ব দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে। তারপরও সে Will to power এ অনুপ্রাণিত হয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে চায়। তাঁর এ ইচ্ছাই তাকে বৃহৎ মর্যদা দান করে। মহিতলালের ভাষায়-

দেবতা-দোসর বীর, তারি পরাজয়-কথা
সে হৃদয়-সাগর-মস্থল
লীলাকাশের উষাসম পরলে অমৃত-রাগ
মৃত্যুঞ্জয়ী জীবন-কাহিনী।

শ্রেষ্ঠ ট্রাজেডি ‘মৃত্যুঞ্জয়ী জীবন-কাহিনী’ বলে এ নাটক আমাদেরকে নায়কের ভাগ্যপরিষয় সত্ত্বেও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করে তোলে (শ্রীশচন্দ্র দাস: ৬৩)।

২। **মিলনাত্মক (Comedy) নাটক:** যে নাটকে নায়ক আত্মপ্রতিষ্ঠার সর্ববিধ ঘটনাচক্র ও বাধাবিঘ্ন অনায়াসে বা অল্পায়াসে উত্তীর্ণ হয়ে সাফল্যের উচ্চত্বাঙ্গে উপনীত হন এবং দৈনন্দিন জীবনের লঘু দিকটি আনন্দোচ্ছল রূপে ও নায়ক-নায়িকার মিলন-মাধুর্যে পরিসমাপ্তি লাভ করে তাকে মিলনাত্মক (Comedy) নাটক বলা হয় (শ্রীশচন্দ্র দাস: ৬৩)। উল্লেখ্য, মানবচরিত্রের যে-কৌতুকবহু দিকটি নীড়ন করে না, ব্যথা দেয় না, হাস্যরস সৃষ্টি করে, তাই কমেডির উপজীব্য। কমেডি জীবনের কোনো গভীর সমস্যাকে নাটকীয় উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করে না, শুধু জীবনের লঘুতর দিকটি উপস্থাপন করে (শ্রীশচন্দ্র দাস: ৬৯)। আর কমেডির লক্ষ্য হচ্ছে পৃথিবীর সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে আত্মপ্রতিষ্ঠা করা এবং বসুন্ধরাকে বীরের মতো দেহ-মন-প্রাণ দিয়ে ভোগ করাই নায়কের লক্ষ্য। তাই সে বলে-

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবার চাই।

৩। **প্রহসনমূলক (Farcical) নাটক:** সমাজের কুসংস্কার ও কু-রীতি সংশোধনের উদ্দেশ্যে রহস্যজনক ঘটনাসম্বলিত হাস্যরসপ্রধান নাটককে প্রহসনমূলক (Farcical) নাটক বলা হয় (শ্রীশচন্দ্র দাস: ৭০)। প্রহসনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘটনাবিন্যাসের বা চরিত্রের অতিরঞ্জিত পরিদৃষ্ট হয় এবং এতে চরিত্র অপেক্ষা ঘটনাবিন্যাসের প্রধান্য দেখা যায়। এর প্রধান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হচ্ছে হাস্যরস সৃষ্টি।

ড. ইজুদ্দিন ইসমাইল আরবি নাটককে দুভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা

১। **কوميديا (ملهاة)** বা মিলনাত্মক

২। **تراجيديا (مأساة)** বা বিয়োগাত্মক (ইসমাইল: ১৩৮)। **كوميديا (ملهاة)** বা মিলনাত্মক নাটককে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা:

১। **نৈতিকতামূলক কমেডি (ملهاة الأخلاق)**

২। **রোমান্টিক কমেডি (الملهاة الرومانتيكية)**

৩। প্রহসনমূলক কমেডি (الفارص)। নিম্নে এগুলোর সংজ্ঞা প্রদান করা হল:

১। নৈতিকতামূলক কমেডি (ملهه الاخلاق): যে কমেডিতে নৈতিক আচরণ, সমাজের ধর্ম, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতির বিদ্রোপাত্মক অবতারণা থাকে, তাকে নৈতিকতামূলক কমেডি বলা হয়।

২। রোমান্টিক কমেডি (الملهه الرومانتيكية): যে কমেডি অত্যাধিক কল্পনাপ্রবণ বা কাব্যধর্মী, তাকে রোমান্টিক কমেডি নামে অভিহিত করা হয়।

৩। প্রহসনমূলক কমেডি (الفارص): যে কমেডিতে কুশীলবগণ কোনো চরিত্রবিশেষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক ক্রিয়াকলাপের দ্বারা নাটকীয় পরিণতি দান করে, তাকে প্রহসনমূলক কমেডি বলা হয়।

আরবি নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

সাহিত্য মানবজীবনের দর্পন। সাহিত্য হচ্ছে চিন্তাধারা ও কল্পনার সুবিন্যস্ত ও সুপরিকল্পিত লিখিত রূপ (এনামুল হক ও অন্যান্য: ১১৫০)। শ্রীশচন্দ্র দাশের মতে- “নিজের কথা, পরের কথা বা বাহ্যজগতের কথা সাহিত্যিকের মনোবীণায় যে-সুরে বাজত হয়, তাহার শিল্পসঙ্গত প্রকাশই সাহিত্য (শ্রীশচন্দ্র দাস: ১৭।।” সাহিত্য বলতে ইন্দ্রিয় দ্বারা জাগতিক বা মহাজাগতিক চিন্তা-চেতনা, অনুভূতি, সৌন্দর্য ও শিল্পের লিখিত বা লেখকের বাস্তব জীবনবোধকে বুঝায়। সাহিত্যকে দুভাগে ভাগ করা যায়। পদ্য ও গদ্য। পদ্যের মধ্যে ছড়া, কবিতা ইত্যাদি এবং গদ্যের মধ্যে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি। অনেক সাহিত্যিক নাট্যকলাকে আলাদা প্রধান শাখা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন (<https://bn.wikipedia.org/wiki/নাটক>)।

আরবি নাটক আরবি সাহিত্যের একটি নতুন সংযোজন। হযরত মুহাম্মদ (স.)- এর জন্মের সময় আরবি ভাষা ছিল শ্রেষ্ঠ ভাষা। তখন ছন্দোবদ্য গদ্য ও কবিতার প্রতি মানুষের গভীর ভালোবাসা ও মমত্ববোধ ছিল অসাধারণ। বাগ্মী ও কবিদের মানুষ সমাজের নেতৃত্বের আসনে বসিয়েছিলেন। তাঁরা ছিলেন গোত্রপ্রধান বা নেতা। আব্বাসীয় (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) খলীফা আল-মামুনের রাজত্বকালে (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.) জ্ঞান-বিজ্ঞানে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত ‘বায়তুল হিকমাহ’ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় রচিত মূল্যবান গ্রন্থরাজি আরবিতে অনুবাদ করার ক্ষেত্রে প্রভূত অবদান রাখে। তবে আরবিতে অনুবাদের ক্ষেত্রে জ্ঞানবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা যতটা গুরুত্ব লাভ করেছে সে অনুযায়ী নাট্যসাহিত্য কোনো গুরুত্বই লাভ করেনি। তাই আমরা দেখতে পাই যে, এ সময় গ্রীক, ল্যাটিন, চীনা ও সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় বহু গ্রন্থ আরবিতে রূপান্তরিত হলেও কালিদাসের নাটক কিংবা এ্যারিস্টটলের কোনো নাট্যগ্রন্থ আরবিতে অনূদিত হয়নি।

আধুনিক যুগে আরবি নাটক রচনার যাত্রা শুরু হয়। ১৭৯৮ সালে নেপোলিয়ান বোনাপার্ট কর্তৃক মিশর বিজিত হওয়ার পরপরই আরবি সাহিত্যে পালাবদলের হাওয়া বইতে শুরু করে। কারণ নেপোলিয়ান মিশরে আরবি সাহিত্যিকদের জন্য সাহিত্যচর্চার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে। ফলে আরবি কবি-সাহিত্যিকরা নব উদ্যমে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় নিমগ্ন হন। তাঁরা ফরাসি ও ইংরেজি সাহিত্যের নিত্য নতুন স্টাইল ও আঙ্গিক আয়ত্ত্ব করে অনুরূপ স্টাইলে আরবি সাহিত্য চর্চা করেন। একই সাথে আরবির মৌলিকত্বও বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আরবি নাটকের যাত্রা শুরু হয়। সিরিয়ার মার্কান আন-নাক্বাশ (১৮১৭-১৮৫৫ খ্রি.)^২ সর্বপ্রথম ফরাসি নাট্যকার মোলিয়ার (Molière)^৩ নাটক অনুবাদের মাধ্যমে আরবি নাটকের সূত্রপাত করেন।

মারুন আন-নাক্বাশ এর ব্যবসায়ী পিতা ছেলেকে নিয়ে দেশবিদেশে ভ্রমণ করেন। তিনি দামিষ্ক, মিশর, আলেকজান্দ্রিয়া প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন। তিনি ইতালিও ভ্রমণ করেন এবং ইতালিতে কয়েক বছর অবস্থান করেন। এখানে মারুন আন-নাক্বাশ নাট্যদলের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন এবং নাট্যাভিনয় রপ্ত করেন (আল-মার'আ: ৮২)।

মারুন আন-নাক্বাশ ছিলেন অসাধারণ মেধাবী লোক। দেশে ফিরে এসে তিনি ইটালির আদলে একটি নাট্যদল গঠন করেন। এ নাট্যদলের মাধ্যমে তিনি ১৮৪৭ সালে তাঁর অনূদিত আরবি নাটক আল-বখিল (البخيل) নিজ গৃহে মঞ্চস্থ করেন। এটি দেখার জন্য তিনি এলাকার গণমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সরকারি কর্মকর্তাদের আহ্বান জানান। শুরুতে তিনি নাটক রচনা লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। এতে প্রাচ্যের লোকদের পিছিয়ে পড়ার কারণও তুলে ধরেন (আল-মার'আ: ৮৩)। উল্লেখ্য যে, এ নাটকটি মোলিয়ার বিখ্যাত নাটক L'Avare এর আরবি অনুবাদ। এতে তিনি কবিতার সংযোজন করেন এবং ইতালীয় ভাষার নামগুলোকে আরবিতে রূপান্তর করেন।

মারুন আন-নাক্বাশ ১৮৪৯ সালে নিজ গৃহে তাঁর দ্বিতীয় নাটক উপস্থাপন করেন। এটির নাম ছিল 'আবুল হাসান আল-মাগাফফাল ওয়া হারুন আর আল-রশীদ' (أبو الحسن المغفل وهارون الرشيد)। এ নাটকটি দেখার জন্য তিনি বৈরুত অবস্থানরত ওসমানী রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও স্থানীয় নেতৃস্থানীয় লোকদের আমন্ত্রণ জানান। এ নাটক সম্পর্কে একজন পর্যটক মন্তব্য করেন- “অভিনয়ে অদক্ষতা ও নিম্নমানের গান দেখা যায়, কিন্তু নাটকের শিল্প নির্দেশনা, প্রয়োজনীয় সাফল্য ও দর্শকপ্রিয়তা লক্ষণীয় (আল-মার'আ: ৮৪)।”

মারুন আন-নাক্বাশ ১৮৫৩ সালে তাঁর তৃতীয় নাটক 'আল হাসুদ আল-সালীত' (الحسود السليط) মঞ্চস্থ করেন (আল-মার'আ: ৮৪)। এটি ছিল একটি সামাজিক নাটক। নাটকের প্রতি তখনো গণমানুষের আগ্রহ সৃষ্টি হয়নি। তাই তিনি নাটকে গদ্য, পদ্য বা গান সন্নিবেশিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর ভ্রাতৃপুত্র সালীম আন-নাক্বাশ বলেন, لما رأى عدم ميل أبناء وطنه إلى هذا الفن المفيد نظرا لعدم معرفتهم بمنافعه، زاده فكاكه فجعل في الرواية الواحدة شعرا ونثرا وأنغاما، علما بأن الشعر يروق للخاصة والنثر تفهمه العامة والأغنام تطرب.

অর্থাৎ “তিনি যখন দেখলেন তাঁর দেশের সন্তানরা এ (বিষয়ের) উপকারিতা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে বিষয়ের প্রতি ঝুঁকছে না তখন তিনি কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি একই নাটকে কবিতা, গদ্য ও গান সন্নিবেশিত করেন। কারণ কবিতা বিশেষ শ্রেণিকে আকৃষ্ট করে, গদ্য সাধারণ মানুষের বোধগম্য হয় এবং গান সবাইকে আনন্দ দেয় (আল-মার'আ: ৮৪)।”

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতৃপুত্র সালীম আন-নাক্বাশ^৪ নাট্যদলের হাল ধরেন। তিনি এ নাট্যদলকে নিয়ে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রবেশ করেন এবং এটি ছিল মিশরের প্রথম নাট্যগোষ্ঠী (ড. মোস্তাক মোহাম্মদ ও অন্যান্য, ২০০৫: ১২৬; <https://www.google.com/النقاش/سليم>)। তিনি মারুন আন-নাক্বাশ থেকে তিনটি ভাষা শিখেছিলেন। আরবি, ফরাসি ও ইতালি। তিনি ফরাসি, ইতালি ও ইংরেজি ভাষায় প্রচুর নাট্যসাহিত্য অধ্যয়ন করেন। তিনি তাঁর জীবনের প্রথমার্ধ বৈরুত অতিবাহিত করে মিশরে চলে আসেন। এখানে তিনি সাংবাদিকতার পাশাপাশি গান, উপন্যাস ও নাটক রচনা ও মঞ্চায়ন করেন। তিনি মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় ১৯৭৬ সালে ২২ ডিসেম্বর মঞ্চায়ন করেন মারুন আন-নাক্বাশ রচিত ‘আবু হাসান আল-মুগাফফাল ওয়া হারুন আল-রশীদ’, ২৮ ডিসেম্বর ‘আল-হুসুদ আল-সালীত’। তাঁর লিখিত ও অনূদিত নাটকের মধ্যে الظلوم (আল-জালুম), موارس (হোরাস), (فيدر (ফেডার), متريدات (মেট্রিডাট) উল্লেখযোগ্য (<https://www.google.com/النقاش/سليم>)।

সিরিয়ায় আরবি নাট্যসাহিত্যের প্রবর্তক ছিলেন আহমদ আবু খালীল আল-কাব্বানি (১৮৩৬-১৯০২ খ্রি.)। তিনি ছিলেন একজন প্রতিভাধর সংগীত শিল্পী ও অভিনেতা। সিরিয়ার দামিস্কে তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা। তিনি বিখ্যাত সংগীত শিল্পী আহমদ আকিল আল-হালভি (১৮১৩-১৯০৩ খ্রি.) এর শিষ্য ছিলেন। তিনি নাট্যসাহিত্য শিখার জন্য পাশ্চাত্যের কোনো দেশে যাননি। বরং নিজ দেশের বিখ্যাত শিল্পীদের অনুকরণ ও নির্দেশনায় অন্যতম নাট্যকার হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন (আল-মার'আ: ৮৫)। ১৮৭৮ সালে তিনি তাঁর প্রথম আরবি নাটক 'নাকির আল-জামিল' (ناكر الجميل) নিজ গৃহে মঞ্চগয়ন করেন। তারপর তিনি 'ওদ্দাহ' (وضاح) নাটক রচনা ও মঞ্চগয়ন করেন। এতে বহু সংখ্যক দর্শক উপস্থিত হয়েছিল এবং তিনি প্রশংসিত হয়েছিলেন (আল-ফাখুরি: .১১২)। শুরুতে আবু খালিল মহিলা চরিত্রের অভিনয় করার জন্য পুরুষ লোকের সাহায্য নিতেন। এতে তিনি অসুবিধার সম্মুখীন হন এবং এক পর্যায়ে তাঁর কার্যক্রম বন্ধ করে দেন। পরবর্তীতে মিদাত পাশা শাসনভার গ্রহণ করলে তিনি তাঁর পেশায় ফিরে আসেন এবং সফলতার সাথে নাট্যসাহিত্যের প্রসার ঘটান। তিনি ৬০টির অধিক নাটক রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো (আল-ফাখুরি: .১১২):

- ১। নাকির আল-জামিল (ناكر الجميل)
- ২। ওয়াদ্দাহ (وضاح)
- ৩। আনতার ইব্ন শাদ্দাদ (عنتر بن شداد)
- ৪। আফিফা (عفيفة)
- ৫। হারুন আল-রশীদ মা'আ আনসিল জলিস (هارون الرشيد مع أنس الجليس)
- ৬। মাজনুন লাইলা (مجنون ليلى)
- ৭। হারুন আর-রাশীদ মা'আল আমীর গানিম ইব্ন আইয়ুব ওয়া কূত
আল-কুলূব (هارون الرشيد مع الأمير غانم بن أيوب وقوت القلوب)
- ৮। আল-আমীর মোহম্মদ ওয়া যাহরর রিয়াড (الأمير محمود وزهر الرياض)
- ৯। আবদুস সালাম আল-হামাছী (عبد السلام الحمصي)

মিশরের আরবি নাট্যসাহিত্যের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ইয়া'কুব ইব্ন রাফাঈল সান্নু' (১৮৩৯-১৯২২ খ্রি.) যিনি আবু নাজ্জারাহ নামে পরিচিত। তাঁর বাবা ছিলেন মুহাম্মদ আলী পাশার নাতি আমির আহমদ ইকুন এর উপদেষ্টা। ১৩ বছর বয়সে তিনি আমির ইয়াকুনের প্রশংসায় একটি কবিতা লিখেন। এতে আমির সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে উচ্চশিক্ষার জন্য ইতালি পাঠান। তিনি ইতালি, আরবি, ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, স্প্যানিশ প্রভৃতি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি দক্ষতার সাথে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করতেন (আল-মার'আ: ৮৫)। ১৮৭০ সালে তিনি একটি নাট্যদল গঠন করে তাঁর স্বরচিত নাটকগুলো 'আজবেকিয়া হলে' মঞ্চস্থ করেন। তাঁর ভাষা ছিল সহজ-সরল এবং নাটকগুলো ছিল সামাজিক ও শিক্ষণীয়। তাই অল্প সময়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। স্বয়ং খেদিব ইসমাঈল তাঁর নাটকে মুগ্ধ ছিলেন। তিনি মাত্র দুবছর স্বরচিত এবং ফরাসি গল্প অবলম্বনে নির্মিত বেশ কটি উপান্যাসের নাট্যরূপ উপস্থাপন করেন। তাঁর নাটকগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো (আল-মার'আ: ৯২):

- ১। আল-ওয়াতান ওয়াল হুররিয়া (الوطن والحرية)
- ২। গানদুর মিশর (غندور مصر)
- ৩। গাজওয়াতু রাসি ছুর (غزوة رأس نور)
- ৪। যাওজাতুল আব (زوجة الأب)
- ৫। জুবাইদা (زبيدة)
- ৬। আল-বুরছা (البورصة)
- ৭। আস-সাদাকাহ (الصدقة)
- ৮। আল-বারবারী (البربري)
- ৯। আদ-দুররাতান (الضرثان)

তিনি তাঁর নাটকগুলোতে চরিত্র সংশোধনমূলক আলোচনা সন্নিবেশিত করেছেন। الوطن والحرية (স্বদেশ ও মুক্তি) নাটকে তিনি সরকারের সমালোচনা ও তাদের চারিত্রিক দ্রুটির কথা তুলে ধরেছেন। এতে প্রশাসন ক্ষুব্ধ হয়। ফলে তাঁর নাট্যশালা বন্ধ করা হয় এবং তাকে তাঁর চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয় (আল-মার'আ: ৯২)।

আরবি নাট্যসাহিত্যের উন্নয়নে আর এক প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন বিখ্যাত সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও নাট্যকার আদীব ইসহাক (১৮৫৬-১৮৮৫ খ্রি.)।^৫ তিনি সালীম আন-নাক্বাশের নাট্যদলের সদস্য ছিলেন। তিনি সিরিয়ার দামেস্কে জন্মগ্রহণ করলেও মিশরে চলে যান এবং সেখানে নাট্যদলের সাথে আরবি নাটক মঞ্চায়ন করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক হচ্ছে- شارلمان ও اندروماك। অতঃপর নাট্যদলের হাল ধরেন ইউসুফ খাইয়াত। তিনি উক্ত নাট্যদলকে নিয়ে কায়রোতে স্থানান্তরিত হন এবং সেখানে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত নাট্যাঙ্গনে কাজ করতে থাকেন। এ সময়কালের মধ্যে মিশরে অনেকগুলো নাট্যদলের জন্ম হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে একটি দলের নেতৃত্বে দেন সুলায়মান আল-কারদাহী (১৮৮২-১৯০৯ খ্রি.), দ্বিতীয় দলের নেতৃত্বে ছিলেন আহমদ আবু খালিল আল-কাব্বানী (১৮৩৬-১৯০২ খ্রি.) এবং তৃতীয় দলের নেতৃত্বে ছিলেন ইসকান্দর ফারাহ (১৮৫১-১৯১৬ খ্রি.)।

ইসকান্দর ফারাহ বৈরুতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইউরোপীয় নাট্যদলের মাধ্যমে নাট্যাভিনয় রপ্ত করেছেন। তিনি আবু খালিল আল-কাব্বানীর নাট্যদলের সদস্য ছিলেন। ১৮৮৪ সালে আল-কাব্বানী যখন মিশরে চলে যান তখন তিনি তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় ব্যাণ্ডের সাথে কাজ চালিয়ে যান। ১৮৮৬ সালে তিনি আল-কাব্বানীর দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজস্ব দল প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর দলে সালামা হিজাজি (১৮৫১-১৯১৭ খ্রি.)^৬ ও যোগ দেন। শরীফ পাশা তাঁকে কায়রোর “আতাবা” এলাকায় একটি কাঠের মঞ্চ তৈরি করতে সাহায্য করেন। এ নাট্যদলটি শেক্সপিয়ারের ‘রোমিও এণ্ড জুলিয়েট’ অবলম্বনে ‘দ্যা মিসরি অফ লাভার্স’ সহ বেশ ক’টি সফল নাটক উপস্থাপন করেছিল। ১৮৯৯ সালে ইসকান্দর ফারাহ স্থাপত্য ও সাজসজ্জার দিক থেকে ইউরোপীয় টিয়েটারের মতো একটি আধুনিক টিয়েটার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। অপেরা হাউসের পর এটি মিশরে দ্বিতীয় টিয়েটার যা বিদ্যুত দ্বারা আলোকিত করা হয়। দলটি ছয় বছর ধরে নতুন টিয়েটারে সফলতার সাথে নাটক উপস্থাপন করেছিল। নিজের ভাইয়ের সাথে মতবিরোধের কারণে ১৯০৫ সালে তাদের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। কিছু সময়ের ব্যবধানে তিনি আবার নাট্যদল গঠন করেন। এতে আজিজ ঈদ (১৮৮৪-১৯৪২ খ্রি.), আহমদ মুহররম (১৮৭৭-

১৯৪৫ খ্রি.), মাহমুদ কামেল (১৯১৯-১৯৯৪ খ্রি.), আমিন আতাল্লাহ (১৮৯৬-১৯৪০ খ্রি.), আলী ইউসুফ (১৮৬৩-১৯১৩ খ্রি) প্রমুখ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁরা বেশ কটি নাটক মঞ্চায়ন করেন। সেগুলো মধ্যে الإفریقیة، البرج অন্যতম। ১৯০৬ সালে ম্যারি সোফিয়ানের মৃত্যুর পর তাঁদের কার্যক্রম আবার বন্ধ হয়ে যায়। কিছু দিন পর তিনি আবার নতুন নতুন অভিনেতা যথা নাজিব আল-রায়হানী (১৮৮৯-১৯৪৯ খ্রি.) ও মানসি ফাহমীকে তাঁর দলে অন্তর্ভুক্ত করে পুনরায় কার্যক্রম চালু করেন। তিনি নাটকের প্রতি দর্শকদের আরো আকর্ষণীয় করার জন্য টিয়েটার শো শেষ হওয়ার পর নীরব সিনেমা শো উপস্থাপন করেছিলেন। সে সময় মিশরে সিনেমা ছিল একটি নতুন শিল্প। তাই এতে জনগণ বেশ আকৃষ্ট হয়েছিল।

নাট্যসাহিত্যের উন্নয়নে ফরাহ আনতুন (১৮৭৪-১৯২২ খ্রি.) এর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি ছিলেন সাংবাদিক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, সামাজিক ও রাজনৈতিক লেখক। তিনি লেবানানের ত্রিপোলিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং উসমানীয় নিপীড়ন থেকে বাঁচতে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় চলে আসেন। তিনি কয়েকটি পত্রিকার সম্পাদনা করেন এবং তাঁর পত্রিকায় তাঁর লেখা ছাপাতে থাকেন। ১৯০৮ সালে তিনি আমেরিকা যান এবং ‘আল-জামিয়া’ নামক পত্রিকার সম্পাদনা করেন। অতঃপর মিশরে ফিরে এসে লেখালেখির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। আমহমদ মুনসি ফরাহ আনতুনের ১৫টি নাটকে কথা উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি স্পষ্ট করেননি যে, সেগুলো কি অনুবাদকৃত নাকি রচিত (আল-মার’আ: ৯৫)। ড. ফুয়াদ আল-মার’আ তাঁর দুটি বিখ্যাত নাটকের কথা উল্লেখ করেছেন। তা হচ্ছে ((আল-মার’আ: ৯৭):

(১) মিশর আল-জাদিদা ওয়া মিশর আল-কুদীমা (مصر الجديدة ومصر القديمة)

(২) আস-সুলতান সালাহ উদ্দিন ওয়া মমলাকাতু উরশালীম (السلطان صلاح الدين ومملكة اورشليم)

আরবি নাট্যসাহিত্যে জর্জ আবইয়াজ (১৮৮০-১৯৫৯ খ্রি.) এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর আবির্ভাবের পরে অভিনয় শিল্প নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করে। প্রথম দিকের নাট্যশিল্পীদের কোনো মৌলিক লেখাপড়া ছিল না। তাঁর গান ও সুললিত কণ্ঠের ওপর নির্ভর করতেন। প্রখর মেধার অধিকারী জর্জ আবইয়াজের জন্য বৈরাগ্য হলেও তিনি জীবিকার সন্ধানে মাত্র আট বছর বয়সে আলেকজান্দ্রিয়ায় গমন করেন। সেখানে বিভিন্ন বিদেশি নাট্যগোষ্ঠীর সাথে সখের বসে অভিনয়ের সাথে সম্পৃক্ত হন। অল্প সময়ে তাঁর সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় তিনি সরকারি কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হন। ফলে নাট্যশিল্পে পড়াশোনা ও অধ্যয়নের জন্য তিনি প্যারিস যাবার সুযোগ পান। সেখানে তিনি সাত বছর লেখাপড়া করেন। ১৯১২ সালে মিশরে ফিরে আসেন এবং আরবদের নিয়ে একটি নাট্যদল গঠন করেন। তিনি আধুনিক ধারায় বিভিন্ন উপান্যাসকে নাট্যরূপ দিয়ে মঞ্চস্থ করতে থাকেন। ফলে নাট্যশিল্পের বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাঁকে নাট্যসাহিত্যের অন্যতম পথিকৃত হিসেবে উল্লেখ করা হয় (আল-মাকদাসী: ৫৩৬; ড. মোস্তাক আহমদ ও অন্যান্য: ১২৮)। এ সময় আরবি নাটক আরব বিশ্বে ব্যাপকভাবে চর্চা হতে থাকে। বিশেষ করে মিশর, সিরিয়া ও লেবাননে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাই এ শিল্পের প্রতি ঝুকে পড়েন। ফলে ক্লাব, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতি সংগঠন নিজ নিজ নাট্যদল গঠন ও বিভিন্ন নাটক মঞ্চায়ন করে নাট্যসাহিত্যকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

মুহাম্মদ তায়মূর (১৮৯২-১৯২১ খ্রি.)^৭ মিশরীয় ছোটগোষ্ঠীর রচয়িতা ও নাট্যকার। তাঁর নাটকগুলো মিশরীয় সমাজের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার প্রতিচ্ছবি। তিনি ১৯১৪ সালে আইন বিষয়ে পড়ার জন্য প্যারিস গমন

করেন। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার কারণে মিশরে ফিরে এসে ছোটোগল্প ও নাটক রচনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। তিনি গল্পগুচ্ছ, প্রবন্ধ ও কবিতা ছাড়াও নাটক রচনা করেছেন। তাঁর নাটকগুলোর মধ্যে **العصفور في القفص، العشرة الطيبة، عبد الستار افندي، الهاوية** অন্যতম। তিনি মাত্র ২৯ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন। ফলে তিনি তাঁর চিন্তাধারা অনুযায়ী নাট্যসাহিত্যকে পরিপক্বতা দান করতে পারেন নি। এতদসত্ত্বেও নাট্যসাহিত্যে তাঁর অবদান অপরিসীম। প্রসিদ্ধ চার নাট্যকার তাঁর লেখায় প্রভাবান্বিত হয়েছেন। এঁরা হলেন ফারাহ আনতুন (১৮৭৪-১৯২২ খ্রি.), তাওফীক আল-হাকিম (১৮৯৮-১৯৮৭ খ্রি.), মাহমুদ তায়মূর (১৮৯৪-১৯৭৩ খ্রি.) ও আলী আহমদ বাকাহীর (১৯১০-১৯৬৯ খ্রি.) (ড. মোস্তাক আহমদ ও অন্যান্য: ১২৮)।

আধুনিক নাট্যসাহিত্যে তাওফীক আল-হাকিম (১৮৯৮-১৯৮৭ খ্রি.)- এর অবদান সবার উর্ধ্বে। তাঁর নাট্যশৈলী চমৎকার, মনস্তাত্ত্বিক, রাজনীতি ও সমাজ চেতনা সমৃদ্ধ। তাঁর সৃজনশীল বহুমাত্রিক প্রতিভায় আরবি নাট্যাঙ্গন সরব হয়ে ওঠে। তিনি ১৯২৪ সালে আইন শাস্ত্রে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করার পর আইন শাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রি নেয়ার জন্য তিনি প্যারিস গমন করেন। তিনি সেখানে চার বছর অবস্থান করেন। আইন শাস্ত্র তথা প্রতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল না। তিনি গল্প, নাটক ও সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। বিশেষ করে নাট্যচর্চা করতে থাকেন। অবশ্য এ শাস্ত্রে তাঁর নতুন পদার্পণ নয়। এর আগে ১৯২২ সালে তিনি তাঁর লিখিত নাটক ‘আল-মর’আতু আল-জাদিদা’, ‘আদ-দ্বাইফু আস-সাকীল’ ও ‘আলী বাবা’ মঞ্চায়ন করছিলেন (শাওকী দ্বাইফ: ২৮৯)। সে সময় প্যারিস ছিল নাট্যকলায় বেশ এগিয়ে। তাই তিনি পিতার নির্দেশক্রমে আইন শাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে প্যারিস গমন করলে মূল বিষয় বাদ দিয়ে সাহিত্য ও নাট্যকলায় দক্ষতা অর্জনে সচেষ্ট হন এবং গভীরভাবে প্রাচীন ও আধুনিক বিশ্বসাহিত্য অধ্যয়ন করতে থাকেন। এ প্রসঙ্গে ইসমত মাহদী বলেন, In 1925 al Hakim went to Paris for farther studies. Neglecting his main subject law, he made thorough study of European literature, both classical and comtemporary. Thanks to his father’s generour stipend, he could frequent theatres operas and art museums (Mahdi: ১২৪).

তাওফীক আল-হাকিম প্যারিসে অবস্থানকালে বিশ্বসাহিত্য অধ্যয়নের পাশাপাশি লেখালেখিও শুরু করেন। ১৯২৭ সালে তিনি রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস ‘আওদাত আর-রুহ’ (আত্মার প্রত্যাবর্তন)। প্রথম উপন্যাসে তিনি পাঠকপ্রিয়তা লাভ করেন। কিন্তু তাঁর ঝোঁক ছিল মঞ্চ নাটকের প্রতি। তাই তিনি আইন বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি না নিয়ে নাট্যজগতে বিচরণ করার সিদ্ধান্ত নেন। প্যারিসে তিনি নাট্যসাহিত্যের ওপর গভীর পড়াশোনা করেন। নাটক দেখা, অভিনয় রঙ করা এবং নাটক লেখার উপকরণ যোগানোর প্রতি বিশেষ মনোনিবেশ করেন। তিনি আইন বিষয়ে ডিগ্রি না নিয়ে ১৯২৮ সালে মিশরে ফিরে আসেন (তাওফীক আল-হাকিম: ১২৯)।

দেশে ফিরে তিনি সরকারি উকিল হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে চাকরি করেন। সরকারি চাকরিতে অধিষ্ঠিত থেকে লেখালেখি করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সেখানে মুক্ত মনে লেখা যায় না। তিনি বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হন। তাই তিনি ১৯৪৩ সালে সরকারি চাকরি ত্যাগ করেন এবং কায়রো থেকে প্রকাশিত ‘আখবার আল-ইয়াওম’ পত্রিকায় যোগদান করেন। বাকী জীবন তিনি পত্রিকার সম্পাদনা, নাটক রচনা ও মঞ্চায়ন তথা সাহিত্যচর্চায় কাটিয়ে দেন (আহসান উল্লাহ: ২৩৬)।

তাওফীক আল-হাকিম সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে সাহিত্য ও নাট্যশিল্প চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, নাট্যশিল্প চর্চাকে তিনি সবকিছুর উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। এজন্য বিপুল নাট্যকর্ম সৃষ্টি তাঁর জন্য সম্ভব

হয়েছে। ১৯৫০ সালে তাঁর রচনা ২১টি সামাজিক নাটক নিয়ে প্রকাশিত ‘আল-মাসরাহ আল-মুজতামা’ (সামাজিক নাটক) এবং ১৯৫৬ সালে ‘আল-মাসরাহ আল-মুনাও’আহা’ শিরোনামে বিচিত্র বিষয়ে ২১টি নাটক সম্বলিত অপর গ্রন্থ প্রকাশিত হয় (আল-দাসূকী: ৪০)।

তাওফিক আল-হাকিম প্রতীকী ও বুদ্ধিবৃত্তিক দীর্ঘ নাটক ছাড়াও কমেডি শ্রেণির ছোট-বড় ৭২টি নাটক রচনা করেছেন (আহসান সাইয়েদ: ৯)। তাঁর নাটকে সমাজের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, ধনী-গরীব ব্যবধান, লিঙ্গবৈষম্য, চারিত্রিক অধঃপতন প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত কাহিনিকে উপজীব্য করে নাটক রচনা করার প্রতি তাওফীক আল-হাকিমের ঝোঁক বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যা আরবি বা অন্য কোনো ভাষার নাট্যকারদের মাঝে দেখা যায় না। ‘আহল আল-কাহফ (১৯৩৩)’, ‘সুলাইমান আল-হাকিম (১৯৪৩)’, ‘মুহাম্মদ (১৯৩৬)’ আল-কুরআনে বর্ণিত কাহিনি অবলম্বনে রচিত নাটকের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাওফীক আল-হাকিমের অন্যান্য নাটকগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো (আল-ফাখুরি: .৩৯৭):

- (১) আল-দয়ফ আল সকীল (الضيف الثقيل)
- (২) মুহাম্মদ (স.) (محمد)
- (৩) শাহরযাদ (شهرزاد)
- (৪) সালাতুল মালায়িকা (صلاة الملائكة)
- (৫) আহল আল-কাহফ (أهل الكهف)
- (৬) সুলাইমান আল-হাকীম (سليمان الحكيم)
- (৭) আল-মালিক উদীব (الملك أوديب)
- (৮) আল-শয়তান ফী খতর (الشیطان في خطر)
- (৯) বাইনাল হারব ওয়াস সালাম (بين الحرب والسلام)
- (১০) আস-সুলতান আল-হাইর (السلطان الحائر)
- (১১) আল-মরআ আল-জাদীদা (المرأة الجديدة)
- (১২) খাতিমু সুলাইমান (خاتم سليمان)
- (১৩) খুরুজ মিন আল-জান্নাহ (خروج من الجنة)
- (১৪) রাসাসা ফী আল-কলব (رصاصه في القلب)
- (১৫) আল-যম্মার (الزمار)

আধুনিক আরবি সাহিত্যের পুরোধা হচ্ছেন কবি আহমদ শওকী বেগ (১৮৬৮-১৯৩২ খ্রি.)।^৮ তাঁকে কবি সম্রাট উপাধিতে ভূষিত করা হয়। আরবি নাট্যসাহিত্যেও তাঁর অবদান অপরিসীম। তাঁকে কাব্য নাটকের পথিকৃৎ বলা হয়। ফ্রান্সের প্যারিসে থাকাকালীন তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন এবং ফরাসি থিয়েটারে অভিনীত বিখ্যাত নাটকগুলোর মঞ্চায়ন প্রত্যক্ষ করেন। এতে অনুপ্রাণিত হয়ে ইতিহাস বিষয়কে উপজীব্য করে তিনি কাব্য নাটক রচনা করেন। তাঁর কাব্যনাট্যগুলো হচ্ছে- আল-আস (ورقة الأس),^৯ ও দাসিয়াস (داسياس),^{১০} ক্লিওপেট্রা (كليوباترا), মাজনুন লায়লা (مجنون ليلى), আলী বেগ আল-কবির (علي بك الكبير), কাম্বিজ (قمبيز),

আনতারার (عنتر), আস-সিত্ত হুদা (الست هدى)। এছাড়া তিনি গদ্যেও আমিরাহ আল-আন্দলুস (أميرة الأندلس) নামক একটি নাটক রচনা করেছেন। আরবি কাব্যে তাঁর এ নাটকীয় ধারার প্রবর্তন আরবি সাহিত্যের মানকে বহু গুণে বৃদ্ধি করেছে।

ইতিপূর্বে আরবি কথ্য ভাষায় রচিত গীতি নাট্যসমূহ যেগুলো যুব সম্প্রদায়ের অভিনিবেশ অর্জন করতে শুরু করেছিল এবং তাদের মাঝে কথ্য ভাষার জোয়ার বয়ে এনেছিল, শাওকী তাঁর অভিনব আবিষ্কারের মাধ্যমে এর মোকাবেলা করতে সক্ষম হন। তিনি তাঁর বিশুদ্ধ ভাষায় রচিত গীতিনাট্যসমূহ দ্বারা কথ্য ভাষা থেকে বিশুদ্ধ আরবি ভাষার দিকে যুব সমাজকে মনোনিবেশ সৃষ্টিতে যথার্থ ভূমিকা রাখেন।

শাওকীর পর কাব্য নাটক রচনাকারীদের মধ্যে আযিয আবাবা^{১১} অন্যতম। তিনি শাওকীকে রাহবার হিসেবে গ্রহণ করেন এবং একে আরো অধিক প্রসার করার উদ্দেশ্যে শাওকীর অনুসৃত ধারা অনুকরণ করে অনেকগুলো কাব্য নাটক রচনা করেন। আল-বালাগা ওয়ান নাকদ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে- “আযিয আবাবা নাটকসমূহের বিষয়বস্তু নির্বাচনে কেবল শাওকীর নীতি দ্বারা প্রভাবিত হতেন তা নয়, বরং বিভিন্ন চরিত্রের রূপায়ন, কথোপকথন প্রক্রিয়া, গীতিধর্মীয়তা ও সম্ভাষণ পদ্ধতি ইত্যাদির ক্ষেত্রেও তাঁর অনুসৃত পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হন (আল-বালাগা ওয়ান নাকদ লিস সাফফিছ ছালিছ ছানভী: ৯১)।”

শাওকীর মতো আযিয আবাবা (১৮৯৮-১৯৭৩ খ্রি.)ও আরব ইসলামি ঐতিহ্যকে উপজীব্য করে নাটক রচনা করেন। এ রকম নাটকগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- কায়স ও লুবনা (قيس ولبنى), আল-আব্বাসা (العباسة), আবদুর রহমান আল-নাসির (عبد الرحمن الناصر), কাফিলাহ আন-নূর (كافلة النور) প্রভৃতি। এছাড়া তিনি লোক-কাহিনি অবলম্বনেও কতিপয় নাটক রচনা করেছেন। তন্মধ্যে ‘শাহরিয়ার’ একটি বিখ্যাত নাটক। সমাজের বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে নাট্যগীতিও তাঁর লেখনি থেকে বাদ যায়নি। তাঁর আওরাক আল-খারীফ (أوراق الخريف) সমাজের বাস্তব ঘটনাদি নিয়ে লিখিত (আল-দাসূকী: ৫৭)।

আযিয আবাবার পর অনেক আধুনিক কবিই নাট্যশিল্পের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। কবি আহমদ শাওকী বেগ ও আযিয আবাবার অনুসরণ করে কাব্য নাটক রচনা করেছেন মাহমুদ গুনায়ম (১৯০১-১৯৭২ খ্রি.)। তাঁর লিখিত ‘আল-মারআ’তু আল-মুকান্নাআ’, গরামু ইয়াযিদ প্রভৃতি নাটক পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তাঁর লিখিত কাব্য নাটকে আরব ঐতিহ্যের মনোমুগ্ধকর চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে (আল-দাসূকী: ৬৬)। কবি আলী আবদুল আজিম (১৯৪২-২০১৪ খ্রি.)^{১২} রচিত ‘বিলাদা’ ও কবি আলী আহমদ বাকাছীর (১৯১০-১৯৬৯ খ্রি.)^{১৩} ‘কাছরু আল-হাউদাজ’ নাটকদ্বয়ও কাব্য নাটকের উৎকৃষ্ট উদাহরণ (আল-দাসূকী: ৭০)। এছাড়া মুক্ত হৃদে রচিত আলী আহমদ বাকাছীর ইসলামি ভাবধারা সম্বলিত مسرحية إخناتون ونفرتي ও اسلاماه, ইত্যাদি কাব্য নাটক, কবি আবদুর রহমান শরকাভী (১৯২১-১৯৮৭ খ্রি.)^{১৪} مأساة جميلة، المجاهدة الجزائرية (جميلة) ও مأساة مهران الفتي প্রভৃতি নাটক তাঁদের সক্ষমতার স্বাক্ষর বহন করে। কবি সালাহ আবদুস সবুর (১৯৩১-১৯৮১ খ্রি.) কাব্য নাটকের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। তাঁর রচিত কাব্য নাটকগুলোর মধ্যে আল-আমিরাহ তানতায়ির (الأميرة تنتظر), বা‘দা আন ইয়ামূতা আল-মালিক (بعد أن يموت الملك) অন্যতম।

নাট্যচর্চা থেকে ফিলিস্তিনী কবিদের অবদানও কম নয়। কবি মু'ঈন বাসীসু (১৯২৮-১৯৮৪ খ্রি.)^{১৫} ছিলেন আধুনিক আরবি সাহিত্যের একজন বড়ো পণ্ডিত। তিনি ছিলেন অধ্যাপক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও নাট্যকার (https://ar.wikipedia.org/wiki/معين_بسيسو)।

এ ছাড়া সিরিয়ার কবি উমর আবু রিশা (১৯১০-১৯৯০ খ্রি.) আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে অন্যতম। তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক ও নাট্যকার।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, আরবি নাট্যশিল্প আরবি সাহিত্যের তুলনামূলক নতুন শাখা। ১৭৯৮ সালে নেপোলিয়ান বোনাপার্টি কর্তৃক মিশর বিজিত হওয়ার পর পরই আরবি সাহিত্য পাশ্চাত্য সাহিত্যের সংস্পর্শে আসে। নতুন নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ অধ্যাপনা করেন। তাছাড়া আরবরা ইটালি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে অধ্যয়ন করে নাট্যশিল্প ও নাট্যাভিনয় রপ্ত করেন। ১৯১২ সাল পর্যন্ত নাট্যশিল্পীদের মৌলিক লেখাপড়া ছিল না। তাঁরা অভিনয়ের ক্ষেত্রে গান ও সুললিত কণ্ঠের ওপর নির্ভর করতেন। পরবর্তী পর্যায়ে নাট্যশিল্পীদের মৌলিক লেখাপড়া ছিল। তাঁরা নাট্যশিল্পের ওপর উচ্চতর ডিগ্রিসহ বিখ্যাত নাট্যকারদের দলে কাজ করেন। দেশে ফিরে এসে তাঁরা পেশাদার নাট্যদল গঠন করেন। তাঁরা দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরে নাটক রচনা ও মঞ্চায়ন করেন। প্রথম দিকের নাট্যকারগণ অনুবাদ ও অনুকরণের মাধ্যমে এ সাহিত্যের যাত্রা শুরু করলেও পরবর্তীতে প্রখর মেধাবী সাহিত্যিকরা নাটক রচনায় এগিয়ে আসেন। ফলে আরবি নাট্যসাহিত্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। তবে আরব দেশগুলোর মধ্যে মিশর ও লেবানন ও সিরিয়ায় এ সাহিত্য বেশি অগ্রগতি লাভ করে। বিশেষ করে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাবে মিশর, লেবানন, সিরিয়াসহ আরব রাষ্ট্রসমূহে নাট্যসাহিত্যের চর্চা, রচনা ও মঞ্চায়ন নাট্যশিল্পকে অগ্রগতির শীর্ষে উন্নীত করেছে।

টীকা:

^১ মাজদি ওহবাহ (১৯৪৪-১৯৯০ খ্রি.) বিখ্যাত মিশরীয় অভিনেতা ও নাট্যকার। তাঁর বিখ্যাত নাটকগুলোর মধ্যে شقة المراهقين বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(https://ar.wikipedia.org/wiki/مجدى_وهبة)

^২ মারুন বিন ইলিয়াস বিন মিখাইল আল-নাক্বাশ (১৮১৭-১৮৫৫ খ্রি.) মিশরীয় নাট্যশিল্পের প্রবর্তক। তিনি লেবনানের সাইদায় ১৮১৭ সালো ৯ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৫৫ সালের ১ জুন তারসুস নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন। (আল-যিরিকলি: ৫/৫২৩)।

^৩ মোলিয়ার (১৬২২-১৬৭৩ খ্রি.) একজন কবি, অভিনেতা, আইনজীবী, পরিচালক ও নাট্যকার। তিনি ১৫ জানুয়ারি ১৬২২ সালে প্যারিসের রাজধানীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৯৫টি নাটকে অভিনয় করেছেন, যার মধ্যে ৩১টি নিজে রচনা করেছেন। (<https://ar.wikipedia.org/wiki/مولير>)

^৪ সলীম আন-নাক্বাশ (মৃ. ১৮৮৪ খ্রি./১৩০১ হি.) বৈরুতের একজন গবেষক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও ঐতিহাসিক। মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়ায় তাঁর অনেক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলির মধ্যে ৯ খণ্ড বিশিষ্ট مصر للمصريين উল্লেখযোগ্য (আল-যিরিকলি: ৫/১১৭)।

^৫ আদীব ইসহাক (১৮৫৬-১৮৮৫ খ্রি.) সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও নাট্যকার। তিনি দামিস্কে জন্মগ্রহণ করেন এবং লেবানানে মৃত্যুবরণ করেন (আল-জামি: ১১৪)।

- ৬ সালামা হিজাজি (১৮৫১-১৯১৭ খ্রি.) মিশরীয় নাট্যকার। ১৮৫১ সালে তিনি স্কান্দরিয়া শহরের রাস-আত-তীন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯১৭ সালের ৪ অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন।
- ৭ মুহাম্মদ তায়মুর (১৮৯২-১৯২১ খ্রি.) ১৯৯২ সালে মিশরের রাজধানী কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন। শিশুকাল থেকে নাট্যসাহিত্যের প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল। ফরাসি সাহিত্য অধ্যয়ন করে তিনি নাট্যদল গঠন করে নিজেই নেতৃত্ব দেন। তিনি নাট্যশিল্প ও ছোটগল্প রচনায় খ্যাতি লাভ করেছিলেন (আল-যিরিকলি: ৬/২২)।
- ৮ আহমদ শাওকী বেগ (১৮৬৮-১৯৩২ খ্রি.) কবি ও সাহিত্যিক। তিনি ১৯৬৮ সালের ১৬ অক্টোবর কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৩২ সালের ১৩ অক্টোবর জন্মস্থান কায়রোতে মৃত্যুবরণ করেন (ফজলুর রহমান: ৮২-৮৪)।
- ৯ নাদিরা নামক আরব রাজকন্যা এবং পারস্য সেনাপতি ‘সাবুর’ এর প্রেমকে কেন্দ্র করে রচিত নাটক (আল-দাসূকী: ৪৪)।
- ১০ মিশরীয় ফারাও আমলে ‘হামাস আল-মিশরী’ এবং গ্রিক রানি ‘দাসিয়াস’ এর প্রেম কেন্দ্রিক নাটক (আল-দাসূকী: ৪৪)।
- ১১ আযিয আবাবা (১৮৯৮-১৯৭৩ খ্রি.) মিশরীয় কবি ও শাওকীর পরে কাব্য নাটক আন্দোলনের পথপ্রদর্শক। তিনি নয়টি নাটক রচনা করেছেন। (<https://ar.wikipedia.org/wiki/عزير اباطة>)
- ১২ আলী আবদুল আজিজ (জন্ম ১৯৪২-২০১৪ খ্রি.) ফিলিস্তিনের নাট্যকার ও অভিনেতা। তিনি ১৯৪২ সালের ১০ অক্টোবর ফিলিস্তিনের ইয়াফা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তারপর তিনি মিশরের অভিবাসী হন। তিনি ১০ অক্টোবর ২০১৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর নাটকের মধ্যে ما هو الصحيح يا عليوة, يا أنا يا هو, يا أنا يا هو, يا أنا يا هو। (<https://arz.wikipedia.org/wiki/عبدالعزير>)
- ১৩ আলী আহমদ বাকাছীর (১৯১০-১৯৬৯ খ্রি.) প্রখ্যাত নাট্যকার ও সাহিত্যিক। তিনি ইন্দোনেশিয়ার ‘সুরাবায়া’ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের ১০ বছর পর তাঁর মাতাপিতা তাঁদের আদি জন্মভূমি ইয়ামেনের হাদরামাউত চলে যান। সেখানে তিনি লেখাপড়া করেন। তাঁর নাটকের মধ্যে ليلة النهر عودة الفردوس و القرعون، مأساة زينب، سر الحاكم بامر الله, উল্লেখযোগ্য। (আল-যিরিকলি, ৪/২৬২)।
- ১৪ আবদুর রহমান শরকাভী (১৯২১-১৯৮৭ খ্রি.) একজন মিশরীয় কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও নাট্যকার। তিনি ১৯২১ সালের ১০ নভেম্বর মিশরের দলাতুন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮৭ সালে ২৪ নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। (<https://ar.wikipedia.org/wiki/عبد الرحمن الشرقاوي>)
- ১৫ মুঈন বাসীসু (১৯২৮-১৯৮৪ খ্রি.) ১৯১০ সালের ১০ অক্টোবর ফিলিস্তিনের গাজা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২৩ জানুয়ারি ১৯৮৪ সালে লণ্ডনে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর অনেকগুলো কাব্য গ্রন্থ মিশর ও বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র

- ১। বলিয়াভী, মাওলানা আবদুল হাফিজ, *মিসবাহ আল-লুগাত*, দিল্লী: মাকতাবাতু বুরহান, ১৯৮১; ইব্রাহিম মাদকুর ও অন্যান্য, *আল-মুজাম আল-ওয়াসীত*, কায়রো: ১৯৭২।
- ২। ওহবাহ, মাজদি, *মুজামু মুসতালিহাত আল-আদব*, বৈরুত: মাকতাবাতু লিবনান, ১৯৭৪।
- ৩। আবুল কাসেম, ড. মুহাম্মদ, *আধুনিক বাংলা নাটকের ইতিবৃত্ত ও সমাজচিত্র*, চট্টগ্রাম: শব্দশিল্প প্রকাশন, ২০১৬।
- ৪। দাস, শ্রীশচন্দ্র, *সাহিত্য সন্দর্শন*, ঢাকা: বিনুক প্রকাশনী, ২০০৯।
- ৫। ভৌমিক, দুলাল, *সংস্কৃত নাটকের ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪।
- ৬। ঘোষ, অজিতকুমার, *বাংলা নাটকের ইতিহাস*, কালকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিশার্স, ১৯৯৯।
- ৭। ইসমাঈল, ড. ইজুদ্দিন, *আল-আদব ওয়া ফুনুহ দিরাসাহ ওয়া নাকদ*, আল-কাহিরা: দার আল-ফিকর আল-আরবি, ২০১৩।
- ৮। এনামুল হক, ড. মুহাম্মদ ও অন্যান্য, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৫।
- ৯। আল-যিরিকলি, খাইরুদ্দিন ইবনু মাহমুদ, *আলআলাম*, দারু আল-ইলম লিল মালাজিন, ২০০২।

-
- ১০। আল-মার'আ, ড. ফুয়াদ, *ফী তারিখ আদাব আল-হাদিস*, আল-মাতবুআত আল-জামিয়া, ১৯৯৮।
- ১১। মোহাম্মদ, ড. মোস্তাক ও অন্যান্য, *আধুনিক আরবি সাহিত্যের ইতিহাস*, কুষ্টিয়া: সেন্টার ফর ইসলামিক এডুকেশন এণ্ড রিসার্চ প্রমোশন, ২০০৫।
- ১২। আল-ফাখুরি, হান্না, *আল-জামি ফী তারিখ আল-আদব আল-আরবি*, বৈরুত: দারু আল-জিল, ১৯৮৬।
- ১৩। আল-মাকদাসী, আনিস, *আল-ফুনুন আল-আদাবিয়াহ ওয়া আল্লামুহা*, বৈরুত: দার আল-ইলম লিল মালায়িন, ১৯৯০।
- ১৪। দ্বাইফ, ড. শাকী, *আল-আদব আল-আরবি আল-মু'আসির ফী মিশর*, কায়রো: দারু আল-মা'আরিফ, ১৯৭৪।
- ১৫। Mahdi, Ismat, *Modern Arabic Literature*, Hyderabad: 1983।
- ১৬। আল-হাকিম, তাওফিক, *সিজন আল-ওমর*, কায়রো: দারু আল-মা'আরিফ, তা.বি।
- ১৭। আহসান উল্লাহ, ড. মুহাম্মদ, *দ্যা চিটাগাং ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস এণ্ড হিউম্যানিটি*, খণ্ড ১৯, নভেম্বর ২০০৩।
- ১৮। আল-দাসুকী, ওমর, *ফী আল-আদব আল-হাদিস*, কায়রো: দার আল-ফিকর আল-আরবি, ১৯৭২।
- ১৯। সাইয়েদ, আহসান, *তাওফিক আল-হাকিমের নাটক*, ঢাকা: গ্র্যাডুইজ পাবলিকেশন, ২০০২।
- ২০। ফজলুর রহমান, ড. মুহাম্মদ, *আরব মনীষা*, ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৩।
- ২১। আল-দাসুকী, ওমর, *আল-মাসরাহিয়াহ নাশ্আতুহা ওয়া তারীখুহা ওয়া উসূলুহা*, কায়রো: দার আল-ফিকর আল-আরবি, তা.বি।
- ২২। *আল-বালাগা ওয়ান নাগদ লিস সাফ আল-ছালিছ আল-ছানতী*, সৌদি আরব: শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ১৯৮৩।
- ২৩। <https://bn.wikipedia.org/wiki/নাটক>। Accessed 1 January 2023.
- ২৪। <https://ar.wikipedia.org/wiki/مولير>। Accessed 2 January 2023.
- ২৫। <https://www.google.com/سليم النقاش>। Accessed 2 January 2023.
- ২৬। <https://ar.wikipedia.org/wiki/عزيز اباطة>। Accessed 4 January 2023.
- ২৭। <https://arz.wikipedia.org/wiki/عبد العزيز علي>। Accessed 4 January 2023.
- ২৮। <https://ar.wikipedia.org/wiki/عبد الرحمن الشرقاوي>। Accessed 5 January 2023.
- ২৯। https://ar.wikipedia.org/wiki/معين_بسيسو। Accessed 5 January 2023.
- ৩০। https://ar.wikipedia.org/wiki/عمر_أبو_ريشة। Accessed 5 January 2023.

তারাশঙ্করের ছোটগল্পে তন্ত্র ও তান্ত্রিকসাধনা

ড. শিপক কৃষ্ণ দেব নাথ*

প্রতিপাদ্যসার: তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাধিক গল্পে শক্তি ধর্মাচরণ বা কালীসাধনা তথা তন্ত্র ও তান্ত্রিক সাধন পদ্ধতি বিষয় হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। কালী বাঙালির শক্তি সাধনার অন্যতম দেবী। এই দেবী ভয়ঙ্করী, শ্যামবর্ণা, মুক্তকেশী, চতুর্ভুজা, মুণ্ডমালাবিভূষিতা, বামের দুহাতে একটিতে সদ্যচ্ছিন্ন শির, উর্ধ্বহস্তে খড়্গ, ডানে নিচের হাতে অভয়, উর্ধ্বের বর। শবারুঢ়া তিনি। শিবাকুল দ্বারা সমন্বিত। ‘কালকে গ্রাস করেন বলেই দেবী কালী।’ তিনি আদিভূতা, আদ্যাকালী, বাঙালির শক্তি সাধনার কেন্দ্রে এই কালী দেবী, তারাকেও কালীস্থানীয়া করে নেওয়া হয়েছে। তিনি “খড়্গ”, “ট্যারা”, “ছলনাময়ী”, “পুত্রেষ্টি”, “প্রতিধ্বনি”, “চণ্ডীরায়ের সন্ন্যাস”, “রায়বাড়ি”, “ট্রিটি”, “ডাইনী”, “একরাত্রি”, “প্রহ্লাদের কালী”, “সখী ঠাকরুন” প্রভৃতি গল্পে কখনো শক্তিপূজক হিসেবে, কখনো বা তন্ত্রসাধনার প্রত্যক্ষ বাতাবরণে ধর্মাচার রূপায়িত করেছেন। ধর্মাচার ও ধর্ম বিশ্বাসের বিচিত্র পরিচয় লেখক মানুষের জীবনযাপনে, পেশায় ও চেষ্টনায় রূপায়িত করেছেন। আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধে তন্ত্র ও তান্ত্রিক বিষয় সম্বলিত তারাশঙ্করের গল্পগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর ‘ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য’ গ্রন্থে বিস্তৃত পরিসরে তন্ত্র ও তান্ত্রিক সাধনা সম্পর্কে বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন (দাশগুপ্ত ৬৩-৭৯)। অন্যদিকে মিল্টন বিশ্বাস তাঁর ‘তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে নিম্নবর্ণের মানুষ’ গ্রন্থে উক্ত বিষয়ের স্বরূপ নির্ণয় করেছেন (বিশ্বাস ৩২৮-৪৪৮)। বাংলায় কালী নানা প্রকারের, কালীর সাধনার পদ্ধতিও বিবিধ। কালীপূজা বা শ্যামাপূজা দীপালি উৎসবের দিনে প্রধানত করা হয়। এছাড়া বিশেষ কোনো উপলক্ষে ‘মানসিক’ করা কালীপূজার ব্যবস্থা হয়। কালীসাধনাকে কেন্দ্র করে তান্ত্রিক সাধনা তথা শক্তি সাধকদের আবির্ভাব। ‘পার্বতী উমা সতী এবং দুর্গা চণ্ডিকার ধারা মিলিয়া পুরাণ-তন্ত্রাদিতে যে এক মহাদেবীর বিবর্তন দেখিতে পাই, তাহার সহিত আসিয়া মিলিত হইয়াছে আর একটা ধারা, তাহা হইল কালিকা বা কালীর ধারা। এই কালী বা কালিকাই বাঙলাদেশের শক্তিসাধনার ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত সর্বেশ্বরী হইয়া উঠিয়া দেবীর অন্য সব রূপ অনেকখানি পিছনে ফেলিয়াছেন (দাশগুপ্ত ৬৩)।’

লোক আচারিত বৈষ্ণবধর্ম সম্প্রদায় যেমন তারাশঙ্করের গল্পে শিল্পরূপ পেয়েছে তেমনি শাক্ত ও তান্ত্রিক ধর্ম চর্চার তথা শক্তি উপাসকদের জীবনকে রূপায়িত করেছেন তিনি। বীরভূম শাক্ত ধর্ম চর্চার অন্যতম পীঠস্থান। তারাশঙ্করের পরিবার ছিল তন্ত্রোপাসক। *ধাত্রীদেবতায়* শিবনাথ বলেছেন— আমাদের দেশটাই হল তান্ত্রিকের দেশ। এককালে তন্ত্রসাধনার মহাসমারোহ ছিল আমাদের দেশে (দেবতা ১৩)। বীরভূমের কঙ্কালীতলা, তারাপীঠ, উদ্ধারণপুর বক্রেশ্বর লাভপুর, সাঁইথিয়া প্রভৃতি স্থান শাক্তপীঠ হিসেবে পরিচিত। বক্রেশ্বর তান্ত্রিক সাধনার অন্যতম পীঠস্থান। লাভপুরে দেবী ফুলরার মন্দির বিখ্যাত। এছাড়া ‘এখানে গ্রামে গ্রামে, বিশেষত লাভপুর, কীর্ত্তাহার অঞ্চলে বহু প্রসিদ্ধ কালীবিগ্রহ পূজিত হয়। তারাশঙ্করের উপন্যাসে বিভিন্ন শাক্তবিগ্রহের নাম ও

* সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

জনপ্রিয়তার উল্লেখ আছে। যেমন, ভাঙাকালী, জয়ন্তীমঙ্গলা কালী, বুড়ী কালী, শ্মশানেশ্বরী, বাকুলের মা শ্মশানকালী প্রমুখ। শক্তিপূজার সঙ্গে এদিকে তন্ত্রসাধনাও অধিক প্রচলিত (মুখোপাধ্যায় ৩২২)।

- তারাক্ষরের গল্পে শাক্ত সন্ন্যাসী ও তান্ত্রিক চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। গল্পটিতে পাওয়া যায় কালীভক্তের পূজা প্রক্রিয়াও। তবে লেখক ‘তন্ত্রোপাসক পরিবারের সন্তান হয়েও তন্ত্রসাধনার নির্মমতা, কদাচার আর ব্যভিচার’ ও তার অন্তঃসারশূন্য ভণ্ডামিকে তুলে ধরেছেন (গিরি ৭৫২)। তারাক্ষরের জীবনাভিজ্ঞতা থেকে গল্পের উপকরণ সংগ্রহ করতে দেখা গেছে। সেই অভিজ্ঞতায় নিম্নবর্ণের মানুষের রাজত্ব মহিমাম্বিত। তাছাড়া পারিবারিক ঐতিহ্যে তান্ত্রিকতার প্রভাবের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এজন্যই বলা হয়- ‘তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তারাক্ষরের একাধিক ছোটগল্পের বিষয়ীভূত হয়েছে (ভট্টাচার্য ৫৮)।’ গল্পগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো।

- “খড়গ” গল্পে পিতৃনির্দেশে বংশের বৃত্তিরক্ষায় ব্রতী কিন্তু জীব হত্যায় অনিচ্ছুক ছেত্তা কামারের ধর্মবিশ্বাসের পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। রামজীবনের সিংহবাহিনীর মন্দিরের বলির বংশানুক্রমিক ছেত্তা ব্রহ্মচর্য পালন করে, অবলীলায় বড় বড় মহিষ বলি দেয়। মন্দিরের পুরোহিত মহাতান্ত্রিক ব্রাহ্মণ মন্ত্রবলে দশ সের ওজনের খড়গ কালদণ্ডকে গল্পের কাহিনী কথককে ধারণ করতে অনুপ্রাণিত করেছেন। কারণ তা অনিচ্ছা সত্ত্বেও পিতার কণ্ঠস্বরে বাপ পিতামহের বৃত্তি গ্রহণ করেছে সে। ‘আড়াইশো বছর আগে মহাতান্ত্রিক এক ব্রাহ্মণ আমার জড়চেতনাকে জাগ্রত করেছিলেন। রাজা রামজীবনের পুরোহিত আমায় মন্ত্রবলে প্রাণবন্ত করেছিলেন (ভট্টাচার্য ২৭৮)।’ লোহার খড়গের মুখে এই তন্ত্রসাধকের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। এ খড়গ ধারণ করে আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করত কামার সন্তান। আর দেবীর সামনে তাকে শপথ করে বলতে হয়েছে রমণীর চরণ ভিন্ন মুখের দিকে তাকাবে না। (১/২৭৯) এ-গল্পে ছেত্তার ধর্মীয় বিধিবিধানের এভাবেই সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ছেত্তার আত্মহত্যাও সম্পন্ন হয় ধর্মবিশ্বাস থেকে। সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ে ‘ঢেকা’র রাজা রামজীবন রায়ের রাজনৈতিক গোলযোগে মুর্শিদকুলী খাঁ রাজ্য আক্রমণে উদ্যত হওয়ার মুহূর্তে মন্দিরে ছাগশিশু বলি দিতে গিয়ে ছেত্তা অঘটন ঘটায়। মহাষ্টমীর বলি দিচ্ছেদ হয়ে যায়। অর্ধচিহ্ন ছাগশিশু দিচ্ছেদ হওয়ায় কর্মকার রামসাগরের বাঁধা ঘাটে রানার ওপর কোপ মেরে খড়গটি বসিয়ে দিয়ে কাপড়ে পাথর বেঁধে জলে ডুবে আত্মহত্যা করে। এর পূর্বে সে নাটমন্দিরে নারী কণ্ঠ শুনেছে ‘এ হত্যার কাজ তুমি ছেড়ে দিয়ো। একাজ তুমি কর না।’ (১/২৮২) মহাষ্টমীর বলির সন্ধ্যার বর্ণনায় কর্মকারের মানসিক অবস্থা :

- “সন্ধ্যায় স্নানান্তে খড়গ হাতে আসিয়া দাঁড়াইলাম। উৎকণ্ঠিত জনতা চারিপাশে করজোড়ে দাঁড়াইয়াছিল। নারীকণ্ঠের উলুধ্বনি উঠিতেছিল। তাহার মধ্য হইতে একটি কণ্ঠ আমি চিনিতে পারিলাম। সর্বাঙ্গ আমার কাঁপিতেছিল যে খড়গখানা একদিন আমার কাছে পালকের মতো হালকা ছিল সে আজ যেন হইয়া উঠিয়াছে পাষাণের মতো গুরুভার আলোকোজ্জ্বল মুক্ত দ্বারপথে দেবীমূর্তি ধূপ ধুমে আচ্ছন্ন হইয়া গেছে— আমার চোখের দৃষ্টিপথও আজ রুদ্ধ। দেবী মূর্তি আজ আমার সম্মুখে নাই” (১/২৮৩)।

এ অবস্থার পর পুরোহিতের আদেশে বলি দিতে গিয়ে অঘটন ঘটে। রাজা ক্ষুব্ধ হলে সে আত্মবলি দিতে উৎসাহী হয়। রামসাগরে এসে খড়গ পাষণভিন্ন করে প্রোথিত করে ক্রন্দনরত কর্মকার নিজেকে অপরাধী ভাবে। রাজা খড়গের পাষণ প্রোথিত করা দেখে তাকে মার্জনা করলেও তার বিশ্বাস-দোলাচল তাকে আত্মহননে প্ররোচিত করে। ‘সে নিজে রাজার কালী বাড়ির শক্তিমান ছেত্তা হয়েও মনে মনে এই জীবহিংসাকে অপছন্দ করেছে। তার ব্যর্থতা এসেছে এই অপ্রবৃত্তি থেকেই (সামাদী ৫৪)।’ তারাক্ষর এই গল্পে কুলধর্মে শাক্ত তান্ত্রিক হয়েও অহিংসার

পক্ষে তার চরিত্রকে দাঁড় করিয়েছেন। অভ্যাসবশে নিষ্ঠুর হস্তারক থেকে অন্তরাত্মায় করুণাময় হয়ে উঠেছে ছেত্তার কাহিনী।

- আসলে ‘খড়্গ’ গল্পে শাক্ত আচার ও বিশ্বাস হিসেবে বলি প্রথার চিত্র ও ছেত্তার জীবনে তার প্রভাব ও প্রভাবমুক্তির চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। অন্যদিকে লেখক ‘ট্যারা’ গল্পে বাঙালির ধর্মীয় জীবনে শাক্তপীঠের বাস্তবতা তুলে ধরেছেন। বীরভূমের একান্ন পীঠের একটি মহাপীঠ গ্রাম প্রান্তের দেবায়তন এই গল্পের পটভূমি। বাউরি অনাথ সন্তান ট্যারা যার পিতা ছিল দিনমজুর গরিব নয়ান, তারই কাহিনী এই গল্পে বর্ণিত। গ্রাম প্রান্তরের দেবায়তন আরণ্যক পরিবেশে দেবী বিরাজিত। গদিয়ান মহাস্ত পশ্চিমদেশীয় সন্ন্যাসী, সেবাইত স্থানীয় জমিদার বংশ, মহাস্ত নির্বাচন করেন তারাই। গদিয়ান মহাস্ত হল সেবাইত জমিদারের অধীন (১/৩১৭)।
- শাক্তধর্মসম্প্রদায়ের অভিজ্ঞতা বংশগত বলেই লেখক শাক্ত মন্দির কেন্দ্রিক জীবনধারা এই গল্পে তুলে ধরতে পেরেছেন নিখুঁতভাবে। ‘স্থানটি হিন্দুর খ্যাতনামা একটি তীর্থস্থল, একান্ন মহাপীঠের এক মহাপীঠ। অট্টহাসে দেবী ফুলরা, বিশ্বেশ্বর ভৈরব বিরাজমান। গদিয়ান মহাস্ত পশ্চিমদেশীয় সন্ন্যাসী। আবক্ষ শ্বেত শূশ্রু, অনাবৃত বিশাল দেহ, বাহুতে পঞ্জরে কাটা ক্ষতচিহ্ন দেখা যায়। এগুলি যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন। তিনি পূর্বে ছিলেন সৈনিক এখন লইয়াছেন সন্ন্যাস’ (১/৩১৬)। এই সন্ন্যাসী বাউরি ট্যারাকে চেলা করে, আশ্রয় দেন দেবায়তনে গরু চরানো ও অন্যান্য কাজের বিনিময়ে। নির্জন বনভূমির মন্দির মুখরিত হয় দিবসের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে। বলিদান হয়।
- নিবিড় বনের শাক্ত পরিবেশে সুউচ্চ দেব-ভবন, নাটমন্দির, তার সামনের ‘পুষ্করিণী’। মন্দিরের পিছনে আশ্রম মহাস্তের পঞ্চমুণ্ডীর আসন, ভোগমন্দির, গোশালা। এই তন্ত্রসাধনার আরণ্যক পরিবেশে ও গ্রামীণ মানুষের সম্পৃক্ততায় গল্প কেবল বলিদানের বীভৎসতায় সীমাবদ্ধ থাকে না। বলিদানে রক্তপাতের আনন্দে ট্যারা অংশ নেয়। ট্যারা মন্দির থেকে বিতাড়িত হয় দুষ্টবুদ্ধির জন্য। তিন বছর পর তার আগমন সন্ন্যাসী হয়ে। চলনে বলনে সন্ন্যাসী রূপ থেকে মহাস্তের অন্তিম নির্দেশে সে সংসারে ফিরেছে। নিম্নবর্গ ট্যারার জীবন ইতিহাসের সঙ্গে মহাপীঠের শাক্ত ধর্মাচার সম্পৃক্ত হয়ে গল্পটিকে বিশেষ মাত্রা দিয়েছে। এ-গল্পে গাঁজা খাওয়ার প্রচলনটি তন্ত্রসাধনার সঙ্গে বিজড়িত বিষয়।
- তান্ত্রিক সাধনার জীবন্ত গল্প ‘ছলনাময়ী’। এই গল্পে কয়লাখনির ম্যানেজার তন্ত্র সাধনার মাধ্যমে অসীম ক্ষমতার অধিকারী হতে চেয়েছিল। নিজের কন্যার স্বামী খনির সার্ভেয়ার কানাই চক্রবর্তীর (কম্পাস) শবদেহের ওপর বসে সে শবসাধনায় প্রবৃত্ত হয়। বিধবা কন্যার আর্তনাদে সম্মিত ফিরে পেয়ে উন্মাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে অর্থাৎ তার শবসাধনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। শবাসন ত্যাগ করে অহরহ বিধবা কন্যার ছবি চোখের উপর ভেসে ওঠায় তার অমানুষী, নিষ্ঠুর সাধনা পেয়েছে মনুষ্যত্বের রূপ। কারণ তারই প্ররোচনায় কুলি সর্দার কানাইকে হত্যা করে শব গায়েব করে তাকে দিয়েছিল। এই পাশও প্রবৃত্তির কারণ সুলক্ষণ জীবন্ত মানুষের শব হিসাবে কানাই ছিল সর্বলক্ষণযুক্ত।
- তান্ত্রিক সাধনা এখানে ম্যানেজারকে পৈশাচিক করে তুলেছে। তাঁর বিশ্বাস তান্ত্রিক সাধনায় মানুষ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে। মধ্য জীবনে সন্ন্যাস নিয়ে তন্ত্রসাধনায় তিনি শক্তি লাভের সাধনা করেছিলেন। জীবনে অর্থ, ভোগ, সম্মান প্রভূত কামনা করেই তার সেই সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া। কিন্তু সজ্ঞান চঞ্চলা ছলনাময়ী তাকে প্রতারণা করেছে। জলকে সুমিষ্ট শরবতে পরিবর্তন ও হাতের তালুতে মিষ্টি গন্ধ সৃষ্টি করতে পারা ছাড়া আর কোনো শক্তি তার অর্জিত হয়নি। এতে সন্তুষ্ট নন ম্যানেজার। সম্রাটের মতো অসীম শক্তি,

ভোগ ও প্রভুত্ব তার চাই। পাঁড় মাতাল ম্যানেজারের অষ্টাদশবর্ষীয়া কন্যার বিবাহচিন্তা নেই। স্ত্রী-কন্যাকে প্রহার করেন তিনি। খনির অন্যরা তাকে ভয় পায়। অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের ধনী শ্বশুরের একটি কলিয়ারির ঠিকাদারিতে এসে তাকে প্রথম দেখায় মনে হয়েছে ‘প্রান্তরের বুকোর অদূরবর্তী ঘনাককার পটভূমির সম্মুখে সে মূর্তি যেন এক অদ্ভুত শোভন রহস্য’ (১/৩২৬)। স্থিরদৃষ্টি নিমেষহীন কঠিন। ক্ষুদ্র চোখ, মুখের নিম্নাংশে দাড়িগোঁফ সমাচ্ছন্ন, কাঁচাপাকা দীর্ঘ রক্ষ চুল বিশৃঙ্খল প্রকৃত সাধকের চিত্র। তান্ত্রিক সাধক ছলনাময়ীকে স্ববশে এনে অনন্ত ভোগ, অসীম প্রভুত্ব পেতে চান। তাই নদীর ধারে শ্মশানে তিনি সাধনার জন্য অমিয়ার কাছে অর্থ পাওনা চেয়েছেন। পুনরায় সাধনার জন্য অর্থের সঙ্গে শব প্রয়োজন। অসীম ক্ষমতালিস্তু তান্ত্রিক ম্যানেজার পূর্বের তন্ত্রসাধনায় তার ব্যর্থতার বর্ণনা দিয়েছেন :

- এই সাধনা থেকে প্রাপ্তিতে তৃপ্তি পাননি তান্ত্রিক। স্নেহ-মমতা বিসর্জন দিয়ে সর্বশক্তি অর্জনে আত্মনিয়োগ করতে ইচ্ছুক। ‘জীবন্ত মানুষকে শব প্রস্তুত’ করে নিতে চেয়েছেন। পরিবারকে প্রহার করার পক্ষে তার যুক্তি ‘তারা আমার আয়ত্তাধীনে আছে।’ (১/৩৩১) ম্যানেজার তার নিজের আকাঙ্ক্ষা পূরণে উন্মত্ত, মোহে অন্ধ। তাই গৃহত্যাগ করে সাধনার উদ্দেশ্যে। কম্পাস ও ম্যানেজার কন্যার বিবাহের পর কম্পাসের ঘরে সাপ নিক্ষেপ করে ম্যানেজার অমিয় বাবুর কাছে অর্থ চেয়ে বিফল হন। নিরুদ্দেশে যাবার চিত্রটি গৈরিক প্রান্তরের গৈরিকবসনা সন্ধ্যাসিনী প্রকৃতির সাযুজ্যে চিত্রিত। ‘অস্থির পদক্ষেপে খর্বাকৃতি অসম্ভব প্রয়াসী বাহির হইয়া গেলেন। উন্মত্ত বাতায়নপথে চাহিয়া অমিয় দেখিল- সম্মুখে রৌদ্রদন্ধ প্রান্তর-বক্ষের শেষ সীমায় চিক্-চিক্ করিয়া কাঁপিতেছে মরীচিকার প্রবাহ। দন্ধ প্রান্তর অতিক্রম করিয়া অস্থির পদক্ষেপে খর্বাকৃতি তান্ত্রিক চলিয়াছেন সম্মুখের পানে।’ রৌদ্রদন্ধ প্রান্তর, মরীচিকার প্রবাহ প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ তান্ত্রিকের পরিণাম সঞ্চরী। তার জীবনে প্রকৃতির নির্মম প্রতিশোধের ইঙ্গিত। তান্ত্রিকের কন্যাকে দেখে অমিয় মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়েছে: ‘এই সেই কঠোর তান্ত্রিকের সন্তান, সন্ধ্যাকাশের গোধূলি-তারার মত শুভ্র, প্রশান্ত, সুন্দর।’ (১/৩৩৩) সন্ধ্যাকাশের গোধূলি তারার মত শুভ্র মেয়েটির জীবনে শ্মশান, নরকঙ্কাল ও শবসাধনা নিয়ে আসে হাহাকার। কম্পাসকে পরিকল্পিতভাবে খাদের ভিতরে ধ্বংস নামিয়ে হত্যা করা হয়। নীরন্ধ অন্ধকারে, শ্মশানের মাঝে অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত সেখানে কম্পাসের কুশপুত্তলী দাহের ব্যবস্থা করতে গিয়ে সদ্যবিধবা কন্যার করুণ আর্তনাদে, ‘জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে শবারোহী খর্বাকৃতি তান্ত্রিক লাফ দিয়া আসন ছাড়িয়া বলিয়া উঠিল- দূর দূর দূরহ’ (১/৩৩৬)। সদ্যবিধবা কন্যার আর্তধ্বনি তান্ত্রিককে নির্মম কশাঘাতে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। দশবছর পর বালীগঞ্জ পার্কে অমিয়ার সঙ্গে তান্ত্রিকের দেখা হলে বলেছে ‘শবাসন ছেড়ে উঠে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম। অহরহ বিধবা কন্যার ছবি চোখের ওপর ভাসত। আমি অস্থির হয়ে চিৎকার করে ছুটে বেড়াইতাম। এখনও কখনও কখনও হয়।’ (১/৩৩৭)।
- তান্ত্রিকের তন্ত্রসাধনায় রাক্ষসী ছলনাময়ী ভীষণ প্রতিশোধ গ্রহণ করে। অতি যন্ত্রণায় সন্ধিত ফিরে আসে বলেই হাত কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে। উৎকট তান্ত্রিক সাধকের ব্যর্থতার কাহিনী ‘ছলনাময়ী’। ‘স্বাণেন্দ্রিয়ের আমন্ত্রণে প্রথমবারে ঘটে ছিল তার ব্যর্থতা। সেওতো পার্থিব মানবিক দুর্বলতা। এবারে গভীরতর দুর্বলতা- বাৎসল্য। জামাতার শবদেহে বসে সাধনা ভেঙেছে কন্যার আর্তক্রন্দনে, যে কন্যার প্রতি বাৎসল্য সে শাসন করেছিল বলে স্থির বিশ্বাস ছিল (সামাদী ১৪)।’ “পুত্রোষ্টি” গল্পে শ্মশানচারী ভীমকায় উগ্রদর্শন সন্ধ্যাসী কালী সাধকের নরবলি প্রদানের ইচ্ছের সঙ্গে বাঁড়ুজ্জ বাড়ির নিঃসন্তান মেজোকর্তার সন্তান কামনার ঘটনা একাত্ম হয়েছে। উচ্চবর্গ মেজকর্তার বিশ্বাস সৃষ্টি করেছেন সন্ধ্যাসী। যে সন্ধ্যাসী ‘মড়া খায়’। শ্মশানে ধুনির সামনে বসে থাকেন। অপরিচিত ব্যক্তির নাম ধরে ডাকতে পারে, বাড়ির খবর বলতে পারে। এই আশ্চর্য সন্ধ্যাসী গঙ্গার তটভূমির উপর ঘন জঙ্গলের পাশে শ্মশানে বসবাস করে। জনশূন্য শ্মশানে অগ্নিকুণ্ডের সামনে গঙ্গার

দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকেন। নর-কপালের পায়ে পানীয় পান করে। মেজোকর্তা ‘শাক্ত ব্রাহ্মণবংশের সন্তান’ (১/৪৫৪) সন্ন্যাসীর মাটির পায়ে মায়ের প্রসাদ পান করতে বললে পান করে।

- সন্ন্যাসী ‘কালী সম্পর্কে বলেছেন শিববাক্য লঙ্ঘন করতে পারে একজন যে শিবের বুকে চড়ে নাচে। সে তার কালীমা। এই কালীমাকে তুষ্ট করতে পারলে সন্তান জন্মাবে। তিনি বলেন, তন্ত্রমতে আমি তোর জন্যে মায়ের কাছে পুত্রোষ্টি যাগ করব।’ (১/৪৫৪) অমাবস্যার অন্ধকারে গভীর রাতে দূর শ্মশানে নরবলি দিতে বললে মেজকর্তা রাজি হয়। মেজকর্তা তন্ত্রমতে জপ তপ সুরা পান করে। সন্ন্যাসী সেবাও স্বাভাবিক কাজ। শ্মশানে পুত্রোষ্টি যাগ করার জন্য মেজগিনীর বুকের কাছে আশ্রিত পোষ্য খোকাকে শ্মশানের উদ্দেশ্যে নিয়ে গিয়েও ফেরত আনে বিবেক তাড়িত হয়ে। ‘সুরাপ্রভাবিত মস্তিষ্কের’ স্বাভাবিক ক্রিয়াশীলতা নষ্ট হওয়ায়, অপরের পুত্রকে নরবলি দেয়ার বিনিময়ে পুত্রলাভের নিষ্ঠুর বাসনাকে পরাজিত করেছে এক সন্তানহারা কুকুরের আর্তনাদ যা মেজকর্তাকে সুরাপানোন্মত্ত অবস্থায় সর্বক করেছে। স্বাভাবিক বুদ্ধি নষ্ট হওয়ায় সন্তানের ক্ষুধা তাকে কালীসাধকের কাছে নিয়ে গেছে। রুষ্ট তান্ত্রিকের আহ্বানকে উপেক্ষা করতে পেরেছে মেজকর্তা। অনাথ শিশুকে বলি দেওয়ার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা থেকে মেজকর্তা রক্ষা পেয়েছে। ‘তন্ত্রসাধনার উপায় আর উদ্দেশ্য সম্পর্কে গল্পলেখকের তীব্র বিরূপতারই প্রকাশ ঘটায়’ (গিরি ৭৫৩) এই গল্পে। ‘ছলনাময়ী’র মতো শাক্ততান্ত্রিকতার নিষ্ঠুরতা ‘পুত্রোষ্টি’ গল্পেও রূপায়িত হয়েছে। তবে লেখকের অভিজ্ঞতালব্ধ তন্ত্রসাধনার নানা স্তরে উভয় গল্পে মানবিকতাপ্রাপ্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।
- ‘প্রতিধ্বনি’ গল্পে রসরাজ ঘোষাল ‘কালী সাধনা’ করতে গিয়ে পাগল হয়ে গেছেন (১/৫২৯)। লেখকের দিদিমা বলেছেন, “মা দেখা দেবার আগে, নানা বীভৎস ভয়ঙ্কর মূর্তিতে আসেন কিনা সাধককে ভয় দেখাতে। সেই রকম এক মূর্তি দেখে উনি ফুঃ ফুঃ করে আসন ছেড়ে উঠে পড়েছিলেন। সেই অবধি অহরহ ফুঃ ফুঃ করেই বেড়ান। (১/ ৫২৯) গল্পে রসরাজের যে চেহারার বর্ণনা তা একান্তই কালীসাধকেরই। ‘অস্বাভাবিক মূর্তির মুখ, মাথায় বিশৃঙ্খল দীর্ঘ রক্ষ চুল, দীর্ঘ শূশ্রু গুম্ফে সমাচ্ছন্ন মুখ, চোখে প্রখর দৃষ্টি, সে মূর্তি দেখিয়া ভয় হয়।” (১/৫২৮) কলেজে বি এ পর্যন্ত পড়েছে, পাশ করেনি রসরাজ। কলেজে পড়ার সময় রাত্রির পর রাত্রি শ্মশানে কাটিয়েও মৃত্যু কি, কি তার রূপ, কোথায় বাস সে প্রশ্নের উত্তর পায়নি। এখন পাগল হয়ে চারিপাশে মৃত্যুকে ফুঃ দিয়ে উড়িয়ে দেয়। তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর প্রসঙ্গ নির্জন নদীতীর ও শ্মশান এবং রসরাজের নিয়মিত মৃত্যুজিজ্ঞাসায় সমীকৃত হয়েছে।

‘চণ্ডীরায়ের সন্ন্যাস’ গল্পের চণ্ডীচরণ কালী উপাসক ও প্রাচীন নিষ্ঠাবান তান্ত্রিক পণ্ডিত বংশের সন্তান। অকৃতদার চণ্ডী তন্ত্রসাধনা ও জপতপ নিয়েই সময় কাটায়। সংসারে একমাত্র আত্মীয় ভাগ্নী চিন্ময়ী। চিন্ময়ীকে সমস্ত সম্পত্তি দানপত্র করে সন্ন্যাসী হতে চেয়ে কালীমন্দিরে আশ্রয় নেয় সে। কিন্তু মন্দির দোকানের বাকি পাওনা পরিশোধের জন্য ভাগ্নীকে একখণ্ড জমি দোকানিকে দিতে বললে ভাগ্নী অস্বীকৃতি জানালে চণ্ডীরায়ের বিষয়াসক্তি চাওড় দিয়ে ওঠে। চিন্ময়ীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করে আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে মামলায় জয়ী হয়েছে চণ্ডী। বিষয়াসক্তি চরিত্রটিকে জীবন্ত মানুষের জটিলতায় উজ্জীবিত করলেও বৈরাগ্য বা তন্ত্রসাধনা ব্যাহত করেছে। সংসারবিমুখ চণ্ডী শেষে গৃহে চিন্ময়ীকে না দেখতে পেয়ে প্রকৃত অর্থেই গৃহত্যাগী হয়েছে। বৈরাগ্য পরাজিত হলেও কুলুপ চাবি খোঁজায় তার বিষয়াসক্তি জয়ী হয়েছে।

এই গল্পে লাভপুরের পীঠস্থান ও সেখানকার দেবী চণ্ডীকার প্রসঙ্গ আছে। ‘ট্যারা’ গল্পে অটুহাস এর পরিচয় থেকে এই পরিচয় বিস্তৃত। সতীর অধর-ওষ্ঠ পড়েছিল এজন্য এখানকার মন্দিরে অঙ্গ আকৃতিহীন একটি বড় শিলা ফুলরা ও অটুহাস নামে পরিচিত। শ্মশান সন্নিহিত জঙ্গলাকীর্ণ এই পীঠ অতিপ্রাচীন তন্ত্রসাধনার ক্ষেত্র। লাভপুরের

শক্তিপূজার ঐতিহ্য ব্যক্ত করতে এই পীঠের বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন— ‘লাভপুর থানার সিদ্ধল গ্রামে ভট্ট ভবদেবের মহাদেব ও অট্টহাস নামে দুই ভাই ছিলেন। অট্টহাস সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং তাঁর সাধনভূমি ছিল লাভপুর। ফলে পরে ফুল্লুরাপীঠের নাম হয়েছে অট্টহাস (মুখোপাধ্যায়: ২৩৪)।’

- “রায়বাড়ি” গল্পের জমিদার রাবণেশ্বর রায় কালীসাধক। বৃহৎ নাটমন্দির ও কর্তার নতুন মহালের নাম ‘হুদা-শ্যামপুর-কালী মায়ের নতুন মহাল’ থেকে এ-সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়। রায়-তারা-তারা উচ্চারণ করেছেন হুদা-শ্যামপুরের প্রজা শুনে। তাঁর মন্দিরটি দেবী মন্দির। ‘রায় কর্তা জপমালা লইয়া মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন— তন্ত্রমতে সন্ধ্যাতর্পণ জপ করিবেন।’ (১/৫৯৩) বীজনগর থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় আকস্মিক ঝড়ের তাড়নায় ময়ূরাক্ষী ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে ঘূর্ণিতে পড়ে বজরা ডুবিতে রায়গিনী ও পুত্র বিশ্বেশ্বর মৃত্যুবরণ করলে সেই সংবাদ কালী বাগদি কর্তাকে জানানোর পর লেখকের বর্ণনায়— ‘তারপর অন্ধকার স্তব্ধ রায়বাড়ি। গভীর রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করিয়া মধ্যে মধ্যে কালী মন্দিরের প্রাঙ্গণে রব উঠিতেছিল, তারা-তারা।’ (১/৫৯৮) দরিদ্র নরনারী বন্যার সময় আশ্রয় নেয়— কালীবাড়ি-গোবিন্দবাড়িতে। ফলে বোঝা যায় তান্ত্রিক-বৈষ্ণবের সহাবস্থান সম্পর্কে। (১/৬০০) লেখকের বাণী স্মরণীয়: ‘কাছারি পার হইয়া রাধাগোবিন্দজীর মন্দির, তাহার পর জগদ্ধাত্রীর বাড়ি, তাহার পর একেবারে গঙ্গার কূলের উপরেই রায় চৌধুরীদের কালীবাড়ি। গঙ্গা যখন কূলে কূলে পাথার হইয়া উঠে, তখন কালীবাড়ির বাঁধা ঘাটের প্রশস্ত চতুরের গায়ে গঙ্গার জল ছল-ছল করিয়া আঘাত করে। ভিতরে দক্ষিণমুখী মন্দিরের সম্মুখে সুবৃহৎ সুউচ্চ নাটমন্দির, নাটমন্দিরকে পরিবেষ্টন করিয়া তিন দিকে খিলানের বারান্দাযুক্ত সারি-সারি একতলা ঘর।’ (১/৫৯১) মন্দিরের ঠিক সামনেই দক্ষিণে বামে সুবৃহৎ দুই যূপকাঠ— অর্থাৎ বলি প্রচলিত ছিল। রাবণেশ্বর স্ত্রী পুত্রের মৃত্যুর পর সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে চেয়েছেন— এখানেও তার তান্ত্রিকতায় বিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে।
- “ট্রিটি” গল্পে বৈষ্ণবধর্মী ব্রাহ্মণবংশের সন্তান রাধাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ও শাক্তবংশের সন্তান কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের সংঘাতের চিত্র কৌতুকময় করে পরিবেশন করা হয়েছে। দুই ধর্ম গোষ্ঠী পারস্পরিক সহাবস্থানের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিরোধের বিষয়গুলো লেখক ব্যঙ্গাত্মকভাবে এই গল্পে উপস্থাপন করেছেন। দুই ধর্ম সম্প্রদায়ের আচরণ ও বিশ্বাসের চিত্র অঙ্কনে তারাশঙ্কর উদারতা দেখিয়েছেন। এই দুই চরিত্র উভয়েই উভয়ের ভগ্নিপতি অর্থাৎ উভয়েই উভয়ের শ্যালক (ভট্টাচার্য: ১৯৭)। “ট্রিটি” হাস্যরসাত্মক গল্প। এই শ্রেণির গল্পগুলিকে জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন— ‘আড়ষ্ট ও ম্রিয়মাণ’ (ভট্টাচার্য ৩৪)। ধর্ম ও ভক্তি শূন্য দুই চরিত্রের দ্বন্দ্ব কৌতুক সৃষ্টি করেছেন গল্পকার। কালীচরণ কারণসলিলে নিমজ্জমান ও রাধাচরণ গঞ্জিকাসেবনে ‘ব্যোমমাগী’। অথচ উভয় ধর্ম সম্প্রদায়ের মৌল বিরোধকে লেখক বাস্তবতায় তুলে ধরেন শত্রুভাব। ছাত্রজীবনে তাদের বন্ধুত্ব, প্রেম বিবাহ ও পরস্পর আত্মীয়তা প্রভৃতিই কৌতুককর। বলির বিরুদ্ধে রাধাচরণ, কালীচরণ বলির পক্ষে। দুজনই তাদের শিষ্যদের একে অপরকে প্রভাবিত ও উত্তেজিত করেছে কিন্তু মামলায় তারা ভগ্নিপতিদ্বয় লাভবান হয়েছে। শশিভূষণ দাশগুপ্ত যে দ্বন্দ্ব দেখেছেন তা এই গল্পে উপেক্ষিত :
 - বাঙলাদেশে শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের কথা সুপ্রসিদ্ধ। নবদ্বীপে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে দম্পতীক বিহীন পূজা, মঙ্গলচণ্ডীর গীতে জাগরণ এবং মদমাংস দিয়া বাসুলী পূজার উল্লেখ দেখিতে পাই। সেই পটভূমির উপরে বৈষ্ণবধর্মের জাগরণ। ফলে শাক্ত ধর্মের সহিত দ্বন্দ্ব-কলহ অনিবার্য। নবদ্বীপে এই দ্বন্দ্ব-কলহ বহুদিন পর্যন্ত চলিয়াছে। তাহার চিহ্ন আজিও বর্তমান। এখন পর্যন্তও বৈষ্ণবগণের একটি প্রধান উৎসব রাসযাত্রার পূর্ণিমা রাত্রিতে নবদ্বীপের প্রধান প্রধান রাস্তাগুলির তেমাথা-চৌমাথায় বিরাট বিরাট দেবীমূর্তি

প্রতিষ্ঠিত হইয়া মহাসমারোহে পূজিতা হন (দাশগুপ্ত ২২৩)।’ তবে এই দ্বন্দ্বের সমন্বয় দেখা যায় শাক্ত ও বৈষ্ণব কবিদের রচনায়। তারাশঙ্কর দ্বন্দ্বের সমন্বয় চেয়েছেন বিভিন্ন গল্পে।

- “ডাইনী” গল্পে গ্রামের প্রান্তে বুড়াশিবতলার কথা আছে। (২/২৪৫) বিতাড়িত ডাইনীর গ্রামে তারাদেবীর পূজা হয়। ‘বাকুলের তারাদেবীতলায় পূজার ঢাক বাজিতেছিল। জাগ্রত মা তারাদেবী; পূর্ণিমায় আগের প্রতি চতুর্দশীতে মায়ের পূজা হয়, বলিদান হয়। কিন্তু মা তারাও তাহাকে দয়া করেন নাই। কতবার সে মানত করিয়াছে মা, আমাকে ডাইনী হইতে মানুষ করে দাও। আমি তোমাকে বুক চিরিয়া রক্ত দিব। কিন্তু মা মুখ তুলিয়া চাহেন নাই।’ (২/২৪৮) ছাতিফাটা মাঠের পূর্বপ্রান্তে দলদলির জলা। এই জলাটার উপরেই রামনগরের সাহাদের আমবাগানে ডাকিনী-ভীষণ শক্তিশালিনী। নিষ্ঠুর ত্রুর এক বৃদ্ধা ডাইনী চল্লিশ বছর ধরে বাস করে। গ্রামবাসীর অন্ধ সংস্কার অপবিশ্বাসের জন্য একজন সাধারণ অনাথা মেয়ে ডাইনীতে পরিণত হয়। ক্রমাগত দোষারোপে ডাইনীর নিজের বিশ্বাস জন্ম নেয় সে ডাইনী- এই ডাইনীতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে তন্ত্রমন্ত্র ঝাড়ফুঁকের দ্বারা অসম্ভবকে সম্ভব করে। ওঝা, গুনিং এরা ডাকিনীদের দুষ্কর্মের প্রতিবিধান করে তন্ত্রমন্ত্রের দ্বারা। গুনিংয়ের মন্ত্রপ্রহারে ডাইনী আকাশ পথে যেতে যেতে গাছের ডালে বিদ্ধ হয়ে মরে। এই বিশ্বাস লোকাচার অপবিশ্বাস। গ্রামের অপবাদ যেমন সুরধুনীকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করায় তার অনাথা লোভী ক্ষুধার্ত অবস্থা ও পূর্বজন্মের পাপে তার ডাইনীত্ব। তারাদেবী তথা কালীমন্দিরে প্রার্থনা করেও তার প্রার্থনা পূরণ হয়নি। এ-গল্পের বাতাবরণে তারামন্দির ও গুনিংয়ের মন্ত্রতন্ত্রের কথায় শাক্ত অনুষ্ণ উন্মোচিত হয়েছে।

অজয়ের তীরে বৈষ্ণব আখড়ার সঙ্গে সঙ্গে শক্তি সাধনার পীঠস্থানও নদীতীরবর্তী অরণ্যে গড়ে উঠেছিল তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় “একরাত্রি” গল্পের পটভূমি উন্মোচনে। পটভূমিতে শক্তিদেবীর মন্দির ও তন্ত্রসাধনার স্থানে অজ্ঞাত পরিচয় প্রৌঢ় ও তরুণ- এই দুজন সন্ন্যাসীর যথাক্রমে পুত্র ও পিতাকে অন্বেষণের চলতি পথে আশ্রয়হীন হয়ে আশ্রয়স্থল হিসেবে পীঠস্থানে আকস্মিক সাক্ষাতের কেন্দ্র রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। দু’জনের কথোপকথনে ও কর্মকাণ্ডে পরিচয় উদ্ঘাটিত না হলেও এদেরই একজন পিতা রূপলাল ও অন্যজন যে পুত্র কার্তিক এটা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয়নি। তরুণ সন্ন্যাসী রূপলালের যৌবনের কথা ও প্রৌঢ় সন্ন্যাসী কার্তিকের বাল্যের কথা বলেছে। মানবিক প্রেম ও বাৎসল্য এই দুজনের গল্পে প্রাধান্য পেলেও “ছলনাময়ী” কিংবা “পুত্রোষ্টি”র মতো তন্ত্রসাধনার ভয়াল পরিবেশ এই গল্পের পরিণতিকে নিয়ন্ত্রণ করে নি। ভয়াল পরিবেশে জীবন বাসনার উগ্রপ্রখর রূপ এসেছে দুজনের কথোপকথনে। কিন্তু গল্পের শেষে পরস্পরের সন্ধানে আবার দুজন বের হয়। প্রৌঢ় দক্ষিণ দিকে সমুদ্র কিনারে চলল আন্দামান দ্বীপে কার্তিকের অন্বেষণে, আর তরুণ হিমালয়ের দিকে রূপলালের খোঁজে মূলত অজানার পথে পা বাড়ানোর মধ্যে দুই গঁজেল মাতাল সন্ন্যাসীর অন্তর আলোকিত হয়েছে।

এই গল্পে সমাজসংসার থেকে দূরে শ্মশানের ভয়াবহ রিক্ততার মধ্যে অরণ্যের সংসার দূরবর্তী নির্জনতায় পীঠস্থানকে ঘিরে গড়ে ওঠা নানা কিংবদন্তিকে আশ্রয় করে পটভূমি বিবৃত হয়েছে। লেখক বীরভূমের কঙ্কালীতলা, তারাপীঠ লাভপুর বক্রেস্বর প্রভৃতি শাক্ত পীঠের বাস্তব চিত্র অঙ্কন করেছেন। সংসার সমাজ থেকে দূরবর্তী শাক্ত মন্দিরের পটভূমি জীবনের অনিত্যতা ও ভয়ালতাকে উপস্থাপন করেছে।

“প্রহ্লাদের কালী” গল্পে নিম্নবর্ণের শাক্তরূপটি স্পষ্ট। কুলধর্মে ডাকাত প্রহ্লাদ ভুল্লা আঠারো বছর বয়সে শ্মশানবাসিনী মা কালীর মেয়ালদহড়ার জঙ্গলের সাধন ভজনরত ফৌজদার বাবা সাধুর একটি তলোয়ার যা দিয়ে ঠেঙো এক পায়ের সন্ন্যাসী পাঁঠা বলি দিত তা কুক্ষিগত করার জন্য কালী পূজা শুরু করে। ফৌজদার বাবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার পরও ডাকাত প্রহ্লাদকে তলোয়ার ছুঁতে নিষেধ করেছিলেন বাবা, কারণ কালী মায়ের কৃপায় মায়ের

কাছে বলি দেন এটি দিয়ে। কালী মায়ের কাজে ছাড়া কোনো কাজে তলোয়ারটি ব্যবহার করা যাবে না বলে সে কালীপূজো শুরু করে। ‘শেয়ালদহড়ার শ্মশানবাসিনী কালী, যিনি শিবের বুকের উপর সামনে ফিরে দাঁড়িয়ে আছেন’ তারই স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে সে কালীপূজো শুরু করে। এমনকি কালী প্রতিষ্ঠা করে। তলোয়ারটি ফৌজদার বাবা তাকে দান করেন। পূজোয় প্রতিমা পাওয়ার অনিশ্চয়তার মুখে রতিলালের কাছ থেকে কাঠামো বেঁধে নিয়ে সে নিজেই কালী প্রতিমা সম্পন্ন করে। কালী পূজার দিন অপরাহ্নে শিষ্য, বন্ধু ও বিবিধ উপকরণ এলে পূজা সম্পন্ন হয়। দীর্ঘ দিন হয়েছে ফৌজদার বাবার অস্ত্র দিয়ে বলি দানের। বর্তমানে ডাকাতি তার পেশা নয় বরং সে মদ ও গাঁজা বিক্রি করে। এরই মধ্যে কালী সেবা-তার কাজ। ঘোরভক্ত প্রহ্লাদ।

মা-কালী এসেছেন আজ কুড়ি বছর। অমাবস্যায় সংক্রান্তিতে সে বলিদান করেছে। ফৌজদার বাবার সিদ্ধ তলোয়ার। এই তলোয়ারে যখন বলি হয়, মা-কালীর জিভ লকলক করে। এই তলোয়ারের বলি নিতে তার ওই মা-কালীকে জাগতে হয়েছে। তার মা-কালী খেলার পুতুল নয়। এই তলোয়ার নিয়ে কখনও সে ডাকাতি করে নি। লাঠিই নিয়ে গিয়েছে। তারপর বোধ হয় দুবার সে ডাকাতি করেছে। আর না। সেই খতম। এই অস্ত্রখানা ধরতে পারে না বলেই ছেড়ে দিয়েছে। আঠারো বছরের মধ্যে ও-কাজ সে করেনি। চোলাই মদ বেচে খায়। চোরাই গাঁজা বিক্রি করে। ওই হাতিয়ার আর মা-কালী। মা-কালী আর ওই হাতিয়ার। কি হল তার কে জানে। স্ত্রীর নেশা, স্ত্রীলোকের নেশা, সংসারের নেশা- সব গেল। জয় মা-কালী। ভালই হয়েছে। সদানন্দময়ী কালী। (৩/১৭২)

প্রহ্লাদের কালী প্রতিমা থানার দারোগা জুতো পায়ে ছুঁয়ে দিলে সে প্রতিমাকে স্নান করিয়ে শুদ্ধ করেছে। সত্তর বছরের কাছাকাছি প্রহ্লাদের কালীপ্রীতি লেখক ভল্লী জীবনের ধর্মীয় অবস্থার চিত্রে তুলে ধরেছেন। ‘বিচিত্র প্রহ্লাদ। বিচিত্র তার পূজাপদ্ধতি এবং শাস্ত্র। সন্ধ্যাবেলায় সে ঢাকি ডেকে নিয়ে এল। বাজাও ঢাক। কালী-মা চামড়া ছোঁয়া পড়েছে। মা চান করতে যাবে।’ (৩/১৬৫) স্নানের পর ঢাকিকে বলেছে পরদিন সন্ধ্যায় কালীর পূজা হবে। ঢাক কাসি শিঙে সহযোগে আর ভোর বেলায় ধুমুল দিয়ে যাবে ঢাকি। আগামীদিনের পূজার চিন্তায় বিভোর প্রহ্লাদ : ‘কাল নূতন করে কালীমায়ের অঙ্গরাগ করে পূজো করে তারপর তোকে দেখাবে। কাল সমস্ত দিন কাজ, মা-কালীকে মেরামত করে, রোদে শুকিয়ে, না শুকায় তো আগুন জেলে সেকে শুকিয়ে রঙ দিতে হবে। তারপর পূজো। কলাগাছ চাই, ঘট চাই, সিঁদুর চাই, ডাব চাই, মিষ্টি চাই, চাল চাই, ডাল চাই, পাঁঠা চাই, কাঠ চাই, নুন-তেল-মসলা-আদা পেঁয়াজ, ফুল বেলপাতা- ফর্দ তার মুখস্থ। পাঁঠা, একটা ভাল পাঁঠা চাই। ওই সাতনা হাড়ীর একটা শিঙ-ভাঙা বড় পাঁঠা আছে। তার মা-কালীর সে-সব বাছা-বিচার নেই। শিঙ-ভাঙা, শেয়ালে ধরা, খুঁতো-এসব খুঁতখুঁতুনি নেই। বলি হলেই হল। তাজা রক্ত আর প্রচুর মাংস। পেঁয়াজও খায় তার মা-কালী।’ (৩/১৬৬)

প্রহ্লাদের পূজার উপকরণে তার ধর্মীয় জীবনের বাস্তব চিত্র উন্মোচিত হয়েছে। তবে ‘কালীই ডাকাতির উপাস্য দেবী (ভট্টাচার্য্য: ৩১)।’ কালী প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে তলোয়ারের লোভ কাজ করলেও শেষ পর্যন্ত প্রহ্লাদ কালী ভক্ত। তলোয়ারটি সে লুকিয়ে রাখে। কারণ তার অঞ্চলের নতুন ডাকাত সর্দার ঘনশ্যাম দাস এই তলোয়ারটি করায়ত্ত করতে চায়। সে পিস্তল হাতে প্রহ্লাদের আস্তানায় প্রবেশ করে। অস্ত্রটি জব্দ করেছে গুলি ছুঁড়ে। জানুতে গুলিবিদ্ধ প্রহ্লাদ অজ্ঞান হয়। জ্ঞান হলে সে বলেছে গুলি করেছে মা কালী। নাটকীয় পরিসমাপ্তি ঘটেছে গল্পের। ‘ফৌজদার বাবার হাত থেকে লোভের বশে সিদ্ধ তলোয়ারখানি কেড়ে নেওয়ার অপরাধবোধ তার মানসচৈতন্যে ক্রিয়াশীল ছিল। তাই তলোয়ারখানি হস্তান্তর হওয়া তার কাছে ইষ্টদেবীর অন্তর্ধানেরই প্রতীক (ভট্টাচার্য্য: ৩১)।’

প্রহ্লাদের ডাকাতি জীবন কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছিল। পিতার মতই দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল তরুণ বয়সে রায়বেশে নৃত্য পারদর্শী ছিল। প্রকাশ্য হত্যা, মারলুট করা ও লাঠিতে ভর দিয়ে ত্রিশ মাইল দ্রুত অতিক্রম করে পুলিশকে বোকা

বানিয়েছিল সে। ডাকাতির সময়েই তার কালী ভক্তির সূচনা। ডাকাতি ছেড়ে দিলে কালীকে সে সমস্ত বোধ বোধি বিশ্বাস ও ভক্তি দিয়ে আগলে রেখেছে। বয়সের কারণে সে ভক্তিশীল তবে নিবৃত্তিহীন। অন্ধ বিশ্বাস ও ভক্তিতে কালী পূজা করে সে। মদের ব্যবসা করে সে বর্তমানেও অপরাধ জগতের বাসিন্দা। কালী প্রতিমার নিচে গোখরো পোষা, লুকিয়ে রাখা তরবারি, পত্নী ও সন্তানদের অবহেলা কালীকে জুতা পায়ে স্পর্শ করায় শুদ্ধিকরণ পদ্ধতি এবং তার উদ্ভট পূজা পদ্ধতি সবই জীবন সংলগ্ন। ‘সব কিছুতেই একটা বলিষ্ঠ মানুষের, অনুশোচনাহীন মানুষের মূর্তি’ (সামাদী ২৭২)। নতুন ডাকাত ঘনশ্যামের কালীভক্তি নেই। কিন্তু পিস্তল থাকা সত্ত্বেও তলোয়ারটি নিতে বদ্ধপরিকর। প্রাক্তন ফৌজি ও বর্তমানে সন্ন্যাসীর বলি দেওয়ার তলোয়ার শত্রুনাশী যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েও সেটি প্রহ্লাদের হাতে আসে। প্রহ্লাদ থেকে নবীন ডাকাত সর্দার ঘনশ্যামের হাতে। ডাকাতির ঐতিহ্য পরম্পরা হয়। মূলত প্রহ্লাদ ভলার ডাকাতির জীবনে মা-কালীর আশ্রয় ও শেষে কালীমার বিদায় ও নতুন ডাকাত সর্দারের আবির্ভাব তার অতীতের উজ্জ্বল জীবন ও বর্তমানের ব্যর্থতার কাহিনী হিসেবে গুরুত্ববহ।

“সখী ঠাকরুন” গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র শক্তিসাধিকা। বীরভূমের প্রাচীন গ্রাম বিল্বগ্রামের দেবীর নাম বিল্ববাসিনী। কথিত আছে মদনভাস্মে হতমানিনী উমা, এখানকার এই বিল্বতলে এসে দুশ্চর তপস্যা শুরু করেন। তাঁর তপস্যায় আকৃষ্ট শিব এসে দ্বারপ্রান্তে ভিক্ষুনাথরূপে দাঁড়িয়ে আছেন, আর এই দেবস্থানে তপস্বিনী উমার আজ্ঞাবাহিনী এবং সকল কিছুর ভার নিয়ে রয়েছেন যিনি-তিনি জয়া-বিজয়ার মতোই তাঁর সখী। তিনিই এখানে সর্বময়ী। তিনি কুমারী ও তিনি ব্রহ্মচারিণী। তাঁরই নাম সখী ঠাকরুন। (৩/৮০৩)

বিল্বগ্রামের দক্ষিণে ময়ূরাক্ষীর দিকে বিল্ববাসিনীতলা, মায়ের স্থান। গাছপালায় ঘেরা, ২৫/৩০ বিঘা জুড়ে এলাকা আশ্রমের মতো। এর মধ্যে দুটো পুকুর বড় ছোট। পুকুর দুটোর মধ্যবর্তী স্থানটিতে দেবস্থল। একটি প্রশস্ত বাঁধানো বিল্বমূল হলো আসল দেবস্থল। তার পাশে একটি একতলা ঘরে দেবীর প্রস্তরময়ী মূর্তি সিঁদুরে তেলে লোহিতাঙ্কিনী। একটু দূরে শিবস্থান। ভিক্ষুনাথের আসন সামনের বাঁধানো চত্বরে যাত্রীরা বসে। পূজাপার্বণে উৎসব হয়। কতগুলো ঘর আশ্রমের কাজ করে। মাঠকোঠা রান্নাঘর, গোয়াল ঘর, চালা, দেবস্থানের এলাকা থেকে একটু দূরত্বে ৪/৫ দেবাংশীদের ঘর। অন্য কয়েক ঘর লোক ঠাকুরতলার কাজকর্ম করে। বিল্ববাসিনীকে পূজা দিলে বা তাঁর কাছে মানত করলে পলুপোকা বা রেশমকীট প্রতিপালনে আশ্চর্য ফল পাওয়া যায়। সখী ঠাকুরানী চিরকুমারী ও চিরযুবতী। ১৬ বছরে নিযুক্ত হয়ে যৌবন বিগত হলে নতুন সখী ঠাকুরানী নিযুক্ত করা হয়। এলোকেশী ১৬ বছর বয়সে নিযুক্তি পায়। এর পূর্বে শ্যামাদাসী ছিলেন। এলোকেশী হিতু দেবাংশীর মেয়ে। ঘনশ্যাম বিল্ববাসিনী তলার গরু-বাছুরের মাহিন্দার। ১৫/১৬ বছর বয়স। অর্থাৎ সমবয়সী। শ্যামার কুড়িয়ে পাওয়া সন্তান। তার মা দেবীর থানে মারা যায়। বর্তমানে এলোকেশীর ৪৪ বছর বয়স। ‘সাল ১৯৩৮। বিল্ববাসিনী পলুর কল্যাণ করেন- আর যুবতী নতুন বিয়ানো বউ-বেটীদের কল্যাণ করেন। তারা স্বামীর আদর পায় আর রূপে যৌবনে মেয়েরা ভরে ওঠে।’ (৩/৮১৩) সখী ঠাকরুন পদটি পুরোনো দিনের পীঠস্থান-সদৃশ মন্দিরের ভৈরবী পদের সঙ্গে মিল আছে (সামাদী ৩১৬)।

এ-গল্পে সখী ঠাকরুনের প্রথা, বিশ্বাস ও ধর্মীয় আচরণের অনুষ্ঠানের সঙ্গে একাত্ম করে এলোকেশীর জীবন কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কালের নিষ্ঠুর বিধানে যৌবন গত হয়েছে তার। জীবনের এই অনিবার্য ট্রাজিক বেদনা এলোকেশী চরিত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন গল্পকার।

তারাশঙ্করের উপন্যাসেও শাক্ত মতাদর্শে বিশ্বাসী চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। *ধাত্রীদেবতার* (১৯৩৯) রামজী সাধুর শাক্ত সন্ন্যাসী ও তান্ত্রিক চরিত্র, *আরোগ্য নিকেতনের* (১৯৫৩) জমিদার ও ব্রাহ্মণদের তন্ত্রচর্চা, *কীর্তিহাটের কড়চাঁর* (১৩৯৩-৯৬) শ্যামাচরণ, *অরণ্যবহিন্* (১৯৬৬) ত্রিভুবন ভট্টাচার্যের চরিত্রে এবং অন্যান্য কিছু চরিত্রের

নির্ভয় আচরণের পেছনে রয়েছে শাক্ত প্রভাব। ইন্দ্র রায় বিশ্বম্ভর রায় চরিত্রে শাক্ত আচার, দর্প, স্বর্গমর্ত্যের বৈষ্ণবের পুত্র দুলাল খ্যাপা মা'র আশ্রমের তান্ত্রিক বাগদি বুড়ার সান্নিধ্যে কৈশোর থেকেই অকুতোভয়, অবিনয়ী ও উদ্ধত। *আরোগ্য* নিকেতনের রংলাল ডাক্তারের আচরণ শবসাধকের মতো। কবর ও নদী থেকে মৃতদেহ উঠিয়ে এনে ময়ুরাঙ্গী তীরের নির্জন বাংলায় চিকিৎসাবিদ্যা রপ্ত করেন তিনি। বামাচারীর মতো আচার বিচারহীন, রুঢ় নির্ভুর সঙ্গী তাঁর খেয়াঘাটের মনা হাড়ি – শ্মশানবাসীর মতো ঘৃণা-ভয়-বিবমিষাশূন্য। মূলত 'বাঁকুড়া বীরভূমের মহাযান বজ্রযান সক্রিয় থাকায় বৈষ্ণব সহজিয়া ও তান্ত্রিক শাক্তধর্মের প্রসার হয় (মুখোপাধ্যায় ৩২৩)।'

তারাশঙ্করের পারিপার্শ্বিক ভূগোল ও তার সংলগ্ন মানুষের প্রতিফলন শাক্ত ভাবের গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে। রাঢ়ভূমির বিচিত্র লোকায়ত জীবনের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের শক্তি উপাসক ও উপাসনার প্রসঙ্গ তাঁর গল্পকে বাস্তবগন্ধী করে তুলেছে। তন্ত্র ও তান্ত্রিক সাধনার বাস্তবচিত্র তাঁর গল্পগুলোকে উচ্চ মাত্রায় উন্নীত করেছে।

তথ্যসূত্র

- গিরি, সত্যবতী। *তারাশঙ্করের কথাশিল্পে শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভাব*। *তারাশঙ্কর: সমকাল ও উত্তরকালের দৃষ্টিতে*, সম্পাদনা-
প্রবন্ধকুমার মুখোপাধ্যায়, রত্নাবলী, ১৯৯৯।
দাশগুপ্ত, শ্রী শশিভূষণ। *ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য*। সাহিত্য সংসদ, ১৩৮৭।
দেবতা, ধাত্রী। *তারাশঙ্কর রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড)। মিত্র ও ঘোষ, ১৩৮৬।
বিশ্বাস, মিল্টন। *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে নিম্নবর্ণের মানুষ*। বাংলা একাডেমি, ২০০৯।
ভট্টাচার্য, জগদীশ। *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ* (১ম খণ্ড)। ১৯৯৬।
ভট্টাচার্য, জগদীশ। *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ* (২য় খণ্ড)। ১৯৯৮।
ভট্টাচার্য, জগদীশ। *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ* (৩য় খণ্ড)। ১৯৯৭।
মুখোপাধ্যায়, রঞ্জিতকুমার। *তারাশঙ্কর ও রাঢ় বাংলা*। নবাব, ১৯৮৭।
মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ। *বীরভূম বিবরণ* (২য় খণ্ড)। ১৩২৬।
সামাদী, সফিকুল্লাহী। *তারাশঙ্করের ছোটগল্প : জীবনের শিল্পিত সত্য*। জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৪।

বৌদ্ধ দর্শনে কর্মতত্ত্ব এবং প্রাত্যহিক জীবনে কর্মের প্রভাব

ড. সুদীপ্তা বড়ুয়া *

প্রতিপাদ্যসার: বৌদ্ধদর্শনে কর্মবাদ একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।। জীব জগৎ কর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বিশেষ করে মানব জীবন। এই মতবাদ বৌদ্ধদর্শনের মূল ভিত্তি চতুরার্য সত্য ও প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে ব্যাখ্যাত। চারি আর্যসত্য যথা - দুঃখ, দুঃখ সমুদয়, দুঃখ নিরোধ ও দুঃখ নিরোধের উপায়- এই চারি আর্যসত্যের দ্বিতীয় আর্যসত্য ‘দুঃখ সমুদয়’ বা দুঃখের কারণ সত্য। দুঃখের কারণ জন্ম, জন্ম হলেই জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, প্রিয় বিচ্ছেদ, অপ্রিয় সংযোগ, পঞ্চোপদানস্কন্ধ দুঃখের উৎপত্তি। জন্মের কারণ তৃষ্ণা ও অবিদ্যা। অবিদ্যার কারণে জীব ভালোমন্দ, সত্যাসত্য জ্ঞানের অভাবে তৃষ্ণা বা কামনা বাসনায় আকৃষ্ট হয়ে কায়-বাক্য-মনো দ্বারে অকুশল কর্ম সম্পাদন করে, ফলে তাকে তার সৃষ্ট কর্মের ফল ভোগ করার জন্য পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয়।

আলোচ্য প্রবন্ধটি বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিতে করা হয়েছে। তথ্য উপাত্তগুলোতে প্রাথমিক উৎস এবং দ্বিতীয়িক উৎস ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক উপাত্তগুলো পালি ভাষায় লেখা, তবে সব গ্রন্থের বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদ রয়েছে। এছাড়া দ্বিতীয়িক উৎস হিসেবে ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ ব্যবহার করা হয়েছে। বস্তুতঃ বৌদ্ধদর্শনে কর্মতত্ত্ব একটি জটিল বিষয়। মানবজীবন কর্মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই নিয়ন্ত্রণ কী ভাবে হয়, প্রক্রিয়া কী, কর্মের শ্রেণিবিভাগ এবং কোনো কর্ম কখন এবং কীভাবে ফল প্রদান করে এবং প্রাত্যহিক জীবনে কর্মের প্রভাব কতটুকু প্রতিফলিত হয় তা বুদ্ধ কর্তৃক পিটকীয় গ্রন্থে বর্ণিত এবং বিভিন্ন পণ্ডিত গবেষকদের আলোচনার সূত্র নিয়ে আলোচ্য নিবন্ধে বৌদ্ধ কর্মতত্ত্বের পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বৌদ্ধ কর্মতত্ত্বের সপক্ষে যাঁরা যুক্তিসঙ্গত আলোচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে ভদন্ত নাগসেন ও গ্রীকরাজ মিলিন্দার কথোপকথন, জ্যোতি:পাল মহাথের, ড. সুকোমল চৌধুরী, Na-Rangsi, Payutto Bhikkhu P.A প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

ভূমিকা :

বৌদ্ধদর্শনে কর্মতত্ত্ব একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। মানবজাতির অস্তিত্বের বিকাশ থেকে মানবগণ চেষ্টা করে আসছে মানবে মানবে এত বৈষম্য কেন? কেউ ভোগ ঐশ্বর্যে আকর্ষণ নিমজ্জিত, আবার কেউ নিদারুণ দারিদ্রের মধ্যে সীমাহীন দুর্বিষহ জীবন কাটায়, কেউ স্বাস্থ্যবান, কেউ রুগ্ন, কেউ বুদ্ধিমান, কেউ বোকা, কেউ সুন্দর, কেউ কুৎসিত, কেউ গুণী, কেউ মূর্খ, কেউ সুখী, কেউ দুঃখী এই বৈষম্যের কারণ কী? এর কারণ খুঁজতে গিয়ে বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে, বিভিন্ন ধর্মমতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। কারো কারো মতে কোনো অদৃষ্ট সৃষ্টিকর্তা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী এই বৈষম্য সৃষ্টি করেছেন। আবার কারো কারো মতে এ বৈষম্য জগতে স্বাভাবিক গতি। বৌদ্ধদর্শন কিন্তু এ বৈষম্যের কারণ সম্পর্কে একটি যুক্তিসঙ্গত সর্বজনগ্রাহ্য ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। এ প্রক্রিয়াকে বলা হয়

* সহযোগী অধ্যাপক, পালি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

‘কর্মতত্ত্ব’। কর্মকে মানসিক কার্য-কারণ বিধি বলা যায়। কর্মের অনুসিদ্ধান্ত হলো পুনর্জন্ম। কর্ম এবং পুনর্জন্ম পরস্পর পরিপূরক। বুদ্ধ পূর্ব যুগেও কর্ম ও পুনর্জন্ম সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণা ও বিভিন্ন মতবাদ প্রচলন ছিল। কিন্তু বুদ্ধই সর্বপ্রথম এই মতবাদের একটি যুক্তিগ্রাহ্য বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

‘কর্ম শব্দের অর্থ’

সংস্কৃত শব্দ ‘কর্ম’-কে পালি ভাষায় ‘কম্ম’ বলা হয়। ক + মন থেকে কর্ম শব্দের উৎপত্তি। কর্ম বা কম্ম শব্দের আভিধানিক অর্থ কাজ, ক্রিয়া, কর্তব্য, বৃত্তি, যা করা হয়, কার্য (Mahathera 78) ইত্যাদি। কর্ম হলো কর্তা যা করে তাই কর্ম। বৌদ্ধদর্শনে কর্মের সংজ্ঞা আরো বিস্তৃত এবং বহুমাত্রিক। বৌদ্ধদর্শনে কর্ম বলতে কর্তার কায়িক, বাচনিক ও মানসিক ইচ্ছাকৃত ভালো-মন্দ যে কোনো কাজকে বুঝায়। এখানে ‘কর্ম’-র মূল উৎস হলো কর্তার ‘মন’। কায়-বাক্য হলো এর অনুষ্টি। বুদ্ধ ‘অঙ্গুত্তর নিকায়’ গ্রন্থে বলেছেন, ‘চেতনাং ভিক্ষবে কম্মং বদামি, চেতযিত্তা কম্মং করোতি কামেন, বাচায়, মনসা একায চেতনায় এক পটিসকিং’ (করণাবংশ ভিক্ষু ৩০২)।

অর্থাৎ হে ভিক্ষুগণ! আমি ইচ্ছা বা চেতনাকেই কর্ম বলি, ইচ্ছা প্রণোদিত বা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে কায়, বাক্য এবং মনের দ্বারা কর্ম সম্পাদন করে। একটি চেতনা একটি প্রতিসন্ধি।

কর্ম সম্পন্ন করতে মনের ভূমিকা মুখ্য। চিত্ত বা মন যখন অরক্ষিত থাকে তখন কায় অরক্ষিত থাকে, বাক্য অসংযত থাকে, চিন্তাও থাকে অসংযত। পক্ষান্তরে চিত্ত যখন সুরক্ষিত থাকে তখন কায়-বাক্য-চিত্ত থাকে সুরক্ষিত। সেজন্য বুদ্ধ বলেন, মন হলো সমস্ত ভালো এবং খারাপ অবস্থার পূর্বগামী (পূর্বসূরী)। কেউ যদি অকুশল চিন্তে কোনো কথা বলে বা কাজ করে তাহলে দুঃখ শকটের চাকা যেমন ভারবাহী বলীবর্দের পদানুসরণ করে আবর্তিত হয়, তেমনি দুঃখও তাকে অনুসরণ করে। আর যদি কেউ প্রসন্ন মনে বা কুশল চিন্তে কথা বলে বা কাজ করে তাহলে সুখ তাকে ছায়ার মত অনুসরণ করে।^১ অতএব কর্ম বলতে মন বা চিত্ত দ্বারা যা চিন্তন বা মনন করা হয় এবং চিত্ত প্রসূত কায়িক ও বাচনিক ভালো মন্দ কুশলাকুশল প্রতিক্রিয়াকে বোঝায়।

কর্ম ও বিপাক

কর্ম হলো কাজ এবং বিপাক হলো কাজের ফল, পরিণতি বা পরিণাম। কর্ম যদি কুশল হয় বিপাকও কুশল বা ভালো হয় আর কর্ম যদি অকুশল হয় তাহলে বিপাকও অকুশল বা খারাপ হয়। কর্মের - এ বিধান অখণ্ডনীয়। কর্ম ও বিপাককে বস্তুর ছায়ার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। প্রতিটি বস্তুর যেমন ছায়া থাকে, তেমন প্রতিটি কর্মের বিপাক থাকে। ছায়া যেমন বস্তুকে অনুসরণ করে তেমন বিপাকও কর্মকে অনুসরণ করে। কর্ম থেকে কর্ম বিপাকের উৎপত্তি। কর্ম ও বিপাক সম্পর্কে আচার্য বুদ্ধঘোষ *বিশুদ্ধিমাগ* গ্রন্থে বলেন,

Kamma-result proceeds from kamma, Result has kamma for its source, Future becoming springs from kamma, And this is how the world goes round (Translated by Nonamoli Bhikkhu).

উপযুক্ত সময় ফল প্রদানই কর্মের অন্তর্নিহিত শক্তি। সত্ত্বগণ কুশলকর্মের ফলস্বরূপ ইহজীবনে উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি, সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু প্রভৃতি লাভ করে, আবার অকুশল কর্মের কারণে দারিদ্র্যতা, কুৎসিত রূপ, অল্পায়ু প্রভৃতি ভোগ করে (চৌধুরী ১২৭)। কর্ম ও বিপাককে বুদ্ধ বীজ ও ফল এর সাথে তুলনা করেছেন -

যাদিসং বপতে বীজং, তাদিসং হরতে ফলং, কল্যাণকারী কল্যাণং, পাপকারী চ পাপকং (সংযুক্ত নিকাযো, পঠমো ভাগো ১৮৭) ।

অর্থাৎ যেমন বীজ বপন করবে তেমন ফল ভোগ করবে, কল্যাণকারী মঙ্গল ফল এবং পাপী অমঙ্গল ফল ভোগ করে ।

কর্মের কারণ

মানুষের জীবন হচ্ছে কর্মময় । কর্মহীন মানুষ এক মুহূর্তও থাকতে পারে না । এ কর্ম সংঘটিত হয় দুটি কারণে । প্রথম ও প্রধান কারণ অবিদ্যা এবং দ্বিতীয় কারণ তৃষ্ণা । অবিদ্যাচ্ছন্ন মানুষ তৃষ্ণার বশবর্তী হয়ে প্রতিনিয়ত কুশলাকুশল কর্ম সম্পাদন করে । যার ফলস্বরূপ জন্মজন্মান্তর দুঃখ ভোগ করে ।

অবিদ্যা ও তৃষ্ণা হলো সমস্ত অকুশল কর্মের কারণ । কুশল কর্মকেও কর্ম নামে অভিহিত করা হয় । কেননা কুশল কর্মের মূল অলোভ, অদ্বेष ও অমোহ হলেও এরূপ কর্মে অবিদ্যা ও তৃষ্ণা বিদ্যমান থাকে । শুধুমাত্র লোকোত্তর মার্গচিহ্নে কোনো কিছু করা হলে তাকে কর্ম বলা যায় না । কারণ এরূপ কর্ম অবিদ্যা ও তৃষ্ণা ধ্বংসের জন্য নিযুক্ত হয় (চৌধুরী ১২৬) ।

কর্মের অবস্থান

মানুষ যে কুশলাকুশল কর্ম সম্পাদন করে তা শরীরে বা শরীরের বাইরে কোনো অংশে সঞ্চিত থাকে না । কেননা বৌদ্ধ দর্শন মতে জীব হচ্ছে পঞ্চস্কন্ধের (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান) সমষ্টি । পঞ্চস্কন্ধের সমন্বয়ে গঠিত সতত পরিবর্তনশীল দেহের ভিতরে বা বাইরে কোথাও কোনো পাত্র বা ভাণ্ড নেই যেখানে কর্ম সঞ্চিত থাকে । তাহলে মানুষের কৃত কর্মগুলো কোথায় অবস্থান করে ? এ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাওয়া যায় রাজা মিলিন্দ ও ভদন্ত নাগসেনের কথোপকথনে (ধর্মার্থার মহাস্থবির ৭৮) ।

রাজা মিলিন্দ জিজ্ঞেস করেন, ভন্তে নাগসেন! নাম-রূপ দ্বারা কৃত কর্মরাশি কোথায় অবস্থান করে? উত্তরে ভদন্ত নাগসেন বলেন, মহারাজ! ভালো-মন্দ কর্মরাশি অপরিত্যাগিনী ছায়ার মত অনুসরণ করে ।

রাজা মিলিন্দ আবার প্রশ্ন করেন, ভন্তে! কৃত কর্মসমূহ কী দেখতে পারা যায়? এখানে বা সেখানে অবস্থান করছে, এরূপ বলা যায় কী?

উত্তরে নাগসেন বলেন, মহারাজ! কর্মসমূহ এভাবে দেখা যায় না । যেসব বৃক্ষের ফল এখনও ফলেনি সেসকল বৃক্ষের ফলগুলো এখানে কিংবা সেখানে আছে –এভাবে যেমন দেখানো যায় না, অনুরূপ মানবের জীবন প্রবাহে কৃতকর্মসমূহকে এখানে বা সেখানে দেখতে পারা যায় না ।

কর্মের কারক

মানুষের কৃত কর্মের কারক বা কর্তা কে? কে কর্মের ফল ভোগ করে? এসব গূঢ় প্রশ্নের উত্তরে আচার্য বুদ্ধঘোষ *বিজ্ঞানমাগ* (রেবতপ্রিয় বড়ুয়া ৭৪৬) গ্রন্থে বলেন, কাম্মস কারকো নথি বিপাকস্ চ ভেদকো, সুদ্ধধম্মা পবত্ততি এবে তং সম্মাদস্সনং ।

– পরমার্থতঃ ভালো-মন্দ কর্মের কর্তা ও বিপাকের ভোক্তা নেই। ক্ষণ বিধ্বংস জড়-চেতনময় ধর্মপ্রবাহ কর্ম ও কর্মফলরূপে চলছে। বৌদ্ধদর্শনে এটাই সম্যকদর্শন।

সমস্ত কিছু কর্মনিয়ন্ত্রিত কিনা?

বুদ্ধ কর্মকে সত্ত্বদের সুখ-দুঃখের মূল কারণ বলে উল্লেখ করলেও তিনি একথা স্বীকার করেননি যে, জগতের সমস্ত কিছু কর্ম নিয়ন্ত্রিত। ক্ষেত্র বিশেষে সব কিছু কর্ম নিয়ন্ত্রিত নয় একথা বুদ্ধ স্বীকার করেছেন। কর্তা সুখ-দুঃখ, অসুখ-দুঃখ যাই অনুভব করে তার জন্য কর্ম দায়ী – এরূপ ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে বুদ্ধ দৃষ্ট কণ্ঠে বলেন,

So, then, owing to previous action, men will become murderers, thieves, unchaste, liars, slanderers, abusive, babblers, covetous, malicious and perverse in view. Thus for those who fall back on the former deed as the essential reason, there is neither desire to do, nor effort to do, nor necessity to do this deed or abstain from that deed. (woodward 157)

সব কিছু কর্ম নিয়ন্ত্রিত হলে সত্ত্বরা কখনো কর্মজাল থেকে মুক্ত হতে পারত না। পূর্ব জন্মের কারণে যদি পরবর্তী জন্মে একই ফল লাভ করত তাহলে মন্দ লোক মন্দ হয়ে, চোর চোর হয়ে, খুনী খুনী হয়ে কিংবা ধার্মিক ধার্মিক হয়ে জন্ম গ্রহণ করত। সত্ত্বরা চাইলে পূর্ব জন্মে কৃত অকুশল কর্মের ফল পরবর্তী জীবনে স্বীয় প্রচেষ্টায় দান, শীলাদি তথা সৎকর্ম সম্পাদন করে ভবিষ্যৎ এবং পরজীবন সুন্দর করতে পারে। পূর্বকর্ম যদি সম্পূর্ণভাবে বর্তমান জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে বৌদ্ধ ‘কর্মনিয়ম’ অদৃষ্টবাদে কিংবা নিয়তিবাদে পর্যবসিত হতো। বৌদ্ধদর্শনে নিয়তিবাদের বা অদৃষ্টবাদের স্থান নেই (চৌধুরী ১২২)।

বৌদ্ধ দর্শন মতে জগতের জাগতিক ঘটনা প্রবাহের জন্য কর্ম নিয়মের সাথে আরো অন্যান্য নিয়ম দায়ী থাকে, যা সত্ত্বদের সঙ্গে নানান কারণে অনুষঙ্গী। বৌদ্ধদর্শন জগতের এ ঘটনা প্রবাহকে ‘নিয়ম’ নামে অভিহিত করে। অভিধর্ম মতে, জড় ও চেতন রাজ্যে সমস্ত ঘটনা প্রবাহের জন্য পাঁচটি নিয়ম রয়েছে। যা ‘পঞ্চনিয়াম ধম্ম’ নামে অভিহিত।

নিয়মগুলো হলো - ১. ঋতু নিয়ম, ২. বীজ নিয়ম, ৩. কর্ম নিয়ম ৪. অর্থ নিয়ম - ৫. চিত্ত নিয়ম (Ledi 103)

মানুষে মানুষে বৈষম্যের কারণ

সভ্যতার চরম শীর্ষে পৌঁছেও বিশ্বে সমতা বা সাম্যের কথা যতই বলা হোক না কেন, মানুষের মধ্যে দেখা যায় নানা প্রকারের বৈষম্য। এ অসমতা শুধুমাত্র ধনী-গরীবের মধ্যে সীমাবদ্ধ তা নয়। এ বৈষম্যের মধ্যে আছে সুন্দর-কুৎসিত; সুস্থ-অসুস্থ; দীর্ঘায়ু-অল্পায়ু; সাধু-অসাধু; নির্বোধ-তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান। মানব সভ্যতার সৃষ্টিলাগ্ন হতে এ বৈষম্য বিদ্যমান। যা বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। জগতে এ বৈষম্য দেখে (খ্রি.পূ. ৬ষ্ঠ শতকে) শুভ মানব নামক জনৈক যুবক বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে বৈষম্যের কারণ জিজ্ঞেস করেন, হে গৌতম, কি কারণে মানুষের মধ্যে হীনতা ও উৎকর্ষতা দেখা যায়? মানুষের মধ্যে কেউ অল্পজীবী, কেউ দীর্ঘজীবী ; কেউ দুর্বল দেহের অধিকারী, কেউ সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী ; কেউ কুৎসিত, কেউ সুশ্রী ; কেউ সামর্থ্যহীন, কেউ সামর্থ্যবান ; কেউ গরীব, কেউ ধনী ; কেউ নিম্নজাত, কেউ উচ্চজাত ; কেউ নির্বোধ, কেউ বুদ্ধিমান। (মধ্যম নিকায়, তৃতীয় ভাগ, চুল্লকর্ম বিভাগ)

উত্তরে বুদ্ধ বললেন,

কম্মসুসকা মাণব, সত্তা কম্মদাযাদা কম্মযোগী কম্মবন্ধু কম্মপটিসরণা। কম্মং সত্তে বিভজতিযদিদং -
হীনপ্পণীততাতাতি।

অর্থাৎ হে মাণবক! কর্ম সত্তাদের স্বকীয়, তারা কর্মের উত্তরাধিকারী, কর্মই প্রতिसন্ধিকারক, কর্মই বন্ধু, কর্মই
আশ্রয়স্থল, কর্মই সত্তগণকে হীন এবং উচ্ছে বিভাজিত করে।

এ সূত্রে বুদ্ধ মানুষের মধ্যে বিভিন্ন বৈষম্যের কারণ হিসেবে কর্মকে নির্দেশ করেছেন। সত্তগণ যে স্ব স্ব কৃতকর্মের
জন্যই সুখ-দুঃখের অংশীদার – এটাই তিনি ব্যক্ত করেন।

কর্মের ত্রিধার

সত্তাদের জীবন কর্মবহুল। কর্ম ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না। গভীর নিদ্রা ছাড়া স্বপ্নে, জাগরণে বা তন্দ্রা অবস্থায়
সকলেই কর্ম সম্পাদন করে। প্রতিমুহূর্তে কুশল-অকুশল এবং নিরপেক্ষ কর্ম সম্পাদন করা সত্তাদের ধর্ম। এ
কর্মসমূহ সম্পাদন করে তিনটি দ্বার -এর মাধ্যমে, যা বৌদ্ধদর্শনে ‘ত্রিধার’ নামে অভিহিত। এ ত্রিধার হলো

১. কায় দ্বার

২. বাক্য দ্বার

৩. মনো দ্বার

১. কায় দ্বার - কায় দ্বারা যেসব কর্ম সম্পন্ন করা হয় তাকে কায় দ্বার বলে। কায় দ্বারে তিন (৩) রকমের কর্ম
সম্পাদিত হয়। যেমন- হত্যা, চুরি, ব্যভিচার করা বা হত্যা, চুরি, ব্যভিচার থেকে বিরত থাকা।

২. বাক্য দ্বার- বাক্যের সাহায্যে যেসব কর্ম সম্পন্ন হয় তাকে বাক্য দ্বার বলে। বাক্য দ্বারে চার (৪) রকমের কর্ম
সম্পাদিত হয়। যেমন- মিথ্যা বাক্য, পিণ্ডন বাক্য, ভেদ বাক্য, বৃথা বাক্য বলা, বা সত্য বাক্য, মিলনার্থক বাক্য,
মধুর বাক্য ও অর্থপূর্ণ বাক্য বলা।

৩. মনো দ্বার - মন বা চিত্তের সাহায্যে যেসব কর্ম সম্পন্ন হয় তাকে মনো কর্ম বলে। মনো দ্বারে তিন (৩)
রকমের কর্ম সম্পাদিত হয়। যেমন- লোভ, দ্বেষ, মোহ এবং অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ কর্ম মনের মাধ্যমে
সম্পাদিত হয়।

অতএব কায়িক, বাচনিক ও মানসিক কর্মসমূহ সম্পাদন করার সময় নিজের চিত্ত ও চিত্তবৃত্তিসমূহ সর্বক্ষণ
মনোনিবেশের মাধ্যমে অকুশল বৃত্তিসমূহ ত্যাগ এবং কুশল বৃত্তিসমূহকে গ্রহণ করতে হবে। যথাযথ বিচার
বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে যা শুভ, মঙ্গলজনক তা-ই গ্রহণ ও অনুশীলন করতে হবে। এতে করে মানুষের সৎ
প্রবৃত্তিসমূহের যেমন-অলোভ, অদ্বেষ, অহিংসা, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা প্রভৃতির বিকাশ ঘটে এবং অসৎ
প্রবৃত্তিসমূহ তিরোহিত হয়।

কর্মের শ্রেণী বিভাজন

কর্ম প্রধানত তিন প্রকার। যথা - ১. কুশল কর্ম, ২. অকুশল কর্ম এবং ৩. অব্যক্ত কর্ম।

১. **কুশল কর্ম** - ‘কুশল’ শব্দের অর্থ ভালো, সৎ, পুণ্য, ন্যায়, প্রশংসনীয়। কুশল অর্থ দাঁড়ায় পুণ্যকার্য, প্রশংসনীয় কার্য। যে কর্ম নিজের এবং চারপাশে বসবাসরত সবার জন্য মঙ্গলকর, কল্যাণজনক, সুখকর হয় সে কর্ম কুশল কর্ম।

২. **অকুশল কর্ম** - ‘অকুশল’ শব্দের অর্থ হলো পাপ, অপুণ্য, অসৎ কার্য। তাহলে অকুশল কর্মের অর্থ দাঁড়ায় অপুণ্য কার্য, পাপ কার্য। যে কর্ম নিজের এবং চারপাশে বসবাসরত সবার জন্য অশুভ ও অমঙ্গলকর হয়, সে কর্ম অকুশল কর্ম।

৩. **অব্যক্ত কর্ম** - কুশল-অকুশল কর্ম ছাড়া যে কর্ম সম্পাদনে কোনো পাপও হয় না পুণ্যও হয়, সে কর্মকে অব্যক্ত বা নিরপেক্ষ কর্ম বলা হয় (ব্রহ্মচারী ৩৭)।

মধ্যম নিকায়ের ‘কুষ্করবতিক সূত্র’ অনুসারে কর্ম চার প্রকার। যথা: ১. কৃষ্ণ কর্ম, ২. শুক্ল কর্ম, ৩. কৃষ্ণ-শুক্ল কর্ম এবং ৪. অকৃষ্ণ-অশুক্ল কর্ম (ধর্ম্মাধার মহাস্থবির ৪৬-৫০)।

১. **কৃষ্ণ কর্ম** - যে কর্ম কর্তা হিংসায়ুক্ত চিন্তে কায়িক, বাচনিক ও মানসিক দ্বারে সম্পন্ন করে তাকে কৃষ্ণ কর্ম বলে।

২. **শুক্ল কর্ম** - যে কর্ম কর্তা অহিংস চিন্তে কায়িক, বাচনিক ও মানসিক দ্বারে সম্পন্ন করে তাকে শুক্ল কর্ম বলে।

৩. **কৃষ্ণ-শুক্ল কর্ম** - যে কর্ম হিংসা-অহিংসা চিন্তে কায়িক, বাচনিক ও মানসিক দ্বারে সম্পন্ন হয় তাকে কৃষ্ণ-শুক্ল কর্ম বলে।

৪. **অকৃষ্ণ-অশুক্ল কর্ম** - যে কর্ম সম্পাদনে শুভ-অশুভ কোনো প্রকার ফল দান না করে কর্ম ক্ষয়ে সংবর্তিত হয় তাকে অকৃষ্ণ-অশুক্ল কর্ম বলে।

কৃত্যানুসারে কর্ম - কৃত্যানুসারে কর্ম চার প্রকার। যথা - ১. জনক কর্ম, ২. উপস্তুভক কর্ম, ৩. উপপীড়ক কর্ম এবং ৪. উপঘাতক কর্ম

১. জনক কর্ম

যে কর্ম কেবল প্রতিসন্ধি বা পুনর্জন্ম দেয়, জীবন প্রবাহে কোনো প্রকার ফল বা বিপাক প্রদান করে না, তাকে জনক কর্ম বলে। উদাহরণ স্বরূপ- একজন মা সন্তান প্রসব করার পর ধাত্রীকে সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব দিলেন। এখানে ‘মা’ হলো জনক কর্ম (জিনবংশ মহাস্থবির ২০৭)।

জনক কর্ম কুশল-অকুশল ভেদে দু’প্রকার। মরণাপন্ন ব্যক্তি ইহজীবনে যদি কোনো কুশল কিংবা অকুশল গুরুকর্ম সম্পন্ন করে তাহলে সেই গুরু কর্মই তার জনক কর্ম। আর গুরু কর্মের অভাবে আসন কর্মই জনক কর্ম নির্বাচন করে (শুভ্রা বড়ুয়া ৫৮৩)।

২. উপস্তুক কর্ম

উপস্তুক শব্দের অর্থ উপকারী, সাহায্যকারী বা সহায়তাকারী। যে কর্ম জনক কর্মকে সহায়তা করে, তাকে উপস্তুক কর্ম বলে (জগন্নাথ বড়ুয়া ২৪১)। জীবের গর্ভধারণের ক্ষণ হতে মৃত্যু পর্যন্ত উপস্তুক কর্ম জনক কর্মকে সাহায্য করে। উপস্তুক কর্ম কুশল ও অকুশল ভেদে দু'প্রকার। কুশল উপস্তুক কর্ম জীবকে সুখ এবং অকুশল উপস্তুক কর্ম জীবকে দুঃখ, দুর্ভোগ প্রদান করে (চৌধুরী ১৩৭)।

৩. উপপীড়ক কর্ম

বাধাদানকারী বা উৎপীড়নকারী কর্ম। যে কর্ম অন্য কর্মকে ফল প্রদানে বাধা দেয় বা ফলকে দুর্বল করে তা উপপীড়ক কর্ম। পড়ালেখায় মনোযোগী ছাত্রের পড়াশুনা যদি অসৎ সঙ্গের সংস্পর্শে পড়ে বিঘ্নিত হয়, তাহলে এখানে অসৎ বন্ধুরা হলো ভালো ছাত্রের উপপীড়ক। কুশল উপপীড়ক কর্ম অকুশল উপস্তুককে এবং অকুশল উপপীড়ক কর্ম কুশল উপস্তুককে বাধা দেয়। উপপীড়ক কর্ম উপস্তুক কর্মের বিপরীত। উপস্তুক কর্ম কর্মের অনুকূলে এবং উপপীড়ক কর্ম কর্মের প্রতিকূলে ফল দেয় (জ্যোতি:পাল মহাথের ২৫)।

৪. উপঘাতক কর্ম

যে কর্ম অন্য দুর্বল কুশল-অকুশল কর্মের বিপাককে উচ্ছেদ করে নিজে আধিপত্য বিস্তার করে তাই উপঘাতক কর্ম। উপঘাতক কর্ম বিপরীত জাতীয় জনক কর্মকে সমূলে ধ্বংস করে নিজের প্রভাব প্রতিষ্ঠা করে। উপপীড়ক কর্মের ন্যায় উপঘাতক কর্মও কুশল কর্মের ফল প্রদানের সময় অকুশল কর্মের বিপাক দেওয়া এবং অকুশল কর্মের ফল প্রদানের সময় কুশল কর্মের ফল দেওয়া - এর কাজ। তবে এক্ষেত্রে উপপীড়ক কর্ম শুধু বিপরীত জাতীয় জনক কর্মকে ফল প্রদানে বাধা দেয় বা দুর্বল করে, আর উপঘাতক কর্ম কিন্তু বিপরীত জাতীয় জনক কর্মকে বিনাশ করে নিজে প্রভাব বিস্তার করে (জ্যোতি:পাল মহাস্থবির ২৭)। আয়ু ও কর্ম উভয় থাকা সত্ত্বেও উপঘাতক কর্ম সত্ত্বদের আকস্মিক মৃত্যু ঘটায়। যেমন- দুর্বলের হাতে মৃত্যু, অকস্মাৎ বজ্রপাতে মৃত্যু, দুর্ঘটনায় মৃত্যু ইত্যাদি উপঘাতক কর্মের বিপাক।

প্রতিসন্ধিক্ষণে ফল প্রদানের পর্যায় অনুসারে কর্ম চার প্রকার। যথা- ১. গুরু কর্ম, ২. আসন্ন কর্ম বা মরণাসন্ন কর্ম, ৩. আচরিত কর্ম এবং ৪. উপচিত কর্ম।

১. গুরু কর্ম

যে কর্ম অন্যান্য কর্মের তুলনায় (বিপাক প্রদানের ক্ষেত্রে) গুরুতর, সাংঘাতিক, মারাত্মক তা-ই গুরু কর্ম। কুশল-অকুশল ভেদে গুরুকর্ম দু'প্রকার। কুশল গুরু কর্মকে মহদগত কর্ম এবং অকুশল গুরু কর্মকে আনন্তরিক কর্ম বলা হয়।

গুরু কর্ম এতটাই শক্তিশালী যে, এ কর্ম বর্তমান থাকলে অন্যান্য কুশল-অকুশল সমস্ত কর্মকে ফল প্রদানে নিষ্ফল করে দেয়। এ কর্মের ফল অমোঘ (জিনবংশ মহাস্থবির ২০৫)। এটি (ক) কুশল ও (খ) অকুশল ভেদে দু'প্রকার। যথা

ক. কুশল গুরু কর্ম

নির্বাণ লাভের জন্য সাধককে ধ্যান-সাধনা করতে হয়। এই ধ্যান সাধনার সর্বমোট নয়টি স্তর আছে। ধ্যানের মাধ্যমে সাধক যখন অষ্ট সমাপত্তি স্তর অতিক্রম করে নবম স্তরে উন্নীত হন, তখন তিনি পরম সুখ নির্বাণ লাভে সক্ষম হন। চিত্ত নবম স্তরে উন্নীত হবার পূর্বে যদি সাধকের মৃত্যু হয়, তাহলে মৃত্যু মুহূর্তে ধ্যানচিত্ত যে স্তরে অবস্থান করে সে স্তরের শক্তি অনুযায়ী জনক কর্মরূপে অব্যবহিত পরবর্তী জন্মকে পরিচালিত করে। জনক কর্মরূপে ফল প্রদানকারী অষ্ট সমাপত্তির অন্যতম স্তর স্থিত এই ধ্যান চিত্তই কুশল গুরুকর্ম নামে অবিহিত (রণধীর বড়ুয়া ৪১)।

খ. অকুশল গুরু কর্ম

অকুশল কর্মসমূহের মধ্যে যে কর্মসমূহ সবচেয়ে নিকৃষ্ট, অপকৃষ্ট, জঘন্য, যে কর্মের সাথে অন্য কোনো কর্মের তুলনা হয় না, তাই অকুশল গুরুকর্ম। অকুশল গুরুকর্ম পাঁচ প্রকার। যথা- ১. মাতৃ হত্যা, ২. পিতৃ হত্যা, ৩. অর্হৎ হত্যা, ৪. দ্বেষ চিন্তে বুদ্ধের দেহ হতে রক্তপাত, ৫. সংঘভেদ। কেউ যদি এ কর্মসমূহের মধ্যে যে কোনো একটি কর্ম সম্পাদন করে, তাহলে সে মৃত্যুর অব্যবহিত পরজন্মে অবীচি নিরয়ে জন্ম গ্রহণ করে। (জ্যোতি:পাল মহাস্থবির ৩৫)।

২. আসন্ন কর্ম

মৃত্যুর পূর্বক্ষণে মানুষের মনে কুশল-অকুশল কর্মসমূহের মধ্যে যে কর্মের কথা চিন্তে উৎপন্ন হয়, তাই আসন্ন কর্ম। এ আসন্ন কর্ম মরণাপন্ন ব্যক্তির পরবর্তী জন্মের জন্ম-রূপ ফল প্রদান করে থাকে। এ কর্ম অন্তিমক্ষণে সর্বশেষ মনঃকর্ম (জবন চিত্ত) বলে ‘আসন্ন কর্ম’ নামে খ্যাত (জ্যোতি:পাল মহাস্থবির ৩৭)।

৩. আচরিত কর্ম

কুশল-অকুশল কর্মের মধ্যে যে কর্ম বারবার বা সর্বাধিক করা হয় সে কর্মই আচরিত কর্ম। সাধারণত যে কর্ম বারবার করা হয় তা ক্রমে স্বভাবে পর্যবসিত হয়। গুরু কর্ম এবং আসন্ন কর্মের অভাবেই আচরিত কর্ম জনক কর্মরূপে অব্যবহিত পরবর্তী জন্মে বিপাক দান করে (জ্যোতি:পাল মহাস্থবির ৩৮)।

৪. উপচিত কর্ম

যে সকল কর্ম গুরু, আসন্ন ও আচরিত কর্মের তুলনায় দুর্বল ও অল্প শক্তি সম্পন্ন কিন্তু ইহ ও অতীত জীবনে ধারাবাহিকভাবে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্রভাবে সম্পাদিত হয়ে চিত্ত ভাঙারে সঞ্চিত হয়ে সংখ্যাধিক্যের কারণে সর্বাধিক ফলবান হয়ে ওঠে, তাকে উপচিত কর্ম বলে (জ্যোতি:পাল মহাস্থবির ৪০)।

ফল বা বিপাক প্রদানের সময় অনুসারে কর্ম চার প্রকার। যথা ১. দৃষ্টধর্মবেদনীয় কর্ম, ২. উপপাদ্যবেদনীয় কর্ম, ৩. অপরপর্যায়বেদনীয় কর্ম এবং ৪. অহোসি কর্ম।

১. দৃষ্টধর্মবেদনীয় কর্ম

যে কর্মের ফল কর্তাকে কর্ম সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে বা অল্প সময়ের মধ্যে ভোগ করতে হয়, তাকে দৃষ্টধর্মবেদনীয় কর্ম বলে। দৃষ্টধর্মবেদনীয় কর্ম ইহ জীবনে ফল প্রদানে ব্যর্থ হলে, পরবর্তী জন্মে আর ফল প্রদান করতে পারে না। এ কর্ম কুশল-অকুশল দ্বিবিধ (মুৎসুদ্দি ৪১)।

২. উপপাদ্যবেদনীয় কর্ম

যে কর্ম কর্তা ইহজীবনে সম্পাদন করে, কিন্তু তার ফল মৃত্যুর ঠিক পরবর্তী জীবনে ভোগ করে, তাকে উপপাদ্যবেদনীয় কর্ম বলা হয়। একর্ম কুশল-অকুশল দু'প্রকার। এ কর্মের ফল প্রদানের নির্দিষ্ট সময় হলো কর্তার মৃত্যুর অব্যবহিত পরবর্তী জন্ম। অন্যথায় এ কর্ম ফল প্রদানে ব্যর্থ হয়ে যায়। অর্থাৎ অহোসি কর্মে পরিণত হয়। তবে কর্তার কর্মবহুল জীবনে কুশল-অকুশল কর্মের মধ্যে যে কর্ম অধিক শক্তিশালী সে কর্মের ফল ভোগ করতে হয় (জ্যোতি:পাল মহাস্থবির ৪২)।

৩. অপরপর্যায়বেদনীয় কর্ম

যেসব কর্মের ফল কর্তাকে তৃতীয় জন্ম থেকে (বর্তমান ও অব্যবহিত পরবর্তী জন্ম) পূর্ণ মুক্তি অর্থাৎ পরিনির্বাণ লাভ না করা অবধি যে কোনো জন্মে ভোগ করতে হয়, তাকে অপরপর্যায়বেদনীয় কর্ম বলে (জ্যোতি:পাল মহাস্থবির ৪৩)। এক কথায় বলা যায় অপরপর্যায়বেদনীয় কর্মের ফল অলঙ্গনীয় ও অখণ্ডনীয়। এ কর্ম এতটাই অলঙ্গনীয় যে অর্হৎ কিংবা স্বয়ং বুদ্ধও এ কর্মের ফলভোগ থেকে নিষ্কৃতি পান না।

৪. অহোসি কর্ম

যে কর্ম দুর্বলতার কারণে নির্দিষ্ট সময়ে ফল প্রদান করতে পারে না বা প্রতিকূল কর্ম শক্তির দ্বারা প্রতিহত হয়ে ফল প্রদানের সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, তাই অহোসি কর্ম। অহোসি কর্মকে ভূতপূর্ব কর্মও বলা হয় (জ্যোতি:পাল মহাস্থবির ৪৮)।

ফল প্রদানের স্থানানুসারে কর্ম চার প্রকার। যথা- ১. কামাবচর অকুশল কর্ম, ২. কামাবচর কুশল কর্ম, ৩. রূপাবচর কুশল কর্ম এবং ৪. অরূপাবচর কুশল কর্ম।

১. কামাবচর অকুশল কর্ম

‘কামাবচর’ শব্দের অর্থ কাম্য জগতের এগার প্রকার ভূমিকে কামাবচর বা কামভূমি বলা হয়। এগার প্রকার ভূমি হলো- ছয়টি দেবভূমি, একটি মনুষ্যভূমি, এবং চারটি অপায়ভূমি। কামাবচর অকুশল কর্ম হলো যে কর্মসমূহ সত্ত্বদের চতুর অপায়ে জন্ম গ্রহণে সহায়ক হয় (জগন্নাথ বড়ুয়া ২৪৪)।

২. কামাবচর কুশল কর্ম

যে কর্মসমূহ সত্ত্বদের চতুর অপায় ব্যতীত বাকী সাত প্রকার কামাবচর ভূমিতে জন্ম গ্রহণে সহায়ক হয় তাই কামাবচর কুশল কর্ম (জগন্নাথ বড়ুয়া ২৪৪)। কুশল কর্মও দশপ্রকারে ত্রিধারে সম্পাদিত হয় এবং দেবমনুষ্যালোকে সুখ ভোগ করে।

৩. রূপাবচর কুশল কর্ম

রূপাবচর কুশল কর্ম মনোকর্ম। যে কর্মসমূহ সত্ত্বদের কামভূমির উর্ধ্বে ষোল প্রকার রূপব্রহ্মলোকে ৬ জন্ম গ্রহণে সহায়ক হয়, তাই রূপাবচর কুশল কর্ম (জগন্নাথ বড়ুয়া ২৪৪)। এ কর্ম শুধু চিত্ত বা মনো গঠিত। অর্থাৎ ধ্যানের মাধ্যমে এ কর্ম সম্পাদিত হয়।

৪. অরূপাবচর কুশল কর্ম

উত্তোরত্তর সাধনার ফলে সত্ত্বদের রূপলোকের উর্ধ্বে অরূপলোকে অর্থাৎ চার অরূপভূমিতে ৭ জন্ম গ্রহণে সহায়ক হয়, তাকে অরূপাবচর কুশল কর্ম বলে। এটি মনোকর্ম।

কর্মের সাথে জন্মের সম্পর্ক

জন্মাবধি মানুষ কায়িক, বাচনিক ও মানসিক দ্বার দিয়ে কখনো সৃষ্টি করেছে কুশল কর্ম কখনো বা অকুশল কর্ম। আর এ দ্বিবিধ কর্মের মধ্যে শক্তি যেরকম বেশী সেদিকে সত্ত্বগণ জন্ম গ্রহণ করে। অর্থাৎ যদি কুশল কর্মের প্রভাব বেশী হয় তাহলে কুশল কর্মের তারতম্য অনুযায়ী মনুষ্যলোকে, স্বর্গে কিংবা ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করে। আর যদি অকুশল কর্মের প্রভাব বেশী হয় তাহলে নিম্ন থেকে নিম্নতম স্থানে যথাক্রমে তির্যক, প্রেত, অসুর ও নিরয়ে জন্মগ্রহণ করে। কর্ম হচ্ছে ভবিষ্যৎ জন্ম নির্ধারণের নিয়ামক। তাই সত্ত্বদের কুশলকর্ম সম্পাদন করা উচিত যাতে পরবর্তী জন্ম সুখের হয়।

উক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, কর্মের সাথে জন্মের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই মানুষের কুশলকর্ম সম্পাদন করে পুণ্য সঞ্চয় করা উচিত যাতে পরবর্তী জন্ম সুখের হয়।

কর্মবাদের শিক্ষা

বৌদ্ধ কর্মতত্ত্ব মানবসমাজকে আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভরশীল হতে শিক্ষা দেয়। উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা নিম্নোক্ত শিক্ষাসমূহ গ্রহণ করতে পারি।

১. আত্মনির্ভরশীলতা - কর্মবাদ আত্মনির্ভরশীল হতে এবং আপন কর্মের প্রতি মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন করতে শিক্ষা দেয়। পরনির্ভরশীলতা ও পরমুখাপেক্ষিতা পরিহার করতে শেখায়। কারণ এই মতবাদ অনুযায়ী স্বীয় ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখের সৃষ্টিকর্তা নিজেই। বুদ্ধ বলেন,

অত্তাহি অন্তনো নাথো কোহি নাথো পরোসিয়া ?

অন্তনা'ব সুদন্তেন নাথং লভতি দুল্লভং (ধর্মপদ ১৬০)।

নিজেই নিজের ত্রাণকর্তা। অপর কোনো ত্রাণকর্তা পৃথিবীতে নেই। নিজেকে সংযত করার মধ্য দিয়ে দুর্লভবস্তু অর্থাৎ পরম সুখ নির্বাণ লাভ সম্ভব। জগতে এমন কোনো গোপন স্থান নেই যেখানে আত্মগোপন করে অন্যায় কর্মের ফল ভোগ থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারে (ধর্মপদ ২৮৮)। বুদ্ধ অন্তিম শয্যায় শায়িত হয়েও মানুষকে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার বিষয়টি স্মরণ করে দিয়ে বলেন,

অন্তদীপ বিহরথ, অন্তসরণা অনএৎসরগা (ধর্মরত্ন মহাস্থবির ৫৫)।

- নিজের জ্ঞানরূপ আলোতে বিহার করতে হবে; আত্ম শরণই শ্রেষ্ঠ শরণ। যেহেতু এ দর্শন মতে পুরস্কার বা শাস্তিদাতা বলতে কেউ নেই, স্বকৃত কর্মের ফল ইহজীবনে এবং পরজন্মে নিজেকে ভোগ করতে হয়; সুতরাং এই তত্ত্ব আত্মনির্ভরশীল হওয়ার শিক্ষা দেয়।

২. আত্মবিশ্বাস - কর্ম, কর্মফল এবং জন্মান্তরে আত্মবিশ্বাসী হতে শিক্ষা দেয়। কারণ মন্দ কর্ম করে কারো কাছে ক্ষমা চেয়ে মুক্তি পাওয়া যায় না কিংবা মন্দ কর্মের ফলভোগ থেকে উদ্ধার করা এমনকি পুত্র-কন্যা, মাতা-পিতা, বন্ধু-বান্ধব, জ্ঞাতি-মিত্র কারো পক্ষে সম্ভব নয় (ধম্মপদ ২৮৮)। স্বকৃত কর্মের ফল নিজেকেই ভোগ করতে হয়। মন্দ কর্ম সম্পাদনকারীর আত্মবিশ্বাস হয় নড়বড়ে। পক্ষান্তরে ভালো কর্ম সম্পাদনকারীর আত্মবিশ্বাস হয় দৃঢ়; যে কোনো পরিস্থিতিতে মানসিক মনোবল থাকে সুদৃঢ়। এ দর্শনের মাধ্যমে সৎ কর্ম সম্পাদনকারী আত্মবিশ্বাসী হতে পারে।

৩. সংযমতা অবলম্বন - কর্ম ও কর্মফল এবং কর্মফলের কারণে জন্মান্তর যেহেতু অবশ্যম্ভাবী সেহেতু মানুষকে আত্ম সংযমের শিক্ষা দেয়। কারণ সংযমতা অবলম্বনের মাধ্যমেই মানুষ পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে সৎ হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। এতে নিজের ও চারপাশে বসবাসরত সবার উপকার ছাড়া ক্ষতি হয় না। বুদ্ধ বলেন, সাধু ব্যক্তি কায়ে সংযত, বাক্যে সংযত, চিন্তে সংযত, তিনি সকল ক্ষেত্রে সংযত। সর্বদা সংযত সাধু সকল প্রকার দুঃখ থেকে মুক্তি লাভে সমর্থ হন (ধম্মপদ ৩৬১)।

৪. সর্বজীবে দয়াবান - কর্মতত্ত্ব ও জন্মান্তরবাদ জীবে দয়ালু হতে শিক্ষা দেয়। জীব জগতে প্রত্যেক জীবই নিজ প্রাণকে সর্বাধিক ভালোবাসে; এটা জীবের স্বভাব। প্রত্যেকের কাছে নিজের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় বস্তু আর কিছুই নেই। কাজেই নিজের জীবনকে প্রত্যেকে যেমন ভালোবাসে; সর্বতোভাবে রক্ষা করে তেমনি জগতের অপরাপর প্রাণিরাও তাদের স্ব স্ব জীবনকে ভালোবাসে ও রক্ষা করার চেষ্টা করে। যারা কর্ম ও কর্মফলে এবং জন্মান্তরে বিশ্বাসী তারা সকল জীবের প্রতি নিজ প্রাণের মতো মমতা পোষণ করে। কেননা তারা অবগত আছে যে, সর্বকর্মের ফল ইহ কিংবা পর জীবনে ভোগ অবধারিত।

৫. দায়িত্বশীলতা - বৌদ্ধ কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ মানুষকে দায়িত্বশীল হতে শিক্ষা দেয়। কর্ম এবং কর্মের ফল ভোগ করার জন্য যেহেতু মানুষ পুনরায় জন্মগ্রহণ করবে এবং তার ইহজন্মে কৃত কর্মের ফল ভোগ করতে হবে, সে কারণে সে অবশ্যই তার কাজকর্মে দায়িত্বশীল হবে। দায়িত্বে সযত্ন দৃষ্টি বা সতর্কতা না থাকলে তার দ্বারা অন্যায় কর্ম সাধিত হতে পারে। একারণে কর্ম এবং জন্মান্তরে বিশ্বাসী মানুষ স্বেচ্ছাচারী হতে পারেন না; দায়িত্ব পালনে যত্নশীল হন।

৬. মনুষ্যত্ববোধ অর্জন - মানুষের দুটি চরিত্রগত দিক আছে, একটি মানবিক অন্যটি পাশবিক। সকল মানুষের চরিত্রে এ দুটি দিক বিরাজ করে। পাশবিক চরিত্র মানুষকে পশুর মতো হিংস্র করে আর মানবিক চরিত্র মানুষের মনুষ্যত্ব বোধকে জাগ্রত করে। পাশবিক চরিত্র স্বভাবজাত এবং মনুষ্যত্ব বোধ অর্জন করার জন্য প্রয়োজন কঠোর সাধনার, প্রয়োজন উদ্যমের। কেননা মনুষ্যত্ব অর্জন আত্মপ্রচেষ্টা ব্যতীত অসম্ভব। এই মনুষ্যত্ব অর্জনে বুদ্ধ যে দশবিধ কুশল কর্মের বর্ণনা করেছেন তা অনুশীলন করা একান্ত প্রয়োজন। দশবিধ কুশল কর্ম নৈতিক চরিত্র গঠনের মূল ভিত বললে অত্যাুক্তি হবে না। এজন্য কায়িক অনাচার দমন করে কায়ে সংযত হতে হবে, বাচনিক দুর্বাক্য পরিহার করে সুবাক্যভাষী হতে হবে এবং মানসিক কুপ্রবৃত্তি ত্যাগ করে সুমনোবৃত্তির অধিকারী হতে হবে। তাহলে মানুষের মনুষ্যত্ব অর্জন হবে।

৭. সমাজ উন্নয়ন - মানব সামাজিক জীব। সমাজ ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। আবার মানুষ ছাড়াও সমাজ হয় না। মানুষ এবং সমাজ একে অন্যের পরিপূরক। তবে সমাজের সার্বিক উন্নয়নে মানুষের ভূমিকা অবর্ণনীয়। মানুষেরাই পারে একটি সুন্দর শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে তুলতে। আর এজন্য মানুষকে বুদ্ধোপাদিষ্ট সুকর্মের (দশবিধ কুশল কর্ম) দ্বারা গঠনমূলক, সংস্কারমূলক, উন্নয়নমূলক কাজ করতে হবে। এসুকর্ম অনুশীলনের মাধ্যমে আত্মউন্নয়নের পাশাপাশি সমাজের উন্নয়নও হবে। সমাজে খুনাখুনি, হানাহানি, চুরি, ধর্ষণ প্রভৃতি দূরীভূত হয়।

উপযোগিতা - বৌদ্ধ কর্মতত্ত্ব বা কর্মবাদ মহামানব গৌতম বুদ্ধের একটি মৌলিক সিদ্ধান্ত। উপর্যুক্ত আলোচনা হতে প্রমাণিত হয় যে, সমস্ত প্রাণি জগত কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ এবং কর্ম বিপাকে আবর্তিত। কর্ম বিপাকের গতিধারা কোনোভাবেই বতায় ঘটে না। এ বিষয়টি সম্যক উপলব্ধি হলে কোনো সুস্থ বিবেকবান মানুষ কোনো প্রকার অপকর্ম করতে পারবে না।

বৌদ্ধ কর্মতত্ত্ব দুঃখের উন্মোচন করে, সাধারণ জ্ঞানে যাকে ভাগ্য বা নিয়তি বলা হয়, এই নিয়তিকে খণ্ডন করে এবং সর্বোপরি মানুষে মানুষে যে ভিন্নতা তার রহস্যও উদ্ঘাটন করে। মানুষ প্রত্যেকে তাদের নিজ নিজ ভাগ্য নিয়ন্তা। কর্মতত্ত্ব শিক্ষা দেয়, কর্মই আমাদের সৃষ্টিকর্তা এবং কর্মই আমাদের ধ্বংস কর্তা। আমরা নিজেরাই রচনা করি আমাদের স্বর্গ-নরক (চৌধুরী, ১৪৭)। তাই আমাদেরকৃত প্রতিটি কর্ম সম্পাদনের পূর্বে সচেতন হয়ে সম্পাদন করতে হবে। তাহলে পরিবারে, সমাজে এবং রাষ্ট্রে শান্তি বজায় থাকবে এবং মৃত্যুর পর পারলৌকিক সুখ লাভ করা যাবে।

উপসংহার

কর্মবাদের সূত্র অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষকে তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হয়। ভালো, মন্দ, কুশল অকুশল কর্মের ফল ভোগ করতেই হবে। কর্মবাদ হচ্ছে জন্মান্তর গ্রহণের মূল সূত্র। কর্ম হচ্ছে এমন একটি শক্তি যার কারণে কর্মের ভালো বা মন্দ বর্তমান জীবনে অথবা পরবর্তী জন্মে অবশ্যই ভোগ করতে হবে। কর্মের এই অমোঘ নিয়ম থেকে অব্যাহতি পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কর্মবাদের ওপর ভিত্তি করে বৌদ্ধ জন্মান্তরবাদ প্রসারিত হয়েছে। কর্মের পরিসমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত, অর্থাৎ দুঃখ নিরোধ প্রতিপদ আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলনের মাধ্যমে তৃষ্ণা ও অবিদ্যার উচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত মানুষকে ভালো-মন্দ কর্মের ফল ভোগ করার জন্য জন্মান্তর গ্রহণ করতে হয়। তাই কর্মবাদ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের সাথে একই সূত্রে গাথা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে লোভ, দ্বেষ, মোহযুক্ত কর্মের দ্বারা সংস্কারের সৃষ্টি হয় এবং জন্মান্তর ঘটায়। কর্মের কারণে মানব আসবমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হতে থাকে। বর্তমান ও অতীত কর্ম দ্বারা জীবন আবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও মানব স্বীয় ইচ্ছাশক্তি বলে শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা তথা আর্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলনের মাধ্যমে কর্মবন্ধন ছিন্ন করে বিমুক্তি লাভ করতে পারে। তাই আমাদের উচিত পুরাতন কর্মের ক্ষয় করে, ভালো কর্ম সম্পাদন করে মনকে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবনা দ্বারা, আনাপনা স্মৃতিভাবনা দ্বারা সর্বদা সচেতন রাখা। উঠতে, বসতে, গমনে ও শয়নে যতক্ষণ ঘুম না আসে সবসময় নিজের মত করে অন্যের সুখ ও মঙ্গল কামনা করা।

টীকা

১। মনোপুংগমা ধম্মা মনোসেট্টা মনোময়া,
মনসা চে পদুট্টেন ভাসতি বা করোতি বা,
ততো নং দুক্খমস্বেতি চক্কং'ব বহতোপদং।

মনোপুংগমা ধম্মা মনোসেট্টা মনোময়া,
মনসা চে পসল্লেন ভাসতি বা করোতি বা,
ততো নং সুখমস্বেতি ছায়া'ব অনপাযিনী। ধম্মপদ (পালি), গাথা নং- ১,২

তথ্যসূত্র

- জগন্নাথ বড়ুয়া। গৌতম বুদ্ধের মহাজীবন ও ধর্মদর্শন। নবরাগ প্রকাশনী, ২০১৪।
জ্যোতি: পাল মহাথের। কর্ম তত্ত্ব (দ্বিতীয় সংস্করণ), ১৯৭৯।
জিনবংশ মহাস্থবির। সদ্ধর্ম-রত্ন-চৈত, The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation, ১৩৬৬
বঙ্গাব্দ।
ধর্মাধার মহাস্থবির, মিলিন্দ প্রশ্ন, (বঙ্গানুবাদ) ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, ১৯৭৭।
শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির। মধ্যম নিকায় (অনুবাদ), উপালি সূত্র (৫৬), ১৯৫৬।
প্রজ্ঞাবাদী ভিক্ষু, অঙ্গুত্তর নিকায় (অনুবাদ), পঞ্চম খণ্ড, রাজবন বিহার, ২০১৫।
ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু। সংযুক্ত নিকায়ো (পালি), পঠমো ভাগো। ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, ২০১৩।
ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু। অঙ্গুত্তর নিকায় (পালি), ততিযো ভাগো (নিবেদিকসুত্তং), ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, ২০১৩।
ভদন্ত শান্তরক্ষিত মহাস্থবির। নেতিপকরণ, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০১১।
রণধীর বড়ুয়া (অধ্যাপক)। মহামানব বুদ্ধ দ্বিতীয় পর্ব বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন (তৃতীয় প্রকাশ)। বুড্ডিস্ট রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন সেন্টার-বাংলাদেশ, ২০০৭।
রাজগুরু শ্রীধর্মরত মহাস্থবির। মহাপরিনিব্বান সুত্তং, ১৯৪১।
রেবতপ্রিয় বড়ুয়া (ড.)। বিশুদ্ধিমাগ, (অনুবাদ) এলিট কম্পিউটার এণ্ড প্রিন্টার্স, ২০১৫।
শীলানন্দ ব্রহ্মচারী। অভিধর্ম-দর্পণ (অখণ্ড সংস্করণ)। মহাযোগী ট্রাস্ট বোর্ড, ১৩৯৮।
শ্রী বীরেন্দ্রলাল মুংসুন্দি। অভিধর্মার্থ-সংগ্রহ বা সংক্ষিপ্ত-সার অভিধর্ম (অনূদিত ও সম্পাদিত) ১৯৪০।
শ্রী বেণীমাধব বড়ুয়া (অনু)। মধ্যম-নিকায়। কলিকাতা: যোগেন্দ-রূপসী বালা ত্রিপিটক বোর্ড, ১৯৪০।
শুভ্রা বড়ুয়া। বৌদ্ধ কোষ (দ্বিতীয় খণ্ড) পালি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭-৯৮, শুভ্রা বড়ুয়া। বৌদ্ধ কোষ (চতুর্থ খণ্ড)। পালি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭-৯৮।
সুকোমল চৌধুরী (ড)। বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন। জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০৯৭।
সুমঙ্গল বড়ুয়া। অঙ্গুত্তর নিকায় (অনুবাদ, দ্বিতীয় সংস্করণ), প্রথম খণ্ড। বনভন্তে প্রকাশনী, ২০০৪।
সুমঙ্গল বড়ুয়া। সুত্ত পিটকের অন্তর্গত ধম্মপদ (গাথা, অনুবাদ ও কাহিনী সম্মিলিত)। রাজবন বিহার, ২০১৬।
Pali-English Dictionary. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers PVT. Ltd, 1993.

The Chittagong University Journal of Arts and Humanities

The path of Purification (Visuddhimagga). Translated by Nonamoli Bhikkhu, 4th ed., Buddhist Publication Society, Kandy, Sri Lanka, 2010.

F.L. Woodward, M.A; *Gradual Samingi*(trans). London: The Pali Text Society, 2006.

Ledi, Sayadow; *The Manual of Buddhism*. Rangoon: Union Buddha Sasana Council, 1965.

Mahathera, A.P. Buddhadasa; *Concise Pali-English Dictionary* (Rep) Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 1997.

Payutto, Bhikkhu P.A. *Good, Evil and Beyond Karma in the Buddhist Teaching*. Thailand : Buddhadasa Foundation, 1993.

Peter, Santina, D. *The Tree of Enlightenment*. USA: Chico Dharma Study Foundation, 1997.

স্যার সাইয়েদ আহমদ খান ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদের ভাবনায় প্রাচ্যবিদদের চিন্তাদর্শন

ড. মুহাম্মদ শফিউল্লাহ কুতুবী *

প্রতিবাদ্যসার: ঔপনিবেশিক শাসনের একটি আনুষঙ্গিক প্রতিক্রিয়া হচ্ছে প্রাচ্যবাদ। ইহুদি-খ্রিষ্টানসহ প্রাচ্যবিদদের প্রায় সকলেই প্রাচ্য সংস্কৃতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল; শুধু তাই নয়, সংস্কৃতি চর্চার সাথেসাথে পর্যায়ক্রমে তারা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাচেতনার অনুপ্রবেশ ঘটায়। ফলে স্থানীয় সংস্কৃতির ধারকবাহকগণের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম পণ্ডিত হিসেবে সর্বপ্রথম স্যার সাইয়েদ আহমদ খান (১৮১৭-১৮৯৮) প্রাচ্যবিদদের সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করেন এবং তাঁর রচিত খুতুবাতে *আহমদিয়া* গ্রন্থে নবিজির সা. সীরাত নিয়ে তাদের অবাস্তিত গবেষণাকর্মের জবাব দেন। এক্ষেত্রে ভারতীয় উপমহাদেশের আরেকজন বিখ্যাত পণ্ডিত মাওলানা আবুল কালাম আজাদের (১৮৮৮-১৯৫৮) অবদানও সর্বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই প্রবন্ধে ইসলাম সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের বিদ্যাবত্তা নিয়ে এই দু'জন বিখ্যাত পণ্ডিতের বোধ ও চিন্তার তুলনামূলক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো।

ভূমিকা

বিশ শতকের নতুন নতুন বিষয়ে মানুষের আগ্রহ ও চর্চা শুরু হয়েছে। দৃশ্যপটে এসেছে নতুন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, আর্থসামাজিক পরিবেশ-পরিপার্শ্বিকতায় ঘটেছে পরিবর্তন। প্রগতিশীলতায় যুক্ত হয়েছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জোরালো হয়েছে প্রতিবাদ ও মুক্তিকামী আন্দোলন। একইভাবে বিভিন্ন জায়গায় সাম্রাজ্যবাদের একেক দুর্গের পতনও ঘটেছে। ভারত উপমহাদেশে সাম্রাজ্যবাদের কর্তৃত্ব ক্রমেই শিথিল হতে চলেছে। অন্যদিকে সশস্ত্র সংগ্রাম ও ইসলামি আন্দোলনগুলোর তৎপরতার পরোক্ষ পরিণতিতে ভারতীয় মুসলমানদের মাঝে শুরু হয়েছে শিক্ষার জাগরণ। এ জাগরণ যেখানে জ্ঞানবিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করেছে সমান্তরালে পাশ্চাত্য আধিপত্যবাদ ও প্রাচ্যবাদীদেরকে কাঠগড়ায় ও দাঁড় করিয়েছে। উপমহাদেশের স্ফলাররা সিরাতে রাসুলের ওপর গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি প্রাচ্যবিদদের নানা অভিযোগের জবাবও দিয়েছেন। স্যার সাইয়েদ নিজের ঈমানী চেতনা ও আত্মমর্যাদাবোধের উপলব্ধির ফলে সমকালের প্রাচ্যবিদ উইলিয়াম ম্যুর (William Muir : 1819-1905)-এর *The Life of Mohammad* প্রকাশিত হবার পর নীরব থাকা রীতিমতো নিজের জন্য অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। বহু সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি গ্রন্থটির নির্মোহ বিশ্লেষণ ও জ্ঞানভিত্তিক জবাবে খুতুবাতে *আহমদিয়া* নামের গ্রন্থটি রচনা করেন (সাইয়েদ খ. ২, ১১৮)। অন্যদিকে উনিশ শতকের গোড়া থেকেই ভারতজুড়ে প্রাচ্যবিদদের তৎপরতার মোকাবেলায় জ্ঞানভিত্তিক আন্দোলনের সূচনা ঘটে। যা পরে আরও ব্যাপকতা লাভ করে এবং ক্রমশ জোরদার হয়।

অল্প সময়ের মধ্যে খ্রিষ্টবাদের জবাব ও প্রাচীন আর আধুনিক যুগের পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনায় অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে (আলী নদভী ২৭)।

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

সাইয়েদ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮) প্রাচ্যবাদীদের বিরুদ্ধে একটি আন্দোলনের নাম। তিনি ভারতীয় উপমহাদেশে শীর্ষস্থানীয় মুসলিম নেতা শুধু নয় বরং একজন আইনবিদ হওয়ার পাশাপাশি বরেন্দ্র সমাজকর্মীও ছিলেন। তা সত্ত্বেও মৌলিকভাবে তাঁর লেখকসত্তাই ছিল মূল্য। লন্ডনে অধ্যয়নরত অবস্থায় পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গির জবাবে আল্লাহর রাসুলের সিরাত ও জীবনাদর্শ বিষয়ে একটি বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ রচনা করেন যা ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। তাঁর *The Spirit of Islam* গ্রন্থের সূচনা বস্তুত এর মধ্যদিয়েই হয় (কন্টভেল খ. ৩, ২৭২)।

ইসলাম বিষয়ে তাঁর নতুন ধারার রচনা পাঠকমহলে ব্যাপক সমাদৃত হয়। বৃটিশ সমাজে তাঁর রচনাবলি বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এ গ্রন্থ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। এটির ভাষাগত আঙ্গিক থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় ইংরেজি ভাষায় লেখকের বলিষ্ঠ দক্ষতা রয়েছে। ভারতীয় ইংরেজি শিক্ষিতদের রচনায় সাধারণত যে ধরনের দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয় তাঁর এ গ্রন্থটি এ থেকে মুক্ত (আমীন ১৪০)।

শিবলী নোমানীর (১৮৫৭-১৯১৪) বিশ্ববিখ্যাত *সিরাতুননবী* গ্রন্থটি শ্রেষ্ঠ সিরাতগ্রন্থ নয় বরং এটি প্রাচ্যবিদদের বিভিন্ন অভিযোগের তাত্ত্বিক জবাব। গ্রন্থটির ভূমিকায়- যা সিরাত বিষয়ে লিখিত- ইউরোপিয়ান লেখকদের রচনাবলির ওপর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে (নোমানী ৮৬-৯৯)।

ভারতীয় যে-সব বিজ্ঞ আলিম প্রাচ্যবিদদের প্রকাশ্য মোকাবেলা করেছেন, তাদের মধ্যে মানাযির আহসান গিলানি (১৮৯২-১৯৫৬), মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদি (১৮৯২-১৯৭৭), মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (১৯০৩-১৯৭৯) ও মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভির (১৯১৩-১৯৯৯) নাম অগ্রগণ্য। পাক-ভারত উপমহাদেশের ধর্মতত্ত্ববিদগণ প্রাচ্যবাদী চিন্তার সঙ্গে কেবল পরিচিত ছিলেন না বরং এর চুলচেরা বিশ্লেষণও করেছেন তাঁরা। এর সূচনা করেন স্যার সাইয়েদ আহমদ খান। তিনি সাধারণত তাঁর রচনাবলিতে দুই শ্রেণির প্রাচ্যবিদের চিন্তাধারা পর্যালোচনা করেন; যারা ইসলামের ওপর বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করেছেন এবং যারা ইসলামের বিষয়ে খানিকটা নমনীয় ও সহানুভূতিশীল। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ সেই গবেষক আলিমদের কাতারে রয়েছেন যাদের চিন্তাধারা হলো, প্রাচ্যবিদদের কতিপয় অনুসন্ধানী ও ইতিবাচক গবেষণাগুলো ইসলামের কল্যাণে কাজে লেগেছে। বিশেষত, আরবি ভাষায় কৃত গবেষণাকর্ম। কাজেই তাদের বক্তব্য হলো, এগুলো গ্রহণ করা, স্বীকৃতি দেওয়া উচিত এবং তা থেকে উপকৃত হওয়া দরকার। সাইয়েদ আমীর আলীর নামও সেই বিবেচনায় উল্লেখ করা হয় এবং তিনি প্রাচ্যবাদী চিন্তাকে বোঝার জন্য কোনো হঠকারিতা ছাড়া নির্মোহ চিন্তার আহ্বান জানান। এর ফলে সেসব গবেষণার ইতিবাচক অংশ থেকে উপকৃত হওয়া যাবে (নোমানী ৮৬-৯৯)।

প্রাচ্যবিদ্যা ও প্রাচ্যবিদ

“প্রাচ্য” শব্দটি “পাশ্চাত্য”-এর বিপরীতার্থক। এর অর্থ পূর্বাঞ্চল বা পৃথিবীর পূর্বের দেশসমূহ। বিশেষত এর দ্বারা এশিয়ার দেশগুলোকে বুঝানো হয়। প্রাচ্য শব্দের অর্থ- পূর্বদিকস্থ; এশীয়, পূর্বদেশীয় বা ইউরোপের পূর্বের দেশসমূহ। (এনামুল হক ৭৯৩) প্রাচ্যবিদ্যা মানে পূর্বাঞ্চলের জ্ঞানবিজ্ঞান বা সেখানে চর্চিত বিদ্যা। পরিভাষায় প্রাচ্যের বাইরের লোকদের কর্তৃক প্রাচ্যের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, দর্শন, মতবাদ ইত্যাদি নিয়ে লেখাপড়ার নাম প্রাচ্যবিদ্যা। এটাকে ইংরেজিতে Orientalism বলা হয়। “Oriental” শব্দ থেকে যার উৎপত্তি। আভিধানিক অর্থে Oriental এর অর্থ প্রাচ্যবিষয়ক, প্রাচ্য সম্বন্ধীয়, পূর্বাঞ্চলীয় ধারণা, দর্শন, মতবাদ ইত্যাদি। প্রাচ্যের মতবাদের পাশাপাশি প্রাচ্যের বাইরে লোকদের কর্তৃক তাদের ভাষা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, ধর্ম-দর্শন ইত্যাদির চর্চাকেও Orientalism বলা হয়। যেমন আহমাদ আম্মার বলেন, “প্রাচ্যের বাইরে লোকদের কর্তৃক প্রাচ্যের ভাষা, সভ্যতা, দর্শন, সাহিত্য ও ধর্ম নিয়ে চর্চাকে প্রাচ্যবিদ্যা বলা হয়” (আম্মার ১৬)।

“প্রাচ্যবিদ্যা হলো প্রাচ্যের সাথে লেনদেন ও কাজ-কারবারের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়। যেমন, প্রাচ্য বিষয়ক বিভিন্ন সিদ্ধান্ত, বিবৃতি, পঠন-পাঠন, সেখানে অবস্থান করা, শাসন করা। ড. এডওয়ার্ডের মতে : “এককথায়, প্রাচ্যকে জয় করা, পুনর্গঠন এবং নেতৃত্ব দানের নাম প্রাচ্যবিদ্যা” (সাদ্দ ৩)।

মুসা আল হাফিজ বলেন, “মুসলিমদের জ্ঞানবিজ্ঞানে অমুসলিমদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস হচ্ছে প্রাচ্যবাদ” (আল হাফিজ ৫০)।

মালিক ইবন নবি (১৯০৫-১৯৭৩) বলেন,

الاستشراق هو مصطلح أو مفهوم عام يطلق على اتجاه فكري بدراسة الحياة الحضارية للأمم الشرقية بصفة عامة ودراسة حضارة الإسلام والعرب خاصة.

“প্রাচ্যবিদ্যা হলো, এমন ব্যাপক অর্থবোধক পরিভাষা, যা সাধারণত প্রাচ্যের জাতিসমূহের চিন্তাগত দিক তথা সভ্যতা-সংস্কৃতির জীবনধারা চর্চাকে বোঝায়। বিশেষ করে ইসলাম ও আরব সভ্যতা সম্পর্কে অধ্যয়ন” (ইবন নবি ৫০)।

“প্রাচ্যবিদ” এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Orientalist। শাব্দিক অর্থে One versed in the eastern languages “প্রাচ্যের ভাষাবিশেষজ্ঞকে Orientalist বলা হয়।” (অভিধান ৬২৪)

কলিং জেম ইংরেজি অভিধানে বলা হয়েছে, An expert in eastern language and history, “যিনি প্রাচ্যের ভাষা ও ইতিহাস বিশেষজ্ঞ, তিনিই প্রাচ্যবিদ” (করম শাহ খ.৬, ১১৯)।

প্রাচ্যবিদ্যার সূচনাকাল

প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা কখন এবং কোথা থেকে শুরু হয়েছে তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে বিতর্ক আছে। নিম্নে কয়েকটি মতামত পেশ করা হলো :

প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা সূচনা হয়েছে ১৩১২ খ্রিষ্টাব্দে। এর জন্মস্থল হলো ভিয়েনার (<https://bn.m.wikipedia.org>) গির্জা। সে গির্জায় অনুষ্ঠিত পাদ্রিদের সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ক্রমান্বয়ে আরবি বিভাগ খোলা হবে। (মাকজুক ২৫) কারো কারো মতে এর সূচনা হয়েছে ১২৬৯ সালে, যখন পর্তুগালের বাদশা দ্বিতীয় এলফনসু (১২১২-১২২৩ খ্রি.) মরিসালিয়ায় উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কয়েম করেন। সে প্রতিষ্ঠানে আবু বকর আর-রাকুতির নেতৃত্বে উচ্চ শিক্ষার জন্য মুসলমান, খ্রিষ্টান ও ইহুদি শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। তাঁদেরকে গ্রন্থ রচনা, অনুবাদ ও গ্রন্থ সার-সংক্ষেপকরণের কাজ দেয়া হয়। সে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্পেনিশ ভাষায় বাইবেল, তাওরাত ও আল-কুরআনের অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করা হয়। সিসিলির রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিক (১১৯৪-১২৫০/ ফ্রেডারিক ১১৯৮ হতে সিসিলির রাজা, ১২১২ হতে জার্মানির এবং ১২২০ হতে ইটালির রাজা এবং ১২২৫ হতে জেরুসালের রাজা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সাহিত্য-সংস্কৃতির উন্নতির জন্য বড় ভূমিকা পালন করেন এবং জ্ঞানতাপস হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন) ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মাইকেল স্কটের (১১৭৫-১২৩২/ মাইকেল স্কট একজন গণিতবিদ ও মধ্যযুগের বড় পণ্ডিত। তিনি ইবন রুশদের গ্রন্থগুলো অনুবাদ করেন। তিনি সমকালে বুদ্ধিজীবী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন এবং রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের উপদেষ্টা ছিলেন) তত্ত্বাবধানে একটি অনুবাদকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত প্রতিষ্ঠান তাঁর তত্ত্বাবধানে কিছু ইসলামি বিষয় ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করে (দাইয়াব ১৪)।

কতিপয় গবেষকের মতে, আরো আগে থেকে অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা শুরু হয়েছে। কারণ, ১১৪৩ সালে Peter the Venerable (১০৯২-১১৫৬)- এর নির্দেশে ল্যাটিন ভাষায় আল-কুরআন পরিপূর্ণ অনুবাদ করা হয়, যখন তিনি “ডায়র” (‘ডায়র’ আর্মেনীয় শব্দ। শাব্দিক অর্থে ক্ষেত্রে ও কৃষকের ঘরকে বোঝায়। পরিভাষায়, ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের উপাসনা ও ধ্যান করার ঘর। পাদ্রী বা ধর্মযাজকেরা অবস্থান করেন। ডায়র কলোনী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ৯১৩ সালে) কলোনী এর প্রধান ছিলেন। তার অন্তরে ইসলাম ধর্মের প্রতি প্রচণ্ড বিদ্বেষ ছিল।

প্রাচ্যবিদ্যার উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি

পশ্চিমা পণ্ডিতরা ইসলামের জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা-গবেষণায় লিপ্ত হওয়ার বেশ কিছু লক্ষ্য-উদ্দেশ্য রয়েছে। তবে ব্যক্তি প্রাচ্যবিদদের ভিন্নতার ভিত্তিতে এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ধরনের ভিন্নতা তৈরি হয়। তাছাড়া যুগের বিবর্তন ও সময়-পরিবেশ-পরিস্থিতির পরিবর্তনও এই লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের মধ্যে বৈচিত্র্য আশার অন্যতম কারণ। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের বিশ্বাস ও জীবন সম্পর্কিত বিষয়াদির একটি অপরটির সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয় ইত্যাদি বিষয়

পরস্পর সম্পর্কিত। সে আলোকে প্রাচ্যবিদ্যা বিশেষজ্ঞগণ প্রাচ্যবিদ্যার মৌলিক চারটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। একাধিক উদ্দেশ্যের অন্যতম কারণ হলো, এ বিদ্যাচর্চাকারীরা বিভিন্ন ধর্ম ও দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ ছিলেন। তাঁদের পরস্পরের মধ্যেও বিভিন্ন বিষয়ে মতানৈক্য ছিল। প্রাচ্যবিদদের বিভিন্ন শ্রেণির কারণেও তাঁদের উদ্দেশ্যের মধ্যে ভিন্নতা দেখা যায়। সুতরাং যেসব উদ্দেশ্যে এ বিদ্যার চর্চা হয়েছে তাতেও ভিন্নতা দেখা দেওয়াই স্বাভাবিক (মুহাম্মদ নুর হোসাইন ২৯)। প্রাচ্যবিদ্যার সংজ্ঞা থেকে এর উদ্দেশ্য কিছুটা পরিষ্কার হয়েছে। এ বিদ্যাচর্চার উদ্দেশ্য ছিল একাধিক। আমাদের নিকট ধর্মীয় উদ্দেশ্য প্রধান বলে প্রতীয়মান হয়, যদিও অন্যান্য উদ্দেশ্যকে অস্বীকার করা যায় না। যেমন, জ্ঞানগত গবেষণার স্পৃহা, সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা, রাজনৈতিক অভিলাষ ও অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি অর্জন (আল মাসউদ ৭২)।

স্যার সাইয়েদ আহমদ খান ও প্রাচ্যবাদী চিন্তাধারা

স্যার সাইয়েদ আহমদ খানের প্রকৃত নাম সাইয়েদ আহমদ এই নামটি তৎকালীন দিল্লির বিখ্যাত দরবেশ তাঁর বাবার পীর হজরত শাহ গোলাম আলী রেখেছিলেন (ইকরাম ২৫৫; হোসাইন খ. ১,৪৫১)।

‘স্যার’ ইংরেজ কর্তৃক প্রদত্ত তাঁর উপাধি (ফরিদাবাদী খ. ১,৪৬০)। তিনি ৫ অক্টোবর, ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লিতে তার মাতামহ-এর বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন (নাজির ২২৭; সওয়ারি তা.বি., ২১৫)। তাঁর পিতার নাম মীর মুত্তাকী (মতান্তরে মীর তকী আহমদ খান। তিনি অত্যন্ত আল্লাহভীরু লোক ছিলেন) এবং মায়ের নাম আজীজুননেছা (Firoz 456) পিতৃ ও মাতৃকুল উভয় দিক থেকে হোসাইনি এবং হজরত মুহাম্মদ (সা.) এর ৩৭ বংশধর ছিলেন (Gradham 287)। অতঃপর তিনি যুগের রীতি অনুযায়ী প্রথমে এক সম্ভ্রান্ত পর্দানশীন গৃহ শিক্ষিকার কাছ থেকে সমস্ত কুরআন দেখে পড়েন (Hosain N.D., 451-453)। কুরআন মাজীদের পাঠ শেষে তিনি স্থানীয় মকতবে ভর্তি হন (হালী ১০২-১০৩)। তিনি তাঁর পারিবারিক চিকিৎসক হাকীম গোলাম হায়দার খানের কাছ থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রের পুস্তকাদি অধ্যয়ন করেন। মোদাকথা, স্যার সাইয়েদ আহমদ খানের শিক্ষাজীবন নানার বাড়িতে সমাপ্ত হয়। তিনি তাঁর নানার কাছ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান লাভ করা ছাড়াও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও প্রশাসনিক দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর পিতার মৃত্যু হলে তাঁর ওপর পরিবারের সমস্ত ভার ন্যস্ত হয়। তখন তিনি প্রবলভাবে একটি চাকুরির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাই তিনি ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকুরি করার সিদ্ধান্ত নেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ২২ বছর। যেহেতু সে সময় তিনি ইংরেজি ভাষা, ব্রিটিশ নিয়মকানুন ও আদালতের কার্যক্রম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন সেহেতু সর্বপ্রথম তিনি আদালতের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য তাঁর খালু খলীলুল্লাহ খানের কাছে শিক্ষাদীক্ষাও নিতে থাকেন। তিনি ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

স্যার সাইয়েদ আহমদ খান সাচ্ছা ও স্বভাবসুলভ ইসলামপন্থী ছিলেন। উত্তরাধিকারসূত্রে পূর্বপুরুষের ইসলামি রক্তধারা বহন করছিলেন তিনি। সমাজের প্রভাব ও পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা তাঁর স্বভাবজাত ধর্মানুরাগ ও দ্বীন চেতনার বন্ধনকে অধিকতর দৃঢ়তা দিয়েছে। তাঁর যোগ্যতাকে বিকশিত করেছে উন্নত শিক্ষা-দীক্ষা। নিজস্ব অনুভূতি, বোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও ধর্মীয় চিন্তাধারাকে তিনি যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির মানদণ্ডে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ইসলামি চিন্তাধারা ও বোধ স্যার সাইয়েদ আহমদকে একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলেছে। ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তি ও আমলি সম্পর্কের সম্মিলিত রূপ হলো তাঁর লিখিত রচনাবলি ও গবেষণাকর্ম। তাঁর রচনাকর্মের শিরোনাম থেকে স্যার সাইয়েদ আহমদ খানের গবেষণা, কুরআন, হাদিস, সিরাতে নববি, আসমানি গ্রন্থাবলি, কালামশাস্ত্র, তাসাওউফ ও ফিকহ বিষয়ে সীমাবদ্ধ মনে হলেও বক্তৃতা, আলোচনা ইত্যাদিতে উসুলে হাদিস, ইতিহাস, নৈতিকতা প্রভৃতি বিষয়েও তাঁর গবেষণার ছাপ লক্ষ করা যায় (হালী ১৫৯-১৮১)। গুরুত্ব দিকের লেখালেখি ও রচনাবলিতে স্যার সাইয়েদ আহমদের মৌলিক উদ্দেশ্য তাসাওউফের শিক্ষাকে জাতির সামনে পেশ করা এবং উম্মতকে অনৈসলামি মতবাদ ও চিন্তাধারা থেকে বাঁচানোর প্রয়াস লক্ষণীয়। স্যার সাইয়েদ প্রাচ্যবিদদের চিন্তাধারা, ধ্যান-ধারণা ও ইসলামের বিরুদ্ধে তাঁদের হঠকারী কর্মপন্থা সম্পর্কে যথাযথভাবে ওয়াকিবহাল ছিলেন। খ্রিষ্টান ধর্মপ্রচারক, গ্রন্থকার, ইতিহাসলেখক কুরআন, হাদিস ও সিরাতে রাসুলের (সা.) ওপর যেসব অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন আপত্তি তুলেছেন স্যার সাইয়েদ আহমদ খান এসবের প্রত্যেকটি দালিলিকভাবে খণ্ডন ও নাকচ করেছেন। তিনি ছিলেন আপাদমস্তক একজন জ্ঞানসাধক।

আল্লাহ তায়ালা তাঁকে অপরিমেয় দূরদর্শিতা ও জ্ঞানসম্পদে সমৃদ্ধ করে দিয়েছিলেন। এ কারণে তিনি ঢালাওভাবে প্রাচ্যবিদদের কাজকর্মকে প্রত্যাখ্যান করেন নি; বরং ইতিবাচক ও গ্রহণযোগ্য কাজগুলোর স্বীকৃতিও দিয়েছেন উদারচিন্তে। স্যার সাইয়েদ আহমদের অনবদ্য রচনা *খুতবাতে আহমদিয়া* নবিজির প্রতি অসাধারণ ও অপারিসীম ভালোবাসার সাক্ষর বহন করে। তিনি বিশ্ববিখ্যাত এ গ্রন্থের এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন: ইংরেজরা মুসলমান শাসক ও সরকারগুলোর ইতিহাস লিখতে গিয়ে অত্যন্ত অবিচার ও পক্ষপাতের আশ্রয় নিয়েছেন। এসব গ্রন্থ শিক্ষার্থীরা পড়ে; যার ফলে তাদের মন ও মগজে এর নেতিবাচক প্রভাব প্রতিফলিত হয়। বস্তুনিষ্ঠতা ও সত্যতার সঙ্গে ঘটনাবলির বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এমন গ্রন্থাবলির খুবই প্রয়োজন রয়েছে। পৃথিবীর দুটি বড়ো ঘটনা একটি স্পেন (স্পেন উত্তর আফ্রিকার একেবারে সম্মুখভাগে ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত এক অনিন্দ্যসুন্দর দ্বীপ নগরী। যা ওয়ালিদ ইবন আবদুল মালিকের যুগে তারেক ইবন জিয়াদ ও মুসা ইবন নুসাইর কর্তৃক বিজিত হয়) বিজয় আর দ্বিতীয়টি ক্রুসেড (ইংরেজদের দেওয়া নামে ক্রুসেড যুদ্ধসমূহ বস্তুত ধারাবাহিক ধর্মযুদ্ধ ছিল। এ যুদ্ধগুলো মধ্যযুগে ল্যাটিন কেন্দ্রীয় গির্জা কর্তৃক অনুমোদিত ও অনুপ্রাণিত। যেখানে রোমশাসকের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তাদের উদ্দেশ্য ছিল বায়তুল মুকাদ্দস সন্নিহিত পবিত্র ভূমি মুসলমানদের কাছ থেকে মুক্ত করা) অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাসকে ঘিরে মুসলমান ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে সংঘটিত আটটি যুদ্ধের সঠিক চিত্র মানুষের সামনে প্রকাশিত হলে মুসলমানদের ব্যাপারে বিশ্ববাসীর কাছে বাস্তব ধারণা উদ্ভাসিত হবে (স্যার সাইয়েদ ৩৮)।

খ্রিষ্টান লেখক মারাকেশি সম্বন্ধেও স্যার সাইয়েদ আহমদ লিখেছেন, তিনি ইসলামের অন্ধবিরোধিতায় সবসময়ে অবিচার করে গেছেন (স্যার সাইয়েদ ১৩)। স্যার সাইয়েদ আহমদ মিস্টার ডিন প্রেডিকেও ইসলামফোবিয়ায় আক্রান্ত গবেষকদের কাতারে গণ্য করেছেন। তাঁর বইপত্র পড়লে কোনো পাঠকের পক্ষে লেখকের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অজ্ঞতার জন্য হাসি সংবরণ করা কঠিন হবে (স্যার সাইয়েদ: ১৩)। স্যার সাইয়েদ আহমদ লিখেছেন, জার্মানিতে ড. স্পিঙ্গারের (Aloys Sprenger : 1813-1893) একটি বই পাওয়া যায়; এটি ইবন ইসহাক (মৃ. ৭৬৭ খ্রি.) ও ওয়াকেদির (৭৪৭-৮২৩) ওপর ভিত্তি করে রচিত রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর চারখণ্ডের ‘জীবনীগ্রন্থ’ (স্যার সাইয়েদ ১৩)।

স্যার সাইয়েদ আহমদ কতিপয় এমন প্রাচ্যবিদ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন, যারা ইসলামের ব্যাপারে বাস্তব ও নির্মোহ অবস্থানে ছিলেন। তারা হঠকারিতা ও নীচতাকে খুব কমই প্রশ্রয় দিয়েছেন। সাধারণত সত্যাত্মক থাকার নীতি-আদর্শ ভুলুপ্তি করেন নি মোটাদাগে। তাদের মধ্যে বিখ্যাত একজন হলেন, জন ডিভানপোর্ট (John Davenport : 1597-1670)। সাইয়েদ আহমদ নিজের গ্রন্থাবলির বিভিন্ন জায়গায় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির বরাত দিয়েছেন। মুহসিন মালিকের নামে লিখিত একপত্রে স্যার সাইয়েদ আহমদ ডিভানপোর্ট সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করেন এভাবে: ডিভানপোর্ট নামের একজন ইংরেজ ইসলামের সত্য ও সৌন্দর্যের সমর্থনে একটি চমৎকার ও অসাধারণ গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেখানে তিনি ইসলামের নবী সম্পর্কে আলোচনা করেন। নবিজির জীবনচরিত, কুরআন মাজীদ ও ইসলামের ওপর কতিপয় ইংরেজের নানা অভিযোগ-আপত্তির জবাব দিয়েছেন যথাযথভাবে (স্যার সাইয়েদ ১৬০)। স্যার সাইয়েদ আহমদ *খুতবাতে আহমদিয়ায়* ডিভানপোর্টের একটি অভিমত এভাবে উদ্ধৃত করেন:

‘কারো এমন ধারণা জন্মাতে পারে যে, তাঁর জন্মভূমির (আরব উপদ্বীপ) লোকেরা নিকৃষ্ট প্রতিমা পূজায় দীর্ঘকাল যাবৎ ডুবেছিল; তাদেরকে এক ও সর্বভৌম আল্লাহর ইবাদতে ফিরিয়ে আনার গভীর প্রভাব বিস্তারে সংস্কার করেছেন। যেমন কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়ার রেওয়াজ বন্ধ করেছেন। সর্বব্যাপী মাদকের অভিশাপ ও জুয়া ইত্যাদির বিলুপ্তি। একইভাবে যথেষ্ট বহুবিবাহ চালু ছিল ব্যাপকহারে। এসবের অনেককিছুই বন্ধ এবং সংস্কার করেছেন। এককথায় এমন বহুমুখী ও জীবনবাদী সংস্কারকে আমরা ধোকাবাজি কীভাবে বলতে পারি’ (Davenport, 214)?

মারগোলিউথ (D.S. Margoliouth : 1858-1940) ও থিউডর নলডেকেও (Theodor Noldeke : 1836-1930) ইসলাম প্রসঙ্গে সত্যাত্মক ও ন্যায্যনিষ্ঠতার পথে হেঁটেছেন। এ প্রসঙ্গে একটি উদ্ধৃতি এনেছেন স্যার সাইয়েদ আহমদ: ‘পৃথিবীর বহু মানুষকে তাঁরা এটা শিখিয়েছেন যে, ইসলাম একটি প্রাণময়, জীবন্ত ও মানবতার জন্য বিপুল

অবদান রাখা এক সুফলা জীবনবিধান। একইভাবে মুহাম্মদ (সা.) ইতিহাসের পাতায় সোনালি অক্ষরে নিজের নাম খোদাই করতে সক্ষম হয়েছেন’ (স্যার সাইয়েদ ৫০)।

স্যার সাইয়েদ আহমদের মতে এডওয়ার্ড গিবনও (১৭৩৭-১৭৯৪) একজন ন্যায়নিষ্ঠ গবেষক। তিনি ইসলামের ব্যাপারে কোনো হিংসার পরিচয় দেন নি। স্যার সাইয়েদ আহমদ তাঁর লেখার বিভিন্ন জায়গায় গিবনকে উদ্ধৃত করেছেন : ‘মুহাম্মদের ধর্ম যাবতীয় সন্দেহ-সংশয় থেকে মুক্ত। আল্লাহর একত্ববাদের বড় সাক্ষী কুরআন। মক্কায় জন্মগ্রহণকারী এ পয়গাম্বর প্রতিমা, মানব, তারকা ও চন্দ্র-সূর্যের উপাসনাকে এই দলিল দিয়ে নাকচ করেছে যে, যা একবার উদিত হয়ে আবার অস্ত যায়; যা নশ্বর এবং একসময় নিঃশেষিত হয়ে যায়; অস্তিত্ব হারায় তা উপাস্য হতে পারে না। তিনি প্রতিপালক ও উপাস্যের এমন এক ধারণা উপস্থাপন করেছেন যে, সেই সত্তার আদি-অন্ত নেই, কোনো সীমিত ও নির্দিষ্ট স্থানের পরিসরে অবস্থান করেন না। যার শুরু বা শেষ বলতে কিছু নেই। যার দ্বিতীয়, সমকক্ষ কিংবা সমতুল্য কোনো সত্তা নেই (স্যার সাইয়েদ ২০)। স্যার সাইয়েদ আহমদ থমাস কার্লাইলের (১৭৯৫-১৮৮১) অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। কারণ তিনি ইসলামের সত্যতা স্বীকার করার ক্ষেত্রে কার্পণ্য করেন নি; আশ্রয় নেন নি ভান-ভণিতার। খুবোতে *আহমদিয়ায়* উদ্ধৃত তার একটি বক্তব্য পেশ করা হলো। যা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তার অন্তরে বিদ্বেষের হলাহল ছিল না। তিনি নিজের নির্মোহ বক্তব্য পেশ করেছেন এমন ভাষ্যে:

“আমাদের (খ্রিষ্টান) মধ্যে যে কথাটি প্রচারিত আছে যে, মুহাম্মদ একজন স্বভাবজাত উচ্চশিক্ষিত লোক ছিলেন। তিনি ছিলেন মিথ্যার অবতার! তার ধর্ম পাগলামী ও খামখেয়ালীর সম্ভারমাত্র। বর্তমানে এসব কথাবার্তা মানুষের কাছে ভুল ও বিভ্রান্তিকর প্রমাণিত হয়েছে। এসব লোকের (খ্রিষ্টান) যেসব মিথ্যাচার ও ধর্মীয় উগ্রতাপ্রসূত কথাবার্তা তাঁর (মুহাম্মদ) বিরুদ্ধে ছড়ানো হয়েছে আজকে তা সর্বোত্তমভাবে আমাদেরকে লজ্জিত করছে” (স্যার সাইয়েদ ২০)। তিনি আরও উল্লেখ করেন :

প্রাক-ইসলামি যুগে সভ্যতা-সংস্কৃতিতে আরবরা অনেক পিছিয়ে ছিল। পৃথিবীর উন্নত জাতিগুলোর তালিকায় তাদের নাম ছিল না। কিন্তু তাদের মধ্যে এই প্রত্যয়ী পয়গাম্বর এক বাণী নিয়ে আবির্ভূত হলেন যাতে তারা বিশ্বাস স্থাপন করে। ফলে তারা গোটা দুনিয়ায় মর্যাদার আসন অধিকার করে, ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। দীর্ঘকাল পর্যন্ত পৃথিবীর বিশাল অংশজুড়ে তাদের প্রভাব ও দাপট ছিল (স্যার সাইয়েদ ৪৬০)। বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ, জর্জ সেইল (1697–1736) কুরআন মাজীদের গুরুত্ব তুলে ধরতে গিয়ে লিখেন, আরবের সবচেয়ে অভিজাত গোত্র কুরাইশ যাদের ভাষাও অন্যান্য গোত্রের চেয়ে মার্জিত ও পরিশীলিত ছিল। কুরআন মাজীদ তাঁদের উচ্চাঙ্গ ভাষারীতিতে অবতীর্ণ হয়েছে; যদিও অন্যান্য গোত্রের ভাষার কিছু মিশ্রণ রয়েছে—তবে তা নিতান্ত স্বল্প। এ ভাষারীতি আরবি সাহিত্যের জন্য আদর্শ। দৃঢ়বিশ্বাসী লোকদের অভিমত এবং এই মহাগ্রন্থের ঘোষণামতে, এরকম রচনা মানুষের সাধের বাইরে। এ কারণে এ গ্রন্থকে শাস্ত্র মুজিয়া বলা হয়েছে। খোদ মুহাম্মদ (সা.) তাঁর রিসালাতের সত্যতার ব্যাপারে এ মুজিয়াকে উপস্থাপন করেছেন (স্যার সাইয়েদ ৪৬২)। (Humphrey, Dean of Norwich : 1648-1724) হাম্পরি ডিন অব নরভিচ পবিত্র কুরআন সম্বন্ধে লিখেন: মুহাম্মদ (সা.) তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিয়েছেন, এই কুরআন মাজীদের মূল পাণ্ডুলিপি আসমানের লওহে মাহফুজে সংরক্ষিত। জিব্রাইল (আ.) যে পরিস্থিতিতে মানবজাতির জন্য যে সুরা প্রয়োজন তা আমার কাছে নিয়ে এসেছেন।

স্যার সাইয়েদ এ উক্তির সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন, এটা এমন অনর্থক বক্তব্য যার জবাব দেওয়াও বেহুদা। স্যার সাইয়েদ বলেন, মিস্টার গিবনও এরকম মূর্খতাপ্রসূত কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, রাসুলুল্লাহর হাদিস ও তাঁর সাহাবিদের বয়ান অনুসারে কুরআনের শাস্ত্র ও চিরন্তন অস্তিত্ব মহান আল্লাহর অবিনশ্বর সত্তার মাঝে রয়েছে এবং লওহে মাহফুজে নূরের কলমে তাঁর লিখিত রূপ সংরক্ষিত আছে। কাগজে লিখিত মণিমুক্তা খচিত তার একটি কপি হজরত জিব্রাইল শেষ আসমানে নিয়ে এসেছিলেন (স্যার সাইয়েদ ৪৬২)। হাদিসের গ্রন্থাবলি প্রসঙ্গে স্পিরিটারের ধারণা উদ্ধৃত করেছেন স্যার সাইয়েদ। স্পিরিটার বলেন, ‘আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মতে এখানে কতিপয় গ্রন্থ সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারির কিতাবের নাম *আল জামিউস সহীহ*, আবুল হোসাইন মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল কুশাইরি নিশাপুরী কিতাবের নাম *সহীহ মুসলিম*, আবু দাউদ সুলাইমান ইবন আশআস আস সাজিস্তানির

গ্রন্থের নাম *সুনান আবু দাউদ*, আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত তিরমিযির গ্রন্থের নাম *সুনান তিরমিযি*, আবু আবদুর রহমান আহমদ ইবন গুয়াইবের গ্রন্থের নাম *সুনান নাসায়ি*, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াজিদ ইবন মাজা আল কাযভিনির গ্রন্থ *সুনান ইবন মাজা*। এছাড়াও আরও কিছু গ্রন্থ আছে যা পূর্ববর্তী সময়ের গ্রন্থাবলির ওপর নির্ভরশীল, যা সুন্নিদের কাছে খুবই মূল্যবান ও মর্যাদাপূর্ণ। যেমন, *দারেমি*, *দারা কুতনি*, *ইবন ওয়াইনা*, *জুরকানি*, *আহমদ*, *বায়হাকি*, *হুমাইদি*, *বাগাভি*, *রাযি*, *ইবনুল জাওযি* ও *নববি*। স্যার সাইয়েদ বলেন, আমরা যতদূর জানি, শেষের ১৪টি গ্রন্থ পূর্ববর্তী কোনো গ্রন্থের ওপর নির্ভরশীল নয়; কেবল বাগাভির মিশকাত ছাড়া। গ্রন্থটির অধিকাংশ বর্ণনা ইমাম বাগাভির সূত্রে গ্রহণযোগ্য ও প্রমাণিত নয় এবং উক্ত ছয়টি গ্রন্থে তা উল্লেখ নেই। দ্বিতীয় কথা হলো, যে-সব হাদিসরূপে বর্ণনা যা পূর্ববর্তী সময়ের কোনো গ্রন্থে নেই অথবা কোনো মতাদর্শিক বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত নয় এবং বিশুদ্ধসূত্র পরম্পরায় প্রমাণিত নয় তা উপর্যুক্ত নীতিমালার ভিত্তিতে সহীহ হাদিস হতে পারে না (স্যার সাইয়েদ ৪৬২)।

প্রাচ্যবিদ ও খ্রিষ্টবাদী লেখকেরা ইসলামকে যেভাবে একটি জবরদস্তিমূলক বর্বর ধর্মবিশ্বাস সাব্যস্ত করেছেন এবং প্রচারণা চালিয়েছেন যে, ইসলাম নৈরাজ্যবাদী মতবাদ আর শক্তির জোরে গোটা পৃথিবী শাসন করেছে— স্যার সাইয়েদ তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে এসব দাবি রদ করেছেন। তিনি বলেছেন, ইসলাম মানবতার জন্য আশির্বাদ ও মুক্তির কাণ্ডারী এবং মুসার (আ.) ও ঈসার (আ.) ধর্মবিশ্বাস ইসলামের কাছে ঋণী।...“কিন্তু ইসলামের সবকিছুকেই খ্রিষ্টান লেখকেরা সবসময় মন্দ ও নেতিবাচক দৃষ্টিকোণে দেখে এসেছেন। ভালো দিক বাদ দিয়ে খারাপ বিষয় আবিষ্কারের চেষ্টা করে গেছেন। স্যার সাইয়েদ নিজের গবেষণাকেন্দ্রের গবেষকদের মাধ্যমে তাদের এসব বক্তব্যকে খণ্ডনের কাজে নেতৃত্ব দিয়েছেন (স্যার সাইয়েদ ২৪৪-২৪৫)। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ গিবন লিখেছেন, মুহাম্মদের (সা.) জীবনাদর্শের একেবারে চূড়ান্ত যে দিকটি গভীর ভাবনার দাবি রাখে তা হলো, তাঁর ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা মানবতার সর্বজনীন কল্যাণে নিবেদিত নাকি মানুষের জন্য ক্ষতিকর ছিল? রাসুলের ঘোরতর শত্রু কিংবা হঠকারী খ্রিষ্টানও স্বীকার করতে বাধ্য যে, নবিজির দাওয়াতি প্রক্রিয়া ও অনুসৃত নীতি মানবতার পক্ষে বিপুলভাবে কল্যাণকর ছিল (স্যার সাইয়েদ ২২৪)। অনুরূপভাবে *Apology* গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, লক্ষ্য করতে হবে যে, কতিপয় লোক একটা অসার দাবি করে থাকে, কুরআনের পয়গাম তরবারির জোরে ছড়িয়েছে। যাদের স্বভাবেই হঠকারিতা নেই তারা বিনাবাক্যে স্বীকার করবেন যে, প্রাচ্য-দুনিয়ার জন্য ইসলাম মহাকল্যাণের বার্তাবাহক (স্যার সাইয়েদ ২৪৯)।

স্যার সাইয়েদ খুতবাতে *আহমদিয়াসহ* তাঁর রচনাবলিতে (ইসলাম সম্বন্ধে) এরূপ ভ্রান্ত ধারণাকে এমনভাবে অপনোদন করেছেন যে, বিবেকবান, নির্মোহ ব্যক্তিমাত্রই— তিনি খ্রিষ্টান হোক বা অন্য ধর্মাবলম্বী— ইসলামের বিধান জিহাদ সম্পর্কে সমালোচনা বা আপত্তি তোলার কোনো সুযোগই থাকে নি। যারা ইসলাম সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান রাখে এবং বোঝার সক্ষমতা আছে— কথিত সেই অভিযোগ—

لَا يُكْرَاهُ فِي الدِّينِ طَعْدُ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

“ধর্মের (গ্রহণ করার) জন্য কোনো জবরদস্তি নেই। কারণ হেদায়েত ও গোমরাহীর পথ পরস্পর থেকে স্পষ্টভাবে আলাদা হয়ে গেছে” (কুরআন- ২, ২৫৬)। তাদের দাবি কুরআন মাজীদে সুস্পষ্ট এ আয়াতের সঙ্গে কত বৈপরিত্যপূর্ণ তা অনুধাবন করতে পারবে।

স্যার সাইয়েদ *Apology* গ্রন্থ থেকে নিজের কথাগুলো উদ্ধৃত করেন: ‘সাম্প্রতিক দুইশ বছরে খ্রিষ্টানদের যুদ্ধবাজ অংশটি তুর্কিদের ওপর যে রক্তক্ষয়ী আক্রমণ চালিয়ে এসেছে, তাতে প্রাণহানি ঘটেছে লাখো মানুষের। এমন দীর্ঘ ও সর্বব্যাপী লড়াই খ্রিষ্টান সমাজ ছাড়া অন্য কোথাও ছিল না, যা রোমান ক্যাথলিকদের রাইন নদীর তীরবর্তী অঞ্চল থেকে ওদের ধর্মীয় একটি তত্ত্বে বিশ্বাস করতে অসম্মত হওয়ায় রাজা অষ্টম হেনরী ও তাঁর কন্যার নির্দেশে তাদের ওপর হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করা হয়। ফ্রান্সের সিনেট বারতুলো মেড হত্যাকাণ্ডসহ চল্লিশ বছর যাবত সর্বব্যাপী রক্তপাত ও নিধন অভিযান অব্যাহত ছিল। ফ্রান্সে হেনরী প্রথম থেকে হেনরী চতুর্থের ক্ষমতাসীন হওয়া পর্যন্ত সময় ধরে ধর্মীয় আদালতের নির্দেশে পরিচালিত

হত্যাকাণ্ডগুলো আজ পর্যন্ত ঘৃণ্য অপকর্ম হিসেবে এ কারণে স্মরণীয় যে, তা আদালতের নির্দেশে সংঘটিত হয়েছিল। এর বাইরে এই বিশ বছরে ধর্মীয় বহু কুসংস্কারসহ অন্যান্য মন্দ কর্মকাণ্ডের বর্ণনাই তো উল্লেখ করা হয় নি। শেষকথা হলো, গত চৌদ্দশ বছরে পৃথিবীর এক কোটি বিশ লাখ মানুষ ক্রুসেডারদের হাতে প্রাণ হারানোর মতো সন্দেহাতীত ঘৃণ্য কাজের এবং সম্ভবত অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিক ঘটনা খ্রিষ্টানদের ছাড়া আর কারো ইতিহাসে নেই (স্যার সাইয়েদ ৩২৭)। স্যার সাইয়েদ আহমদ খান মানবেতিহাসের ক্ষণজন্মা মনীষীদের একজন। যারা প্রতিকূল অবস্থা ও বৈরী পরিবেশে নিজস্ব চিন্তাধারার শক্তিতে সময়ের শ্রোতধারা পাশ্চাতে দিতে পারে। স্যার সাইয়েদ কেবল সিরাতুল্লবী (সা.) বিষয়েই প্রাচ্যবিদদের চিন্তাকে চ্যালেঞ্জ করেন নি বরং ইসলামি চিন্তাধারা ও জীবনব্যবস্থার সামগ্রিক দিক নিয়ে প্রাচ্যবাদী চিন্তাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। তাদের সামনে তুলে ধরেছেন ইসলামের স্বরূপ। এ কারণে স্যার সাইয়েদ তাঁর রচনাবলিতে হঠকারী অবস্থানের পরিবর্তে অনুসন্ধানী ও প্রামাণ্য বিশ্লেষণপদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। এটা কেবল তার চিন্তার প্রতিবন্ধই নয়, ইসলামের বিশেষ খেদমত হিসেবেও পরিগণিত হয়েছে (স্যার সাইয়েদ ৩২৭)।

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ও প্রাচ্যবাদী চিন্তাধারা

তিনি ১১ নভেম্বর ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাওলানা খায়রুদ্দিন। পিতা ও পিতামহের সূত্রে মাওলানা আজাদের পরিবার আরবের হেজাজ এবং মক্কার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল। তাঁর পিতা একজন খ্যাতিমান পীর ছিলেন। আবুল কালাম আজাদের শিক্ষা প্রধানত পারিবারিক পরিসরে সম্পন্ন হয়। শিশু-কিশোরকালেই তিনি বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। ‘প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতির পাঠ্যক্রমের সবগুলো বিষয় তিনি পিতার শিক্ষকতায় পূর্ণভাবে আয়ত্ত্ব করেন। এরপর আবুল কালাম আজাদ ব্যক্তিগত অধ্যয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন বিদ্যায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি প্রথমে ফরাসি এবং পরে ইংরেজি শিক্ষা লাভ করেন। কিশোরকাল থেকেই তিনি কবিতা রচনা করতেন এবং ‘আজাদ’ তাঁর কবিনাম (করিম ২০-২১)। উর্দু ভাষায় তিনি শক্তিমান বাগ্মী ছিলেন। কিশোর বয়সে মাসিক সাহিত্যপত্র ‘লিসানে সিদক’ সম্পাদনা করেন। ১৯১২ সালে কোলকাতা থেকে সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘আল হেলাল’ তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে যুদ্ধ সম্পর্কে আল হেলালের ব্রিটিশ সরকারবিরোধী অবস্থানের কারণে সরকার পত্রিকাটির জামানত বাজেয়াপ্ত করে। মাওলানা আবুল কালাম আজাদের মতামত সর্বদাই ইংরেজ সরকারের বিরোধী এবং ভারত স্বাধীনতার পক্ষে সংগ্রামী চরিত্রের ছিল। তাঁর রাজনৈতিক ভিন্নমতের কারণে ১৯১৬ সালে তাঁকে কোলকাতা থেকে বহিষ্কার এবং নজরবন্দি করে রাখা হয়। ১৯২০ সালে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে মাওলানা আজাদ বঙ্গীয় প্রাদেশিক খেলাফত কনফারেন্সের সভাপতি হন। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ছিলেন, স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী। তিনি ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রতিষ্ঠাতা (করিম ২০-২১)।

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ও ভারতের অসহযোগ আন্দোলন

১৯২০ সালে গান্ধীজিকে (১৮৬৯-১৯৪৮) মাওলানা আবুল কালাম আজাদ বৈদেশিক পণ্যবর্জন ও সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রস্তাব পেশ করেন। স্বাধীনতা আন্দোলন ও জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে এটা অত্যন্ত কার্যকর পন্থা প্রমাণিত হয়। ইংরেজ সরকার এর প্রতি যথাযথ গুরুত্বারোপ করতে বাধ্য হয়। এক পর্যায়ে পুরো রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয় এবং সর্বত্র গণবিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ার উপক্রম হয়। তখন ধীরেধীরে ইংরেজ শাসনের অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে আসার আলামত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। (আলী নদভী ১২৬) মাওলানা আবুল কালাম আজাদ সমকালের একজন বড়মাপের ব্যক্তিত্ব। তাঁর মধ্যে একাধারে বহুমাত্রিক প্রতিভার উপস্থিতি ছিল পূর্ণমাত্রায়। যদিও তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রোজেক্ট কৃতিত্বের দীপ্তিতে অন্যান্য প্রতিভা প্রীয়মান হয়ে গিয়েছিল। তিনি সমাজ, সাহিত্য, সাংবাদিকতা বিষয়ে অসাধারণ পারদর্শিতার সাক্ষর রেখেছেন। আরবি, ফার্সি, উর্দু তিন ভাষাতেই তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। এসব ভাষায় দক্ষতার ফলে তিনি আরবিতে লিখিত প্রাচ্যবিদদের গ্রন্থাবলির বিচার-বিশ্লেষণ এবং তাদের চিন্তাধারা নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা করতে পেরেছেন। তাঁর সম্পাদিত *আল হেলাল* ও *আল বালাগ* পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় মাওলানার লেখাগুলোর আঙ্গিকে আরবির প্রভাব সুস্পষ্ট।

সেইসঙ্গে তাঁর প্রবন্ধগুলো শাণিত, বলিষ্ঠ, যুক্তিনিষ্ঠ ও আকর্ষণীয় গদ্যের নমুনা (আলী নদভী ১২৬)। সুরেশ কাশ্মিরী লিখেন, “মাওলানা সমকালীন বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনকে ভালোমতো বুঝতে পারতেন। কুরআন মাজীদকে সর্বকালের সকল

সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান হিসেবে উপস্থাপনের মাধ্যমে সমাজকে সেই ছাঁচে ঢেলে সাজাতে প্রয়াসী ছিলেন। কুরআনে কারীমের শ্বাশত পয়গামের আলোকে বিশ্বব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপনের চিন্তাধারা লালন করতেন তিনি” (সুরেশ ৪৮৩)।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য মাওলানা আবুল কালাম আজাদের চিরস্মরণীয় কাজ হলো কালাম (ভাষার অলঙ্কার) শাস্ত্রের নতুন পরিভাষা উদ্ভাবন। স্যার সাইয়েদের নতুন মু’তাজিলা আকিদায় মুসলমানরা কখনও সন্তুষ্ট ছিল না। তবে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ এসবের জবাব দিয়েছেন। এটা সত্য যে, স্যার সাইয়েদের জীবৎকালেই ওলামায়ে কেরাম তার চিন্তাধারা রদ করেছেন। তাদের মধ্যে মাওলানা আবুল কালাম আজাদের নাম শীর্ষে। প্রবীণ আলেমদেরকে আল্লাহ কলমের শক্তি খুব বেশি দেন নি কিন্তু এ ক্ষেত্রে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ব্যতিক্রম। তিনি শক্তিমান লেখক ছিলেন (ইকরাম ২৬২)।

কাজেই মাওলানার মধ্যে জ্ঞান ও অনুসন্ধানের মৌল উপাদান ছিল পুরোমাত্রায়। ফলে অনেক বিষয়ের সমাধানে তাঁর সক্ষমতা ছিল সহজাত এবং অনন্য। এ কারণে তিনি স্বকালের আন্দোলনগুলোর চরিত্র বুঝতেন যথাযথভাবে এবং বিরাজিত প্রেক্ষাপটের আলোকে সমাজকে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা করেছেন।

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ও প্রাচ্যবাদ

ইতিহাসে মুহাম্মদের (সা.) চেয়ে বাজেভাবে কাউকে বিচার করা হয় নি। অধিকাংশ পশ্চিমা ইতিহাসবিদ ভুলভাবে জেনেছেন এবং যেখানে সামান্যতম ত্রুটি উদ্ভাবনের সুযোগ পেয়েছেন সেখানে বানোয়াট বিষয়কে বাস্তবতার পোশাক পরাতে গলদঘর্ম চেষ্টা চালিয়েছেন। জে. জে. সাভার্স লিখেছেন, তা সত্ত্বেও এটা অস্বীকার করা যাবে না; আরবের এ নবির প্রতি খ্রিষ্টানদের মনে সহানুভূতি ছিল। তাঁদের মতে হজরত ঈসার চরিত্র খুবই ভারসাম্যপূর্ণ আর পবিত্র। খ্রিষ্টান বিশ্বকে ইসলামের কারণে কঠিন দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে।

ক্রুসেড চলাকালীন পরিস্থিতিতে নির্মোহ ও নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব ছিল না (Montgomery Watt, 148)। এরপর থেকে আজ অবধি দীর্ঘকাল যাবত সমালোচনা সাহিত্যের ঢঙে মুহাম্মদের (সা.) গালগল্প প্রচার হয়েছে (Saunders, 2003)।

অনুরূপভাবে ডব্লিউ সাউদার্ন লিখেছেন, ‘১১২০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে আরবদের মনে নবি আকরাম (সা.) সম্বন্ধে পরিষ্কার চিত্র হাজির ছিল কিন্তু এটা জ্ঞানলব্ধ চিত্র নয়। অন্যদিকে এর বিস্তারিত তথ্যের উৎসও ছিল বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের বর্ণনাপ্রসূত। সে সময়কার ইতিহাসবিদগণ নিজেদের স্বল্প জ্ঞানের ফলে নিজ নিজ ধারণার ওপর সন্তুষ্ট ছিল (Rechard 72)।

প্রাচ্যবিদরা বস্তুত, ইসলামের শিক্ষা, ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে বিকৃত করার প্রয়াসেই লিপ্ত ছিল। চেষ্টা ছিল ইসলামের পরিবর্তে আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও মৃত ভাষাসমূহকে পুনরুজ্জীবিত করার। ফিলিপ কে. হিট্টির (১৮৮৬-১৯৭৮) দৃষ্টিভঙ্গি মূতার যুদ্ধের মধ্যদিয়ে নবিজি (সা.) খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের সঙ্গে দ্বন্দ্বের সূচনা করেছিলেন (Hitti 147)। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ এই ‘দ্বন্দ্ব তত্ত্বের’ জবাব দিয়েছেন এভাবে:

“ইসলাম যখন ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে সেই সময়টাতে আরব ও শাম অঞ্চলের সীমান্তবর্তী ভূখণ্ডে খ্রিষ্টানদের রোম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। যারা এ আন্দোলনের অগ্রযাত্রা সহ্য করতে পারছিল না। রোমক শক্তির প্রত্যাপে আক্রমণাত্মক আচরণ করতে থাকে বিভ্রান্ত এই শাসকচক্র। হজরত হারিস ইবন উমাইরের শাহাদতের মধ্যদিয়ে তাদের বাড়াবাড়ির প্রথম ঘটনাটি দৃশ্যপটে আসে। নবিজি ইসলামের দাওয়াতি পত্র দিয়ে তাকে মুতা প্রেরণ করেছিলেন। যেখানে ইবন গুরাহবিল গাসসানী অবস্থান করতো। তিনি হজরত হারিসকে বিনা উক্কানিতে হত্যা করে ফেলে। এ ধরনের আত্মসী আচরণ ও জুলুম

ইসলামের পয়গাম্বরকে পাণ্টা জবাব হিসেবে যুদ্ধের পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করে। কাজেই ৮ম হিজরিতে একটি বাহিনী প্রেরণ করা হয়। এ সময়ে কনস্টান্টিনোপলের শাসকও শামে ছিলেন। মুতার গভর্নর তার সহযোগিতা চাইলে তিনি তার পুরো বাহিনীকে রণাঙ্গণে পাঠিয়ে দেন; তারপরও বিজয় মুসলমানদেরই হয়েছিল” (আজাদ ৪২২)।

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ লিখেন, “এই ঘটনার পর সমগ্র সিরিয়া অঞ্চলের আরব গোত্রগুলো মুসলমানদের ওপর হামলার জন্য সংকল্পবদ্ধ হয় এবং কনস্টান্টিনোপলের শাসকও তাদের সহায়তা করার সিদ্ধান্ত নেয়। একবছর অতিক্রান্ত হবার আগেই সিরিয়া অঞ্চলে তারা সৈন্য সমাবেশ শুরু করে। এর ফলে ইসলামের পয়গাম্বরকে তাদের প্রতিরোধ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। বস্তুত এই প্রতিরোধ অভিযানই ইতিহাসে তাবুক যুদ্ধ (৯ম হিজরি) নামে বিখ্যাত হয়েছে। নবিজি সেখানে উপস্থিত হওয়ার পর মুসলমানরা বিপুল উদ্দীপনা আর বীরবিক্রমে লড়াইয়ে বাঁপিয়ে পড়ে এবং শত্রুদের পরিকল্পনা নস্যাত করতে সক্ষম হয়। উল্লেখ্য, একদিকে তাদের ওপর মুসলমানদের দিক থেকে যেহেতু তুমুল আক্রমণ হওয়ার আশঙ্কা ছিল, অন্যদিকে আরবের ইহুদিরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের চিরায়ত চক্রান্তে ছিল বরাবরই তৎপর। ফলে আরবের অন্যান্য মুশরিক গোত্রের মতো মুসলমানদের পক্ষে ইহুদিদের বিরুদ্ধেও ব্যাপক যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়া মুশকিল ছিল (আজাদ ৪২২)।

মাওলানা আবুল কালাম লিখেছেন, এর অর্থ এমন নয় যে, ‘দুনিয়ার তাবৎ ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ওপর কেবল তারা ইহুদি বা খ্রিষ্টান হওয়ার জন্য হামলা করে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মুসলমান না হয়ে যায় অথবা কর না দেয়— যেমনটি ইসলামের সমালোচকরা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। এমন দাবি কেবল তারাই করতে পারে যারা কুরআন মাজীদ, মহানবীর (সা.) জীবনচরিত, সাহাবাদের জীবনধারা ও ইসলামের ইতিহাসের ব্যাপারে অন্ধ। তিনি আরও লিখেছেন, আল্লাহর রাসুল (সা.) কখনও যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন না। বিশ্বজাহানের জন্য যে দ্বীন এনেছেন তা কল্যাণ, নিরাপত্তা, ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব, সাফল্য ও সমৃদ্ধির বার্তাবাহী; তার মধ্যে নৃশংসতা ও ধ্বংসের অবকাশ নেই (আজাদ ৭৭৩)।

কুরআন মাজীদ এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, যে জাতি ভূপৃষ্ঠে মানবতার বিচারে সর্বনিম্ন স্তরে ছিল তাদেরকে মানবিকতার উচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। পৃথিবীর নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্য হিসেবে তাদের গড়ে তোলা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاذْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا.

“স্মরণ করো, তোমরা একে অপরের শত্রু ছিলে। তখন তিনি তোমাদের অন্তরে প্রীতি সৃষ্টি করে দিলেন। ফলে তাঁর দয়ায় তোমরা পরস্পরের ভাই হয়ে গেলে। আর তোমরা খাদের কিনারায় পৌঁছে গিয়েছিলে; তখন আল্লাহ তোমাদেরকে সেখান থেকে বাঁচিয়ে এনেছেন” (আল কুরআন ৩, ১০৩)।

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রাচ্যবিদদের বিভ্রান্তি চিহ্নিত করার পাশাপাশি তাদের ইতিবাচক গবেষণাকর্মের স্বীকৃতিও দিয়েছেন। শিক্ষা-দীক্ষায় মাওলানা আবুল কালাম আজাদ মুসলমানদের পশ্চাৎপদতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন: ‘মুসলমান তো সংখ্যায় অনেক কিন্তু তাদের জ্ঞানের পরিমাণ ও পরিধি কতটুকু? আজকে যদি আরবি ভাষায় ভালো ইতিহাস গ্রন্থ বা জ্ঞানকোষ প্রয়োজন পড়ে তখন ইউরোপের দিকে মুখাপেক্ষী হতে হয়। ইবন্ খালদুন, ইবন্ রশাদ, ইবন্ বতুতা, হাজী খলিফা, ইবন্ আসীর, মুকাইরিযি যারা ইসলামের আকাশে তারকাতুল্য ব্যক্তিত্ব অথচ তাদেরকে কেউ চিনে না। তাআব্বাত শাররা, ইমরাউল কায়েস, বুহতুরী ও আবু তাম্মামের দিওয়ান কত লোকে পড়েছে হয়তো। ইউরোপে বিপুলসংখ্যক পাঠক এগুলো পড়ে আর কুরআনের তরজমা পড়ে লাখো মানুষ (আজাদ ১৬০-১৬২)।

স্যার সাইয়েদ আহমদ খান ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদের ভাবনা: তুলনামূলক বিশ্লেষণ

প্রাচ্যবাদী আন্দোলনের বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যাবে, স্যার সাইয়েদ আহমদ খান মুসলিম স্কলারদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি যিনি প্রাচ্যবাদী আন্দোলনের উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পেরেছেন এবং তাদের গবেষণাকর্মকে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। স্যার সাইয়েদ স্বদেশী ওলামাদের জ্ঞানগত দুর্বলতা বিষয়ে সম্যক অবগত ছিলেন। এ-কারণে তিনি নিজের লিখনী দ্বারা শুধু প্রাচ্যবিদদের মোকাবেলাই করেন নি বরং ইসলামের শিক্ষা ও সত্যতা প্রমাণ করার প্রয়াসকে আন্দোলনের রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। খুতবাতে *আহমদিয়ায়* তাঁর প্রাণঢালা ও হৃদয় উজাড় করা বিশ্লেষণ এর সাক্ষ্য বহন করে। তবে প্রাচ্যবাদী

চিন্তার খণ্ডনে স্যার সাইয়েদ আহমদ খান ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদের মধ্যে কর্মপদ্ধতিগত ভিন্নতা রয়েছে। স্যার সাইয়েদ আহমদ খান প্রাচ্যবিদদের কাজের বিচার-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন, তাদের বেশিরভাগ কাজ হঠকারী ও বিদ্বৈষম্যসূত। প্রাচ্যবিদদের প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে থাকে ইসলাম ও ইসলামি জ্ঞানশাস্ত্রে সংশয় তৈরি করা। এ কারণে তাদের গবেষণায় সাধারণ মূলমানদের মধ্যে সংশয় সৃষ্টি হয়। কাজেই স্যার সাইয়েদ আহমদ খান তাঁর লেখার ধাঁচে কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। অবশ্য, এর পাশাপাশি তিনি ন্যায়নিষ্ঠ প্রাচ্যবিদদের কথাও উল্লেখ করেছেন- যাদের লেখায় হঠকারিতা ও বিদ্বৈষ নেই এবং যারা মহানবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন (স্যার সাইয়েদ ১৫)।

অন্যদিকে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রাচ্যবিদদের গবেষণা সম্বন্ধে সমালোচনা করার পাশাপাশি তাদের লেখা থেকে উপকৃতও হয়েছেন। আরবি-ফার্সি ভাষায় মাওলানার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। সাংবাদিক হিসেবেও সমসাময়িককালে পরিবেশ-পরিস্থিতির ওপর তাঁর সম্যক ধারণা ছিল। এ কারণে তাঁকে আরবি ভাষা ও সাহিত্যে প্রাচ্যবিদদের লেখালেখিতে দৃশ্যত প্রভাবিত মনে হয় এবং তিনি আরবি ভাষায় পারদর্শিতা অর্জনের কথা বারবার বলতেন। তিনি সমৃদ্ধ আরবি ভাষায় প্রাচ্যবিদদের লেখা থেকে উপকৃত হবার তাগিদ দিতেন এবং এটাকে জ্ঞানের অন্যতম আধার মনে করতেন। তিনি চাইতেন, আরবি সাহিত্যে মুসলমানরা যেন গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করে এবং এ-বিষয়ক নীতিসূত্র ভালোভাবে আয়ত্ত্ব করে। কাজেই যেখানে প্রয়োজন হবে সেখানে প্রাচ্যবাদের বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে। তাদের ভালো কাজের প্রশংসার পাশাপাশি ইসলামের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের দালিলিক জবাব দিতে হবে। আবুল কালাম আজাদ স্যার সাইয়েদ আহমদের মতো তাকলীদ অস্বীকারকারী ছিলেন। যাবতীয় মৌলিক বিষয়ের সমাধান যেমন- সৃষ্টি সম্বন্ধীয় আইন, মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, জীবনের মূলনীতি, নৈতিক মূল্যবোধ, রাজনৈতিক ও চারিত্রিক মানদণ্ড প্রভৃতি সবকিছুই তারা কুরআনে খুঁজতে চেষ্টা করেছেন (আজিজ ২৫৫)।

অনেক জায়গায় কুরআন মাজীদ তাদাব্বুর, তাফাক্কুর, তাওয়াক্কুল অর্থাৎ গভীর চিন্তা, গবেষণা এবং আল্লাহর ওপর সোপর্দ করার তাগিদ দিয়েছেন। এগুলোর গুরুত্ব এত পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে মনে হয়, চিন্তাশীলতা ও বোধশক্তির ব্যবহারই যেন ইসলামের সারবত্তা। মাওলানা এই বৈশিষ্ট্যের চমৎকার ব্যবহার করেছেন। নিজের রচিত তাফসীরগ্রন্থে তিনি সূক্ষ্ম ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে এভাবে উপস্থাপন করেছেন। ফলে পাঠকের ঈমান আলোকোদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তিনি আধুনিক দর্শনের পরিবর্তে কুরআন দিয়েই কুরআনকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। এরূপ তাফসীরেই কুরআন মাজীদের নিগূঢ় মর্ম সর্বোত্তমভাবে আয়ত্ত্ব করা যায় (শাহজানপুরী ৩৭)।

উপসংহার

স্যার সাইয়েদ আহমদ উপমহাদেশের প্রাচ্যবিদদের রচনা, গবেষণা অধ্যয়নকারী প্রথম মুসলিম গবেষকদের মধ্যে অন্যতম। তিনি তাদের উদ্দেশ্যকে বিশেষত, ইসলামবিষয়ক গবেষণার মতলবকে রীতিমতো ভয়ঙ্কর সাব্যস্ত করেন। কারণ এসব রচনাকর্ম ও গবেষণায় তারা ইসলামবিদ্বৈষ উগড়ে দিয়েছেন। একই কারণে তিনি তাদের ভাষায় তাদেরকে জবাব দেওয়া এবং অসত্য বক্তব্য নাকচ করা জরুরি মনে করেছেন। তিনি নিজের রচনা *খুতবাতে আহমদিয়া* লিখে প্রামাণ্য জবাব ও বুদ্ধিবৃত্তিক মোকাবেলার সুচনা করেছেন। যেখানে প্রাচ্যবিদদের অভিযোগগুলোর জ্ঞানতাত্ত্বিক ও দালিলিক জবাব দিয়েছেন

গবেষণাধর্মী ধাঁচে। জ্ঞানজগতে তিনি একক ও অনন্য অবস্থানের অধিকারী। আল্লাহ তাঁকে অসাধারণ দূরদর্শিতা ও হেকমত দান করেছিলেন। এ কারণে তিনি একদিকে প্রাচ্যবিদদের রচনাকর্ম অধ্যয়ন করেছেন এর ফলে তিনি ঢালাওভাবে সকল খ্রিষ্টান মিশনারী, ইতিহাসবিদ ও লেখকদের ইসলামের দূশমন সাব্যস্ত করেন নি। বরং ইসলামের প্রশ্লে কোনো প্রাচ্যবিদ সত্যশ্রয়ী ও নির্মোহ গবেষণা করলে তার সত্যায়ন করেছেন: তাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। বহু দ্বন্দ্ব, বৈপরিত্যের পরও খ্রিষ্টানরাই অন্য ধর্মাবলম্বীদের তুলনায় মুসলমানদের নিকটবর্তী। তবে এরপরও স্যার সাইয়েদ খ্রিষ্টান মিশনারী ও প্রাচ্যবিদদের বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতাকে মুসলমানদের জন্য হুমকি হিসেবেই দেখেছেন। ভারতের ভেতরে-বাইরে প্রাচ্যবিদদের বুদ্ধিবৃত্তিক মোকাবেলায় স্যার সাইয়েদ আহমদের অবদান অনন্য কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল। ইহুদি ও খ্রিষ্টবাদ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জনের তাগিদে তিনি গ্রিক ভাষা অর্জন করেছেন এবং গ্রিক ভাষার পণ্ডিত মাওলানা এনায়েত রাসুল সিরিকোটির সহায়তা নিয়েছেন। যাতে তওরাত, যবুর প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ সহজেই অধ্যয়ন এবং তাদের মৌলিক আপত্তিগুলোর জবাব দিতে পারেন।

মাওলানা আবুল কালাম আজাদের মেধা ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আলেমসমাজ নিজ নিজ চিন্তাভাবনার সীমানা থেকেই দেখে থাকেন। তবে বাস্তবতা হলো, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ জ্ঞানের এক অতলান্ত সমুদ্রের নাম। তিনি ধর্মীয়, জাতীয় এবং শীর্ষস্থানীয় জ্ঞানীদের রচনাবলির একজন বোদ্ধা সমঝদার এবং জ্ঞান তথ্যের জায়গায় উচ্চমার্গীয় ব্যক্তিত্ব ও পণ্ডিত। সাংবাদিক হিসেবে নিজের কর্মজীবন গুরু করলেও তিনি ইসলামি জ্ঞানে পারদর্শিতা অর্জন করেন। প্রাচ্যবিদদের জ্ঞান-গবেষণার স্বীকৃতি দিয়েছেন তিনি; বিশেষত আরবি ব্যাকরণ, ফিকহাশাস্ত্রের মূলনীতি, আরবি সাহিত্য প্রভৃতির ক্ষেত্রে প্রাচ্যবিদদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা। তিনি তাকলিদ পছন্দ করতেন না এবং সরাসরি বিধানাবলির সূত্র-মূলনীতির ব্যাপারে সম্যক জ্ঞান রাখতেন। এ কারণে তিনি একদিকে স্যার সাইয়েদ আহমদ খানকে নিজের পথনির্দেশক মানতেন অন্যদিকে ইসলামি বিধানসম্পর্কিত ইস্যুতে তাঁর সঙ্গে ভিন্নমতও পোষণ করতেন। যার মধ্যে জিহাদবিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তথ্যসূত্র

অক্সফোর্ড ইংলিশ অভিধান (ইংরেজি-বাংলা), ৩য় সংস্করণ, ২০১৩।

আল-কুরআন।

আবদুল্লাহ, সাইয়েদ, আহমদ খান, দায়েরায়ে মাআরিফ ইসলামিয়া, দানিশগাহ, পাঞ্জাব, ১৯৮০।

আমীন, আহমদ, জুআমাউল ইসলাম ফিল আসরিল হাদিস, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ২০০৫।

আম্মার, আহমদ, আল-ইসতিশারাক ও সনায়াহ আল-ফিকর আল-হাদ্দাম, দার আমিনা, ২০১৬।

আল হাফিজ, মুসা, প্রাচ্যবিদদের দাঁতের দাগ, মাকতাবাতুল আযহার, ২০১৫।

আজহারি, করম শাহ মুহাম্মদ, জিয়াউল্লবি, ফারুকিয়া বুক ডিপু, তা. বি.।

আল মাসউদ, আবদুল্লাহ, প্রাচ্যবাদের ইতিকথা, সন্ধিপন প্রকাশন লি. ২০২৩।

আহমদ, আজিজ, বররে সগির মে ইসলামী জদিদিয়ত, ইদারায় সাকাফাতে ইসলামিয়া, ১৯৯৭।

ইবন নবি, মালিক, ইত্তাজুল মুস্তাশরিকীন ওয়া আসরুহুম ফিল ফিকরিল ইসলামিল হাদিস, দারুল ইরশাদাত, ১৯৬৯।

ইকরাম, শেখ মুহাম্মদ, মাওয়ায়েজ-ই-এ কাউসার আদবি দুনিয়া, ১৯৯১।

স্যার সাইয়েদ আহমদ খান ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদের ভাবনায় প্রাচ্যবিদদের চিন্তাদর্শন

এডওয়ার্ড, সাইদ, ড., *অরিয়েন্টালিজম*, পেঙ্গুইন বুক, ২০০৩।

কাশ্মিরী, সুরেশ, *আবুল কালাম আজাদ*, চাটান, ২০০৯।

করিম, সরদার, ফজলুল, *দর্শনকোষ*, প্যাপিরাস, ২০০০।

খান, স্যার সাইয়েদ আহমদ, *খুতুতে স্যার সাইয়েদ আহমদ*, নিজামী প্রেস, ১৯৩১।

খান, স্যার সাইয়েদ আহমদ, *খুতবাতে আহমদিয়া*, দোস্ত এসোসিয়েটস উর্দু বাজার, তাবি।

খান, স্যার সাইয়েদ আহমদ *খুতবাতে আহমদিয়া*, ১৮৭২।

দাইয়াব, মুহাম্মদ আহমদ, *আদওয়া আল্লাল ইস্তিশরাক*, ওয়াল মুত্তাশরিকীন, দারুল মানার, ১৯৮৯।

নদভী, সাইয়েদ আবুল হাসান আলী, *ভারতবর্ষে মুসলমানদের অবদান*, (অনুবাদ, ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন) সেন্টার ফর রিসার্চ অন দ্যা কুরআন এন্ড সুন্নাহ, ২০০৪।

নদভী, আবুল হাসান আলী, *ইসলামিয়াত আওর মাগরিবি মুস্তাশরিকীন ও মুসলমান মুসানসিফীন*, মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নশরিয়াতে ইসলাম, ১৯৮২।

নোমানী, শিবলী, *সিরাতুননবী (সা)*, মাকতাবায়ে ইসলামিয়া, ২০১৫।

নুর হোসাইন, মুহাম্মদ, *প্রাচ্যবিদ্যা ও প্রাচ্যবিদ*, আল ইহসান প্রিন্টিং পাবলিকেশন, ২০২০।

ফরিদাবাদী, সাইয়েদ হাশেমী, *তারিখ-এ মুসলমানানে পাকিস্তান ওয়া ভারত*, খ.১, আঞ্জুমানে তারাক্কি-এ উর্দু পাকিস্তান, ১৯৫২।

ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, সম্পা: ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, ২০১০।

মাকজুক, মাহমুদ হামিদ, *আল-ইসতিশরাক ওয়াল খলফিয়াহ আল- ফিকরিয়্যা লি আস-ছিন্না আল-হাদারি*, দার আল-মানার, ১৯৮৯।

শাহজানপুরী, আবু সালমান, *মাওলানা আবুল কালাম আজাদ : এক মুতালাআ*, মাকতাবায়ে উসলুব, ১৯৮৬।

সান্দি, আহমদ, *হুসুলে পাকিস্তান*, এডুকেশনাল ইম-পারিয়াম, ১৯৮৫।

হোসেন, নাজির, *কিংবদন্তির ঢাকা*, প্যারাডাইস প্রিন্টার্স, ১৯৯৫।

হালী,আলতাফ হোসাইন, *হায়াতে জাবিদ*, আঞ্জুমানে তরক্কিয়ে উর্দু, ১৯৪৯।

Davenport, John, *An Apology for Mohammed and the Koran* J. Davy and Sons, 1882.

Gradham, G.F.I, *The Life and Work of Syed Ahmaed Khan*, Idarah-I-Ababiayat-e- Qaasemi jan Street, 1974.

Hossain, Mahmud, *History of the Freedom Movment*, Vol. 1, Historical Society, N.D.

Hosain, Thuryya , *Sir Sayyid Ahmad Khan aur un ka ahad*, Vol. 11, Educational book house , 1993.

Hitti, Philip K., *Islam and the West*, Van Nostrand Reindhold, 1963.

Sherwari, Haroon Shah, *Studies in Muslim Politccal Thought and Administration* Ashraf Press, N.D.

Saunders, J.J. *A History of Medieval Islam*, Rourledge, 1978.

Southern, Rechard, William, *Western Views of Islam in the Middle Ages*, Harvard University Press 1962.

Watt, W. Montgomery *What is Islam*, London Stacey International, 2002.

আলমগীর কবিরের ধীরে বহে মেঘনা চলচ্চিত্রে মুক্তিযুদ্ধ

ড. মোঃ মোরশেদুল আলম *

প্রতিপাদ্যসার: ইতিহাসের সাথে চলচ্চিত্রের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়, ঘনিষ্ঠ ও সুগভীর। ইতিহাস রচনার মূল্যবান উপাদান হিসেবে চলচ্চিত্রের ভূমিকা ও গুরুত্ব অপরিসীম। চলচ্চিত্র ঐতিহাসিক ঘটনার সংগ্রাহক ও সংরক্ষক হিসেবে কাজ করে। চলচ্চিত্র কেবল নির্মাণ ও প্রদর্শনের বিষয় নয়; এর শৈল্পিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং জনসংস্কৃতির দিকও রয়েছে। চলচ্চিত্র নির্মাতাগণ তাঁদের চলচ্চিত্রে যে কাহিনি বর্ণনা করেন বা যে বক্তব্য তুলে ধরেন; তা একটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বর্ণিত হয়। চলচ্চিত্রে একটি জাতির যে সাংস্কৃতিক ও জাতীয় আত্মপরিচয় প্রতিফলিত হয়; তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে জাতিরাষ্ট্রের সীমানা অতিক্রম করে বৈশ্বিক মঞ্চে একটি জাতির সাংস্কৃতিক ইতিহাস, গৌরব ও ঐতিহ্যের পরিচয় বর্ণনা করে। বাঙালির জীবনের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধের ভূমিকা বৈপ্লবিক যুগান্তরের সম্ভাবনাময়, তাৎপর্যবহ ও সুদূরপ্রসারী। ভাষা-আন্দোলন থেকে শুরু করে পাকিস্তানি স্বৈরশাসন-বিরোধী প্রতিটি আন্দোলনের অনিঃশেষ চেষ্টনা আমাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের মতো শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রেও যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করেছে। মুক্তিযুদ্ধের এ গৌরবময় চেষ্টনা চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সৃজনশ্রুতি, মন ও মননে নিঃসন্দেহে গভীরভাবে রেখাপাত করে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের দেশবিভাগোত্তর সময় থেকেই ক্রমাগতসরমান সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাঝে রাজনৈতিক চিন্তার যে প্রকাশ, এদেশের নবতর মাধ্যম হিসেবে নিশ্চিতরূপে চলচ্চিত্রও তার অংশীদার। মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের চলচ্চিত্রশিল্পে এক নতুন ধারার জন্ম দেয়। মুক্তিযুদ্ধের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত এই নবতর ধারা ছিল স্বাধীনতাপূর্ব সময়ে নির্মিত ধারা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। বর্তমান প্রবন্ধে আলমগীর কবির পরিচালিত *ধীরে বহে মেঘনা* চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিবিধ প্রসঙ্গ উপস্থাপনের প্রয়াস চালানো হয়েছে।]

ভূমিকা

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে এদেশবাসীর আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক যে বিরুদ্ধতার সূত্রপাত হয়, তা ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত বিজয়ের মাধ্যমে সে সার্বিক বিরুদ্ধতার চূড়ান্ত ও পরিণত ফললাভ সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশের এ বিজয় অর্জন বাঙালি জাতির দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন এবং ধারাবাহিক আন্দোলন-সংগ্রামের ফসল। মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট অত্যন্ত ব্যাপক, বিস্তৃত ও তাৎপর্যপূর্ণ। একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে বাঙালির অস্তিত্বকে পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে মুছে ফেলার জন্য ঢাকা সেনানিবাসে তৈরি করা ‘অপারেশন সার্চলাইট’ নামক নীলনকশা অনুযায়ী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ নিরস্ত্র বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও গণহত্যা চালায়। এ বর্বরোচিত হামলাকে প্রতিহত করার জন্য

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

দলমত নির্বিশেষে বাংলাদেশের জনগণ পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে ব্যাপক প্রতিরোধ যুদ্ধ গড়ে তুলে, যার নাম ৭১- এর মুক্তিযুদ্ধ। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের বিনিময়ে বাঙালি জাতি এ যুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। বাঙালি অর্জন করে তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার। দীর্ঘ নয় মাসের সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশের সমাজ জীবনে যে রূপান্তর ঘটে, বাঙালির সৃষ্টিশীল চেতনার গুণগত বিকাশের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা নিঃসন্দেহে যুগান্তকারী। মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা বাঙালির শিল্পধারায় এক নবলব্ধ অভিজ্ঞতার স্বাক্ষরবাহী। যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের কবিতা, নাটক, উপন্যাস ও চিত্রকলার পাশাপাশি চলচ্চিত্রও রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা অবলম্বনপূর্বক সৃষ্টিশীল প্রেরণার অন্বেষণে ব্যাপ্ত হয়েছিল। এ জাতীয় চৈতন্যের পটভূমি এবং বাঙালির আত্মত্যাগের কাহিনি বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে প্রোজেক্ট। ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভে এক নতুন চলচ্চিত্রশিল্পের জন্ম-সম্ভাবনা বাস্তব হতে চলেছে। যুদ্ধ চলাকালীন সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী চলচ্চিত্রকারদেরও মানসচেতনায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তঝরা যাতনার এবং লাঞ্ছনার যে ঘটনাবলি, তার তুলনামূল্যে হিটলারের নাজি বাহিনীকেও ছাপিয়ে গেছে। আপামর জনসাধারণের মরণপণের ইতিহাস আমাদের দেশের মানুষের জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস যে সকল গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে গ্রথিত হয়েছে— সে অনুসন্ধানের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র অন্যতম। স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস দৃশ্যায়নের মাধ্যমে উপস্থাপিত হলে একইসাথে ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং বিনোদন পাওয়া যায়। মুক্তিসংগ্রামের ভয়াল সময়ের চিত্র গ্রন্থপাঠে যতটা উপলব্ধি সম্ভব, তার অধিক প্রতিফলিত করা সম্ভব চলচ্চিত্র মাধ্যমে। ফলে মুক্তিযুদ্ধের বাস্তবতা উপলব্ধি এবং চলচ্চিত্রশিল্প মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নির্মাণে কতটা ভূমিকা রেখেছে এ বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বর্তমান প্রবন্ধে আলমগীর কবিরের নির্মিত *ধীরে বহে মেঘনা* (১৯৭৩) চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিবিধ প্রসঙ্গ উপস্থাপন করা হয়েছে। গবেষণাকর্মটি সম্পাদনে প্রধানত দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে: ক) ঐতিহাসিক পদ্ধতি এবং খ) বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি। প্রথমত ইতিহাস অনুসন্ধান এবং একটি তথ্যগত ভিত্তি নির্মাণে ঐতিহাসিক পদ্ধতি এবং চলচ্চিত্রের স্বরূপ উদঘাটনে চলচ্চিত্রটিকে ন্যারেটিভ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে বিচার করা হয়েছে। বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত এ পদ্ধতিতে বিচার-বিশ্লেষণ ও প্রক্রিয়াজাত করে আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে সমালোচনামূলক ও মূল্যায়নধর্মী পদ্ধতিও অনুসরণ করা হয়েছে।

প্রবন্ধ রচনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধ রচনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে:

- ১। চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্যের সত্যতা পর্যালোচনা করা।
- ২। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ বা মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থনের ক্ষেত্রে জনগণের মধ্যে যে চেতনা কাজ করেছিল চলচ্চিত্রমাধ্যমে তা কীভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে, তা পর্যালোচনা করা।
- ৩। চলচ্চিত্রটি সম্পর্কে পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থে প্রকাশিত সমকালীন আলোচনা, সমালোচনা ও প্রতিক্রিয়া তুলে ধরা।
- ৪। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র হিসেবে *ধীরে বহে মেঘনা*-এর বৈশিষ্ট্য ও মূল্যায়ন উপস্থাপন করা।
- ৫। চলচ্চিত্রবিষয়ক গবেষণায় দেশের তরুণ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের গবেষকদের অনুপ্রাণিত করা।
- ৬। দেশের জনগণ বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করার মধ্য দিয়ে দেশ ও জাতিগঠনে অবদান রাখা।

আলমগীর কবিরের ধীরে বহে মেঘনা চলচ্চিত্রে মুক্তিযুদ্ধ

স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দেই এক নতুন ধারার চলচ্চিত্রের পথচলা শুরু। স্বাধীনতার পর সরাসরি মুক্তিযুদ্ধ এবং আরো পরে মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ ধারণ করে বাংলাদেশে এ নতুন ধারার চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু (হোসেন ৩০)। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রের ইতিহাস বস্তুত এ দেশে চলচ্চিত্র নির্মাণের যে সংগ্রাম তার সমান্তরাল। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের চলচ্চিত্র মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করেই যাত্রা শুরু করেছে। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র ধীরে বহে মেঘনা ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পায়। এটি স্বকীয় চলচ্চিত্র নির্মাণশৈলী, আধুনিক জীবনবোধ, সমকাল, স্বদেশ আর বাস্তব জীবনের নবতর উপস্থাপনায় ঋদ্ধ প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা আলমগীর কবির পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনীচিত্র (Kabir, ‘ধীরে বহে মেঘনা’ 71)। চলচ্চিত্রটি নির্মিত হয়েছে বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ প্রযোজনায়। প্রথমে এ চলচ্চিত্রের নাম ছিল ‘এবং ধীরে বহে মেঘনা’। ‘এবং’ শব্দটি পরবর্তী সময়ে বাদ দেয়া হয়। জহির রায়হান ছিলেন এ ছবির মূল পরিকল্পনাকারী। ছবিটি পরিচালনা করার কথা ছিল জহির রায়হানের। তাঁর পরিচালনায় ছবিটির রূপ নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ আলাদা হতো। কিন্তু তিনি জীবদ্দশায় এটি নির্মাণ করতে পারেননি (হায়াৎ ৭৬)। চলচ্চিত্রটির নির্মাতা আলমগীর কবির বলেন, পরিচালকের ভূমিকায় আমার মুখ্যত দুটি প্রধান লক্ষ্য ছিল (আতিকুজ্জামান ৩৭)। ধীরে বহে মেঘনা পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধনির্ভর একটি সার্থক চলচ্চিত্র। শুধুমাত্র বিষয়ের কারণেই নয়, আঙ্গিকের কারণেও এটি আমাদের চলচ্চিত্রশিল্পের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে নিয়েছে। ‘British Film Institute’ প্রণীত এ যাতবকালে বাংলাদেশে নির্মিত শীর্ষ ১০টি ছবির একটি তালিকা (Top 10 Films of Bangladesh) এক সময় তাদের ওয়েব সাইটে পাওয়া যেত (আলম ৩৩৬)।

1. Titash Ekti Nadir Naam	Ritwik Ghatak	1973
2. Chitra Nodir Pare	Tanvir Mokammel	1999
3. Nodir Naam Madhumati	Tanvir Mokammel	1994
4. Shimana Perye	Alamgir Kabir	1977
5. Bader Meye Josna	Tojammel H Bokul	1989
6. Surja Dighal Bari	Shaik Niamat Ali & Masihuudin Shaker	1979
7. Dhire Bohe Meghna	Alamgir Kabir	1973
8. Rupali Shaikate	Alamgir Kabir	1979
9. Srabon Megher Din	Humayn Ahmed	1999
10. Sat Bhai Chompa	Dilip Shom	1968

মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণির টানা পোড়নের চিত্র এতে প্রতিফলিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের বিশাল পটভৌমিক পরিমণ্ডল থাকা সত্ত্বেও আলমগীর কবিরের চলচ্চিত্রে নিবিড়ভাবে ওঠে এসেছে সদ্যস্বাধীন দেশে মধ্যবিত্ত নাগরিকদের যুদ্ধবিধ্বস্ত জীবনযাপন ও আত্মত্যাগের করুণতম চিত্র। নির্মাতা মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে চলচ্চিত্রে উপস্থাপনের জরুরি প্রয়োজন বলে অনুভব করেছিলেন। কারণ, মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে ভারত ও বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে যে সংযোগ ও মননের সমন্বয় ক্ষণকালের জন্য হলেও ঘটেছিল সে সংবাদটি পরবর্তীকালের উভয় দেশের নবপ্রজন্মের নিকট আলোকিত করা (ইসলাম ১৫৭)। ধীরে বহে মেঘনা চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে নির্মাতা আলমগীর কবির বলেন,

যা আমার কাছে সবচেয়ে পীড়াদায়ক তা তথাকথিত উচ্চশ্রেণিভুক্ত লোকের মনোভাব। বাংলাদেশের ছবি এখনও অবিভক্ত বাংলার ছবির যুগেই থেকে গেছে। যতক্ষণ না অত্যন্ত সরলভাবে শরৎচন্দ্রের গল্পোকেন্দ্রিক ধরনের ছবির কাঠামো হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এ আপাতশিক্ষিত দর্শকসমাজ অত্যন্ত অনুৎসাহী বোধ করে। তার পরিবর্তে আমি কল্পমূর্তির মাধ্যমে দেখাতে চেয়েছিলাম বাংলাদেশের আহত ক্ষতকে, আর শত বাধা সত্ত্বেও তার বাঁচার শক্তিকে। অল্প-মিষ্টি স্মৃতির মধ্যে স্বাধীনতার পরবর্তী অধ্যায়ে নতুন দেশের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ এবং ভারত-বাংলার গণমানুষের বন্ধুত্বের টুকরো টুকরো অনুক্রম নিয়ে গড়ে উঠেছিল এ চিত্রনাট্য। চরিত্রগুলোকে হিন্দু-মুসলমান তৈরি না করে যতখানি সম্ভব মানবিক ধর্মনিরপেক্ষ করা হয়েছিল (সাহা ৫৯-৬০)।

বাংলাদেশের রাজনীতি বিশেষ করে পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত বিষয়ও এতে স্থান পেয়েছে এই চলচ্চিত্রে। মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অংশগ্রহণ এবং তাদের অবদানের চিত্র এতে উপস্থাপন করা হয়েছে। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক ছিল এ চলচ্চিত্রের প্রধান দিক (আতিকুজ্জামান ৩৭)। চলচ্চিত্রটি নির্মাণ ছিল একটি নিরীক্ষাধর্মী ও মেধাদীপ্ত প্রয়াস। তবে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধদৃশ্যের চিত্রায়ণ এতে তেমন গুরুত্ব পায়নি (হাসান ১৬৬)। আলমগীর কবির-এর মতে, উদ্ভট কাল্পনিক ঘটনার আশ্রয়ে নির্মাণ না করে *ধীরে বহে মেঘনা* চলচ্চিত্রটি সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে নির্মাণের চেষ্টা করা হয়েছে। সমগ্র মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা কিন্তু গল্পের গাঁথুনিতে উল্লিখিত হয়নি। শুধু যুদ্ধবিধ্বস্ত বাস্তব মানুষের রূপায়ণকে চলচ্চিত্রটিতে আলাদা করে গুরুত্ব দেয়ার প্রয়াস রয়েছে। *ধীরে বহে মেঘনা* চলচ্চিত্রটি বাংলাদেশের চলচ্চিত্রশিল্পের ইতিহাসে এক নবতর আধুনিক প্রয়াস। এর কাহিনি আবর্তিত হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বাস্তব ও প্রমাণ ঘটনার সাথে কল্পিত চরিত্রের সংমিশ্রণে ‘সিনেমা ভেরিতে’ রীতিতে। আলমগীর কবিরের চলচ্চিত্র নির্মাণের ‘ডিরেক্ট সিনেমা’ পদ্ধতির প্রয়োগ, এটিও চলচ্চিত্রের একটি সাহসী রাজনীতি সচেতন শৈলী (দাশগুপ্ত ৫৪০)। দেশের বা সমাজের নানা সঙ্গতি-অসঙ্গতি, দুঃখ-দুর্দশা ও জীবন-সংগ্রামের যে সকল চিত্র তাঁর চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়; তা তিনি সবসময় বাস্তবতার নিরিখে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। এজন্যই চলচ্চিত্রের সবচেয়ে জোরালো ও বাস্তবধর্মী শৈলীটিকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক সচেতনতার কারণে এই শৈলী যেন স্বয়ংক্রিয়ভাবেই তাঁর মধ্যে জারিত হয়েছিল।

আলমগীর কবিরের *ধীরে বহে মেঘনা* চলচ্চিত্রে আশাবাদী আকাজক্ষার ঢেউ দোলায়িত হয়েছে মেঘনার প্রবহমানতায়। যুদ্ধের ক্ষত চিহ্ন আছে এখানে মানুষের স্মৃতিতে তবু তারা বেঁচে আছে এই বর্তমানে, যুদ্ধোত্তর নতুন দেশে- নতুন গন্তব্যে পৌঁছবার আকাজক্ষায়। কারো বা প্রিয়জন, প্রিয়তমা আর স্বজন হারানোর বেদনায় বর্তমান অস্তিত্বের অঙ্গহানী বা অসম্পূর্ণতা আছে এই ছবির প্রায় সকল চরিত্রেরই। ভারতের অনিতা হারিয়েছে প্রদীপকে, আর বাংলাদেশের সুমিত বয়ে বেড়ায় প্রিয়তমা হাসুর পাকিস্তানি সৈন্য কর্তৃক ধর্ষিত হবার নির্মম স্মৃতি। বোন নাজমারও রয়েছে সদ্য বিবাহিত জীবনে হানাদারদের হাতে স্বামী রফিকের হত্যা দৃশ্য অবলোকনের একক নির্মম অতীত। অনিতা, হাসু, নাজমা, সুমিত, মানবেন্দ্র সকলেই যেন যুদ্ধ শেষে যুদ্ধের রেখে যাওয়া এক একটি জীবন্ত ফসিল। ছবিটির ঘটনাকাল দেখানো হয়েছে ১৯৭২ সাল, মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশ। যুদ্ধ শেষ, তবু যুদ্ধ স্মৃতি তাড়িত চরিত্রগুলো বার বারই ফিরে গেছে যুদ্ধের উত্তাল দিনগুলোতে কখনও ভয়েস ওভার, কখনও যুদ্ধকালীন সময়ে ধারণ করা প্রামাণ্যচিত্রের রাশফুটেজ দর্শনের মধ্য দিয়ে, আবার কখনও ফ্ল্যাশব্যাকের মুহূর্মুহু প্রয়োগে। সমালোচকের ভাষায় ‘Internal Flash Back’-এর যথাযথ ব্যবহারে তিনি ভেঙ্গেছেন বর্ণনাধর্মীতার একঘেঁয়েমি; তবে যুদ্ধে পোড় খাওয়া এই মানুষগুলো শুধু যে এই ফ্ল্যাশব্যাক সমেত স্মৃতি কাতরতায় বর্তমানে হাজির তা নয়। এরা সকলেই যাপিত জীবনের ক্রমাগতসতায় যে যার কাজের মধ্য দিয়ে ফিরে যায় অতীতে।

সেই অতীত আবার বর্তমানের গভীরে প্রোথিত। অথবা বলা যায়, এদের অসম্পূর্ণ বর্তমান সেই অতীতেরই বিকলাঙ্গ সমীকরণ (আক্তার ৭৩)।

ফ্ল্যাশব্যাকে মূর্ত হয়েছে রক্তাক্ত যুদ্ধ, ত্যাগ ও গণহত্যার লাশের ছবি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয়দের সহায়তা এবং যুদ্ধোত্তর পরিবেশে বিক্ষুব্ধ তারুণ্যের চিত্র ফ্ল্যাশ ফরওয়ার্ড কৌশলে চিত্রায়িত হয়েছে (হায়াৎ, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র ৭৭)। পরিচালক চলচ্চিত্রটির বাস্তবসম্মত আবহ ও পরিবেশে চরিত্রগুলোকে অন্তর্লীন করে স্থাপন করেছেন যা ধীরে বহে মেঘনা'র চলচ্চিত্রিক নির্মিতির উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহের মধ্যে অন্যতম। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের বাংলাদেশকে উপস্থাপনায় বিশেষ করে অসহযোগ আন্দোলন, যুদ্ধের প্রস্তুতি, গণহত্যা, মুক্তিবাহিনীর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম এবং বিজয় প্রভৃতি নানাবিধ মৌল বা প্রধান আখ্যান থেকে পরিচালক স্বচ্ছন্দে প্রামাণ্যচিত্রে চলে গেছেন। তিনি Internal flash back-এর যথাযথ ব্যবহার করে বর্ণনাধর্মীতার প্রচলিত একঘেয়েমিতাকে ভেঙে ফেলেছেন। তাছাড়া mise-en-scene-এর সুপরিকল্পিত প্রয়োগের ক্ষেত্রে ইতিবাচক অনুঘটকের মত তাঁর ক্যামেরার লেন্স কাজ করেছে (ইসলাম ১৫৯)। এ চলচ্চিত্রের প্রশংসায় তানভীর মোকাম্মেল বলেন, 'যুদ্ধকালীন জনগণের জীবনের আতঙ্কবোধ, সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক বা যুদ্ধ কিভাবে মানবিক সম্পর্কগুলোকে বিপর্যস্ত করে, তার কিছু নিপুণ চিত্রায়ণ আছে ছবিটিতে। জীবনের প্রথম ছবি হিসেবে ধীরে বহে মেঘনা নিঃসন্দেহে আলমগীর কবিরের প্রশংসনীয় সৃষ্টি এবং আমাদের চলচ্চিত্রের একটি মাইলস্টোন।' আলমগীর কবির তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র ধীরে বহে মেঘনা'য় (১৯৭৩) যুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশের বর্তমান আর বর্তমানের প্রবহমানতা ভেঙে অসংখ্য flashback প্রয়োগ করেন মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে বিভিন্ন চরিত্রের নানামুখী অতীত অঙ্কনের প্রয়াসে। বর্তমান আর অতীতের এই মুহূর্তই আন্তঃযোগাযোগ যেন ইতিহাসের এক কালপর্ব নির্মাণের তাগিদ থেকে উৎসারিত। এভাবে নির্মাতা এই চলচ্চিত্রে 'সময়'-এর বর্তমান থেকে অতীতে, আবার অতীত থেকে বর্তমানে ভ্রমণের মাধ্যমে সময়ের ধারাবাহিকতা বা 'Continuity' ভেঙেছেন। একই সাথে, মুক্তিযুদ্ধকালীন ও মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ের একটি সামগ্রিক চিত্রের 'Organic Unity' ও তৈরি হয় এই চলচ্চিত্রে (কবির, ধীরে বহে মেঘনা ৪০)।

ধীরে বহে মেঘনা চলচ্চিত্রে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে গাওয়া 'কত যে ধীরে বহে মেঘনা / শান্ত তবু সুপ্ত সে নয় / কাজল জলের অতল তলে / দোলায় আশা, জাগে হৃদয়। সবুজ শ্লিষ্ট তীরে ভীষণ মমতায় / গঞ্জ-গ্রামের নীড় নিবিড় জড়ায়, ফসলের সোনা স্বপ্নিল সম্ভার / দিয়ে যায় জীবনের অধিকার, দুঃখের ছায়া ঘনাক তবু / প্রাণের পটে আঁকা প্রণয়। / হঠাৎ ক্ষিপ্ত নদী ক্রোধে ছেঁড়ে পাল, বাঁধা-বাঁধের বেগ প্রবল মাতাল, চিরদিন জানি : সংসার সংগ্রাম, প্রতিরোধ, প্রতিকার লেখে নাম। / বিপদ বাধা আঘাত যত / তুচ্ছ করে আসে বিজয়' গানটি পরিবেশিত হয়। গানটির কথা লিখেছিলেন মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এবং সুর দিয়েছিলেন সমর দাস। এছাড়াও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে গাওয়া '(ওরে আয় ঘরে আয় / ওরে আয় ঘরে আয়) সাগর ভেঙে বন্যার বেগে আয় / আকাশ ভেঙে বাঁধার বেগে আয় / সূর্যোদয়ের এই প্রহরে / মুক্তিপাগল ওরে আয় ঘরে / দুর্বীর সংগ্রাম দুর্জয় নাম / আঁকে যে ঐ পতাকায়। সোনাভরা প্রান্তর কত শত গ্রাম / ধ্বংসের বারুদে জ্বলেছে / জনপদ বন্দর গৃহ অবিরাম / হানাদার পশুরা দলেছে / তবু জীবন এই পোড়া মাটিতেই / বারে বারে ডেকে যায়। আমরাতি অশ্রুর জানি অবশেষ / সূর্যের শিখা ঐ যে পথে / শহীদের রক্তের ঋণে গড়া দেশ / সাজবেই নতুনের শপথে / বিজয় আলোর সেই নব পরশেই / চলো ছুটে মোহনায়।' গানটি পরিবেশিত হয়। এ গানটির কথা লিখেছিলেন মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এবং কণ্ঠ দিয়েছিলেন সমর দাস (আহসান ২০৫-২০৬)।

ধীরে বহে মেঘনা চলচ্চিত্রটি মুক্তিযুদ্ধের একদম প্রান্তিক বিষয়, প্রতিবেশী দেশের সাধারণ মানুষ, সেনাবাহিনী বা বিমানবাহিনীর লোক, যাঁরা আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন; তাঁদের ক্ষয়ক্ষতি, অবদান, আত্মত্যাগের গল্প। তাঁদের ‘দৃষ্টিকোণ থেকে মুক্তিযুদ্ধকে দেখা’ এ ছবিতে এসেছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। ভারতের অনেক তরুণ এ দেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। এরই প্রাসঙ্গিকতায় মুক্তিযুদ্ধের সময় মিত্রবাহিনীর হয়ে যুদ্ধে অংশ নিয়ে ভারতীয় ছাত্রী অনিতার প্রেমিক ভারতীয় বিমান বাহিনীর পাইলট প্রদীপ নিহত হন। প্রদীপের মৃত্যুর পর সদ্য স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশে অনিতা ছুটে আসে স্মৃতি ত্যাগিত হয়ে। সে বুঝতে চায়— এ দেশের জন্য কিসের এত দায় ছিল প্রদীপের? কিন্তু পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক এদেশে পরিচালিত ধ্বংসযজ্ঞ স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণের পর তার ভুল ভাঙে। চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্যে এ প্রসঙ্গে অনিতা বলে, ‘সারা ভারত, বাংলাদেশ যখন জয়ের আনন্দে মত্ত তখন আমি নিজেকে ঘৃণা করেছি, বাংলাদেশকে ঘৃণা করেছি। আমার চোখেও ঘুম ছিল না। থাকতে না পেরে চলে এসেছি এখানে। দেখতে বুঝতে বাংলাদেশ কী এমন জিনিস যার জন্যে চিরদিন দক্ষে দক্ষে মরতে হবে। আজ মেঘনার বুকে ভাসতে ভাসতে যেন আমার প্রশ্নের উত্তর পেলাম। হঠাৎ যেন বুঝতে পারলাম এমন দেশের মুক্তির জন্যে যে কোনো মূল্য দেয়া যায়’ (ধীরে বহে মেঘনা চলচ্চিত্রের ডিভিডি থেকে সংগৃহীত)।

এখানে এসে অনিতা তার মায়ের বান্ধবী এবং তার মেয়ে নাজমা ও পুত্র সুমিত্রের সাথে পরিচিত হয়। সুমিত্র পেশায় একজন সাংবাদিক। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী এবং তাদের দোসরদের অত্যাচার ও নির্যাতনের বিভিন্ন দৃশ্য দেখে এবং কাহিনি শুনে অনিতা ভীষণ আবেগ ত্যাগিত হয়। তার হৃদয় গভীর মানবিকতা বোধে আচ্ছন্ন হয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ থেকে নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে সে তার দেশ ভারতে ফিরে যায়। ধীরে বহে মেঘনা চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে সমালোচক আপন চৌধুরী বলেন, ধীরে বহে মেঘনা’র শেষ দৃশ্যের শটগুলোতে দেখানো হয় লং শটে ইন্ডিয়ান ইয়ার লাইসেন্সের বোয়িং বিমান অনিতাকে নিয়ে আকাশে উড়লো। ঢাকার বুকে সন্ধ্যা নেমে আসার প্রস্তুতি চলছে। বুড়িগঙ্গার ওপারে সূর্যাস্তের আভা। ঘিঞ্জি পুরানো ঢাকার একফালি আকাশ ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসছে। রাস্তার ধারে হাপরের আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। আর বুড়িগঙ্গার জলে অন্তর্মিত সূর্যের প্রতিবিম্ব জ্বলছে ঝিকঝিক। চমৎকার কয়েকটি ইমেজ নতুন আশাবাদের জন্ম দেয়। এটি ঢাকায় নির্মিত অন্যান্য ছবির চাইতে উন্নতমানের। অন্যান্য ছবির নির্মাণ পদ্ধতি যাত্রাধর্মী হওয়ায় চলচ্চিত্রিক উপাদান নির্ভর ছবিটি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

শিল্পোত্তীর্ণ অধিকাংশই auteur (ওতর) রীতির অর্থাৎ চলচ্চিত্রকারের ব্যক্তিগত সর্ববিধ মতবাদ বিধৃত। ফলে আদিযুগ থেকে fiction এবং non-fiction চলচ্চিত্রের সৃজনরীতিতে যে আপাত পার্থক্য নির্দেশিত হয়ে আসছে তা উত্তরোত্তর অর্থহীন হয়ে দাঁড়াচ্ছে (আতিকুজ্জামান ১১৯)। দু’ধরনের চলচ্চিত্রই চলচ্চিত্রকারের ব্যক্তিগত মানসের, মতবাদের ধারক ও বাহক। কেবল দৃশ্য সংগ্রহের রীতিটা আলাদা। উভয় কর্মেই realism, naturalism এবং ইচ্ছাকৃত construction কমবেশি বিদ্যমান। কাজেই সব চলচ্চিত্রই মূলত একাধারে fiction এবং non-fiction অর্থাৎ Complete Cinema (কবির, ‘ধীরে বহে মেঘনা’ চ)। ধীরে বহে মেঘনা এই উপলব্ধিরই প্রথম প্রচেষ্টা। এর অধিকাংশ ঘটনা সত্য এবং সমকালীন রুঢ় বাস্তব থেকে সংগ্রহ করা। সেই recreated reality-র সাথে সমন্বিত হয়েছে সমকালীন প্রামাণ্য চিত্র যা কোনো স্টক শট নয়। গল্পের কাঠামোটি constructed (হায়াৎ ১০৪)। আলমগীর কবির পেশায় একজন সাংবাদিক ছিলেন এবং তিনি নিজে মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। তাই তাঁর নির্মিত ধীরে বহে মেঘনা যেন সে সাংবাদিক এবং মুক্তিযোদ্ধারই চিত্র। মুক্তিযুদ্ধের ধ্বংসলীলা ও মানসিক বিপর্যয়কে তিনি প্রামাণ্য ও কল্পনার মাধ্যমে এ চলচ্চিত্রে উপস্থাপন করেছেন। ছবিটি প্রামাণ্য বা

তথ্যচিত্রের আঙ্গিকে উপস্থাপিত। আবহমান বাংলার প্রবাহমান জীবন চেতনার অনুভবের কোনো ভাষ্য নয়, সমকালীন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের কয়েকটি মানুষের খণ্ডিত জীবন মুহূর্তের উদ্ধৃতি মাত্র। নামকরণ অন্য কিছু হলে ক্ষতি ছিল না। ধীরে বহে মেঘনার ব্যাপকতা আর গভীরতার মর্মমূলে প্রবেশ অল্প পরিসরে সম্ভব নয়। এ কথা টাইটলেও ব্যক্ত। অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী দিয়ে দেশীয় চলচ্চিত্র নির্মাণ পদ্ধতিতে আধুনিক এবং ব্যতিক্রমী প্রয়াসের সূচনা আর ধীরে বহে মেঘনা সেই আঙ্গিক প্রকরণে সৃষ্ট বলিষ্ঠ সংযোজন।

চলচ্চিত্রটির নির্মাণশৈলীতে একজন আধুনিক নির্মাতার ছাপ লক্ষণীয়। তবে এটি প্রামাণ্যচিত্রের ঢং-এ নির্মিত বলে জনসংযোগের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র হিসেবে বিবেচিত হলেও এতে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের ত্যাগ তিতিক্ষার চেয়েও যুদ্ধে সহায়তাকারী ভারতীয় জওয়ানদের ভূমিকাই বেশি প্রতিফলিত হয়েছে (কাদের ২৩০)। চলচ্চিত্রটি প্রচারধর্মী প্রবণতা থেকে পুরোপুরি মুক্ত তা বলা যাবে না। কারণ পরিচালকের নিজস্ব চিন্তা-দর্শনের পক্ষে সংলাপের মাধ্যমে বক্তব্য উপস্থাপনের সময় তাঁর সচেতন প্রয়াস অনেক সময়ই প্রচ্ছন্ন থাকেনি (আতিকুজ্জামান ২০২)। মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সহযোগিতার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত দু'দেশের সম্পর্কের দৃঢ়তা বাড়ানোর যথার্থতা প্রতিপন্ন করাই ছিল চলচ্চিত্রটির অন্যতম প্রচারণা লক্ষ্য যা সাধারণ দর্শকও বুঝতে সক্ষম। প্রচারণা প্রবণতার কারণে আরোপিত বলে প্রতীয়মান হলে মহৎ কর্মেরও শিল্প সৌন্দর্য কমে যায়। এ সকল বিষয় বিবেচনা করলে চলচ্চিত্রটি যে ত্রুটিহীন নয় তা অনুধাবন করা যায় (হাসান ১৬৬)। চলচ্চিত্রটি নির্মাণে বিবিধ প্রতিবন্ধকতার কথা পরিচালক আলমগীর কবির উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'বিবিধ কারণে আমাকে চিত্রনাট্য বদলাতে হয়েছে, অনেক দিক বাদ দিতে হয়েছে।...কারণ, স্টুডিওর পূর্ণ সুবিধা পাইনি বলে ছবিটাকে পুরোপুরি সিনেমাটিক করতে পারিনি এবং আরো অনেক কথা বলার ছিল কিন্তু বলতে পারিনি।...তবে আমার পরম শত্রুও নিশ্চয় আমাকে এ বলে দোষারোপ করতে পারবেন না যে বাজারি মনোবৃত্তি নিয়ে আমি ছবিটি করেছি (আতিকুজ্জামান ৩৭-৩৮)।' ধীরে বহে মেঘনা চলচ্চিত্রের সমালোচনায় চিন্ময় মুৎসুদী বলেন, 'এ ছবি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে তৈরি করেছেন নির্মাতা। এটি বাংলাদেশ-ভারত যৌথ প্রয়াস। এখানে এই দুই দেশের 'বন্ধুত্বের' ওপর জোর দেয়া হয়েছে। রোমান্টিকতার আমেজে ভাবাবেগের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি বৈমানিকের মৃত্যুকে আত্মত্যাগ হিসেবে মহিমান্বিত করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এভাবে বিকৃত করা হয়েছে এ ছবিতে। আলমগীর কবিরের কাছে এ দেশের তরুণদের দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ যেন কোন বিষয় নয় (মুৎসুদী ৬২-৬৩)।' তবুও বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে ধীরে বহে মেঘনা চলচ্চিত্রটি এক ভিন্নধর্মী প্রকরণ বা সেলুলয়েডিক স্টাইল। এই প্রামাণ্যের শরীরে টুকরো টুকরো ইমেজ-এর যোজনে গড়ে ওঠে ফিকশানের একটি পূর্ণাঙ্গ অর্গানিক কাঠামো। সামগ্রিক অর্থেই, ধীরে বহে মেঘনা Creative fiction of actuality- প্রামাণ্য আর কাহিনিচিত্রের এক অদ্বৈত অথচ নবতর চলচ্চিত্রিক ভাষা (আক্তার ৮৯)।

ধীরে বহে মেঘনা যে এদেশের এলিট শ্রেণি তেমন পছন্দ করেনি, তার কারণ শুধুই এদেশের এলিটদের সাধারণ ফিলিস্টিনিজম এবং চলচ্চিত্রবোধ তথা সংস্কৃতিবোধের অভাব নয়, আরও গভীর একটি সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক কারণও এর পেছনে কাজ করেছে, তা হচ্ছে-সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা। যে সহজ সাবলীলতায় আলমগীর কবির হিন্দু-মুসলমান এ দুই সম্প্রদায়ের মানুষদের সম্পর্ক গড়েছেন, তা এ এলিট শ্রেণির প্রিয় ছিল না (আতিকুজ্জামান ৪৮)। সাম্প্রদায়িকতার কল্যাণে '৪৭-এর দেশভাগ, যার কল্যাণে আজ তাদের বাড়ি-গাড়ি-বিদেশভ্রমণ-বিলাসব্যসন, ফলে পরিপূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষতার বোধ প্রসার করবে যে চলচ্চিত্র, সাম্প্রদায়িক মানসিকতার গোড়ায় আঘাত হানতে চাইবে যে শিল্পকর্ম, তা তাদের প্রিয় না হওয়ারই কথা। শুধুমাত্র চলচ্চিত্রিক ফর্মটাই হয়তো

এক্ষেত্রে একমাত্র অন্তরায় ছিল না (সাহা ৬০)। বাংলাদেশের দর্শক সমাজ এমনকি বুদ্ধিজীবী সমাজের নিকটও ধীরে বহে মেঘনা সমাদৃত হয়নি। কারো মতে এটি একটি অক্ষম চলচ্চিত্র, আবার কারো মতে এটি যেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয়দের দানের স্বীকারোক্তি (আহমেদ ১৯৪)। এ চলচ্চিত্রের সমালোচনায় পরিচালক আলমগীর কবির বলেন,

The presentation style was a way off the established track. Instead of a story with neat beginning, middle and end what I eventually succeeded in presenting was a cinematic collage of some recreated real-life episodes that occurred during 1971 Liberation War. I also made extensive use of documentary material on war, genocide and destruction that I had shot myself during the war despite the trade's reservation against documentary footage in drama film. I tried to introduce some cinematic naturalism in acting style also. I used two songs not as usual relief interludes but as integral parts in the emotional development of the narrative. Today as I see the film I find too many flaws in it, particularly in cutting and in treatment. However, from this film I have learnt an important lesson in practical film directing and that is: never change your story line-up during shooting. Various political factors have been responsible for the film's cool reception by the critics as well as by the then government. However, it is my firm belief that one day when some temporary emotions will have died down this film, despite its technical weaknesses, might be recognised as an important filmic document on anti-communalism and progressive internationalism (Kabir 71-72).

ধীরে বহে মেঘনা চলচ্চিত্রের পটভূমিতে দেখি মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর বাংলাদেশ, যে বাংলাদেশ সদ্য সমাপ্ত হওয়া যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন কাটিয়ে উঠেনি তখনও। এই চলচ্চিত্রের চরিত্রগুলো বার বারই ফিরে গেছে যুদ্ধের উত্তাল দিনগুলোতে কখনও আত্মকথনে, কখনও যুদ্ধকালীন প্রামাণ্যচিত্রের রাশফুটেজ অবলোকনের মধ্য দিয়ে, আবার কখনও স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে ফ্ল্যাশব্যাকের পাখায় বর করে। চলচ্চিত্র বস্তুত একটি নির্মাণ। এই নির্মাণ প্রক্রিয়ার মধ্যে তিনটি উপাদান প্রধান: দৃশ্যখণ্ড, শব্দখণ্ড ও সম্পাদনাকর্ম। এই তিনটি উপাদানের সমন্বয়েই চলচ্চিত্রের সাংগঠনিক কাঠামোটি অবয়ব প্রাপ্ত হয় (আউয়াল ১৪৩)। ধীরে বহে মেঘনা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও নির্মাতা মুক্তিযুদ্ধের নানা প্রামাণ্য ফুটেজ আর কাহিনি ছবির কল্পিত কথনের মিশেলে তাঁর প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবির সামগ্রিক অবয়ব গড়েন ইতিহাসের চলচ্চিত্রিক ভাষ্য নির্মাণের অভিপ্রায়ে। এখানে প্রামাণ্য এসেছে রিপোর্ট, আর ফাউন্ড ফুটেজের সত্যকথনের মিশেলে। কল্পিত কাহিনির ফাঁকে ফাঁকে প্রামাণ্যের যোজনে গড়ে উঠেছে এই চলচ্চিত্রের পূর্ণাঙ্গ ও অর্গানিক কাঠামো। আধুনিক করণ কৌশলের প্রয়োগ আর পরিচ্ছন্ন উপস্থাপনা সত্ত্বেও এটি ব্যবসা সফল হয়নি। সমকালীন বাণিজ্যিক ছবির রীতি-পদ্ধতি কিংবা গড়পড়তা দর্শক রুচিকে তুষ্ট করার অভিপ্রায় নির্মাতার ছিলনা। একই সাথে তিনি বুঝতেন না ছবিকে ব্যবসা সফল করার এতদ্দেশীয় কৌশল। প্রথম ছবির ব্যবসা অসফলতা কিংবা সমালোচকের চাবুকাঘাতে কবির কিছুটা হতাশ হলেও দমে যাননি। আপোষও করেননি প্রচলিত বাণিজ্যিক ছবির গৎবাঁধা গঠনের কাছে। আবারও তীব্র আত্মপ্রত্যয়ে অঁথর পরিচালকের স্বভাবেই নিজের গল্প ও চিত্রনাট্যে স্মরণের পথে নির্মাতা অগ্রসর হন (আজার ৫৩-৫৪)। ধীরে বহে মেঘনা চলচ্চিত্রটি এক ধরনের ডকুমেন্টারি। এর প্রত্যেকটি ঘটনা সত্যি, যদিও কিছু কিছু সংলাপ পরিচালকের স্বলিখিত। অনিতাকে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার কিছু প্রামাণ্যচিত্রের রাশ দেখানোর সিন্চুয়েশন তৈরি এবং সে রাশ দেখানোর মাঝে সুমিতের ন্যারেশনে

’৭১-এর ভয়াবহ কিছু ছবি যেমন: চোখবাঁধা অবস্থায় নিহত বুদ্ধিজীবী, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ, সম্পূর্ণ সিকোয়েন্সটি নিঃসন্দেহে সিনেমা ভেরিতের বুদ্ধিদীপ্ত এক ব্যবহার।

চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্যে রহিমুল্লাহর এক প্রশ্নের জবাবে সুমিতকে আমরা বলতে দেখি, ‘দেখুন, দেশপ্রেম শব্দটা বড় গোলমেলে। এরই নামে ইয়াহিয়া খান এদেশের ত্রিশ লক্ষ পুরুষ, মহিলা আর শিশুকে হত্যা করেছে। এরই নামে দালালরা বিহারীদের উত্তেজিত করেছে বাঙালিদের হত্যা করতে। আবার এরই জন্যে লক্ষ লক্ষ বীর বাঙালি অস্ত্র তুলে নিয়েছে এবং জীবন দিয়ে দেশকে মুক্ত করেছে।’ রহিমুল্লাহর আরেকটি প্রশ্নের জবাবে সুমিত বলেন,

...বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস কেবলমাত্র দু’এক বছর বা দু’এক দশকের ইতিহাস নয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাংলার নিরীহ, শান্তিপ্ৰিয় মানুষ বিদেশি এবং দেশি শোষকদের অকথ্য অত্যাচার সহ্য করে সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে শোষণের বিরুদ্ধে, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। সত্যি কথা বলতে কি আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ সত্যিকারের জয়ের পথে প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। এর পরের লক্ষ্য একটি শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা। এরই মধ্য দিয়ে বাঙালিকে অনুপ্রেরণা যোগাতে হবে বিশ্বের লক্ষকোটি নিপীড়িত মানুষের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, বর্ণ-বৈষম্যবিরোধী এবং শোষণ বিরোধী সংগ্রামে। (ধীরে বহে মেঘনা চলচ্চিত্রের ডিভিডি থেকে সংগৃহীত)।

সুমিতের বর্ণনার প্রেক্ষিতে পরিচালক প্রামাণ্যচিত্রে দেখিয়ে যান: মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং, গণহত্যা, পরাজিত পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ, যৌথ কনভয়ের অগ্রগতি, বিধ্বস্ত জনপদ, ব্রিজ, রেলগাড়ি, দালালকোঠা; মুক্ত যশোরে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা, মুজিবনগর সরকারের ঢাকা প্রত্যাবর্তন, মিত্রবাহিনীর সৈন্যদের সাথে স্থানীয় মানুষের করমর্দন; নেপথ্যে সংগীত ‘সাগর ভেঙে বন্যার বেগে আয় / আকাশ ভেঙে ঝঞ্ঝার বেগে আয়’। যা আমাদের অনেক দুঃখে গড়া ইতিহাস, নয় মাসের সে প্রামাণ্য দৃশ্যাবলিকে সিনেমা-ভেরিতে স্টাইল পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের শরীরে আলমগীর কবির গেঁথে দিয়েছেন, যে কাজটি করতে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন (সাহা ৫৬-৫৭)।

চলচ্চিত্র সমালোচক আলমগীর কবির ধীরে বহে মেঘনা চলচ্চিত্রটির নির্মাণে প্রামাণ্য রীতি অনুসরণ করেন। সিকোয়েন্স পত্রিকায় এ ছবি সম্পর্কে উইলিয়াম অ্যাডামস লিখেছেন:

The documentary style of its storytelling proved unpopular with a section of the audience. The narrative does away with the conventional story format and attempts to create a cinematic collage with the lives of characters who have all survived the ravages of 1971. Liberation War with still gaping wounds in their hearts. Although the film has been successful in establishing perhaps for the first time in Bangladesh, the style of time cinematic acting it will continue to remain a problems subject with the critics who have so far refrained from attempting its artistic evaluation. Musical scene is excellent, photography is good. (সিকোয়েন্স, সংখ্যা: ১, বর্ষ: ২, ঢাকা, ১৯৭৪)।

ধীরে বহে মেঘনা সমকালে দর্শক জনপ্রিয়তা পায়নি। প্রচলিত ব্যবসা সফল সিনেমার সূত্রানুযায়ী এটি ব্যবসা সফলতা লাভ করেনি। তবুও ছবিটি আলমগীর কবির নামক একজন নিরীক্ষাপ্রবণ পরিচালকের নবতর সিনেমাটিক ভাষা আর বিস্ময় আবিষ্কারের প্রথম পদক্ষেপ। এতে একদিকে যেমন আছে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের ডকুমেন্টেশান, তেমনি আছে সেই সব ডকুমেন্ট বা প্রামাণ্য প্রকাশের এক ভিন্নধর্মী ফিকশান্যাল স্টাইল বা কাহিনি কথন রীতি। মুনাফা অর্জনের পরিমাপে বাংলা ছবির মূল্যায়নের যে মাপকাঠি তাতে চলচ্চিত্রটির দুর্বল অবস্থান দেখে হতাশ হননি পরিচালক (আজার চ-৬)। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম দিককার চলচ্চিত্রগুলো সঙ্গত কারণেই মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ও প্রামাণ্যধর্মী। এ ছবিতে মুক্তিযুদ্ধের মূল রাজনৈতিক ও সামরিক ঘটনাপ্রবাহকে উপজীব্য করা হয়নি (মাসুদ ১৩২)। নির্মাতা আলমগীর কবির বলেন, বক্তব্য কিছু থাক বা না থাক, ঢাকাসেন্দ্রিক বাংলা চলচ্চিত্রশিল্প একটি বিশেষ কারণে এখনও ১৯৪৭-পূর্ব কলকাতার স্টুডিও-ভিত্তিক বায়োস্কোপের রীতিনীতি দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবান্বিত। তেমন অঙ্গনে সিনেমা ডিরেক্ট নিয়ে পরীক্ষা করতে যাওয়া অনেকটা জেনে শুনেই আঁভা গার্ড জাতীয় সুইসাইড প্রচেষ্টার সামিল (সারওয়ার মুখবন্ধ অংশ)। তাই, বায়োস্কোপে নভেল জাতীয় গল্প বিস্তার দেখতে অভ্যস্ত এবং আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-ফর্মের বিবর্তন সম্পর্কে অচেতন দর্শক, সমালোচক-উভয়েরই কাছেই ছবিটি (ধীরে বহে মেঘনা) দূর্বোধ্য রয়ে গেল (কবির, “অন্য চলচ্চিত্র” খ)। এ চলচ্চিত্রটি পরিচালক আলমগীর কবিরকে ব্যতিক্রমধর্মী পরিচালক হিসেবে ১৯৭২ ও ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে বাচসাস পুরস্কার এনে দিয়েছিল (ইসলাম ১৫৯)।

উপসংহার

চলচ্চিত্র শিল্পমাধ্যমটি জীবনের শিল্পিত উপস্থাপনের পাশাপাশি ইতিহাস-ঐতিহ্যেরও ধারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণীয় হলেও সেলুলয়েডেই সন্নিবেশিত হয় সময় ও বাস্তবতার ছবি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস যে সকল গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে গ্রথিত হয়েছে— সে অনুষ্ণগুলোর মধ্যে চলচ্চিত্র অন্যতম। স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস দৃশ্যায়নের মাধ্যমে উপস্থাপিত হলে একইসাথে ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং বিনোদন পাওয়া যায়। মুক্তিসংগ্রামের ভয়াল সময়ের চিত্র গ্রহণপাঠে যতটা উপলব্ধি সম্ভব, তার অধিক প্রতিফলিত করা সম্ভব চলচ্চিত্র মাধ্যমে। মুক্তিযুদ্ধের সময় নির্মাতা আলমগীর কবিরের কলম, ক্যামেরা আর কণ্ঠ তিনই সক্রিয় ছিল। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের সরাসরি অভিজ্ঞতা তাঁর মানসে রেখে গেছে তীব্র অভিঘাত। সেই অভিঘাতের সিনেমাটিক সাক্ষ্য বহন করে তাঁর প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র *ধীরে বহে মেঘনা*। চলচ্চিত্রটি বাণিজ্যিকভাবে ব্যর্থ হলেও বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প-এর মাধ্যমেই জরাজীর্ণ ও প্রচলিত ধারাকে ভেঙে শৈল্পিক মুক্তির পথে একধাপ এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এ এগিয়ে যাওয়ার মাধ্যমেই বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে সত্যিকার ও ব্যাপক অর্থে চলচ্চিত্র ভাষা-প্রয়োগের নবতর প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের প্রথমদিককার চলচ্চিত্র হিসেবে বিজয় উল্লাস-জাতীয় ভাবাবেগ থাকাটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু *ধীরে বহে মেঘনা* চলচ্চিত্রটির তাৎপর্য এ তাৎক্ষণিকতার উর্ধ্বে উঠে গণহত্যা ও গণনির্যাতনের মানবিক দিক ও সাধারণ মানুষের স্বাধীনতার জন্য ত্যাগ-তিতিক্ষাই তুলে ধরা হয়েছে।

তথ্যসূত্র

হায়াৎ, অনুপম। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র। তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ২০১১।

হায়াৎ, অনুপম। আলমগীর কবিরের চলচ্চিত্র পটভূমি বিষয় ও বৈশিষ্ট্য। বঙ্গজ প্রকাশন, ২০১৬।

আতিকুজ্জামান, আবুল খায়ের মোহাম্মদ ও প্রিয়ম প্রীতিম পাল (সম্পা.)। চলচ্চিত্র ও জাতীয় মুক্তি। ১ম খণ্ড, আগামী প্রকাশনী, ২০১৮।

আলম, মোঃ মোরশেদুল। চলচ্চিত্রে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতিফলন (১৯৭২-২০১৪ খ্রি.)। ২০২০। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, পিএইচডি থিসিস।

কবির, আলমগীর। “অন্য চলচ্চিত্র”। মোহনা। ভিন্টেজ প্রকাশনী, ১৯৮৪।

কবির, আলমগীর। “ধীরে বহে মেঘনা”। চিত্রনাট্য ধীরে বহে মেঘনা, সূর্যকন্যা, সীমানা পেরিয়ে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৭৯।

বাংলাদেশের সিনেমার স্মরণীয় গান (১৯৫৬-২০১৬), আসলাম আহসান (সম্পা.), প্রথম প্রকাশন, ২০১৭।

ইসলাম, আহমেদ আমিনুল। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র: আর্থসামাজিক পটভূমি। বাংলা একাডেমী, ২০০৮।

হাসান, খন্দকার মাহমুদুল। মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র। কথাপ্রকাশ, ২০১১।

মুৎসুদী, চিন্ময়। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে সামাজিক অঙ্গীকার। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮৭।

আহমেদ, তারেক। চলচ্চিত্রের চারিদিক। কথাপ্রকাশ, ২০১৮।

মাসুদ, তারেক। চলচ্চিত্রযাত্রা। তৃতীয় মুদ্রণ, প্রথম প্রকাশন, ২০১৩।

দাশগুপ্ত, ধীমান (সম্পা.)। চলচ্চিত্রের অভিধান। চতুর্থ পরিবর্ধিত সংস্করণ, বাণীশিল্প, ২০১৪।

আক্তার, ফাহিমদা। আলমগীর কবিরের চলচ্চিত্র। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ২০১৯।

সারওয়ার, ফাহিম ইবনে ও সামি আল মেহেদী, সিনেমার আলাপ। কথাপ্রকাশ, ২০১৬।

কাদের, মির্জা তারেকুল। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প। বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩।

হোসেন, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ। রোদেলা, ২০১৩।

আউয়াল, সাজেদুল। চলচ্চিত্রচর্যা। জার্মানিয়ান বুকস, ২০১৭।

সাহা, সুশীল (সম্পাদ.)। *বাংলাদেশের অন্য সিনেমা*। অভিযান পাবলিশার্স, ২০১৩।

Kabir, Alamgir. *Film in Bangladesh*. Bangla Academy, 1979.

বৌদ্ধ দর্শনের কার্য-কারণ-তত্ত্বের স্বরূপ ও প্রাসঙ্গিকতা: একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

শাসনানন্দ বড়ুয়া রূপন *

সারসংক্ষেপ: গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব হয়েছিলো খ্রি. পূ. ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে। তিনি ছয় বছর কঠোর সাধনার মাধ্যমে বুদ্ধত্ব বা পরম জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তিনি এ জ্ঞান অধিগত হয়ে আবিষ্কার করেছিলেন কার্যকারণতত্ত্ব। দর্শনের ইতিহাসে এটি একটি বৌদ্ধ দার্শনিক মতবাদ হিসেবে বিবেচিত। বৌদ্ধ দর্শন প্রতীত্যসমুৎপাদ বা কার্য-কারণ-নীতি তত্ত্বে বিশ্বাসী। জীবন ও জগতে হেতু বা কারণ এবং কার্য একই সূত্রে গ্রথিত। কারণ ব্যতীত কোনো কার্য সংঘটিত হয় না। কারণের ওপর নির্ভর করে কার্য সংঘটিত হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে এ কার্য-কারণতত্ত্ব উপলব্ধি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দুঃখ নিবৃত্তিই হলো বৌদ্ধ দর্শনের মূলমন্ত্র। কারণ বৌদ্ধ দর্শনের অন্যতম মূলনীতি আর্যসত্য ও অপরাপর দার্শনিক মতবাদ প্রতীত্যসমুৎপাদ দার্শনিকতত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। গৌতম বুদ্ধ এ নিয়মের ওপর ভিত্তি করে দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের অবসান এবং দুঃখ বিনাশের উপায়তত্ত্ব প্রকাশ করেন। এ প্রবন্ধে বৌদ্ধ কার্য-কারণতত্ত্বের স্বরূপ ও প্রাসঙ্গিকতা, দুঃখ মুক্তি, বিশ্বশান্তি, কার্যকারণতত্ত্ব উপলব্ধির গুরুত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।]

আলোচ্য প্রবন্ধটি বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিতে করা হয়েছে। তথ্য উপাত্তগুলোতে প্রাথমিক ও দ্বৈতয়িক উৎস অনুসৃত হয়েছে। প্রাথমিক উপাত্তগুলি পালি ও বাংলা ভাষায় লেখা। তবে সকল গ্রন্থের বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদ রয়েছে। এছাড়া দ্বৈতয়িক উৎস হিসেবে ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বিভিন্ন লেখকের গ্রন্থ ব্যবহার করা হয়েছে। বস্তুতঃ বৌদ্ধধর্ম-দর্শনে প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্ব একটি সহজবোধ্য বিষয় নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অনেক লেখক, গবেষক বৌদ্ধধর্ম-দর্শনের প্রতীত্যসমুৎপাদের সমর্থনে যুক্তিসম্মত আলোচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে শ্রীবীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দী, ড. সুকোমল চৌধুরী, ভিক্ষু নাগসেন ও গ্রীকরাজ মিলিন্দেব কথোপকথন, ড. বহি কুমারী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকের নাম উল্লেখযোগ্য।

বিষয়সূচক শব্দ (Key Word): অজ্ঞানতা, ভবচক্র, কার্যকারণতত্ত্ব, বিশ্বশান্তি, দুঃখমুক্তি।

ভূমিকা

কার্যকারণতত্ত্ব বৌদ্ধ দর্শনে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। এ কার্যকারণতত্ত্ব দর্শন জগতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কার্যকারণ নিয়মের অর্থ হলো সকল কার্য কারণ থেকে উদ্ভূত হয়। প্রত্যেক কার্যের একটি সুনির্দিষ্ট কারণ বিদ্যমান আছে। কারণ কার্যের পূর্ববর্তী ঘটনা। সুতরাং প্রথমটি কারণ দ্বিতীয়টি হলো কার্য। কিভাবে জীবের পুনঃ পুনঃ জন্ম হয় তার একটি সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে কার্যকারণনীতিতত্ত্বে। প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্ব বলতে কার্যকারণনীতিকে বোঝায়। এখানে দ্বাদশ কারণ বিদ্যমান রয়েছে। দুঃখের পশ্চাতে এ দ্বাদশ নিদানের প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে। এ দ্বাদশ নিদানের প্রথমটি হলো অবিদ্যা। এ অবিদ্যা সত্যকে জানতে দেয় না। অবিদ্যাই হলো সকল দুঃখের আদি বা মূল। প্রকৃত জ্ঞান অর্জন দ্বারা অবিদ্যার অবসান ঘটাতে পারলেই কেবল

* সহযোগী অধ্যাপক, পালি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

সকল দুঃখের অন্তঃসাধন সম্ভব হয়। তাই বলা যায় যে, বৌদ্ধ দর্শন দুঃখমুক্তি ও শাস্ত শান্তির দর্শন। এ প্রতীত্যসমুৎপাদবোধই মানুষকে অনাসক্ত জীবন গঠন, দুঃখের চির নিবৃত্তিতে সহায়তা করতে পারে। এ প্রতীত্যসমুৎপাদবোধের অভাবে মানুষ অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। কার্যকারিত্ববোধের অভাবে অনন্ত দুঃখ সাগরে পতিত হতে হয়। এ বোধ জাগ্রত হলে মানুষ দুঃখ থেকে পরিত্রাণ অর্জন করতে পারে। বুদ্ধের সকল আলোচনাই জীবনকেন্দ্রিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে আলোচিত হয়েছে। বৌদ্ধ দর্শনের আধার হলো প্রতীত্যসমুৎপাদ।

বৌদ্ধ দর্শনে প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্বের অর্থ

প্রতীত্যসমুৎপাদ বলতে কার্যকারণনীতিকে বোঝায়। ‘প্রতীত্যসমুৎপাদ’ কথাটির অর্থ কোনো কিছুকে প্রাপ্ত হয়ে বা অবলম্বন করে কার্যের উদ্ভবকে (On getting the cause, the effect arise) বোঝায়। (সেনগুপ্ত ৯৫)। আবার অভিযুক্ত গমন করে বলে হেতু-সমূহ প্রতীত্য নামে এবং সহযোগী ধর্মকে উৎপন্ন করে বলে ‘সমুৎপাদ’ নামে অভিহিত হয়। অবলম্বনকে ভিত্তি করে প্রবর্তিত হয় বলে ‘প্রতীত্য’ এবং উৎপন্ন হওয়ার সময় সমবায়ে এবং সম্যকরূপে উৎপন্ন হয় অথচ একক নয়, হেতু ব্যতীত নয় বলে ‘সমুৎপাদ’ বলা হয় (শ্রীমৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ভিক্ষু, ১৪৯)। দীর্ঘনিকায়ে ব্রহ্মজাল সূত্রে অধীত্য সমুৎপাদকে দার্শনিক মতবাদরূপে বর্ণিত হয়েছে। তার মূল কথা হলো: আমি পূর্বে ছিলাম না, পূর্বে না হয়ে এখন আমি সত্ত্বে পরিণতি হয়েছি (রাজগুরু শ্রীমৎ ধর্মরত্ন মহাথের, শীলভদ্র ৩১,৩২)। ‘প্রতীত্যসমুৎপাদ’ বলতে একটি সুশৃঙ্খল চিন্তা প্রণালী হিসেবে বৌদ্ধধর্ম-দর্শনের মূলনীতিকে বোঝায়। বোধিসত্ত্ব শান্তির পথ অন্বেষণে বের হয়ে গভীর, দুর্দশ, দুরনুবোধ্য, শান্ত, প্রণীত, তর্কাতীত, নিপুণ ও পণ্ডিতবেদ্য ধর্মের এ দুই তত্ত্ব আয়ত্ত্ব করেছিলেন। সেগুলো হলো- ১. প্রতীত্য সমুৎপাদ, ২. সর্ব তৃষ্ণামুক্ত বিরাগ ও নির্বাণ (শ্রী বেনীমাধব বড়ুয়া ১৭৫-১৯০)। গৌতম বুদ্ধ বলেন:

“বিজ্ঞান প্রতীত্য-সমুৎপাদ, কারণ ব্যতীত বিজ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। কারণবশতঃ উৎপন্ন হয় (পচ্চয়ং পটিচ্চ উপ্পজ্জতি) অর্থেই প্রতীত্যসমুৎপাদ” (বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দী ১)।

বিশিষ্ট বৌদ্ধ গবেষকরা হল সাংকৃত্যায়ন বলেন:

“প্রতীত্য সমুৎপাদে কার্যকারণকে অবিচ্ছিন্ন বিষয় হিসাবে গ্রহণ করা হয় না। বিনাশ ও সৃজন একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত। একেই বুদ্ধ বলেছেন প্রতীত্য সমুৎপাদ। প্রতীত্য সমুৎপাদের বিচ্ছিন্ন প্রবাহকে মূলসূত্র রূপে ধরে নিয়ে পরবর্তী কালের দার্শনিক নাগার্জুন শূন্যবাদের প্রতিষ্ঠা করেছেন (ভট্টাচার্য ২০২০, ১৪)।”

গৌতম বুদ্ধ দীর্ঘ ছয় বছর কঠোর তপস্যার মাধ্যমে যে ফল অর্জন করলেন তা প্রতীত্য সমুৎপাদনীতি বা কার্যকারণনীতি নামে অভিহিত। মানুষের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড; দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যকলাপ প্রতীত্যসমুৎপাদনীতির সাথে এক অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র রয়েছে। প্রাত্যহিক জীবনেও এর প্রভাব রয়েছে। কার্যকারণতত্ত্ব অনুধাবন করতে পারলে মানুষের গুণগত আচরণের মানদণ্ড উন্নত হতে পারে। মানুষ দুঃখ মুক্তির সাধনায় অগ্রসর হতে সক্ষম হবে। মনুষ্যত্বের বিকাশ ত্বরান্বিত হতে পারে। সুশীল ও মানবিক সমাজ বিনির্মাণ সহজতর হতে পারে। মানুষ নানাভাবে উপকৃত হতে পারে। উপর্যুক্ত কারণে বলা যায় যে, বৌদ্ধ দর্শনে মানবতা সত্য প্রকাশমান। তাই মানবতা, বিশ্বশান্তি, দুঃখ থেকে পরিত্রাণের জন্য এ কার্যকারণ নীতির নিবিড় যোগসূত্রের কথা স্বীকার করা অপরিহার্য। বিশেষ করে অবিদ্যাকে সমূলে উৎপাটন করা গেলে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হবে। প্রজ্ঞার আলোয় আলোকিত মানুষ মানবিক হতে বাধ্য। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি কুশল কর্ম সম্পাদন করেন। দুঃখ মুক্তির সাধনায় ব্যাপ্ত থাকেন। এ

জগতে কোনো বস্তু বা ঘটনা আত্মনির্ভর নয়। এ বিশ্বে বিনা কারণে বা আকস্মিকভাবে কিছু সংঘটিত হয় না। প্রতিটি বস্তু ও ঘটনার কারণ রয়েছে। জাগতিক সকল বস্তুই এক সর্বব্যাপক ও অবশ্য-স্বীকার্য ‘কার্য-কারণ’ নিয়মে চলে। এ ‘কার্য-কারণ’ নিয়ম জগতে স্বাভাবিক নিয়মে কাজ করে চলছে। সকল সংস্কার অনিত্য। অনিত্য মাত্রই দুঃখ, যা দুঃখ তা অনাত্ম। একমাত্র শান্ত নির্বাণই হলো পরমার্থ স্বরূপ (সেন ১৪২)। উপর্যুক্ত কারণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অনিত্য অর্থ হলো যা নিত্য, শাস্ত, অবিনশ্বর নয় অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী। এখানে পরিবর্তনশীলতাকে অনিত্য হিসাবে বোঝানো হয়েছে। যা ক্ষণিক, ক্ষণভঙ্গুর, তা দুঃখময়। এ ক্ষণিকত্ববাদ বা ক্ষণ-ভঙ্গবাদ প্রতীত্যসমুৎপাদের অনুসিদ্ধান্ত। কারণের ওপর নির্ভর করে বস্তুর আবির্ভাব ঘটে বলা অর্থ ক্ষণিকত্ববাদ স্বীকার করা। এ কারণ ধ্বংস হলে বস্তুটি তিরোহিত হয়। যা উৎপন্ন হয়; তার ধ্বংস অনিবার্য। যা ধ্বংস বা মৃত্যুর অধীন তা শাস্ত নয়। যা স্থায়ী নয়; তা ক্ষণিক (সরকার ৭৫)। উপর্যুক্ত কারণে প্রতীত্য সমুৎপাদ অনুধাবন করে জীবন ক্ষণস্থায়ী এ বোধ জাগ্রত করে মানবীয় গুণাবলির বিকাশ করা করা যায়। তা সম্ভব হলে সকল দুঃখের অন্তঃসাধন করা যাবে। বৌদ্ধ দর্শনে কার্য-কারণতত্ত্বের স্বরূপ ও এর প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ নিম্নরূপ:

প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্বের শ্রেণীবিন্যাস

বৌদ্ধ সাহিত্য তথা ত্রিপিটকের অন্যান্য গ্রন্থে প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্ব সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে সূত্রপিটকের মধ্যম নিকায়ে অষ্টগত ক্ষুদ্র সকুলোদায়ী সূত্রে বুদ্ধ সকুলোদায়ী পরিভ্রাজকের উদ্দেশ্যে বলেন: উদায়ী! রেখে দাও পূর্বান্ত (পূর্বকোটি) চিন্তা, রেখে দাও অপরাণ্ত (অপরকোটি) চিন্তা (শ্রীমৎ ধর্মাদার মহাস্থবির ১৭০)। যখন এটিকে শুধু দুঃখ সমুদয়ের হেতু নির্ণয়ার্থে তুলে ধরা হয়। তখন এটিকে উৎপত্তির আলোকে বা ‘অনুলোম’ দেশনা হিসেবে অভিহিত করা হয়। যখন এটিকে দুঃখ নিরোধের উপায় হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। তখন এটি নিবৃত্তি বা ‘পটিলোম’ দেশনা হিসেবে অভিহিত। আবার যখন এটিকে দুঃখ সমুদয় ও নিরোধ উভয়ের হেতু নির্ণয়ে উপস্থাপন করা হয়। তখন এটিকে উৎপত্তি-নিবৃত্তিবশে বা ‘অনুলোম-প্রতিলোম’ দেশনা হিসেবে দেখানো হয়। খুদ্ধক নিকায়ে উদান গ্রন্থে রয়েছে: “অনুলোম দেশনা” বা সাধারণ ধারাবাহিকতায় কার্য-কারণ-শৃংখলগুলিকে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত অর্থাৎ উপায়াসা পর্যন্ত চিন্তার বিষয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়। প্রতিলোম দেশনা বা বিপরীত পর্যায়ে সূত্রটি যথাক্রমে অন্ত থেকে আদি পর্যন্ত অর্থাৎ উপায়াসা থেকে আরম্ভ করে পুনরায় অবিদ্যা পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়। গৌতম বুদ্ধ জন্ম-মৃত্যুর রহস্য আবিষ্কার করেন। আবার এক সপ্তাহব্যাপী ধ্যানরত হয়ে প্রতীত্য সমুৎপাদের অনুলোম-প্রতিলোম (উদয়-বিলয়) ভাবনা করেন। বৌদ্ধ দর্শনে রয়েছে: দ্বাদশ নিদানকে দুঃখের কারণ হিসেবে যথার্থরূপে জানতে হবে। এ দুঃখের কারণগুলি ধ্বংস করতে পারলেই সকল দুঃখ থেকে নিবৃত্তি লাভ করা সম্ভব হয়। এটিই হলো প্রতীত্য সমুৎপাদের মূলসূত্র (রনধীর বড়ুয়া ১৯)। প্রতীত্য-সমুৎপাদের দ্বারা সংসারের বিভিন্ন প্রকার দুঃখ-কষ্টের দূরীভূত কারণগুলি দেখানো হয়েছে। এতে দেখানো হয়েছে যে, দুঃখের এ মূলীভূত কারণগুলি নিঃশেষে ধ্বংস করা গেলে ভবিষ্যতে আর দুঃখের উৎপত্তি হবে না। অন্য কথায় এর দ্বারা চতুরার্য সত্যের দুঃখের কারণ সত্য ও দুঃখের অবসান সত্যের নির্দিষ্ট দার্শনিকতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এক কথায় এটিকে সর্বপ্রকার দুঃখ-উৎপত্তি তত্ত্ব ও দুঃখ-বিমুক্তি তত্ত্ব হিসেবে অভিহিত করা হয় (সুদর্শন বড়ুয়া ১৭৬)। প্রতীত্যসমুৎপাদকে বুদ্ধ একটি সোপান শ্রেণির সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মে কার্যকারণ শৃংখলের বারটি কারণ রয়েছে। এ দ্বাদশ নিদানকে সংক্ষেপ করলে লোভ-দ্বेष-মোহরূপে চিহ্নিত করা যায়। বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শনে এ দ্বাদশ নিদান বা ভবচক্রকে ত্রিকালে (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত)-এর মধ্যে ভাগ করা হয়। প্রতীত্যসমুৎপাদের দ্বারা আনুমানিক অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জন্মের পরস্পর সম্পর্ক ও আপেক্ষিকতা দেখানো হয়েছে। পুনর্জন্মের কার্মিক হেতু (কারণ) মোট পাঁচটি। সেগুলো হলো: অতীত ভবের অবিদ্যা, সংস্কার, তৃষ্ণা, উপাদান ও ভব, এই

পাঁচটি কার্মিক হেতুর ফলে বর্তমান জন্মে বিজ্ঞান, নাম-রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ ও বেদনা এই পাঁচটি ফলের উৎপত্তি হয়। বর্তমানের অবিদ্যা, সংস্কার, তৃষ্ণা ইত্যাদি পাঁচটি কার্মিক হেতু আবার ভবিষ্যৎ জন্মে বিজ্ঞান, নাম-রূপ ইত্যাদি পাঁচটি ফল সৃষ্টি করবে। এ নিদান (ভবচক্র) ও প্রত্যয়ের পারস্পরিক সাপেক্ষ ক্রমের ওপরে ভিত্তি করে জগৎ সংসারে জীবের উৎপত্তি ও বিনাশ হয়ে থাকে। অতএব এ অবিরাম পরিবর্তনের মধ্যে নিত্য বা শাস্তত বলে কিছু থাকতে পারে না। তখন কিছুতেই তাঁর আর আসক্তি বা তৃষ্ণা থাকে না। ফলে সকল দুঃখের অবসান সম্ভব হয়। শাস্তত সুখ নির্বাণ লাভও সম্ভব হবে। নির্বাণ লাভই হলো বৌদ্ধ-দর্শনের সার সংক্ষেপ (ড. সুকোমল চৌধুরী ১০৯-১১১)। উপর্যুক্ত আলোচনা বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, নির্বাণ অর্জন করা সম্ভব হলে আর ভব বা পুনর্জন্মের কোনো অবকাশ থাকে না। বুদ্ধ খুব সাবলীলভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তাঁর এ দার্শনিক সত্যের প্রতিষ্ঠা করেছেন। এরূপে মানুষ বৈষয়িক আকাঙ্ক্ষা থেকে, সুখভোগ থেকে বিরত হয়ে দুঃখ মুক্তি, শান্তিপূর্ণ, মানবিক বিশ্ব প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ লাভ করবে।

প্রতীত্যসমুৎপাদের দার্শনিক তত্ত্ব

প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্বের দার্শনিক গুরুত্ব খুবই প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ। বৌদ্ধ দর্শনে রয়েছে: উদ্ভিদ যেরূপ বীজের মাধ্যমে অপর উদ্ভিদের উৎপাদন করে; তেমনি মানুষের বর্তমান জীবনের সাথে পরবর্তী জীবনের একটা ধারাবাহিকতা বা সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। বিশিষ্ট দর্শন লেখক দেবব্রত দাশ বলেন: এর জন্য কোনও সর্বজ্ঞ, নিত্য চেতন কর্তার প্রয়োজন নেই। সুতরাং জগতের কারণরূপে কোনো অতীন্দ্রিয় সত্তার প্রয়োজন পড়ে না (দাশ ১২১)। বর্তমান জন্মে কৃতকর্মের কারণে ফলস্বরূপ প্রাণী জগতের জন্ম-মৃত্যু প্রবাহ সূচনা হচ্ছে। বীজ ও বৃক্ষের ন্যায় আদি সৃষ্টি বলে কোনো কিছুই দেখা যায় না। এটিই প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্বের মৌলিক তাৎপর্য। বুদ্ধের প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বের দুটি দিক আছে। একদিকে জন্ম হতে জন্মান্তরে মানুষ কীভাবে কার্যকারণ পরম্পরার প্রভাবে আবর্তিত হয় তা দেখানো হয়েছে। অপরদিকে বিশ্ব বা সৃষ্টি তত্ত্বের ধারণা কীভাবে গড়ে উঠেছে তা বলা হয়েছে। জগৎ ও মানুষের প্রারম্ভের সম্পর্কে দীর্ঘ নিকায়ে 'অগ্গংগংগ সূত্রে' বর্ণিত বিষয়ের সাথে বর্তমানকার বৈজ্ঞানিকদের 'বিবর্তন সূত্রের' সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। এ সূত্রে বুদ্ধ বলেন: “লোকের (পৃথিবীর) বিবর্তন হবার পর জগৎ জলময় ছিলো, তখন চারদিকে গভীর অন্ধকার, চাঁদ নেই, সূর্য নেই, নক্ষত্র নেই, রাত-দিনের অস্তিত্ব নেই, মাস, পক্ষও প্রকট হয় না, ঋতুও না, বর্ষাও না, স্ত্রী-পুরুষও না (দীর্ঘ নিকায়ে 'অগ্গংগংগ সূত্র বিস্তারিত দ্রষ্টব্য) (শীলভদ্র ৪৮৮)। জগৎ চক্রের চলাকালে কীভাবে সৃষ্টির বিবর্তন ও দীর্ঘ পরিবর্তন হয় বুদ্ধ তা উল্লেখ করেছেন। তিনি (বুদ্ধ) আরও বলেছেন, ব্যক্তি জীবনের ন্যায় এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এবং জগৎ চক্রেরও উদয় হয়; আবার লয় (ধ্বংস) হয়। আমাদের পৃথিবীও একদিন ধ্বংস হবে। পূর্ববর্তী পৃথিবীরও তা হয়ে আসছিল এবং পুনরায় তা হবে। যে ভাবেই হোক না কেন তা সবই কার্যকারণ নিয়মের শৃংখলে গ্রথিত। সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত প্রাণপ্রবাহের মূলে প্রতীত্য সমুৎপাদের দ্বাদশ নিদান বা ভবচক্রের কারণে প্রাণীর জন্ম-পুনর্জন্ম হয়ে আসছে (শীলভদ্র ১-২)। বৌদ্ধ দর্শনে রয়েছে:

“সমুদিত যবে ধর্ম, জ্ঞানের বিষয়,
বীর্যবান ধ্যানরত ব্রাহ্মণের হয়।
দূরে যায় সর্ব শংকা-সকল সংশয়,
জানে যাহে হেতুবশে ধর্মসমুদয়।”^১

যদি এ হেতুটি থাকে, তাহলে এ ফলটি হয়। এটির সৃষ্টি হলে এটির সৃষ্টি হয়। হেতু বা কারণের উৎপত্তিতে ফলোৎপত্তি, হেতু নিরুদ্ধ হলে ফলের নিরোধ হয়। এরূপে দুঃখের উৎপত্তি ও দুঃখের নিরোধ হয় অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর পরিসমাপ্তি। এ উদয় (সৃষ্টি)-বিলয়ের (বিনাশের) অন্তঃসাধনই হলো নিবৃত্তি বা নির্বাণ। বৌদ্ধধর্ম-দর্শন অনুসারে বিশ্বের যাবতীয় কিছুই শর্তাধীন। সব কিছুই কারণ সম্ভূত বা সাপেক্ষ। অকারণে কোনো কার্য সম্পাদিত হয় না। বুদ্ধের উদ্ভাবিত চতুরার্যসত্য ও অপরাপর দার্শনিক মতবাদ এ দার্শনিক তত্ত্বের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এ দার্শনিক বিশ্লেষণ দ্বারা তিনি দুঃখ উৎপত্তির জটিল বিষয়াদির ব্যাখ্যা প্রদান করেন। প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্ব সমগ্র বৌদ্ধ দর্শনের অন্যতম আধার বা আশ্রয় বা মূল ভিত্তি। বস্তুত বৌদ্ধ দর্শন হৃদয়ঙ্গম করার এটি অন্যতম মাধ্যম। এ প্রতীত্যসমুৎপাদনীতি বা কার্যকারণনীতিতত্ত্ব খুবই গম্ভীর এবং গম্ভীরতর। তিনি প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতির ওপর খুবই গুরুত্বারোপ করেছিলেন। তিনি এটিকে ধর্ম হিসাবে অভিহিত করেছেন। প্রতীত্যসমুৎপাদে আরোহণ করে বুদ্ধত্ব জ্ঞান অর্জন করে জগতের রহস্য অনুধাবন করা যায়। বুদ্ধের মতে, ‘এ জগতের প্রতিটি জিনিস, দৈহিক বা মানসিক, অবশ্য স্বীকার্য কার্য-কারণ শৃংখলে আবদ্ধ। কোনো কিছুই বিনা কারণে বা আকস্মিকভাবে ঘটে না বা উৎপন্ন হয় না।’ এ জগতে কোনো বস্তু বা ঘটনা আত্মনির্ভর নয়। প্রতিটি বস্তু বা ঘটনার পেছনে কারণ থাকে। জাগতিক সকল বস্তুই এক সর্বব্যাপক ও অবশ্যস্বীকার্য ‘কার্যকারণ’ নিয়মের অধীন। বিজ্ঞানের একটি অবশ্য স্বীকার্য তত্ত্বের নাম কার্য-কারণ সম্পর্ক (causal relation)। এ কার্য-কারণ সম্পর্কের উপর এ তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত। এ কার্য-কারণ নিয়ম জগতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করে চলেছে। প্রত্যেক কার্যেরই এক পূর্ববর্তী কারণ আছে। মানুষের বর্তমান জীবনের কারণ হলো তার অতীতের কৃতকর্ম। মানুষের বর্তমানের পরিণতি হলো ভবিষ্যৎ। মানুষকে স্বকৃত কর্মের ফলভোগ করতে হয়। কর্মফল অনুযায়ী মানুষকে বারবার জন্মগ্রহণ করতে হবে। তবে আকাঙ্ক্ষামুক্ত, আসক্তিহীন ও মোহমুক্ত কর্মের মাধ্যমে নির্বাণপ্রাপ্ত হয়। এরূপ ব্যক্তি আর কোনো প্রকার অকুশল কর্ম সম্পাদন করেন না। (জিতেন্দ্রলাল বড়ুয়া ২৮)। উপর্যুক্ত আলোচনা বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, নির্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তির পুনর্জন্ম রোধ হয়। ফলে তাকে আর পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে নানা প্রকার দুঃখ ভোগ করতে হয় না।

দ্বাদশ নিদানের স্বরূপ ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

প্রতীত্যসমুৎপাদের বারটি অঙ্গ বিদ্যমান রয়েছে। এতে দ্বাদশ সংযোজনের ভিত্তিতে গঠিত ভবচক্রের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উপর্যুক্ত কারণে প্রতীত্য সমুৎপাদতত্ত্ব সর্বপ্রকার দুঃখের কারন ও দুঃখ থেকে মুক্তির-উপায়তত্ত্ব হিসেবে অভিহিত। দ্বাদশ নিদানের স্বরূপ ও প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রদান করা হলো নিম্নে:

১.১ অবিজ্ঞা বা অবিদ্যা

অবিদ্যা হলো দুঃখের মূল কারণ। পালিতে অবিজ্ঞা যা বাংলায় অবিদ্যা। অবিদ্যাকে ‘জ্ঞানের’ বিপরীত অর্থে বুঝতে হবে। অবিদ্যা অর্থ অজ্ঞানতা। কিন্তু কিসের অজ্ঞানতা? অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম এ ত্রিলক্ষণাত্মক জগতের স্বরূপ সম্যকরূপে উপলব্ধির অভাবই হলো অবিদ্যা। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এ পঞ্চলক্ষ বা জীব ও বস্তুর ধর্মসমূহ যে অস্থায়ী, ক্ষণস্থায়ী ও ক্ষয়ধর্মী হেতু এগুলো যে দুঃখময়, তা বুঝতে না পারাই হলো অবিদ্যা। দুঃখের মূলীভূত কারণ যে তৃষ্ণা, তা না বুঝতে না পারাই হলো অবিদ্যা। তৃষ্ণার বিনাশ করতে পারলে যে দুঃখের অবসান ঘটে, তা’ জানা হলো অবিদ্যা। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ যে দুঃখ নিরোধের উপায় তা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে না পারাটাই হলো অবিদ্যা। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর ধর্মসমূহ যে অসার ও অনাত্ম তা অনুধাবন করতে না পারাই হলো অবিদ্যা (জিতেন্দ্রলাল বড়ুয়া, ২১)। মহামানব গৌতম বুদ্ধ বলেন:

“হে ভিক্ষুগণ! অবিদ্যার অতীত সম্পর্কে এরূপে জানা যায় না যে, এ অবিদ্যা পূর্বে ছিলো না, এটা পরবর্তীতে উৎপন্ন হয়েছে। এ উক্তি প্রেক্ষাপটে বলা চলে যে, ‘এটা প্রত্যয়েই অবিদ্যা’ (ভিক্ষু প্রজ্ঞাদর্শী ১১১)।

দুঃখকে সুখ এবং অসারকে সার মনে করার নামই হলো অবিদ্যা। অবিদ্যা ও অজ্ঞানতার ভেতরেই সকল অকুশল কর্ম ও অশান্তির মূল হেতু নিহিত রয়েছে। এ অবিদ্যাই সাংসারিক, সামাজিক, বৈশ্বিক নানা প্রকার দুঃখ, যন্ত্রণা, অশান্তি এবং লোভ, দ্বেষ, হিংসা, মান ও অভিমান ইত্যাদির কারণ। এ অবিদ্যার নিরোধে সেগুলির বিনাশ হয়। বৈরাগ্য জীবন অবলম্বন দ্বারা অবিদ্যাকে সমূলে উৎপাটন করতে সক্ষম হলে সংস্কারের নিরোধ হয় (কোসম্বী ৮৯)। আমিত্ব বোধই হচ্ছে বিশেষ অশান্তির একটি অন্যতম কারণ। অবিদ্যাকে সমূলে উৎপাটন করতে পারলে আর কোনো আমিত্ববোধ থাকে না। ফলে অশান্তি অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়ে যায়। অবিদ্যার আদি অনির্ণেয়। তা সত্ত্বেও আমরা এর প্রকৃতি নির্ণয় করতে পারি এবং এর প্রভাব হতে নিজেকে মুক্ত করতে পারি। এ মহাসত্য বুদ্ধ বোধিদ্রুম মূলে বসে আবিষ্কার করেছিলেন, যা অত্যধিক কঠিন ও গভীর; পরম্ভু কার্য-কারণ শৃংখলাবদ্ধ (ভিক্ষু শীলাচার শাস্ত্রী ২২২-২২৩)। অবিদ্যাজনিত আসক্তি বিনাশ হলেই চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয় (শ্রী জ্যোতিপাল মহাথের ৫৩)। উপর্যুক্ত আলোচনা বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, দুঃখের কারণ খুঁজতে গিয়ে বুদ্ধ আদিতে এ অবিদ্যাকে স্থাপন করেন। এ অবিদ্যা চতুরার্য সত্য সম্পর্কে কিছুই জানতে দেয় না, বুঝতে দেয় না, দুঃখ মুক্তি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে দেয় না। এরূপ জানতে না দেয়াই হলো অবিদ্যার কার্য। সুতরাং অবিদ্যা চিন্তের এমন এক অজ্ঞানতা; যেই অজ্ঞানতা চিন্তকে উক্ত তত্ত্বগুলি উপলব্ধি করতে করতে দেয় না (মুৎসুদ্দি ৩)। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, একমাত্র অর্হৎ চিন্তই অবিদ্যা, ক্লেশ এবং একমাত্র চ্যুতিচিন্তই প্রকৃত জীবিতেন্দ্রিয়কে ধ্বংস করতে সক্ষম (শীমৎ জ্যোতিপাল স্থবির তাইওয়ান প্রিন্ট, ১৭০)। কিন্তু অবিদ্যামুক্ত ব্যক্তি বুঝতে পারেন যে, জীবন ক্ষণস্থায়ী। এর ফলে জন্ম-মৃত্যুর অধীন থেকে মুক্ত হয়ে দুঃখ নিবৃত্তি করতে সক্ষম হয়। তারই আলোকে বলা যায়, অবিদ্যা হলো জন্ম-জন্মান্তরে চক্রের মূল কারণ। অবিদ্যাকে ভিত্তি করেই বিশ্বপ্রবাহের অনুভূতি (বন্দোপাধ্যায় ৩০, ৩১)। উপর্যুক্ত বিষয়টি বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, নির্বাণ প্রত্যাশী ব্যক্তি সর্ব প্রকার দুঃখ, সর্ব প্রকার আসক্তি হতে মুক্ত হওয়ার অভিপ্রায়ে উন্নত চরিত্র গঠন করতে স্থিরচিত্ত হন। পুনর্জন্ম রোধ করে সর্ব প্রকার দুঃখ থেকে মুক্তির জন্য, শাস্ত্রত সুখ ও বিমুক্তি (বন্ধন হতে মুক্তি) কামনা করেন। অপ্রাপ্ত নির্বাণ প্রত্যাশা করেন। এরূপ ব্যক্তি প্রথমে অবিদ্যার জাল ছিন্ন করে বিদ্যাসম্পন্ন হওয়ার চেষ্টা করে। কেননা, বিদ্যা বা প্রকৃত সত্য জ্ঞান অর্জনই দুঃখ মুক্তির সন্ধান দিতে পারে। জ্ঞান দ্বারা অবিদ্যার বিনাশ সাধন করা সম্ভব হয় (শ্রী মহিমচন্দ্র বড়ুয়া ৮)। বিদ্যার (চতুরার্য সত্য জ্ঞান) সাথে শ্রদ্ধা (চিন্তের প্রসন্নতা), স্মৃতি (পুনঃ পুনঃ পুণ্যকর্ম স্মরণ) সমাধি (কুশল কর্মে একাগ্রতা), সংকল্প ও বীর্য (উদ্যমের সাথে দুঃখ মুক্তির প্রচেষ্টা বা সাধনা) দ্বারা অবিদ্যার বিনাশ সাধন করা সম্ভব হয়। যে কোনো সাধক বিমুক্তি মার্গ অনুমোদনের পর শীল অনুশীলনে অপায় গমনের পথ রুদ্ধ করতে সক্ষম হন। সমাধি চর্চা করে তিনি কামলোকে উৎপত্তি রোধ করেন। প্রজ্ঞা লাভে তিনি সকল পুনর্জন্ম রোধ করেন। যদি সাধক পরিপূর্ণরূপে শীল পালন করেন এবং অল্প পরিমাণে সমাধি ও প্রজ্ঞার অনুশীলন করলে, তিনি শ্রোতাপত্তিফল ও সঙ্কদাগামি ফল প্রাপ্ত হন। যদি সাধক শীল ও সমাধি পরিপূর্ণরূপে সাধনা করেন, তিনি অনাগামী ফল প্রাপ্ত হন। সাধক শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা পরিপূর্ণরূপে অনুশীলন করেন। তিনি অর্হৎত্বের অনুপম বিমুক্তি সম্প্রাপ্ত হন। বুদ্ধ বলেন: জগতের আদি সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত নয়। কারণ জগতের আদি চিন্তাতীত। এটি চিন্তা করলে সময় অপচয় হয়। ফলে তাকে পরে অনুশোচনা করতে হয়। (অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া ৩৮০, ৩৮১)। ‘অবিদ্যা’ জগতের আদি নয়; অবিদ্যা চির বিদ্যমান। বিশিষ্ট বৌদ্ধ পণ্ডিত সুভদ্র ভিক্ষু বলেন:

“অজ্ঞতা বা অবিদ্যার কারণে প্রকৃত সত্য জানা যায় না। যার ফলে দুঃখের মধ্যে পতিত হতে হয় এবং মুক্তি লাভ আর হয়ে উঠে না।” (Vikkhu 68)

উপর্যুক্ত আলোচনা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, অবিদ্যা ধ্বংস হলে প্রজ্ঞা উদয় হয়। প্রজ্ঞা মানুষকে আলোকিত মানুষে পরিণত করে। সুতরাং সর্ব অশান্তি, দুঃখের মূলে রয়েছে অবিদ্যা। এ অবিদ্যাকে অপসৃত করা সম্ভব হলে ইহ-জাগতিক, বৈশ্বিক ও পারমার্থিক, আধ্যাত্মিক সুখ, বিশ্বশান্তি, কল্যাণ, দুঃখ থেকে মুক্তি সহজ হবে। তাই সর্ব প্রকার দুঃখ হতে মুক্তি প্রয়াসে জ্ঞানের প্রদীপ্ত শিখায় ভাস্বর হওয়া তাৎপর্যমণ্ডিত। সাধনার দ্বারা অবিদ্যা দূরীভূত করা গেলে সকল প্রকার দুঃখ, অশান্তি অপসৃত হয়ে যাবে।

১.২ সংস্কার

অবিদ্যার কারণে সংস্কারের সৃষ্টি হয়। সৎ ও অসৎ মনোবৃত্তিকে সংস্কার বলে। মানুষ ভালো চিন্তা ও কর্মের মাধ্যমে, আদর্শ কর্মের দ্বারা সৎ সংস্কার সৃষ্টি করতে পারে। ভালো কর্ম সম্পাদনের অভ্যাস গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। তাহলে মানুষের পক্ষে দুঃখ থেকে পরিত্রাণ অর্জন করা সহজ হবে। সংস্কারের পালি অভিধা ‘সংখার’। পালিতে এ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন: সংস্কারের অন্য নাম কর্ম। প্রতীত্যসমুৎপাদ বা কার্যকারণ প্রবাহে সংস্কার মানে চেতনা। চেতনা ব্যতীত কর্ম সম্পাদিত হয় না। অতএব, প্রতি কর্মের মূলে রয়েছে কর্ম সম্পাদনের চেতনা বা সংস্কার। চিত্ত অবিদ্যা অবস্থায় যখন কোনো বিষয় চিন্তা করে, বাক্য বলে বা কার্য করে, তখন সেই চিন্তা, বাক্য বা কার্য চিত্তের এক নতুন ভাবের সৃষ্টি করে। চিত্তের এই নতুন ভাব বা অবস্থার নাম হলো ‘সংস্কার’। চেতনাই ভালো-মন্দে পুঞ্জীভূত হয়ে সংস্কারে পরিণত হয়। আর তার অপর নাম হলো কর্ম। এ কর্ম পুনর্জন্ম উৎপাদক। এটিই ‘অবিজ্ঞা পচয়া সংখারা’। অর্থাৎ অবিদ্যার কারণে সংস্কারের উৎপত্তি হয়। সংস্কারের উৎপত্তির পক্ষে অবিদ্যা প্রধান প্রত্যয় বা কারণ। কিন্তু একমাত্র হেতু নয়। এ বিষয়ে আরও বিভিন্ন প্রত্যয় সাহায্য করে থাকে। মানুষ যদি ভালো কর্মের মাধ্যমে, আদর্শ কর্মের দ্বারা সৎ সংস্কার সৃষ্টি করতে পারে, কল্যাণমূলক কর্ম সম্পাদনের অভ্যাস গড়ে তুলতে সক্ষম হয় তাহলে মানুষের কোনো প্রকার অশান্তি, দুঃখ থাকবে না। কার্যকারণ নীতির দ্বাদশ অঙ্গের উৎপত্তি বহু কারণের উপর নির্ভর করে। এখানে শুধু প্রধান প্রত্যয় বা কারণ, প্রকট প্রত্যয় বা অসাধারণ প্রত্যয় মাত্র উল্লেখিত হয়েছে (শ্রী বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি ৩, ৪)। সংস্কার পঞ্চংস্কন্ধের একটি অন্যতম উপাদান। কিন্তু চার লোকোত্তর মার্গচিহ্ন সংস্কার নয়। কারণ লোকোত্তর চিহ্নগুলি অবিদ্যা ধ্বংসকারক। লোকোত্তর চিহ্নে প্রজ্ঞার আধিপত্যই প্রধান এবং ইচ্ছাকৃত চেতনা লৌকীয় চিত্ত সমূহে প্রাধান্য লাভ করে। অকুশল কর্মে অবিদ্যার প্রভাবই প্রধান। অবিদ্যার কারণে অকুশল কর্ম সম্পন্ন হয়ে থাকে (রঞ্জন বড়ুয়া ৩১০)। অবিদ্যা প্রধান প্রত্যয় হয়ে চিত্তে পুনর্জন্ম দায়ক তিন প্রকার সংস্কার (ভিক্ষু শীলাচার শাস্ত্রী ২২১)। উৎপন্ন করে থাকে। সেগুলো হলো: ১.পুণ্য সংস্কার ২.অপুণ্য সংস্কার এবং ৩.আনেন্জা সংস্কার। এগুলোর ব্যাখ্যা নিম্নরূপ:

- পুণ্য সংস্কার: অনেকে অবিদ্যার অপকারিতা চিন্তা করে তার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে চেষ্টা করেন। অবিদ্যাকে ক্ষয় করার অভিপ্রায়ে দানাদি, কল্যাণমূলক কর্ম সম্পাদন করেন। তখন তাঁর সদাভ্যাস গঠিত হয় ও কুশল সংস্কার উৎপন্ন হয়। দান, শীল, ভাবনায় রত হন। এরূপ কুশল কর্ম সম্পাদন করাই হলো পুণ্য সংস্কার। এরূপ কর্ম অনাবিলতার জন্য হয় সুন্দর, সুশোভন। এ জন্য তাকে বলা হয় কুশল বা পুণ্য কর্ম সংস্কার।

- অপুণ্য সংস্কার: অবিদ্যাচ্ছন্ন চিন্তে কোনো ব্যক্তি লোভ, দ্বেষ, মোহ চিন্তের দ্বারা চুরি, ব্যাভিচার, হত্যার মতো অকুশল কর্ম করে থাকে। এরূপ অকুশল কর্ম সম্পাদনের অভ্যাসকে অকুশল সংস্কার বলে। অপুণ্য চেতনা কাম-ক্রোধাদি অকুশল, পাপবিদ্ধ। অপুণ্য চেতনা প্রসূত কর্মকে বলা হয় অকুশল বা পাপকর্ম সংস্কার।
- আনেন্জা সংস্কার: ভাবনাদি দ্বারা উৎপন্ন চার প্রকার অরূপাবচর কুশল চেতনাই আনেন্জা সংস্কার। এখানে সূত্রপিটকের অন্তর্গত ধর্মপদের একটি শ্লোক প্রণিধানযোগ্য। যেমন:

সুখং যাব জরা সীলং সুখা সদ্ধা পতিট্ঠিতা,
সুখো পঞ্ণায় পটিলাভো পাপনং অকরণং সুখং (পণ্ডিত ধর্মাদার মহাস্থবির ১১৯)।

অর্থাৎ, বার্ষিক্য পর্যন্ত সচ্চরিত্র থাকা সুখকর, প্রতিষ্ঠিত শ্রদ্ধা সুখকর, প্রজ্জালাভ সুখপ্রদ এবং পাপাচরণ না করাই সুখকর। এখানে সুখ লাভের জন্যে পুণ্যকর্ম সম্পাদনের ওপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন উঠে যে, সংস্কার কেন হয়, কিসের কারণে সংস্কার? এর উত্তরে বলা যায় যে, অবিদ্যা, অজ্ঞানতা বা সত্যোপলব্ধির অভাবে সংস্কার উৎপন্ন হয় (ভট্টাচার্য ১৩)। এ সম্পর্কে বুদ্ধ এক সময় বলেন: তাঁর সভায় হয়ত এমন একজন শ্রমণ আছেন; যিনি ভাবছেন যে তাঁর মৃত্যুর পর তিনি হয়ত একটি পরাক্রান্ত রাজ পরিবারে জন্ম নেবেন। এ ভাবনাই পুনর্জন্মের সুখের আকাঙ্ক্ষা বা আকুতি। এটিকেই ভবচক্রের দ্বিতীয় নিদানে ‘সংস্কার’ বলে (দাশগুপ্ত ৯৩)। প্রতীত্য সমুৎপাদ বা কার্যকারণ প্রবাহে সংস্কার মানে চেতনা। সূত্র পিটকের অঙ্গুত্তর নিকায়ে রয়েছে: “চেতনাহং ভিক্ষবে কস্মং বদামি”। অর্থাৎ, চেতনাই কর্ম নামে অভিহিত। বস্তুতঃ চেতনা কর্মে রূপান্তরিত হয়। সচেতন চেষ্টা ছাড়া কর্মের অনুষ্ঠান হয় না। অতএব প্রতি কর্মের মূলে রয়েছে কর্ম সম্পাদনের চেতনা। পুনরায় চেতনা লোভাদি হেতুযুক্ত হয়ে কর্মে পরিণত হয়। এ চেতনা সংস্কার রূপে চিত্ত সত্ত্বতিতে সুপ্ত অবস্থায় অবস্থান করে। সুযোগ পেলে এটা কায় ও বাক্য দ্বারে ক্রিয়াক্রমে আত্মপ্রকাশ করে। এজন্য বলা হয়, নির্বাণ লাভ না হওয়া পর্যন্ত চিত্ত সত্ত্বতিতে এটি সুপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। যখন সুযোগ পায় তখনই ফল প্রদান করে (ড.রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া ৪৬১, ৪৬২)। এ সংস্কারের উৎপত্তি ও নিরোধ সম্পর্কে নাগসেন ও রাজা মিলিন্দের প্রশ্নোত্তর (পণ্ডিত ধর্মাদার মহাস্থবির ৪৭) নিম্নরূপ:

মিলিন্দ : ভন্তে নাগসেন ! এমন কোনো সংস্কার আছে, যা উৎপন্ন হয় ? “নাগসেন : হ্যাঁ মহারাজ ! এমন কোনো সংস্কার আছে যা উৎপন্ন হয়।” মিলিন্দ : সেগুলি কি কি ? নাগসেন : মহারাজ ! চক্ষু-বিজ্ঞান হতে চক্ষু সংস্পর্শ হয়, চক্ষু সংস্পর্শ হতে বেদনা (অনুভূতি) হয়, বেদনা হতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হতে উপাদান হয়, উপাদান হতে ভব (কর্ম) হয়, ভব হতে জন্ম হয়, জন্ম হতে জরা-মরণ-শোক-পরিবেদন-দুঃখ-দুশ্চিন্তা-হতাশা উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে কেবল এ দুঃখপুঞ্জের উৎপত্তি হয়। নাগসেন : মহারাজ ! চক্ষু ও রূপ না থাকলে চক্ষু-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় না, চক্ষুবিজ্ঞান না থাকলে চক্ষু সংস্পর্শ হয় না, চক্ষু সংস্পর্শ না থাকলে বেদনা উৎপন্ন হয় না, বেদনা উৎপন্ন না হলে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় না, তৃষ্ণা উৎপন্ন না হলে উপাদান উৎপন্ন হয় না, উপাদান উৎপন্ন না হলে ভব উৎপন্ন হয় না, ভব উৎপন্ন না হলে জন্ম হয় না, জন্ম না হলে জরা মরণ-শোক-পরিবেদন-দুঃখ দুশ্চিন্তা হতাশা উৎপন্ন হয় না, এ প্রকারে কেবল এই দুঃখপুঞ্জের সম্পূর্ণ নিরোধ হয়ে যায়।’ মিলিন্দ : “ভন্তে নাগসেন ! আপনি দক্ষ।” বুদ্ধ ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে আনন্দকে বলেন:

“কোনো (সম্যক) দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি সংস্কারকে নিত্য বলে স্বীকার করতে পারে না। বরং যে কোনো পৃথগজন (সাধারণ মানুষ) সংস্কারকে সুখদায়ক বলে গ্রহণ করতে পারে” (শ্রী বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী ৭৬)।

অবিদ্যা দূর করতে পারলে সংস্কার ধ্বংস হয় (সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভাস্তে) ভূমিকা)। উপর্যুক্ত আলোচনা বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, অবিদ্যাকে ধ্বংস করে সর্ব প্রকার সংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারলে সর্ব প্রকার দুঃখ থেকে নিবৃত্তি অর্জন করা সম্ভব হয়।

১.৩ বিজ্ঞান

পালিতে বিঞঞানং, বাংলায় বিজ্ঞান এবং ইংরেজিতে (Consciousness)। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করাই হলো বিজ্ঞান। বিজ্ঞানে অন্ধবিশ্বাসের কোনো স্থান নেই। বিজ্ঞান চায় প্রমাণ। যদিও যে অর্থে বিজ্ঞান শব্দটি প্রচলিত বৌদ্ধ দর্শনে সে অর্থে বিজ্ঞান শব্দটি ব্যবহৃত হয় না। তথাপি বৌদ্ধ-দর্শনে অন্ধবিশ্বাসের কোনো স্থান নেই। এ দর্শনে অপ্রমাণিত বিষয়ের কোনো স্থান নেই। এখানে অপরীক্ষিত বিষয়ের কোনো স্থান নেই। এ দর্শনে কল্পনার কোনো স্থান নেই। বৌদ্ধধর্ম-দর্শন একটা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত যা তৎমুহূর্তে প্রমাণ করা যায় (সন্দিট্টিকো) প্রত্যক্ষদৃষ্ট (প্রদীপ কুমার বড়ুয়া ১)। উপর্যুক্ত আলোচনা হতে দেখা যায় যে, বৌদ্ধ দর্শন হলো প্রত্যক্ষদৃষ্ট দর্শন। প্রতীত্য সমুৎপাদে যে বিজ্ঞান বা মনের উল্লেখ আছে, তা হচ্ছে প্রতিসন্ধি চিন্ত। প্রতিসন্ধি চিন্তের কথা বলতে গেলে ভবাঙ্গ চিন্ত ও চ্যুতি চিন্তের কথাও বলতে হয়। নদীর উৎসের সঙ্গে নদীর ও তার মোহনার যে সম্পর্ক, প্রতিসন্ধির সঙ্গে ভবাঙ্গ ও চ্যুতির সম্পর্কও একই। নদীর প্রবাহে তার উৎস, মধ্যভাগ ও মোহনা যেমন সম্পর্কযুক্ত, তেমনি জীবন প্রবাহে প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ ও চ্যুতি আদি, মধ্য, অবসানরূপে সম্পর্কিত। কালের অনন্ত বিস্তারে জীবের জীবত্বের লীলা চলে। অর্থাৎ, এমতাবস্থায় জন্ম-জন্মান্তর গ্রহণ চলতে থাকে। তখন সংস্কার রূপ কর্মবীজের অংকুরণে মৃত্যুর অব্যবহিত পরবর্তী নতুন জন্মালগ্নে যে চিন্তের উদয় হয়, তাকে বলা হয় প্রতিসন্ধি চিন্ত। মৃত্যু ও নবজন্মের সন্ধিক্ষণে দুই ভবের মধ্যে মিলন হেতু রচনা করে বলে প্রতিসন্ধি চিন্ত তার উৎস। প্রতিসন্ধি চিন্তের পরেই ভবাঙ্গ প্রবাহ বা ভবাঙ্গ চিন্ত যা চলতে থাকে আজীবন। একে মনের অবচেতন স্তর বলা যায়। মৃত্যুকালে যে চিন্ত একটি জন্মের ওপর যবনিকা টেনে চ্যুতি ঘটায় তাকে বলা হয় চ্যুতি চিন্ত। অতএব, একটি জন্মের কাল সীমার মধ্যে এ তিনটি চিন্ত যথাক্রমে আদি, মধ্য ও অবসান রূপে চিহ্নিত (শ্রী শীলানন্দ ব্রহ্মচারী ৯, ১০)। সংযোজন (বন্ধন) সমুহের বিষয়ীভূত ধর্মসমুহের প্রতি ক্ষতি উপলব্ধি করে বসবাস করতে পারলে বিজ্ঞানের সঞ্চারণ হয় না (শীলানন্দ ব্রহ্মচারী ২৫৪)। সংযোজন বা বন্ধন ছিন্ন করতে পারলে মানুষ নিজেকে বিশ্বে একজন আধ্যাত্মিক, মানবিক ব্যক্তিত্বে পরিণত করতে পারে। একজন সত্যমনস্ক, আধ্যাত্মিক মানুষ বিশ্ববাসীকে আলোর পথ প্রদর্শন করতে পারে, দুঃখ থেকে নিবৃত্তি অর্জন করতে পারে।

১.৪ নাম-রূপ

নাম-রূপ এ মিশ্র শব্দকে কেবল নাম, কেবল রূপ এবং সংযুক্তরূপে নাম-রূপ হিসেবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। এখানে নাম বলতে তিন প্রকার স্কন্ধকে বোঝায়। সেগুলো হলো: বেদনা, সংজ্ঞা এবং সংস্কার। যা প্রতিসন্ধি চিন্তের সঙ্গে একমাত্র (সহজাত রূপ) উৎপন্ন হয় (সুভূতি রঞ্জন বড়ুয়া ৩১১)। কার্যকারণ প্রবাহে আমরা দেখতে পাই, বিজ্ঞানের উদয়ে নাম-রূপের উদয়। সহজ কথায় বলা যায় যে, নাম হচ্ছে সত্তার সূক্ষ্ম মানসিক অংশ, রূপ বলতে স্থূল বা ভৌতিক অংশকে বোঝায় অর্থাৎ কায় ও মন-এ দু’টির সমন্বয়ে জীব। জীবের ভৌতিক দেহের মধ্যে পড়ে রূপ এবং মানসিক দেহের মধ্যে পড়ে বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার। এ দু’য়ে মিলে হয় নাম-রূপ। সংস্কার

হচ্ছে মনোবৃত্তিসমূহ। লোভ, দ্বেষ, মোহ, মান, ঈর্ষা, মাৎসর্য প্রভৃতি অকুশল বা পাপ মনোবৃত্তি এবং অলোভ, অদ্বেষ, শ্রদ্ধা, প্রীতি, করুণা ইত্যাদি কুশল বা পুণ্য মনোবৃত্তি। বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার এ তিনটিকে একত্রে বলা হয় ‘নাম’(মন)। বস্তুত ‘নাম হচ্ছে চিন্ত বা মন এবং রূপ হচ্ছে ভৌতিক দেহ। উপর্যুক্ত কারণে ইন্দ্রিয়গোচর এবং তাদের গ্রাহ্য বিষয়সমূহ নাম-রূপের অন্তর্গত (ড. সুমঙ্গল বড়ুয়া, বেলু রানী বড়ুয়া ও রানী বড়ুয়া ৮৯, ৯০)। তবে আমরা বস্তুতপক্ষে বা সাধারণতঃ যে অর্থে বিজ্ঞান কথাটি ব্যবহার করি, সে অর্থ এখানে প্রযোজ্য নয়। ‘বিজ্ঞানাতীতি বিজ্ঞানং চিন্তেতীতি চিন্তং’ অর্থাৎ, জানা অর্থে বিজ্ঞান এবং চিন্তা করা অর্থে চিন্ত বলা হয়। এ অর্থ সংকীর্ণ, ব্যাপক নয়, তবে বিজ্ঞান এবং চিন্ত মনের প্রতিশব্দ। সুতরাং বিজ্ঞান বলতে মনকেই বোঝায়। মানসিক বৃত্তিসমূহ ব্যতীত মনের কোনো ব্যাপার সংঘটিত হতে পারে না। তাদের সম্মিলনেই তা সম্ভব হয়। এতে উভয়ের একই বস্তু বা আধার, একই আলম্বন বা বিষয়। অতএব, মন এবং মানসিক বৃত্তি সমূহ কোনোটি আগে এবং কোনোটি পরে না হয়ে একসঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে উৎপন্ন হয় এবং একই সঙ্গে ভেঙে যায়। মনোত্পত্তির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ সম্পর্কে আচার্য বুদ্ধঘোষের উক্তি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন: বুদ্ধ কঠিনতর কার্য করেছেন, যেহেতু তিনি একালম্বনে স্থিত চিন্ত চৈতসিক ধর্মসমূহের (মন ও মানসিক বৃত্তি সমূহের) প্রত্যেকটিকে পৃথক করে ভাষায় প্রকাশের উপযুক্ত অভিধা উদ্ভাবন প্রদর্শন করেছেন। এক্ষেত্রে রাজা মিলিন্দ ও ভদন্ত নাগসেনের প্রশ্নোত্তর প্রণিধানযোগ্য। এ নাম ও রূপের একত্ব ও নানাত্ব সম্পর্কে রাজা মিলিন্দ ও ভদন্ত নাগসেনের প্রশ্নোত্তর (পণ্ডিত ধর্মাদার মহাস্থবির ৪৭) নিম্নরূপ:

মিলিন্দ : কে জন্মগ্রহণ করে?

নাগসেন : নাম ও রূপ জন্মগ্রহণ করে।

মিলিন্দ : এই নাম-রূপই কি জন্মগ্রহণ করে?

নাগসেন : এই নাম-রূপই জন্মগ্রহণ করে না। মানুষ এই নামরূপ দ্বারা পাপ কিংবা পুণ্য কর্ম করে, সেই কর্ম দ্বারা অপর নাম-রূপ জন্মগ্রহণ করে।

মিলিন্দ : যদি এই নাম-রূপই জন্মগ্রহণ না করে, তবে সে পাপ কর্ম থেকে মুক্তিলাভ হবে কি?

নাগসেন : যদি পুনর্বীর জন্মগ্রহণ না করে তবে পাপ কর্ম হতে মুক্ত হতে পারে। কিন্তু যেহেতু সে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে সে কারণে পাপ কর্ম হতে মুক্ত নয়।

মিলিন্দ : উপমা প্রদান করুন।

নাগসেন : যেমন কোনো ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির আম চুরি করে। আমের মালিক তাকে ধরে রাজার কাছে নিয়ে যায় এবং বলে-দেব! এ ব্যক্তি আমার আম চুরি করেছে। তখন চোর বলে-দেব! আমি তার আম চুরি করিনি। তিনি এক আম রোপন করেছেন, আমি অন্য আম নিয়েছি। সুতরাং আমার শাস্তি হওয়া অনুচিত। এ ব্যক্তি দণ্ডনীয় হবে কি না?

মিলিন্দ : দণ্ডনীয় হবে।

নাগসেন : কেন? মিলিন্দ : যদিও সে এরূপই মানুষ এই নাম ও রূপ দ্বারা পাপ কিংবা পুণ্যকর্ম করে। সে কর্ম দ্বারা পাপ কিংবা পুণ্যকর্ম করে। সে কর্ম দ্বারা অন্য নাম রূপ পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। এ কারণে সে আপন কর্ম হতে মুক্ত নয়।

মিলিন্দ : পুনরায় উপমা প্রদান করুন?

নাগসেন : যে কোনো ব্যক্তি অপর কারও ধান্য বা ইক্ষু চুরি করে এবং ধরে আনলে আশ্রচোরের মতো বলে--- । মহারাজ! যেমন কোনো ব্যক্তি শীতকালে অগ্নি জ্বলে তাপ নিল এবং সেটা নিভিয়ে চলে গেল। তৎপর সেই অগ্নি অন্য লোকের ক্ষেত্র দক্ষ করল। তখন ক্ষেত্রের মালিক তাকে ধরে রাজার নিকট নিয়ে আসে এবং বলে ‘রাজন! এই ব্যক্তি আমার ক্ষেত্র প্রজ্জ্বলিত করেছে।’ সে এরূপ বলে-‘দেব! আমি তার ক্ষেত্র প্রজ্জ্বলিত করিনি। আমি তার ক্ষেত্র প্রজ্জ্বলিত করিনি। আমি যা নির্বাপিত করিনি তা এক অগ্নি, আর যা ক্ষেত্র প্রজ্জ্বলিত করেছে সেটা অপর অগ্নি। সুতরাং আমি দণ্ডিত নই।’ এখন মহারাজ! আপনি বলুন, তাকে শাস্তি দেয়া উচিত কিনা?”

মিলিন্দ : হ্যাঁ ভণ্ডে! শাস্তি হওয়া উচিত।”

নাগসেন : কেন?

মিলিন্দ : যদিও সে এরূপ বলে তবু ভণ্ডে! পূর্বের অগ্নি প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন থাকায় পরবর্তী অগ্নির জন্য সে দণ্ডিত হবে।

নাগসেন : “মহারাজ! এরূপ মানুষ এই নাম-রূপ দ্বারা পাপ কিংবা পুণ্য কর্ম করে---- ।

মিলিন্দ : আরও উপমা প্রদান করুন।

নাগসেন : মহারাজ! যেমন কোনো ব্যক্তি প্রদীপ নিয়ে স্থায়ী প্রাসাদের ছাদে উঠে এবং সেখানে ভোজন করে। সেই প্রদীপ জ্বলতে জ্বলতে কোনো তৃণ দক্ষ করল। তৃণ জ্বলতে জ্বলতে কোনো গৃহ দক্ষ করল। গৃহ জ্বলে সমগ্র গ্রাম দক্ষ করল। গ্রামবাসীরা সেই ব্যক্তিকে ধরে বলল ‘তুমি কেন গ্রামে আগুন জ্বলে দিলে? তখন সে বলল ‘ আমি গ্রামে আগুন জ্বলে দিইনি, আমি যে আলোতে ভোজন করেছি সেই প্রদীপাগ্নি ছিল এক, আর যে অগ্নিতে গ্রাম জ্বলেছে তা অন্য’। মহারাজ! এ প্রকারে বিবাদমান উভয় পক্ষ আপনার নিকট উপস্থিত হলে আপনি কার পক্ষে রায় দিবেন?”

মিলিন্দ : ভণ্ডে! গ্রামবাসীর দিকে।”

নাগসেন: কেন?

মিলিন্দ: যদিও সে এরূপ বলে তবুও তা (প্রদীপাগ্নি) হতে এই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়েছে।

নাগসেন: মহারাজ! এ প্রকারেই যদিও মরণের সময় এক নাম-রূপ বিনষ্ট হয় এবং জন্ম গ্রহণের সময় অন্য নাম-রূপ উৎপন্ন হয়, কিন্তু পূর্ব নাম-রূপ হতে পরবর্তী নাম-রূপ উৎপন্ন হয়েছে। সে কারণে সে স্থায়ী কর্ম হতে মুক্ত নয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, বিজ্ঞানের রোধ হলে নাম-রূপ ধ্বংস হয় (মহাস্থবির [বনভাণ্ডে], ভূমিকা)। উপর্যুক্ত আলোচনা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, পরবর্তী জন্মে যেহেতু কৃতকর্মের ফলভোগ করতে হয়। সেহেতু সাধ্য অনুযায়ী কুশল কর্ম সম্পাদন করা সমীচীন। মানব কল্যাণমূলক কর্মে ব্যাপৃত থেকে উচ্চতর সংগঠনাবলী উৎকর্ষের মাধ্যমে মানুষের শান্তি, উন্নয়ন, কল্যাণের, দুঃখ মুক্তির জন্যে কাজ সম্পাদনে রত হওয়া উচিত। তবেই ইহ-পারলৌকিক শান্তি সুনিশ্চিত সম্ভব হবে।

১.৫ ষড়ায়তন

আয়তন বলতে বসতি বা স্থানকে বোঝায় (চট্টোপাধ্যায় ৮৯)। গৌতম বুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে অবস্থান কালে প্রতীত্যসমুৎপাদ সম্পর্কে দেশনা করতে গিয়ে ষড়ায়তন সম্পর্কে বলেন: ষড়ায়তন (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় ও মন) ছয়টি দৈহিক অঙ্গের প্রত্যেকটিকে ভিত্তি করে এক একটি ক্ষেত্র বা আয়তনের সৃষ্টি হয় (ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো ১০৯)। উপর্যুক্ত আলোচনা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, নাম-রূপ বা চিত্ত দেহের বাহন। দেহ উৎপন্ন হলেই তার কাজ সম্পাদন করার জন্য ষড়ায়তন বা ষড়েন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয়। এ ষড়েন্দ্রিয়ের মধ্যে মন প্রধান। মনের সাহায্য ব্যতীত মানুষ অচল। দেহ-মন বিদ্যমান থাকলে ষড়ায়তন বিদ্যমান থাকবেই। মানুষ মনে-প্রাণে বা ষড়ায়তন দ্বারা আদর্শ, কল্যাণ কর্ম সম্পাদন করলে সমাজে কোনো প্রকার অশান্তি বিরাজ করবে না।

১.৬ স্পর্শ

পালিতে ‘ফস্স’ যা বাংলায় হলো স্পর্শ। ষড়ায়তনের কারণে স্পর্শ। বিশিষ্ট অর্থকথাকার বুদ্ধঘোষের মতে, সংযোগ বা মিলনকে স্পর্শ বলে। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্পর্শকরণ। এর কাজ হচ্ছে কোনো ব্যক্তিকে বাহ্যিক কোনো বিষয়ের সংস্পর্শে আনা। এর ফল হচ্ছে একত্রে আনা। যে বস্তুটি এর পথে আসে তা স্পর্শ ঘটায়। যেটি আকার বিহীন কোনো একটা বস্তুর সাথে লেগে থেকে এটা অবস্থান করে স্পর্শ এবং এর বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে চক্ষু ও রূপের সাথে, কর্ণ ও শব্দ, মন ও চিন্তন, বস্তুর সাথে সম্পর্কের ন্যায়। সংস্কার সমূহের একটি হলো স্পর্শ। স্পর্শ ছাড়া সঠিক ধারণা লাভ করা সম্ভব হয় না। চক্ষু আছে বলেই সবকিছু দৃশ্যপটে আসে নতুবা সবাই অন্ধ। কর্ণ আছে বলেই শুনতে পায় (M. R. Davids , IV-VI)। ছয় আয়তনের সংশ্লেষে আসলেই স্পর্শ সংঘটিত হয়ে থাকে। আবার স্পর্শও ছয় প্রকার। সেগুলো হলো: ১. চক্ষু সংস্পর্শ। ২. শ্রোত্র সংস্পর্শ। ৩. ঘ্রাণ সংস্পর্শ। ৪. জিহ্বা সংস্পর্শ। ৫. কায়সংস্পর্শ। ৬. মনসংস্পর্শ (প্রফেসর সুমঙ্গল বড়ুয়া ১০২)। এ স্পর্শ থেকে আনন্দ, অপ্রীতি-ধ্বংস ও উৎপত্তিরূপ, সংস্কার উৎপন্ন হয়। স্পর্শের কারণ নাম ও রূপ, রূপের নাশে স্পর্শ বিনাশ হয়। স্কন্ধ সমূহের বিনাশ সাধনই শ্রেষ্ঠ বস্তু (সাধনানন্দ মহাস্থবির [বনভাস্তো, ভূমিকা)। উপর্যুক্ত আলোচনা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, স্পর্শজনিত সুখের জন্যে বিশ্বব্যাপী অন্যান্য কর্মকাণ্ড সম্পাদিত হচ্ছে। সমাজে সৃষ্টি হচ্ছে নানা প্রকার অস্থিরতা। স্পর্শ সুখ ত্যাগ করতে পারলে সকল প্রকার সামাজিক অশান্তি হ্রাস পেতে পারে।

১.৭ বেদনা

‘ফস্স পাচয়া বেদনা’ স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনার উৎপত্তি হয়। অনুভূতি বা বিশেষ অবস্থা এবং সংবেদন হচ্ছে বেদনার লক্ষণ। দ্বার হিসেবে বেদনা ছয় প্রকার। সেগুলো হলো- ১.চক্ষু সংস্পর্শজা বেদনা। ২.শ্রোত্র সংস্পর্শজা বেদনা। ৩.ঘ্রাণ সংস্পর্শজা বেদনা। ৪.জিহ্বা সংস্পর্শজা বেদনা। ৫.কায় সংস্পর্শজা বেদনা এবং ৬.মন সংস্পর্শজা বেদনা (M.R.Davids 136)। একথা স্পষ্ট, স্পর্শের কারণে বেদনার সৃষ্টি। যা স্পর্শ ব্যতীত জাগে না। এ কারণে বলা হয়েছে: স্পর্শের কারণে বেদনা। কোনো ব্যক্তি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে মৃত্যুর পর সুগতি লাভ করে স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। সে সেখানে দিব্য পঞ্চকাম সুখ উপভোগ করে। তার মনে এরূপ চিন্তার উদয় হয় ‘আমি পূর্বে পুণ্যকর্ম করেছি। সে কারণেই আমি এরপ সুখ ভোগ করছি। এরপ অনুভব ও সংবেদন বেদনার লক্ষণ (পণ্ডিত ধর্মাধার (মহাস্থবির ৬৪)। উপর্যুক্ত আলোচনা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, একজন পুণ্যকৃত, আলোকিত, মানবিক ব্যক্তি ইহলোকে ও পরলোকে নিজে সুখ অনুভব করে এবং ইহলোকে অন্যের শান্তি বিঘ্নিত হয় এমন কাজ হতে বিরত থাকেন। ফলে সর্বত্র শান্তি বিরাজ করে।

১.৮ তৃষ্ণা

‘বেদনা পচয়া তণ্হা’- বেদনার প্রত্যয়ে তণ্হা বা তৃষ্ণার উৎপত্তি হয়। তৃষ্ণা বলতে আসক্তি, আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনাকে বোঝায়। তৃষ্ণার বশীভূত হয়ে মানুষ সুখের হোক, দুঃখের হোক কার্য সম্পাদন করে। এ তৃষ্ণা ছয় প্রকার। যথা- ১.চক্ষু তৃষ্ণা, ২. শ্রোত্র তৃষ্ণা, ৩. ঘ্রাণ তৃষ্ণা, ৪.জিহ্বা তৃষ্ণা, ৫.কায় তৃষ্ণা এবং ৬.মন তৃষ্ণা। প্রবর্তন আকারের তৃষ্ণা তিন (০৩) প্রকার। কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা, বিভব তৃষ্ণা। সর্বদিকে এই তৃষ্ণালোকের প্রবাহ। স্মৃতি এর নিবারক। প্রজ্ঞা তার গতি রুদ্ধকারক (সাধনানন্দ মহাস্থবির [বনভাস্ত্রে ভূমিকা])। এ তৃষ্ণা বা অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা, আসক্তির কারণে সমাজে মানুষের মাঝে লোভ, হিংসা, মোহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এগুলোর প্রভাবে নানা প্রকার অন্যায়, অনাচার, অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে। মানবতা চরম অপমানিত হচ্ছে। উপর্যুক্ত আলোচনা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, তৃষ্ণা ধ্বংস করতে পারলে সর্ব প্রকার অশান্তি, অরাজকতা, অমানবিকতা লোপ পেতে পারে। তৃষ্ণার নিরোধ করা গেলে দুঃখ থেকে মুক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে।

১.৯ উপাদান

‘তণ্হা পচয়া উপাদান’- তৃষ্ণার কারণে উপাদান হয়। তৃষ্ণা যখন প্রবল হয়, তখন তা উপাদানে পরিণত হয়। সংরক্ষণ এবং দৃঢ়ভাবে ধারণ করে বলে উপাদান। এ উপাদান চার প্রকার। যথা- ১.কাম উপাদান(ইন্দ্রিয় সঙ্গোগ)। ২.দৃষ্টি উপাদান(মিথ্যা ধারণা)। ৩.শীলব্রত উপাদান (আচার-অনুষ্ঠানই সঠিক পথ) এবং ৪.আত্মবাদ উপাদান (শাস্ত্র আত্মায় বিশ্বাসী)। (Yanatilak 154)। লোভের ভিতর দিয়েই হোক, দ্বেষের ভিতর দিয়েই হোক উপাদানের দৃঢ়বন্ধন জীবকে ভবের সঙ্গে বেঁধে রাখে (শীলানন্দ ব্রহ্মচারী ১৬)। উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, একজন প্রকৃত সাধক যখন লোভ, দ্বেষ বা চার প্রকার উপাদান ধ্বংস করতে পারে তখন সে আত্মকল্যাণ ও পরকল্যাণে ব্রতী হতে পারে। এ প্রেক্ষিতে তাঁর দ্বারা সমাজে কোনো প্রকার অন্যায় কর্মকাণ্ড সম্পাদিত হয় না। এরূপ ব্যক্তি বিশ্বশান্তি ও মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকেন।

১.১০ ভব

√‘ভূ’ ধাতু থেকে ‘ভব’ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। ভব শব্দের অর্থ হলো ‘হওয়া’। হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় কর্ম সম্পাদিত হয় এবং উৎপন্ন হয় বলে ভব। সাধারণতঃ ভব বলতে বোঝায় জন্ম, সংসারকে (শীলানন্দ ব্রহ্মচারী ১৭)। ভব প্রধানতঃ দুই প্রকার। যথা- ১.কর্ম ভব এবং ২.উৎপত্তি ভব। কর্মভব স্বভাবত ক্রিয়াশীল। উৎপত্তি ভব জীবনের প্রতিক্রিয়াশীল অংশ। পূর্বে উল্লেখিত পুণ্যাভি সংস্কার, অপুণ্যাভি সংস্কার এবং আনেজ্জাভি সংস্কার মূলত কর্ম নামে অভিহিত। ভবগামী সমস্ত সংস্কারই কর্মভব। উৎপত্তি ভব হলো কর্মোৎপন্ন স্বক। পূর্ববর্তী জন্ম থেকে পরবর্তী জন্মসমূহের কর্মফল রূপ সংযোগ সৃষ্টি করে কর্মভব এবং উৎপত্তি ভব। উপাদানকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। রূপভূমি এবং অরূপভূমি। এ দুইটি উৎপত্তি ভবের কারণ এবং কামভূমির কারণ হলো কুশলকর্ম এবং বিপাক উপনিশ্রয় দ্বারা উৎপত্তিজাত। কাম ভবে উৎপত্তির কারণ অকুশল কর্মভবের সহজাত, নিশ্রয়, সম্প্রযুক্ত, অস্তি, অবিগত এবং হেতু প্রত্যয় (M. R. Devids 137)। গৌতম বুদ্ধের মতে, ভব রুদ্ধ হলে পুনর্জন্ম নিরোধ হয়। উপাদান নিরোধের দ্বারা জন্ম নিরোধ হয়।(ড. জয়দেব গঙ্গোপাধ্যায় শাস্ত্রী, ১৯৯৯: ৪০১) এটা জীবনের প্রতিক্রিয়াশীল অংশ। উপর্যুক্ত আলোচনা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, কারণ পুনঃ পুনঃ জন্ম লাভ দুঃখ। জন্ম রোধে সচেষ্ট ব্যক্তি কোনো প্রকার শান্তি বিঘ্নিত হয় এমন কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকেন। কারণ মূল

উদ্দেশ্য হলো জন্ম-মৃত্যু রোধ করে শাস্ত সুখ অনুভব করা। ফলে তিনি সর্বদা মঙ্গলময় কর্ম সম্পাদন করে থাকেন।

১.১১ জাতি:

‘ভব পচয়া জাতি’- ভবের প্রত্যয় জাতি বা জন্ম। জন্ম বলতে প্রতীকসন্ধিক্ষেপে পঞ্চাঙ্গের (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান) মাতৃজঠরে উৎপত্তিকে জাতি বা জন্ম বলে (Yanatilok 155)। কর্মভবই প্রতীকসন্ধি বা উৎপত্তির হেতু। নদীর স্রোতের ন্যায় এ গতি প্রবাহমান চলতে থাকে। এ প্রবাহ কার্যকারণ নির্ভর। পুনর্জন্ম বলতে কোনো সত্ত্বে সঞ্চিত কর্মের প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল কর্ম ভবের প্রত্যয়েকেই জন্ম বলে। যা কুশল বা অকুশলও হতে পারে। এই কার্যকারণ সম্পর্ক কর্মের মধ্যে এবং উপনিশয়ে প্রতিষ্ঠিত। উপর্যুক্ত আলোচনা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, জন্মরোধ করার প্রত্যয়ে সকল প্রকার অমানবিকতা, অশান্তি, অকুশল কর্ম বর্জন করে সৎ, মঙ্গলময় কর্ম করলে বিশ্বশান্তি সহজ হতে পারে।

১.১২ জরা-মরণ:

‘জাতি পচয়া জরামরণ’-স জাতি বা জন্ম থেকেই জরা সম্পাদিত হয়। জন্ম হলেই জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, শোক, পরিতাপ, দুর্মনতা, হতাশা, শারীরিক ও মানসিক দুঃখ পোহাতে হয় (T. W. R. Devids 160)। জন্ম না হলে উপরোল্লিখিত দুঃখ যন্ত্রণার ভোগ করতে হয় না। এরূপে জন্মকে উপনিশয় করেই জরা-মরণ প্রভৃতি উপনিশয় প্রত্যয় হয়। বৌদ্ধ দর্শনে তিনবৃত্ত বা চক্রের উল্লেখ রয়েছে। সেগুলো হলো: ১. ক্লেশবৃত্ত: অবিদ্যা, তৃষ্ণা ও উপাদান হলো ক্লেশবৃত্ত। ২. কর্মবৃত্ত: সংস্কার ও কর্মভবকে বলে কর্মবৃত্ত এবং ৩. বিপাকবৃত্ত: বিজ্ঞান, নাম-রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ ও বেদনা। এ পঞ্চাঙ্গ উৎপত্তি ভব বিপাকবৃত্ত নামে অভিহিত। এই ত্রিবৃত্ত চক্রাকারে পরস্পরের উপনিশয়রূপে কাজ করে। এর দ্বিমূল, ত্রিকাল, ত্রিসন্ধি এবং চার সংক্ষেপ বশে বিভাজন করা যায় (ড. রেবতপ্রিয় বড়ুয়া ৭১)। উপর্যুক্ত আলোচনা বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, অবিদ্যাই সকল প্রকার দুঃখ, অশান্তির অন্যতম কারণ। এ অবিদ্যাকে ধ্বংস করা গেলে পুনর্জন্ম রোধ করে সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট থেকে পরিত্রাণ লাভ করা সম্ভব হবে। রাজকুমার সিদ্ধার্থ নগর পরিভ্রমণে বের হয়ে জরাগ্রস্ত, ব্যাধিগ্রস্ত, মৃতদেহ, সন্ন্যাসীর জাগতিক পরিণতির মর্ম বুঝে জীবনের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ প্রয়াসেই তিনি মুক্তির পথে অভিযাত্রা করেছিলেন। মানবজীবনে সুখের চেয়ে দুঃখের পরিমাণই বেশি। মানুষের অপরিসীম দুঃখ-যন্ত্রণা, কষ্ট অনুধাবন করেই সিদ্ধার্থ গৌতম গৃহত্যাগ করেছিলেন। তিনি এ দুঃখের মূল কারণ হিসেবে মানুষের অজ্ঞানতাকেই চিহ্নিত করেছিলেন। তাই বৌদ্ধ দর্শনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত করা। অবিদ্যাকে দূর করে প্রতীত্যসমুৎপাদবোধ জাগ্রত করতে পারলে বৈষয়িক চিন্তা-চেতনার কুফল সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয় (জিতেন্দ্রলাল বড়ুয়া ৯৩, ৯৯)। বৌদ্ধ মতানুযায়ী মানুষের দুঃখভোগের প্রধান কারণ অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা। দুঃখের মূল কারণ হলো অনাত্মবাদ, অনিত্যবাদ, আর্যসত্য চতুষ্টয়সত্য প্রভৃতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাব। এগুলো সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাবে জন্ম নেয় অহংবোধ। এ জগৎকে অপরিবর্তনীয় মনে করার কারণে জাগতিক বস্তুর প্রতি জন্ম নেয় আকাঙ্ক্ষা বা আসক্তি। বৌদ্ধধর্ম-দর্শনে এর যে সমাধান দেওয়া হয়েছে তা মূলত মনস্তাত্ত্বিক। মানুষ যখন সম্যক জ্ঞানের মাধ্যমে তার আত্মবোধকে এবং জাগতিক বস্তুকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে অর্জন করার ও ভোগ করার আকাঙ্ক্ষা বা স্পৃহা বিনষ্ট করতে পারে, তার মধ্যে তখন আসে এক অভাবনীয় পরিবর্তন-সে রূপান্তরিত হয় এক আলোকপ্রাপ্ত অন্য মানুষ। অবিদ্যা পরিহার করলে ব্যক্তি মানুষ তখন পরিবর্তিত হবে এক নতুন মানুষ, পরিপূর্ণভাবে বিকশিত এক মানবিক মানুষ। পৃথিবীর মানুষ আজ সংগ্রাম করছে রোগ-শোক, দুঃখ-

দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কার-এর বিরুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্রযুদ্ধ সন্ত্রাসমুক্ত এক সুন্দর পৃথিবীর জন্য (চাকমা ১০৩-১০৬, ১০৮-১০৯)। উপর্যুক্ত আলোচনা বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, কল্যাণকর, নিষ্পাপ জীবন গঠনে এ কার্যকারণবোধের শিক্ষা অতীব গুরুত্ববহ নিঃসন্দেহে বলা যায়। উপর্যুক্ত কারণে বলা যায় যে, বর্তমান বিশ্বের ক্রেশ, অশান্তি, স্বার্থপরতা, জড়তা, আত্মকেন্দ্রিকতার মূলে রয়েছে কার্যকারণনীতিবোধের অভাব। প্রতীত্যসমুৎপাদের জ্ঞান তথা আত্মজিজ্ঞাসাই এনে দিতে পারে আত্মশুদ্ধি। এ প্রতীত্যসমুৎপাদবোধই দিতে পারে দুঃখ হতে পরিত্রাণ। লাভ হতে পারে পরম সুখ নির্বাণ। এ বিশ্বের সব কিছুই ক্ষুদ্র-বৃহৎ, স্থূল-সূক্ষ্ম, সব ঘটনা প্রবাহই কারণ সম্ভূত। সুতরাং বিশ্ববৈচিত্র্য কারণ সম্ভূত। তখন সে কারণের নিরোধ, সে কারণ সম্ভূত ও তৎসম্পর্কিত দুঃখরাশিও ধ্বংস হয়ে যায়। দুঃখের এ উৎপত্তি-বিনাশ প্রদর্শনই প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতির মূল উদ্দেশ্য। উপর্যুক্ত আলোচনা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, সকল বন্ধন, দুঃখ থেকে পরিত্রাণে ভূমিকা রাখতে পারে এ কার্য-কারণনীতিবোধ। সৎ, আলোকিত, মানবিক ও আদর্শ মানুষ হওয়ার জন্য এবং নির্বাণ অর্জনের ক্ষেত্রে বৌদ্ধ কার্যকারণতত্ত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। উপর্যুক্ত কারণে বৌদ্ধ দর্শনে কার্যকারণতত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্বের উপযোগিতা

এ প্রবন্ধটি জ্ঞানের জগতে অনন্য ভূমিকা রাখতে পারে। কার্যকারণনীতিতত্ত্ব দর্শন জগতে বুদ্ধের একটি অবিস্মরণীয় ও বিস্ময়কর আবিষ্কার। বৌদ্ধ দর্শন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে হলে প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্ব সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি অর্জন করতে হবে। বস্তুতঃ বৌদ্ধধর্মে প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্ব একটি জটিল বিষয়। প্রতীত্যসমুৎপাদ কি, প্রতীত্যসমুৎপাদের শ্রেণীবিন্যাস, প্রাত্যহিক জীবনে এ প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্ব উপলব্ধির গুরুত্ব কতটুকু, দুঃখ নিবৃত্তি সাধনে এর প্রতিফলন কিভাবে করতে হয়, এর প্রক্রিয়া কী, বৌদ্ধ কার্য-কারণতত্ত্বের স্বরূপ কী ও এর প্রাসঙ্গিকতা, দুঃখ থেকে মুক্তি প্রভৃতি সম্পর্কে ত্রিপিটকে বর্ণিত এবং বিভিন্ন পণ্ডিত, গবেষক, বৌদ্ধ তত্ত্ববিদদের আলোচনার সূত্রকে ভিত্তি করে আলোচ্য প্রবন্ধে প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্ব সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে। গৌতম বুদ্ধের দর্শন সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে হলে প্রতীত্যসমুৎপাদ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করা খুবই প্রয়োজন। কারণ প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্ব হলো বৌদ্ধ দর্শনের অন্যতম দার্শনিক উপাদান। বৌদ্ধ দর্শনে বর্ণিত কার্যকারণনীতিতত্ত্বের সাথে মানুষের কর্মকাণ্ড ও জীবনের সম্পর্ক খোঁজে পাওয়া যায়। মানব জীবন দুঃখের সাগর। অবিদ্যা বা অজ্ঞানতাই মানুষের সকল প্রকার অশান্তি ও দুঃখের মূল কারণ। অবিদ্যার কারণে হিংসা, বিদ্বেষ, অমানবিকতা, অশান্তির সৃষ্টি হয়। গৌতম বুদ্ধ মানুষকে সর্বপ্রকার দুঃখ, অশান্তি থেকে মুক্তির লক্ষ্যে কার্যকারণতত্ত্ব উপলব্ধির জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। মানুষের মানবীয় গুণাবলির বিকাশ, সুখ-সমৃদ্ধি, দুঃখ মুক্তির ক্ষেত্রে প্রতীত্যসমুৎপাদবোধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এ প্রবন্ধটির দ্বারা দুঃখ থেকে মুক্তি প্রয়াসী সাধকগণ উপকৃত হতে পারেন।

উপসংহার

বুদ্ধ ছিলেন একজন মানবতাবাদের মূর্ত প্রতীক। বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন শান্তির দর্শন, জ্ঞানের দর্শন। তিনি ছিলেন কার্যকারণতত্ত্ব ও নির্বাণের উদ্ভাবক। বৌদ্ধধর্মের চরম লক্ষ্য নির্বাণ। কার্যকারণ সূত্র তথা জাগতিক ঘটনা উপলব্ধি করতে না পারলে কখনও দুঃখমুক্তি বা নির্বাণ লাভ সম্ভব হবে না। বুদ্ধের আরেকটি উদ্দেশ্য ছিলো সাম্য, শান্তি, মানবতা। এগুলো মনন, ধারণ, অনুশীলন করলেই দুর্লভ মানবজীবন সার্থক হবে। দুর্লভ মানবজীবনকে সঠিক পথে পরিচালনা করার জন্যে কার্যকারণ নীতি অনুধাবন করে সৎ পথে চলা যায়। তাই প্রত্যেকের সত্যসন্ধানী

হওয়া সমীচীন। সত্য সন্ধান করার জন্য নিজের জ্ঞানের উপর নির্ভর করতে হয়। সিদ্ধার্থ সত্য সন্ধান করেছেন নিজের মধ্যে। তিনি সত্যকে খোঁজ করতে গিয়ে দ্বাদশ নিদানের সন্ধান লাভ করেন। কার্যকারণ নীতি বুদ্ধের সাধনার ফল। এটি অকাট্য সত্য। প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে সকল প্রকার বন্ধন ছিন্ন করা সম্ভব হবে। এতে দুঃখ থেকে নিবৃত্তি অর্জন করা যায়। উপর্যুক্ত কারণে পরম সুখ নির্বাণ লাভও সম্ভব হয়।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ:

^১ যদা হবে পাতুভবন্তি ধম্মা

আতাপিনো ঝায়তো ব্রাহ্মণস্স,

অথস্স কজ্জা বপযন্তি সব্বা

যতো পজান্নাতি সহৈতু ধম্মন্তি (শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির এবং শ্রীমৎ জ্যোতিঃপাল ভিক্ষু, অনূদিত [খুদ্দক নিকায়] উদানং, রেঙ্গুন, প্রথম প্রকাশ, ২৪৭৪ বুদ্ধাব্দ, ১৯৩০, বোধিবগ্গো, পঠমো, বোধিসূত্তং, ৩)।

প্রাথমিক উৎস:

অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া (অনূদিত)। অঙ্গুত্তর নিকায় ৪র্থ খণ্ড, প্রজ্ঞা ও শিলাস্তম্ভ। বনভাস্তে প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ২০০৫।

প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু (অনূদিত)। অঙ্গুত্তর নিকায়, ৫ম খণ্ড [দশম-একাদশ নিপাত] যমক বর্গ, অবিদ্যা সূত্র। রাজবন বিহার, ২য় প্রকাশকাল, ২০১৫।

পণ্ডিত ধর্মধার মহাস্থবির (অনূদিত)। ধর্মপদ [মূল ও বঙ্গানুবাদ], শ্লোক নং-৩৩৩। বুদ্ধ ধর্মঙ্কুর সভা, ১৯৫৪।

ভিক্ষু শীলভদ্র (অনূদিত)। দীর্ঘ নিকায়, অগ্গণ্ডক সূত্র। মহাবোধি বুক এজেন্সী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৪৭।

ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো (অনূদিত)। বুদ্ধবাণী সংকলন- সংযুক্ত নিকায় [১ম ও ২য় খণ্ড], বুদ্ধবর্গ। ২০১৬।

রাজগুরু শ্রীমৎ ধর্মরত্ন মহাথের, ভিক্ষু শীলভদ্র (অনূদিত)। দীর্ঘ নিকায় [অখণ্ড], ব্রহ্মজাল সূত্র। ২০১৫।

শ্রীমৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ভিক্ষু (অনূদিত)। অভিধর্ম পিটকে বিভঙ্গ, পরিবেশনায়-শাশানভূমি ধর্মচর্চা কেন্দ্র।

শ্রী বেনীমাধব বড়ুয়া (অনূদিত)। মধ্যম নিকায়, মূল পঞ্চাশ সূত্র, আর্য্যপার্য্যেষণ সূত্র। ১৯৪০।

শ্রীমৎ ধর্মধার মহাস্থবির (অনূদিত)। মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় ভাগ, ক্ষুদ্র সকুলোদায়ী সূত্র। রাজেন্দ্র সিরিজ-১, ১৯৫৬।

শ্রীমৎ জ্যোতিঃপাল স্থবির (অনূদিত)। পুঙ্গল পএঃএত্তি (মানব চরিত্রের স্বরূপ)। The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation.

শ্রী বিনয়েন্দ্র নাথ চৌধুরী (অনূদিত)। মধ্যম নিকায় [তৃতীয় খণ্ড], বহুধাতুক সূত্র (১৫৫)। ২০০৬।

শীলানন্দ ব্রহ্মচারী (অনূদিত)। সংযুক্ত নিকায় [১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড], বিজ্ঞান সূত্র। ধর্মধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, ২০০৯।

সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভাস্তে) অনূদিত, সুত্তনিপাত, ভূমিকা। ১৯৮৭।

দ্বৈতীয়িক উৎস:

অধ্যাপক রনধীর বড়ুয়া। বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন। ১৯৮৪।

অধ্যাপক ড. নীরু কুমার চাকমা। বুদ্ধ: ধর্ম ও দর্শন। অবসর প্রকাশনা সংস্থা, প্রথম প্রকাশ ২০০৭।

বৌদ্ধ দর্শনের কার্য-কারণ-তত্ত্বের স্বরূপ ও প্রাসঙ্গিকতা: একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

- ডা: রামদাশ সেন। বুদ্ধদেব, তাঁহার জীবন ও ধর্মনীতি। করুণা প্রকাশনী, ১৯৯৭।
- ড. সুকোমল চৌধুরী। গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন। মহাবোধি বুক এজেন্সী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭।
- ড.বহি কুমারী ভট্টাচার্য। 'প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি' [প্রবন্ধ] সম্যক। ১০বর্ষ, প্রবারণা পূর্ণিমা সংখ্যা, ২৫৪৯ বুদ্ধাব্দ।
- ড. রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া। পালি সাহিত্যের ইতিহাস [প্রথম খণ্ড]। বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, আগষ্ট ১৯৮০।
- ড. সুমঙ্গল বড়ুয়া, ড. বেলু রানী বড়ুয়া। বুদ্ধবাণীর মূলতত্ত্ব। পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০১০।
- ড.জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়। ত্রিপিটক সমগ্র। মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০১১-১২।
- ড. জয়দেব গঙ্গোপাধ্যায় শাস্ত্রী। ললিতবিস্তর [ভগবান বুদ্ধের জীবন ও চরিত্র], সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৯।
- জিতেন্দ্রলাল বড়ুয়া। বৌদ্ধ দর্শনের রূপরেখা। বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ২০০১।
- রেবতপ্রিয় বড়ুয়া। বিশুদ্ধিমার্গে বৌদ্ধতত্ত্ব। বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩।
- দেবব্রত দাশ। ভারতীয় দর্শন। হুগলী মহাসীন কলেজ, ১৯৮৫।
- ধর্মানন্দ কোসম্বী রচিত, চন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য (অনূদিত)। ভগবান বুদ্ধ, সাহিত্য একাডেমী, সপ্তম মুদ্রণ, ২০১৫।
- প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত। ভারতীয় দর্শন, প্রথম খণ্ড। ব্যানার্জী পাবলিশার্স, পরিমার্জিত সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০২।
- পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির (অনূদিত)। মিলিন্দ প্রশ্ন। ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, তৃতীয় প্রকাশ, ১৯৯৫।
- প্রদীপ কুমার বড়ুয়া। বৌদ্ধধর্ম-বিজ্ঞান-মনবিজ্ঞান-মনচিকিৎসা-অনুদর্শন। জনপ্রিয় পুস্তকালয়, প্রথম প্রকাশ, ২০১৪।
- প্রফেসর সুমঙ্গল বড়ুয়া (অনূদিত)। বুদ্ধঘোষ, জীবন ও কর্ম। '১৬।
- বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি। প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি, পূর্বাভাস। চট্টগ্রাম। ১৯৩৯।
- ভিক্ষু শীলাচার শাস্ত্রী। মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম দর্শন। ২য় সংস্করণ, ২০১২।
- রঞ্জন বড়ুয়া। অভিধর্ম সংগ্রহ [বৌদ্ধ মনোবিজ্ঞান]। ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯১।
- শ্রী জ্যোতি:পাল মহাথের। চর্যাপদ, চর্যা-৯। দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০০৫।
- শ্রী বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি (সংকলিত)। প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি। ২৪৮৩ বুদ্ধাব্দ।
- শ্রী মহিমচন্দ্র বড়ুয়া (অনূদিত)। বিমুক্তি মার্গ। ১৯৮৮।
- শ্রী শান্তিকুসুম দাশগুপ্ত। বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম এবং প্রাচীন বৌদ্ধ সমাজ। মহাবোধি বুক এজেন্সী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮।
- শ্রী শীলানন্দ ব্রহ্মচারী। অভিধর্ম-দর্পন [বৌদ্ধ দর্শন ও মনস্তত্ত্বের আলোচনা]। মহাযোগী জ্ঞানীশ্বর ট্রাস্টি বোর্ড, উত্তর ২৪ পরগনা, অখণ্ড সংস্করণ, ১৩৯৮।
- সায়ন্তনী ভট্টাচার্য (অনূদিত)। ভারতে বৌদ্ধধর্মের উত্থান ও পতন। ১০ বি কলেজ রোড, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারি ২০২০, দ্বিতীয় মুদ্রণ, অক্টোবর ২০২১।
- সোলয়মান আলী সরকার। ভারতীয় দর্শন পরিচিতি। বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, জুন, ২০০২।

সুদর্শন বড়ুয়া। ত্রিপিটক-সংক্ষিপ্তাকার। প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯।

সুভূতি রঞ্জন বড়ুয়া। অভিধম্মার্থ সংগ্রহ [বৌদ্ধ মনোবিজ্ঞান]। ধর্মার্থ বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, ১৯১৯।

হিরন্ময় বন্দোপাধ্যায়। যত মত তত পথ। শশধর প্রকাশনী, ১৯৮৭।

ইংরেজি:

Davids, Mrs. Rhys, [Ed] *Vibhanga*, London: P.T.S.1904.

Davids, Mrs. Rhys, *A Buddhist Manual of psychological Ethics*.

Devids, T.W.Rhys. *Buddhism*, London, 1896.

Vikkhu, Subhadra, *The message of Buddhism* [Ed.], By J.E. Ellan, Kegan paul, London, 1926.

Yanatilak, *Guide through the Abhidhamma pitaka*, The sosiedor News Paper, Ceylon Ltd. Lek House, Colombo, 1938.

নিজামি গাঞ্জুবি ও তাঁর পঞ্চরত্ন

ড. আব্দুল করিম *

সারসংক্ষেপ: ইরানের সেলজুকি যুগের সময়কালে ফারসি সাহিত্যে যে কয়েকজন দিকপালের আবির্ভাব ঘটে তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন নিজামি গাঞ্জুবি। যদিও তিনি একজন রোমান্টিক কবি ছিলেন তথাপি তাঁর কাব্যে আধ্যাত্মিক দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে। ফলে তাঁকে একজন আধ্যাত্মিক কবিও বলা চলে। তিনি পাঁচটি মাসনাবি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন যাকে খামসায়ে নিজামি বা পাঞ্জেগাঞ্জে নিজামি (নিজামির পঞ্চরত্ন) বলা হয়। এসব কাব্যগ্রন্থ হলো- মাখযানুল আসরার, খসরু ওয়া শিরিন, লাইলি ওয়া মাজনুন, হাফত পেইকর ও এক্সান্দরনামা। কবি মাখযানুল আসরার কাব্যগ্রন্থে চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ কাব্যগ্রন্থে আধ্যাত্মিকতার বিভিন্ন স্তরসমূহ বর্ণনার পাশাপাশি সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাঝে সম্পর্ক তৈরির মাধ্যমসমূহ অত্যন্ত চমৎকারভাবে কাব্যাকারে উপস্থাপন করেছেন। এছাড়া খসরু ওয়া শিরিন, লাইলি ওয়া মাজনুন, হাফত পেইকর প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ তাঁর বিখ্যাত রোমান্টিক উপাখ্যান। এসব কাব্যগ্রন্থে তিনি প্রেমের গভীর আবেগ-অনুভূতি, মান-অভিমান, অভিযোগ-অনুযোগ, মিলন-বিরহ, হাসি-আনন্দ প্রভৃতি অত্যন্ত চমৎকার প্রকাশ ভঙ্গির মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। যা সফলতার সাথে পাঠকদের হৃদয় জয় করতে সক্ষম হয়েছে। এ ছাড়াও তাঁর বিশ হাজার বেইত বিশিষ্ট একটি দিওয়ান কাব্যগ্রন্থ রয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে নিজামি গাঞ্জুবির জীবন ও তাঁর সাহিত্যকর্মসমূহ আলোকপাত করা হয়েছে।

ভূমিকা :

হাকিম জামাল উদ্দিন আবু মোহাম্মদ ইলিয়াস বিন ইউসুফ বিন যাকি বিন মুয়াইয়েদ নিজামি গাঞ্জুবি আজারবাইজানের নিকটবর্তী গাঞ্জ নামক স্থানে ১১৪০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কুরআন, হাদিস ও ধর্মশাস্ত্র সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জনের পাশাপাশি অধ্যাত্ম সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং একজন সুফি কবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। এছাড়াও তিনি ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস ও জ্যোতির্বিদ্যায় পারঙ্গমতা অর্জন করেন। তাঁর রচিত পঞ্চরত্ন কাব্যগ্রন্থসমূহ শুধু ইরানেই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জনপ্রিয় ও খ্যাতি লাভ করে। ইরানি কবি শেখ সাদি, হাফিজ শিরাজি, আব্দুর রহমান জামি প্রমুখ বিখ্যাত কবিগণ নিজামি গাঞ্জুবির কবিত্বের অসংখ্য প্রশংসা করেছেন। তাঁর এসব কাব্যগ্রন্থ ফারসি, ইংরেজি, আরবি, উর্দু ও বাংলা প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

কবি পরিচিতি :

মুসলিম জগতের অন্যতম জনপ্রিয় রোমান্টিক কবি নিজামি গাঞ্জুবির প্রকৃত নাম ইলিয়াস (নিজামি গাঞ্জুবি ৯)। উপাধি নিজাম উদ্দিন (সারভাত ৩২) ও জামাল উদ্দিন (নিজামি গাঞ্জুবি ৯)। উপনাম আবু মোহাম্মদ (নেযাদ ৭) এবং ছদ্মনাম নিজামি। তাঁর পিতার নাম ইউসুফ এবং দাদার নাম যাকি। তাঁর মাতার নাম রাইসা (রাযি ২৮৬)। তিনি উত্তর ইরানের আজারবাইজানের গাঞ্জে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে তাঁর উপাধি হয়েছে গাঞ্জুবি। তবে তিনি ইরানে নিজামি গাঞ্জুবি নামেই সমধিক পরিচিত। নিচে নিজামি গাঞ্জুবির বংশ পরিচয় সম্পর্কে তাঁর নিজের রচিত কয়েকটি বেইত উদ্ধৃতি হিসেবে দেওয়া হলো-

* সহযোগী অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

گر شد پدرم به سنت جد یوسف پسر زکی مؤید
با دور بد اوری چه کوشم دورست نه جور چون خروشم
گر مادر من رئیسہ کرد مادر صفتانہ پیش من مرد
(نیجامی گانجی ۳۹۹)

যদিও আমার পিতা আমার দাদার নীতি অনুসারী ছিলেন,
ইউসুফ যাকি মুয়াইয়েদের পুত্র ছিলেন।
আমি কালের আবর্তনের সাথে বিচার নিষ্পত্তিতে কি প্রচেষ্টা করবো,
কালের আবর্তন হলো খাবার সময় কাউকে অত্যাচার না করা।
যদিও আমার মা ছিল রাইসা,
আমার গুণবতী মা আগেই মৃত্যুবরণ করেছেন।

নিজামি গান্জুবি আজারবাইজানের নিকটবর্তী গান্জা নামক স্থানে ১১৪০ খ্রিষ্টাব্দে (মতান্তরে ১১২৬, ১১৩৬, ১১৩৯, ১১৪১, ১১৪৬ ও ১১৫৭ খ্রি.) জন্মগ্রহণ করেন (যানযানি ১১)। তাঁর মাতা কুর্দি এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার বংশ মায়ের বংশের ন্যায় সম্মান ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলো। তিনি নিজেও ব্যক্তিগত জীবনে স্বীয় প্রতিভা বলে মর্যাদার আসনে সমাসীন হন। বাল্যকালেই তাঁর পিতা-মাতা মারা যান। তবে তিনি পিতা-মাতাকে হারিয়ে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েননি। তিনি মনের দৃঢ়তা ও সাহস নিয়ে জীবন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। নিজামি গান্জুবির মতে, পূর্বপুরুষদের রীতি অনুযায়ী পিতা-মাতা অকালেই জান্নাতবাসী হলেন। এ বিষয়ে অদৃষ্টের সাথে বগড়া করে কি হবে? কারো পিতা-মাতা তো চিরকাল বেঁচে থাকে না। চিন্তার এই সরলতা নিজামি গান্জুবি মাতার কাছে থেকেই লাভ করেছিলেন (সারভাত ৩৩)।

নিজামি গান্জুবি প্রাথমিক শিক্ষা তাঁর পিতার কাছে থেকে অর্জন করেন। শৈশবে তিনি আরবি ও ফারসিতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এর পাশাপাশি তিনি কুরআন, হাদিস ও ফিকাহ শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানার্জন করেন। পরবর্তীকালে তিনি উচ্চ শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। তিনি শিক্ষিত বংশে জন্মগ্রহণের ফলে প্রাথমিক জীবনের কবিতাগুলো থেকেই তাঁর মধ্যেও পাণ্ডিত্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। শৈশবে নিজামি গান্জুবির পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও তাঁর জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব পড়েনি। স্বীয় অধ্যাবসায় গুণে তিনি সাহিত্য ও ধর্মীয় প্রভৃতি বিষয়ে গভীর জ্ঞানার্জন করেন (বাদাখশানি ৩৮১)।

নিজামি গান্জুবি কুরআন, হাদিস ও ধর্মশাস্ত্র সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জনের পর অধ্যাত্ম সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি সমকালীন জ্ঞান জগতের সকল শাখায় বিচরণ করেন। বিশেষকরে তিনি ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস ও জ্যোতির্বিদ্যায় পারঙ্গমতা অর্জন করেন (Ahmad 146)। তাঁর জন্মস্থান গান্জে অসংখ্য পণ্ডিত ও বিজ্ঞ মনীষীদের অবস্থান ছিলো। তাঁদের কাছ থেকেও তিনি বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞানার্জন করেন। বিশেষ করে তিনি সুফিসাধক মাওলানা শেখ ফারাজ রায়হানির কাছে থেকে অধ্যাত্মবাদের বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞানার্জন করতে সক্ষম হন (বরকতুল্লাহ ১৬৩)। নিজামি গান্জুবির মৃত্যু সাল নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন- তিনি ৫৯২ হিজরি মোতাবেক ১১৯৬ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তবে ই.জি. ব্রাউন এর মতে, নিজামি গান্জুবি ৬৩ বছর বয়সে ৫৯৯ হিজরি মোতাবেক ১২০২ অথবা ১২০৩ খ্রিষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন (Browne 401)। তাঁকে আজারবাইজানের গান্জেই সমাহিত করা হয় (কালাম সরকার ৯৯)।

নিজামি গাঞ্জুবির সাহিত্যকর্ম :

নিজামি গাঞ্জুবির রচিত কাব্যসাহিত্য ফারসি সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। তিনি পাঁচটি মাসনাভি রচনা করেছেন যাকে *খামসায়ে নিজামি* বলা হয়ে থাকে। কেউ কেউ তাঁর এই পাঁচটি মাসনাভির গুরুত্ব অনুসারে একে *পাঞ্জেগাঞ্জে নিজামি* বা নিজামির পঞ্চরত্ন বলেও আখ্যায়িত করেছেন (Wilber 47)। এ ছাড়াও তিনি *দিওয়ানে নিজামি* নামে একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন।

মাখযানুল আসরার (مخزن الاسرار) :

কবি নিজামি গাঞ্জুবি রচিত প্রথম মাসনাভি কাব্য গ্রন্থের নাম হলো- *মাখযানুল আসরার*। মাখযান শব্দের অর্থ ভাণ্ডার আর আসরার শব্দের অর্থ রহস্য। সুতরাং *মাখযানুল আসরার*-এর অর্থ হলো রহস্যের ভাণ্ডার। কবি *মাখযানুল আসরার* কাব্যগ্রন্থটি ফখরুদ্দিন বাহরাম শাহ বিন দাউদ বিন ইসহাক এবং আজারবাইজানের গভর্নর কিজিল আরসালানের নামে উৎসর্গ করেছেন। এ কাব্যগ্রন্থটি প্রায় ৫৭০ হিজরিতে রচনা করেন। এ কাব্যগ্রন্থটিতে ২০টি অধ্যায় রয়েছে (সাফা ৮০২)। কবি নিজামি গাঞ্জুবি রচিত *মাখযানুল আসরার* কাব্যগ্রন্থে ২,২৬০টি পঙ্ক্তি রয়েছে (সোবহানি ১৬৩)। কারো কারো মতে ২,৪০০টি পঙ্ক্তি রয়েছে (নিজামি গাঞ্জুবি ৭৪)। আবার কেউ কেউ ২,২৮৮টি পঙ্ক্তি বলেও মত দিয়েছেন (যানযানি ২৪)। নিচে এ কাব্যগ্রন্থটির রচনার সাল সম্পর্কে হাকিম নিজামি গাঞ্জুবি বলেন-

پانصد و هفتاد بس ایام خواب روز بلند است بمجلس شتاب
(নিজামি গাঞ্জুবি ৫৬)

পাঁচশত সত্তর সালে যথেষ্ট নিদ্রার পর
দ্রুততম অধিবেশনের প্রতি দীর্ঘ দিবস পতিত হলো।

নিজামি গাঞ্জুবি রচিত *মাখযানুল আসরার* হলো সানায়ির *হাদিকা/তুল হাকিকত* এবং জালালুদ্দিন রুমির *মাসনাভি* এর পদ্ধতিতে বিভিন্ন গল্পের মাধ্যমে সুফিবাদ বিষয়ে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ কাব্যগ্রন্থটি অসংখ্য নীতিমূলক উপদেশ বাণী রয়েছে (পাল ৮১)। এ কাব্যগ্রন্থের শুরুতে মহান আল্লাহ তায়ালা ও রাসুল (সা.) এর প্রশংসায় কবিতা রচনা করা হয়েছে। এ কাব্যগ্রন্থে কবি চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ ছাড়াও *মাখযানুল আসরার* কাব্যগ্রন্থে আধ্যাত্মিকতার বিভিন্ন স্তরসমূহ বর্ণনার পাশাপাশি সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাঝে সম্পর্ক তৈরির মাধ্যমসমূহ অত্যন্ত চমৎকারভাবে কাব্যাকারে উপস্থাপন করেছেন। কবি এ কাব্যগ্রন্থে যে বিষয়টি বেশি গুরুত্বারোপ করেছেন সেটি হলো আত্মা। ফারসি সাহিত্যে যে সকল কবি-সাহিত্যিক অধ্যাত্মবাদ নিয়ে আলোচনা করেছে তার প্রত্যেকটির মূল বিষয়বস্তু হলো আত্মা। কারণ অধ্যাত্মবাদ মূলত আত্মার সাথেই সম্পৃক্ত (Ahmad 12)। এ কাব্যে চিন্তামূলক বা দর্শন বিষয়ের ক্ষেত্রে কুরআনের আয়াত, হাদিস, বিভিন্ন প্রকারের বিজ্ঞান, দর্শন শাস্ত্রীয় বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। নিচে নিজামি গাঞ্জুবি রচিত *মাখযানুল আসরার* কাব্যগ্রন্থ থেকে দু'টি বেইত তুলে ধরা হলো-

ای گهر تاج فرستاد گان تاج ده گوهر آزاد گان
هرچه بیگانه و خیل توان جمله در این خانه طفیل تواند
(নিজামি গাঞ্জুবি ৩৯)

হে মূল্যবান রত্ন (রাসুল) প্রেরিতদের মুকুটধারী
মুকুট দাও স্বাধীন মহামূল্যবানদের।
যা কিছু অজানা ও অযাচিত সে সম্পর্কে তিনি সক্ষম
ইহজগতের সকল পরগাছা সম্পর্কে তিনি সক্ষম।

খসরু ওয়া শিরিন (خسرو و شیرین):

নিজামি গাঞ্জবির দ্বিতীয় বিখ্যাত রোমান্স উপাখ্যান হলো- *খসরু ওয়া শিরিন*। এ কাব্যগ্রন্থের কাহিনী সামানি যুগের একটি গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে। এ মাসনাবি গ্রন্থটি ৫৭১-৪ হিজরি মোতাবেক ১১৭৭-৮১ খ্রিষ্টাব্দে রচনা করেন। এটি আজারবাইজানের গভর্নর কিজিল আরসালান এবং সর্বশেষ সেলজুকি বাদশা তুগরিগ বিন আরসালানের নামে উৎসর্গ করেন (শাফাক ২২১)। তাঁর রচিত *খসরু ওয়া শিরিন* কাব্যগ্রন্থের পঙ্ক্তি সংখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। এ. জে. আরবেরির মতে, *খসরু ওয়া শিরিন* কাব্যগ্রন্থে ৭,০০০টি পঙ্ক্তি রয়েছে (Arberry 124)। এ ছাড়া যবিহ উল্লাহ সাফা এর মতে, ৬,৫০০টি (সাফা ৮০২)। এবং সাঈদ নাফিসি এর মতে, ৭,৭০০টি পঙ্ক্তি রয়েছে (নিজামি গাঞ্জবি ৭৮)। এটি রচনা সম্পন্ন হওয়ার পর আজারবাইজানের গভর্নর কিজিল আরসালান নিজামি গাঞ্জবিকে তাঁর দরবারে আমন্ত্রণ জানান। নিজামি গাঞ্জবি তাঁর দরবারে গমন করলে গভর্নর তাঁকে সমাদর ও পুরস্কার হিসেবে দু'টি গ্রাম (Nijan ও Hamduniyan) প্রদান করেন (Ahmad 148)। হাকিম নিজামি *খসরু ওয়া শিরিন* কাব্যগ্রন্থ থেকে একটি কবিতা তাঁর সামনে আবৃত্তি করে শুনালেন। এতে বাদশা তাঁর কবিতার প্রতি খুবই আকৃষ্ট হলেন এবং নিজামির প্রশংসা করলেন। এ সম্পর্কে হাকিম নিজামি গাঞ্জবির কয়েকটি বেইত উল্লেখ করা হলো-

در آمد راوی و برخواند چون در ثنایی کان بساز از گنج شد پر
حدیثم را چو خسرو گوش میکرد ز شیرینی دهن پر نوش میکرد
حکایت چون بشیرینی در آمد حدیث خسرو و شیرین بر آمد
شهنشہ دست برد و شم نهاده تحسین حلقه در گوشم نهاده
شکر ریزان همی کرد از عنایت حدیث خسرو و شیرین حکایت
(নিজামি গাঞ্জবি ৯)

যখন আবৃত্তিকারক আসলো এবং আবৃত্তি করলো
যেনো প্রশংসার চাদরে গাঞ্জ পূর্ণ হয়ে গেলো।
যখন আমার কথা খসরু শুনলেন
তাঁর মুখ সুমিষ্ট পানীয়তে পরিপূর্ণ হলো।
যখন শিরিনের গল্প শুরু হলো
তখন খসরু ও শিরিনের বর্ণনা আসলো।
যখন রাতের খাবারে বাদশা হাত দিলেন
তাঁর প্রশংসার বলয় আমার কানে আসলো।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিনির খণ্ডের ন্যায়
খসরু ও শিরিনের গল্পের প্রতি আগ্রহ দেখালো।

এ কাব্যগ্রন্থের প্রেমিকা হলেন শিরিন আর প্রেমিক হলেন খসরু। এই প্রেমিক খসরু বুকের ভেতর একজন নারীর

ছবি অঙ্কন করেছিলেন যা শিরিনের অবয়বের সাথে হুবহু মিলে যায়। তাই শিরিনকে প্রথমবার দেখেই তাঁর হৃদয়ে প্রেমের আগুন জ্বলে উঠে। শিরিন সুন্দরীর এক বিরল দৃষ্টান্ত ছিলো। রূপে-গুণে তাঁর কোনো কমতি ছিলো না। রূপ ও গুণে রূপায়িত শিরিনের প্রেমে আসক্ত হয়ে খসরুর মনে মিলনের মাধ্যমে প্রেমের পূর্ণতা পেতে সাধ জাগে এবং সময়ের ব্যবধানে সেটি বাস্তবে রূপও লাভ করে। আর এই মিলনের মধ্যে দিয়েই খসরু ও শিরিনের প্রেমের পরিপূর্ণতা লাভ করে।

অপরদিকে প্রস্তর খোদাইকারী এক দরিদ্র যুবক ফরহাদ শিরিনের প্রেমে আকৃষ্ট হয়। ফরহাদ শিরিনের প্রেমে আসক্ত হয়ে দুনিয়ার সকল চিন্তা-চেতনা থেকে দূরে সরে যায়। ফরহাদ দিন-রাত শিরিনকে নিয়েই নিমগ্ন থাকতো। যেদিকে তাকায় সেদিকেই শিরিনকে দেখতে পায়। তার এই প্রেমের পাগলামীর খবর শিরিনের কাছে পৌঁছে। শিরিন তখন ফরহাদকে দেখার ইচ্ছা পোষণ করেন এবং পরবর্তীতে তার কাছে আগমন করেন।

ফরহাদের প্রেমের খবর যখন খসরুর কাছে পৌঁছল তখন খসরু প্রথমে তার সাহস দেখে আশ্চর্য হলেন। কিন্তু পরবর্তীতে এটাকে নিছক পাগলামী মনে করেন। খসরু ফরহাদের প্রেম সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর তাকে দরবারে ডেকে আনলেন। এ সময়ে নিজ কানে ফরহাদের প্রেমের অনুভূতি ও অভিব্যক্তি শুনে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করলেন। ফরহাদের প্রেমের অনুভূতি শুনে খসরু তাকে শর্ত দিলেন যে, যদি বিসতুন পর্বতমালা কেটে ওপারের জলধারা এপারে প্রবাহিত করতে পারো তবেই শিরিনকে তুমি পাবে। ফরহাদ খসরুর দেওয়া শর্ত মেনে নিলেন। ফরহাদ প্রাণের চেয়ে প্রিয় শিরিনকে পাওয়ায় আশায় বিসতুন পর্বতমালা কর্তন করা শুরু করে দিলেন। তিনি অসাধ্য সাধনের কামনা নিয়ে পর্বতের এক গুহায় আশ্রয় নিলেন এবং পর্বতের এক পাশে শিরিনের শিলামূর্তি অংকন করলেন। এটি প্রতিনিয়ত দেখে তার মন কঠিন এক জীবন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার মানসিক শক্তি ফিরে পায়। বহুদিন যাবৎ এই পর্বত কাটতে লাগলো। এইভাবে ক্রমে সে শিলাক্ষেত্রে এক গভীর খাদ খনন করলো। ধাপে ধাপে জলশ্রোত তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ থেকে কলনাদে নেমে আসলো। মেঘ গর্জনে সে ধারা প্রবাহিনী সৃষ্টি করে দিগন্তের পানে ছুটলো। সকলেই তার এই কঠোর শ্রম দেখতে এসে অবাক হতে লাগলো। অবশেষে ফরহাদের দুঃখ-কষ্টের প্রায় অবসান হতে যাচ্ছে। হঠাৎ একদিন খসরুর দূত এসে বলল, কেনো তুমি এই প্রাণান্তকর পরিশ্রম করছো? তোমার শিরিন এই দুনিয়াতে বেঁচে নেই। তোমার শিরিন দুই সপ্তাহ পূর্বেই ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছে। এই খবর শুনে ফরহাদের মাথায় বজ্রাঘাত নেমে আসলো। তার আর বেঁচে থাকার ইচ্ছা থাকলো না। তার অন্তরের অন্তঃস্থল নিংড়িয়ে একবার ক্ষীণ শিরিন শব্দটা দীর্ঘশ্বাসের দ্বারা বের হয়ে আসলো। হাত দু'টি উর্ধ্বে উখিত হলো। রোদ্রোজ্জ্বল কুঠার ঝকঝক করে সুদূর শূন্যে নিক্ষিপ্ত হলো। আর ফরহাদ সেই তুঙ্গগিরি শিখর থেকে এক লাফে শিরিনের নাম উচ্চারণ করে অতল তলে লুটিয়ে পড়ল। ফরহাদ শিরিনের শোকে চিরবিদায় নিল। কবি নিজামি গাঞ্জুবি এই ত্রিভুজ প্রেমের আবেগময় বর্ণনার মাধ্যমেই *খসরু ওয়া শিরিন* প্রেমোখ্যানের পরিসমাপ্তি টেনেছেন।

কবি নিজামি গাঞ্জুবি *খসরু ওয়া শিরিন* কাব্যগ্রন্থে প্রেমিকা শিরিনের রূপের বর্ণনা করতে গিয়ে কখনো বাগানের ফুটন্ত ফুল, আবার আকাশের জ্বলন্ত চাঁদ, আবার পাহাড়ের প্রবাহিত ঝর্ণার সাথে তুলনা করেছেন। ইয়েমেনের রক্তবর্ণ আকীক পাথরের সাথে তাঁর দু'টি গাল এবং একনিষ্ঠ প্রেমিকের সাথে তাঁর ঠোঁটকে তুলনা করেছেন। তাঁর গালে বসিয়েছেন প্রেমের তিলক যাকে দেখে হাজারো প্রেমিক পুরুষ তাঁর প্রতি আসক্ত হবে। তাঁর চক্ষুদ্বয়কে তুলনা করেছেন হরিনীর সাথে, তাঁর বক্ষকে তুলনা করেছেন রূপালী বর্ণের শীষের সাথে, যেখান থেকে প্রতিনিয়ত প্রবাহিত হচ্ছে ফুলের সুগন্ধি। তাঁর কানকে তুলনা করেছেন উজ্জ্বল জীবন্ত মুক্তার সাথে, যা থেকে হাজারো

প্রেমিক তাঁর প্রেমে পড়বে। তাঁর দাঁতগুলো তুলনা করেছেন স্বর্ণ-মুক্তার সাথে, যার হাসিতে দূর থেকে আলো চমকতে থাকে আর মুক্তা ঝরে। অবশেষে শিরিনকে বেহেশতের হরের সাথে তুলনা করেছেন। কবি নিজামি গাঞ্জুবি দৃষ্টিতে হরেরা বেহেশতে সুন্দর আর এই পৃথিবীর শিরিন হলো বেহেশতের হরের সাদৃশ (নিজামি গাঞ্জুবি ৪৭৭)। কবি নিজামি গাঞ্জুবি রচিত *লাইলি ওয়া মাজনুন* কাব্যগ্রন্থ থেকে কয়েকটি নিচে বেইত উদ্ধৃতি করা হলো-

خبر بردند شیرین را که فرهاد بماهی حوضه بست و جوی بگشاد
چنان کز گوسفندان شام و شبگیر بحوض آید بپای خویشتن شیر
بهشتی پیکر آمد سوی آن دشت بنگرد جوی شیرو حوض بر گشت
(নিজামি গাঞ্জুবি ২১৫)

ফরহাদের খবর শিরিনকে দেওয়া হলো
চৌবাচ্চার মুখ বন্ধ হয়ে গেছে অববাহিকা খুলে গেছে
মেঘ ও রাতের পাখির খাবার থেকে
চৌবাচ্চার দিকে পায়ে হেটে এসেছে সিংহের ভয়ে।
ঐ মরুভূমিতে বেহেশতের হর এসেছে
পানির ঝর্ণার দিকে দৃষ্টি দিল আর চৌবাচ্চা বন্ধ হয়ে গেল।

লাইলি ওয়া মাজনুন (لیلی و مجنون):

নিজামি গাঞ্জুবির তৃতীয় মাসনাভি কাব্যগ্রন্থ হলো- *লাইলি ওয়া মাজনুন*। কবি এই প্রণয়কাহিনীটি ৫৮৪ হিজরি মোতাবেক ১১৮৮ খ্রিষ্টাব্দে চার মাসে রচনা করেন (কেশাভারথি ৩২৮)। এ কাব্যগ্রন্থের পঙ্ক্তি সংখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ই. জি. ব্রাউন এর মতে, ৪,০০০টি পঙ্ক্তি রয়েছে (Browne 407)। সাঈদ নাফিসি এর মতে, ৫,১০০টি (নিজামি গাঞ্জুবি ৯৩), মানসুর সারভাত এর মতে, ৬,৫০০টি (সারভাত ৫৩), এবং পারভিন শাকিব্বার মতে, ৪,৭০০টি পঙ্ক্তি রয়েছে (শাকিব্বা ১০৬)।

নিজামি গাঞ্জুবি রচিত *লাইলি ওয়া মাজনুন* কাব্যগ্রন্থটি বিখ্যাত ও জনপ্রিয় রোমান্স উপাখ্যান। এই মাসনাভি গ্রন্থটিতে লাইলি প্রেমিকা আর মাজনুন হলো প্রেমিক। মাজনুন এর প্রকৃত নাম কায়েস। লাইলির প্রেমে উন্মাদ হওয়ায় তাঁর নাম হয় মাজনুন। তাঁরা একে অপরকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। তাঁরা যখন পরস্পরের প্রেমে পাগলপারা তখন লাইলির পিতা মাজনুনকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তাঁদের প্রেমে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। লাইলির বাবা কোনোভাবেই তাঁদের নিষ্পাপ প্রেম মেনে নিলেন না। মাজনুন যখন শত চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন তখন তিনি লাইলির বিরহে উদাসীন হয়ে গৃহত্যাগ করে মরুপ্রান্তরে ঘুরে বেড়ায় আর লাইলির নাম জপতে থাকেন। তাঁর মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা যে, কোনো একদিন হয়তো লাইলিকে আপন করে পাবে। কিন্তু মাজনুনের এই আশা কোনো সময়ে বাস্তবায়ন হয়নি। অপর দিকে লাইলিও তাঁর প্রেমিকের জন্য বিমর্ষ হয়ে পড়েন। মাজনুনের প্রেম ও আত্মত্যাগের কাহিনী ছড়িয়ে পড়লে নওফল নামক এক যুবক মাজনুনকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসেন। সে লাইলির পিতার সাথে যুদ্ধ করে তাঁকে পরাজিত করেন এবং লাইলিকে মাজনুনের কাছে বিয়ে দিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু লাইলির পিতা তাতেও রাজি হলেন না। ফলে মাজনুন মাতাল ও দেওয়ানা হয়ে গভীর মরুভূমিতে চলে যায়। একদিন হঠাৎ এক অজানা পথিক সংবাদ দিলেন যে, লাইলিকে ইবনে সালাম বিয়ে করেছেন। এদিকে ইবনে সালামও লাইলিকে গভীর ভালোবাসতেন। কিন্তু এই ভালোবাসা তাঁর জীবনে সুখ বয়ে আনতে পারেনি।

মাজনুন লাইলির বিয়ের খবর পেয়ে দুঃখের সাগরে ভাসতে থাকেন। মাজনুনের পিতা একাধিকবার তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন কিন্তু কোনোক্রমে সে আর ফিরে আসলেন না। অপরদিকে লাইলিও মাজনুনের জন্য পাগল প্রায়। সর্বদা মাজনুনের কথা ভেবে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। তাই প্রেমের টানে লাইলি একদিন গোপনে গ্রহরীর দৃষ্টি এড়িয়ে মাজনুনের সন্ধানে বের হলেন। অনেক কষ্ট সহ্য করে শেষ পর্যন্ত লাইলির প্রাণের চেয়ে প্রিয় মাজনুনের কাছে পৌঁছলেন। লাইলি মাজনুনকে আদর করে ডাকছেন কিন্তু মাজনুন তাঁকে চিনতে পারলেন না। আর এ দৃশ্য কোনোক্রমেই লাইলি মেনে নিতে পারলেন না। ফলে মনের কষ্ট নিয়ে লাইলি নিজ গৃহে ফিরে আসলেন। কিছু দিন পর মাজনুনের শোকে লাইলিও দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। অপর দিকে মাজনুনেরও স্বাস্থ্য হানীর কারণে মৃত্যু হয়। তাঁদের মরদেহ উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে একই কবরে সমাহিত করা হয়। কবি নিজামি গাঞ্জুবি এই পর্যায়ে বিয়োগান্তক এ সব ব্যাখ্যার চিত্র আঁকতে গিয়ে নিজেই কষ্টে অস্বস্তিবোধ করেছিলেন। ফলে এ কাহিনীর শেষান্তে এসে লাইলি ও মাজনুনের স্বর্গপুরীতে বিয়ে ও মিলন দেখিয়ে এ অপূর্ব প্রেমকাব্যের সমাপ্তি করেছেন। নিচে হাকিম নিজামি গাঞ্জুবি লাইলি ওয়া মাজনুন কাব্যগ্রন্থ থেকে দু'টি বেইত উদাহরণ স্বরূপ তুলে ধরা হলো-

ای نام تو بهترین سر آغاز بی نام تو نامه کی کنم باز
ای یاد تو مونس روانم جز تو نیست بر زبانم

(নিজামি গাঞ্জুবি ৩৫০)

হে খোদা তোমার নামেই সর্বোত্তম শুভ সূচনা হয়

তোমার নাম ব্যতীত কখন চিঠি উন্মুক্ত করেছি।

তোমার স্মরণে আমার আত্মা হয় গতিশীল

তুমি ব্যতীত আমার ভাষায় আর কিছুই নেই।

লাইলি এবং মাজনুন প্রেমকাহিনীটি মূলত একটি কাল্পনিক উপখ্যান। এই অপরূপ উপখ্যানটি কার সন্তান-সন্ততি তা আজও সঠিকভাবে জানা যায়নি। আরবি সাহিত্যের ইতিহাসে এই উপখ্যানের বিষয় নীরব। ধারণা করা হয় এই কাহিনীটি আরবে উদ্ভূত নয়। যদিও ঘটনার স্থান আরবে এবং পাত্র-পাত্রী আরবীয় (বাহরাম খাঁ ২৮)।

হাফত পেইকার (هفت پیکر):

নিজামি গাঞ্জুবির চতুর্থ মাসনাবি কাব্যগ্রন্থ হলো- হাফত পেইকার। হাফত শব্দের অর্থ সাত আর পেইকার শব্দের অর্থ ছবি সুতরাং হাফত পেইকার এর আভিধানিক অর্থ সাতটি ছবি। এটি বাহরাম নামা ও হাফত গুনবাদ নামেও পরিচিত। নিজামি গাঞ্জুবি এ কাব্যগ্রন্থটি হিজরির ৫৯৩ হিজরি মোতাবেক ১১৯৬ খ্রিষ্টাব্দে আলাউদ্দিন আরসেলানের নামে উৎসর্গ করেন। এতে সাসানি রাজবংশের বিখ্যাত বাদশাহ বাহরাম গোরের বীরত্ব ও প্রণয়কাহিনী কাব্যাকারে রচনা করা হয়েছে (সাফা ৮০৩-৮০৪)। হাফত পেইকার কাব্যগ্রন্থের পঙ্ক্তি সংখ্যা নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সাঈদ নাফিস এর মতে, ৫,৬০০টি (নিজামি গাঞ্জুবি ৯৩), এবং মানসুর সারভাত এর মতে, ৫,১৩৬টি পঙ্ক্তি রয়েছে (সারভাত ৫৪)। কবি নিজামি গাঞ্জুবি এ কাব্যগ্রন্থে বাহরাম গোরের জন্মবৃত্তান্ত ও তাঁর মুসলমান হওয়ার কাহিনী, বাহরাম গোরের পিতার মৃত্যুর সংবাদ প্রাপ্তির বিবরণ, হযরত সোলায়মান (আ.) এর আপন বিবির সাথে কথোপকোথন, বৃদ্ধ কর্তৃক বাহরাম গোরকে দেওয়া উপদেশ, বাহরাম গোর বিচারে বসে সকল বন্দীকে মুক্ত করে দেওয়ার বিবরণসহ আরও অনেক কাহিনী চমৎকারভাবে কাব্যাকারে ফুটে উঠেছে (সাফা ৮০৪)। এ কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে কবি হাকিম নিজামি গাঞ্জুবির দু'টি বেইত উদ্ধৃতি দেওয়া হলো-

از پس پانصد و نود سه بر آن گفتم این نامه را چو ناموران
روز بر چارده ز ماه صیام چار ساعت ز روز رفته تمام
(নিজামি গাঞ্জুবি ৪৯৭)

পাঁচশত তিরানব্বই বছর পর ঐ সম্পর্কে,
বললাম এ গ্রন্থটি এতোই প্রসিদ্ধ।
রমযান মাসের চৌদ্দ দিন,
প্রতিদিন চার ঘণ্টা করে শেষ করেছি।

নিজামি গাঞ্জুবি রচিত *হাফত পেইকার* একটি অনবদ্য প্রেমকাহিনী নির্ভর কাব্যগ্রন্থ। এতে সাতটি ছবি তথা সাত জন রাজকুমারীর সৌন্দর্য বর্ণনার পাশাপাশি প্রেম-ভালোবাসা, চাওয়া-পাওয়া, আবেগ-অনুভূতি, আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে। এ কাব্যগ্রন্থের কাহিনী হলো- ইরানের সামানি রাজবংশের বিখ্যাত বাদশাহ ইয়াযদগারদ তাঁর পুত্র বাহরাম গোরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য আরবের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী লোকমান হাকিমের কাছে প্রেরণ করেন। সেখানে একটি গোপন কক্ষে প্রবেশ করে বাহরাম গোর সাতজন রাজকুমারীর ছবি দেখে মুগ্ধ হন এবং তাঁদের প্রত্যেককে বিবাহ করার ইচ্ছা পোষণ করেন। ক্ষমতায় আরোহণ করে তিনি সাতজনকেই বিবাহ করেন এবং তাঁদেরকে নিজ দেশের অনুকরণে সাতটি বিভিন্ন রঙের রাজপ্রাসাদ তৈরি করে দিয়েছিলেন। সপ্তাহে সাত দিন তিনি সাত জনের সাথে রাত্রিযাপন করতেন এবং তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে একটি করে গল্প শুনতেন। সাতটি কাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে রোমান্টিক ও আকর্ষণীয় ছিল ভারতীয় রাজকন্যার কাহিনী (সাত্তার ৩৩)। এই প্রাসাদের ঘটনা ব্যক্ত করতে গিয়ে কবি নিজামি গাঞ্জুবি যে কাব্য রচনা করেছেন সেখান থেকে নিচে দু'টি বেইত তুলে ধরা হলো-

سوی گنبد سرای غالیه فام پیش بانوی هند شد بسلام
تاشت آنجا نشاط و بازی کرد عوی سوزی و عطر سازی کرد
(নিজামি গাঞ্জুবি ৫৮৪)

পুরো গম্বুজ ছিলো রঙ্গীন ও সুগন্ধিযুক্ত প্রসাধনীতে পূর্ণ
তাঁর সামনে ভারতীয় মহিলা আসলেন।
রাত্রি পর্যন্ত সেখানে আনন্দ উদ্দীপনা ও প্রেমের খেলায় মত্ত রইলেন
সুগন্ধিযুক্ত আতরের আসর জমালেন।

নিজামি গাঞ্জুবি রচিত *হাফত পেইকার* গ্রন্থের পুরোটা কাব্যে প্রেমের কাহিনী ব্যক্ত করেছেন। তিনি এ কাব্যগ্রন্থে প্রেমের গভীর আবেগ-অনুভূতি, মান-অভিমান, অভিযোগ-অনুযোগ, মিলন-বিরহ, হাসি-আনন্দ প্রভৃতি অত্যন্ত চমৎকার প্রকাশভঙ্গির মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। যা সফলতার সাথে পাঠকদের হৃদয় জয় করতে সক্ষম হয়েছে।

ইসকান্দার নামা (اسکنر نامه):

নিজামি গাঞ্জুবির পঞ্চম মাসনাবি কাব্যগ্রন্থ হলো *এসকান্দার নামা*। এটি দু'টি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশকে *শারফ নামা* এবং দ্বিতীয় অংশকে *ইকবাল নামা* বলা হয় (Ahmad 148)। প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের সমন্বয় এতে প্রায় ১০,৫০০টি পঙ্ক্তি রয়েছে (সাফা ৮০৪)। তন্মধ্যে *শারফ নামা*তে ৬,৮০০টি পঙ্ক্তি ও *ইকবাল নামা*তে ৩,৭০০টি পঙ্ক্তি রয়েছে। কবি নিজামি গাঞ্জুবি এ কাব্যগ্রন্থটি ৫৯৭ হিজরি মোতাবেক ১২০০ খ্রিষ্টাব্দে রচনা করা হয় (Arberry 126)। প্রথম খণ্ডে রয়েছে আলেকজান্ডারের বিজয় অভিযানের সাফল্য এবং ২য় খণ্ডে তাঁর জীবন দর্শনের কীর্তি রয়েছে।

এ কাব্যগ্রন্থে নিজামি আলেকজান্ডারকে একজন যোদ্ধা ও দার্শনিক হিসেবে চিত্রিত করেছেন। এর কবিতার ভাষা ও শৈলী সরল, সুস্পষ্ট এবং কোনো অত্যধিক বাগ্মীতা স্বীকার করে না কিন্তু তা সত্ত্বেও এটি কাব্যিক ও দার্শনিক গভীরতা অর্জন করে। নিজামি গাঞ্জুবি *এসকান্দার নামা* কাব্যগ্রন্থের শেষাংশে এসকান্দারের কিছু উপদেশ উল্লেখ করেছেন। নিচে এ কাব্যগ্রন্থ থেকে একটি বেইত পেশ করা হলো-

خدا یا جهان پادشاهی تراست زما خدمت آید خدائی تراست
(নিজামি গাঞ্জুবি ১)

হে খোদা পৃথিবীর রাজত্ব তোমার
আমারা তোমার গোলামীর জন্য, খোদায়িত্ব তোমার।

দিওয়ানে নিজামি (دیوان نظامی) :

নিজামি গাঞ্জুবির গজল, কাসিদা, রুবাই এবং কেতা সম্বলিত একটি *দিওয়ান* তথা কাব্য সংকলন রয়েছে। এটিকে *দিওয়ানে নিজামি* বলা হয়। নিজামি গাঞ্জুবি এ কাব্যগ্রন্থটি ১১৮৮ খ্রিষ্টাব্দে রচনা করেন। *দিওয়ানে নিজামি* কাব্যগ্রন্থে প্রায় ২০,০০০টি পঙ্ক্তি রয়েছে। নিজামি গাঞ্জুবি *দিওয়ানে নিজামি* কাব্যের মাধ্যমে সুফি মতবাদ ব্যক্ত করেছেন (Rypka 212)। তাঁর *দিওয়ানে নিজামি* সম্পর্কে Tanwir Ahmad বলেন-

The lyrical Diwan is said to have contained about 20,000 verses of which, comparatively a few (about 2000) couplets from Ghazals and Qasidas have survived. these verses exhibit that they were written by a great master of Ghazal (Ahmad 149-150).

উপসংহার :

নিজামি গাঞ্জুবি কবিতায় নতুন চিন্তা-চেতনা সঞ্চারিত করার ক্ষেত্রে অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি নতুন ও খুব সুন্দর রূপক এবং সূক্ষ্ম চিন্তার প্রবর্তক ছিলেন। তিনি দক্ষতার সাথে আরবি শব্দ ও বাণী ব্যবহার করেছেন। তাঁর মহৎ ও মর্যাদাপূর্ণ ধারণা ও কল্পনা, অসীম ধর্মীয় অনুভূতি, অভিব্যক্তির নির্ভুল উপাদান নির্বাচন এবং বিন্যাস, দার্শনিক গভীরতা, উচ্চতর কৌশল এবং সমাজিক উপলক্ষের কারণে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি তাঁর তীব্র ধর্মীয় অনুভূতি, তাঁর উচ্চ নৈতিক ধারণা এবং অভ্যন্তরীণ মানসিক সম্পদের প্রকাশে তাঁর সংঘর্ষের জন্য প্রশংসিত হয়েছেন। তাঁর কাব্যে তিনি রাজা-বাদশাহদের অতিরঞ্জিত প্রশংসা করেননি। তিনি কাব্যশিল্পে কৃতিত্বের পাশাপাশি তাঁর নৈতিক উৎকর্ষে পরবর্তী এবং সমসাময়িকদের মাধ্যমে অতুলনীয় প্রশংসিত ছিলেন।

নিজামি গাঞ্জুবি মূলত *খামসায়ে নিজামি* এর উপর ভিত্তি করে খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। এটি কেবল সাহিত্যিক উৎকর্ষের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাব্যগ্রন্থ নয়, এতে অকৃত্রিম অতীন্দ্রিয় আবেগের সাথে মহৎ চিন্তাধারার সমন্বয় ঘটেছে। আজ থেকে আটশত বছর পূর্বে নিজামি গাঞ্জুবি মৃত্যুবরণ করলেও আজো তিনি তাঁর কাব্য সাহিত্যের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

টীকা :

১. গাঞ্জু : আজারবাইজানের প্রজাতন্ত্রের একটি প্রসিদ্ধ শহর। রাশিয়ার সরকার ককেশাস শহরগুলো দখল করার পর গাঞ্জের নাম রাখেন এলিজাবেতপুল। পরবর্তীতে সোভিয়েত শাসনামলে এর নাম পরিবর্তন করে কেইরুফ আবাদ রাখা হয়। ইরানের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত এ শহর, সাহিত্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে পরিচিত (যানযানি ১৭২)।

তথ্যসূত্র

ফারসি ও উর্দু গ্রন্থসমূহ

কেশাভরায়ি, কায়খসরু। তারিখে আদাবিয়াতে ইরান। এন্তেশারাতে হায়দারি, ১৩৭০ [সৌরবর্ষ]।
নিজামি গাজ্জুবি। দিওয়ানে কাসায়েদ ওয়া গাজালিয়াতে নিজামি গাজ্জুবি। সাঈদ নাফিসি (সম্পাদিত), এন্তেশারাতে এলমি, ১৩৩৮ [সৌরবর্ষ]।
নিজামি গাজ্জুবি। কুল্লিয়াতে খামসায়ে নিজামি গাজ্জুবি। মুঈনফার (সম্পাদিত), এন্তেশারাতে যাররিন, ১৩৬২ [সৌরবর্ষ]।
নিজামি গাজ্জুবি। মাখযানুল আসরারে নিজামি গাজ্জুবি। রুস্তম আলি উফ (সম্পাদিত), এন্তেশারাতে বাইনুল মিলালি আল হুদা, ১৩৭৪ [সৌরবর্ষ]।
নিজামি গাজ্জুবি। শারফ নামা। এন্তেশারাতে আমিরে কাবির, ১৩৯৩ [সৌরবর্ষ]।
নেযাদ, কামেল আহমেদ। তাহলিলে আসারে নিজামি গাজ্জুবি। এন্তেশারাতে এলমি, ১৩৬৯ [সৌরবর্ষ]।
বাদাখশানি, মির্যা মকবুল বেগ। আদাব নামে ইরান। ইউনিভার্সিটি বুক এজেন্সি।
যানযানি, বারাতাত। আহওয়াল ওয়া আসার ওয়া শারহে মাখযানুল আসরারে নিজামি গাজ্জুবি। এন্তেশারাতে দানেশগাহ, ১৩৭২ [সৌরবর্ষ]।
রাযি, আব্দুল্লাহ। তারিখে কামেলে ইরান। এন্তেশারাতে ইকবাল, ১৩৭৩ [সৌরবর্ষ]।
শাকিবা, পারভিন। শেরে ফারসি আয অগায তা এমরোয। এন্তেশারাতে হিরমন্দ, ১৩৭৩ [সৌরবর্ষ]।
শাফাক, রেযা যাদেহ। তারিখে আদাবিয়াতে ইরান। এন্তেশারাতে অহাজ, ১৩৬৯ [সৌরবর্ষ]।
সাফা, যব্বিহ উল্লাহ। তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান (২য় খণ্ড)। এন্তেশারাতে ফেরদৌসি, ১৩৯১ [সৌরবর্ষ]।
সোবহানি, তাওফিক হা। তারিখে আদাবিয়াত। এন্তেশারাতে দানেশগাহে পায়ামে নূর, ১৩৭৫ [সৌরবর্ষ]।
সারভাত, মানসুর। গাজ্জিনায়ে হেকমাত দার আসারে নিজামি। এন্তেশারাতে আমিরে কাবির, ১৩৭০ [সৌরবর্ষ]।

বাংলা গ্রন্থসমূহ

কালাম সরকার, মো. আবুল। বাংলাদেশে ফারসি অনুবাদ সাহিত্য। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১৫ খ্রি।
পাল, হরেন্দ্র চন্দ্র। পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস। শ্রী জগদীশ প্রেস, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ।
বরকতুল্লাহ, মোহাম্মদ। মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ রচনাবলী (১ম খণ্ড)। মোহাম্মদ আব্দুল কাইউম (সম্পাদিত), বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯ খ্রি।
বাহরাম খাঁ, দৌলত উজির। লায়লী মজনু। আহমদ শরীফ (সম্পাদিত), মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৭ খ্রি।
সান্তার, আবদুস্। ফারসী সাহিত্যের কালক্রম। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৭৯ খ্রি।

ইংরেজি গ্রন্থসমূহ

Ahmed, Tanwir. *A short History of Persian Literature*. Naaz Publishing Center, 1991 CE.
Ahmad, Sheikh Mahmud. *The Pilgrimage of Eternity*. Institute of Islamic Culture, 1961 CE.
Arberry, A. J.. *Classical Persian Literature*. George Allen and Unwin Ltd, 1958 CE.
Browne, E.G.. *A Literary History of Persia* (Voll.2). Cambridge University press, 1958 CE.
Rypka, Jan. *History of Iranian Literature*. D. Reidel Publishing Company, 1968 CE.
Wilber, Donald N.. *Iran Past and Present*. Princeton University press, 1958 CE.

ব্রিটিশ শাসনামলে পূর্ব বাংলার প্রশাসনিক বিন্যাস (১৭৯৩-১৯৪৭): কিছু পর্যবেক্ষণ

ড. রওশন আরা আফরোজ *

[প্রতিপাদ্যসার: আঠারো শতকের ষাটের দশকে বাংলার নতুন শাসক হিসেবে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উত্থান হয়। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উত্থান একদিকে যেমন মুর্শিদাবাদ ও ঢাকার অবনতি ঘটায়, তেমনি কোম্পানির ব্যবসায়িক ও রাজস্বনীতিসহ এ দেশের সার্বিক প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন সাধন করে। পরবর্তীতে ব্রিটিশ প্রশাসন মোগলদের সুবা, সরকার ও পরগণার ধারণাগুলোকে গ্রহণ করে। ব্রিটিশদের এই প্রশাসনিক পুনর্গঠনে বিভাগ, জেলা, মহকুমা ও থানা সদর দপ্তরগুলো সমস্ত প্রশাসনিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে পরিণত হয়। রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে এবং পরবর্তীতে ব্রিটিশ সরকার প্রশাসনিক কাজ গতিশীল করার জন্য নতুন প্রশাসনিক ইউনিট গঠন ও পুরাতন প্রশাসনিক ইউনিটের পুনর্বিন্যাস করে। আলোচ্য প্রবন্ধে ব্রিটিশ শাসনামলে পূর্ব বাংলার প্রশাসনিক বিন্যাস এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রের পরিব্যাপ্তি সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে।]

ব্রিটিশ আমলে যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা উপনিবেশিক শাসকরা গড়ে তুলেছিলেন তার মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল রাজস্ব আদায়সহ প্রশাসনিক কাজকে গতিশীল করা। প্রশাসনিক ব্যবস্থায় গতিশীলতা আনার জন্য ১৭৯৩ সাল থেকে ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের সময় পর্যন্ত অধিক্ষেত্রগুলোর নানা রদবদল হয়েছে। এই পরিবর্তনে বিভাগের তেমন রূপান্তর না হলেও জেলা ও ক্ষুদ্র ইউনিট হিসেবে মহকুমার যথেষ্টই হ্রাস-বৃদ্ধি ও অবস্থান্তর ঘটেছে। এখানে লর্ড কর্নওয়ালিশ-এর আধুনিক জেলা প্রথা সৃষ্টির সময় থেকে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তিকালে পূর্ব বাংলার প্রশাসনিক বিন্যাসের পরির্তনশীল চিত্রটি তুলে ধরার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। যেখানে এর প্রশাসনিক গতিশীলতাই প্রকাশ পেয়েছে। উপাদান হিসেবে প্রাথমিক উপাত্ত- জনশুমারি রিপোর্ট, District Gazetteers, Statistical Account, Administrative Report; দ্বৈতীয় উপাত্ত- সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকাশিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ ব্যবহৃত হয়েছে।

ব্রিটিশ সৃষ্ট জেলাগুলোতে ১৭৬৯ সালে ইংরেজ ‘সুপারভাইজার’ নিয়োগ দেয়া হয়। ১৭৭২ সালে এদের পদবি হয় ‘কালেক্টর’ যা ১৭৮৬ সালে জেলা প্রশাসনে পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়। লর্ড কর্নওয়ালিশ জেলা প্রশাসনকে পুনর্বিন্যস্ত করে ২৩ টি করেছিলেন। তাঁর আমলেই আধুনিক জেলা প্রথার সৃষ্টি হয় বলে ইতিহাসবিদগণ মনে করেন যা ১৭৯৩ সাল ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেছে। প্রত্যেক জেলা সদর দপ্তরের ৪-৬ বর্গমাইল এলাকাজুড়ে গড়ে প্রায় ৩০ হাজারের বেশি জনগণ বসবাস করত। ১৮২৯ সালে সৃষ্ট ডিভিশনকে মাঠ পর্যায়ে সর্বোচ্চ প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে ধরা হতো। আর প্রত্যেকটি জেলা কতগুলো মহকুমা (সাব-ডিভিশন) নিয়ে গঠিত ছিল। জন পিটার গ্রান্ট ১৮৪৫ সালে প্রত্যেক জেলাকে আরো ক্ষুদ্র প্রশাসনিক ইউনিট ‘মহকুমা’য় বিভক্ত করেন। প্রাথমিক পর্যায়ের ৩৪টি মহকুমার মধ্যে যশোর জেলার খুলনা ছিল ব্রিটিশ সৃষ্ট প্রথম মহকুমা। মহকুমা সদর দপ্তরগুলোর আয়তন ছিল প্রায় ৩.৫ বর্গমাইল এবং এসব স্থানে গড়ে ১০-১২ হাজার লোক বাস করত। প্রত্যেকটি মহকুমা কতগুলো ‘থানা’ বা ‘পরগণা’য় বিভক্ত ছিল। এখানে একটি সার্কেল অফিসার ও রাজস্ব সংগ্রাহক-এর কার্যালয় এবং পুলিশ ক্যাম্প

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

থাকত (Muhit 5)। ১৭৯৩ সালে বাংলার জেলাগুলো হলো-বর্ধমান, বীরভূম, মেদেনীপুর, ২৪-পরগণা, কলকাতা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, যশোহর, ঢাকা, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, সিলেট ও ময়মনসিংহ (ইসলাম ১৬২)। আর ব্রিটিশ বাংলায় ১৯৪১ সালে পাঁচটি বিভাগ (ডিভিশন), আটটি জেলা ও তিরিশটি মহকুমা (সাব-ডিভিশন) সদরদপ্তর ছিল (*Census of India*, 56-71)। প্রায় দেড়শ বছরে পূর্ব বাংলা অংশে জেলার সংখ্যা বৃদ্ধি ও নতুন সৃষ্ট মহকুমা প্রশাসনিক সীমানার পরিবৃদ্ধি করে। পূর্ব বাংলা অংশের প্রধান প্রশাসনিককেন্দ্র ছিল ঢাকা।

১৯০৫ সালে প্রধানত প্রশাসনিক কারণে বঙ্গ বিভাগের ফলে ঢাকা ‘পূর্ব বাংলা ও আসাম’ প্রদেশের রাজধানীর মর্যাদায় অভিষিক্ত হয় (Molla 26-56)। বঙ্গবিভাগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি। শেষ পর্যন্ত সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ (১৯১১ সাল) করতে বাধ্য হয়েছিলেন (মামুন ৩১)। সম্প্রদায়িক মানসিকতার ফলশ্রুতিতে ১৯৪৭ সালে বাংলা আবার বিভক্ত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তিকালে পূর্ব বাংলা অংশে পড়েছিল ১৬টি জেলা। এর মধ্যে অখণ্ড বা প্রায় অখণ্ডরূপে অবিভক্ত বাংলা প্রদেশের যে জেলাগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তা হলো- ১. ঢাকা, ২. বাকেরগঞ্জ, ৩. ফরিদপুর, ৪. ময়মনসিংহ, ৫. চট্টগ্রাম, ৬. নোয়াখালী, ৭. ত্রিপুরা (কুমিল্লা), ৮. পার্বত্য চট্টগ্রাম, ৯. রাজশাহী, ১০. পাবনা, ১১. বগুড়া, ১২. রংপুর ও ১৩. খুলনা। খণ্ডিতরূপে অঙ্গীভূত হয়েছিল- ১৪. যশোহর, ১৫. দিনাজপুর এবং ১৬. ‘গণভোট’ (Referendum)- এর মাধ্যমে সিলেট (*Report on the Administration of Civil Justice* 1)। ১৮৬০ সালের ১ আগস্ট ২২ নং আইন বলে ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম’ জেলা গঠন হয়েছিল। যদিও তখন পর্যন্ত জেলার সীমানা সুনির্দিষ্ট হয়নি (*Bengladesh District Gazetteers: Chittagong Hill Tracts* 29)। এছাড়া নতুনভাবে সৃষ্টি হয়েছিল কুষ্টিয়া। কুষ্টিয়া ছিল নদীয়া জেলার একটি মহকুমা। জেলাটি সৃষ্টি হয়েছিল নদীয়া জেলা ভেঙ্গে এবং এর কয়েকটি মহকুমার সমন্বয়ে। এটি সহ জেলা হয় মোট ১৭টি। অবশ্য ভারত বিভক্তির পরে ১৯৫০ সালে পূর্ব বাংলা সরকারের পক্ষে ‘Bureau of Commercial and Industrial Intelligence, East Bengal, Dacca’ কর্তৃক ‘Statistical Abstract for Districts in East Bengal’ শীর্ষক যে তথ্যপুস্তকটি প্রকাশিত হয়েছিল তাতেও লক্ষ করা যায়, পূর্ব বাংলায় তখন জেলা ছিল ১৬টি (ইসলাম ১৭৬)। কাজী আজহার আলী তাঁর গবেষণায় বলেন, ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় পূর্ব বাংলা তিনটি বিভাগসহ সতেরোটি জেলা নিয়ে গঠিত হয় (আলী ২৪)। ব্রিটিশ আমলের শুরুতে যদিও একটা সময় পর্যন্ত কলকাতা ছিল অবিভক্ত ভারতের রাজধানী কিন্তু ১৯১২ সালে কলকাতা থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত হয় দিল্লীতে। অপরদিকে ১৯০৫-১৯১১ ও ১৯৪৭ পরবর্তী পাকিস্তান আমলে ঢাকা পূর্ব বাংলার রাজধানী হয়ে টিকে ছিল যা বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী।

এক

রাজনৈতিক গুরুত্বই ছিল মূলত ঢাকার উত্থানের প্রধান কারণ। এই রাজনৈতিক গুরুত্ব লাভের আগে ঢাকা সীমিত সামরিক ক্ষমতা এবং ব্যবসা ও প্রশাসনিককেন্দ্র ছাড়া আর কিছু ছিল না (Khatun 634-636)। প্রকৃতপক্ষে, সুবাদারের বাসস্থানই ছিল মোগল ঢাকার বিকাশের কেন্দ্রবিন্দু। দুর্গের পশ্চিমদিকে সুবাদারের বাসস্থানকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠে নানা সরকারি প্রশাসনিক ভবন এবং তাদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসস্থান- দেওয়ানবাজার, বখশীবাজার, মোগলটুলী, কায়েতটুলী এ ধরনের অনেক বসতি এলাকা। দুর্গের পূর্বদিকে যা ছিল পুরনো বসতি, সেখানে নতুন নতুন বাজার গড়ে উঠলো আর গড়ে উঠলো বিভিন্ন কুটির শিল্পী ও কারিগরদের বিশেষ এলাকা- যেমন: বাংলাবাজার, পাটুয়াটুলী, শাঁখারীবাজার এবং তাঁতিবাজার। উত্তর দিকের অপেক্ষাকৃত উঁচু

সমতলভূমিগুলো স্বল্পকালের মধ্যে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, অভিজাত পরিবার ও বড় ব্যবসায়ীদের দখলে চলে যায়। আরো উত্তরে তেজগাঁও এলাকায় ইউরোপীয় বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলো তাঁদের কুঠিসমূহ প্রতিষ্ঠা করে। প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে (১৭০৪-০৭ সালে) স্থানান্তরিত হওয়ায় এর গুরুত্ব ও গৌরব অনেকখানি হ্রাস হয়ে যায় (Karim 17-32)। আঠারো শতকের মধ্য ভাগ থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত ঢাকার প্রশাসনিক ইতিহাস হলো ক্ষয়িষ্ণু ঢাকার ইতিহাস। পলাশির যুদ্ধের পর ব্রিটিশরা ১৭৬৫ সালে এ দেশের দেওয়ানি ভার গ্রহণ করে প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র কলকাতায় স্থানান্তরিত করে। এইভাবে কলকাতা রূপ নিল দেশের নতুন রাজধানীতে। মুর্শিদাবাদ ভেঙ্গে পড়ল, আর গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে এতোদিন ধরে গড়ে উঠা ঢাকা।

উনিশ শতকে পুনরায় বুড়িগঙ্গার কোল ঘেঁষে নতুনভাবে ঢাকার উত্থান শুরু হয়। ঢাকার এই উত্থানের পেছনে যেসব কারণ ছিল তার মধ্যে প্রথম হলো ঢাকার বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থান। পূর্বাঞ্চলের কেন্দ্রে ঢাকার অবস্থান হওয়ায় এর গুরুত্ব অপরিসীম। উনিশ শতকের মধ্য ভাগ থেকে পূর্ব বাংলার কৃষি অর্থনীতি সমৃদ্ধ হয়। কারণ তখন পূর্ব বাংলার মতো এতো ভাল পাট আর কোথাও জন্মাত না। সেই বাণিজ্যের প্রয়োজনে পূর্ব বাংলার গুরুত্ব প্রায় রাতারাতি বৃদ্ধি পেল। ঢাকাকেন্দ্রিক বাণিজ্য বিশ্ব বাণিজ্যের মর্যাদায় পৌঁছায়। এর ফলে বিদেশী ব্যবসায়ীরা ঢাকায় আসা শুরু করে (ইংরেজ, স্কটিশ, আরমেনিয়ান, হিন্দুস্থানী আর মাড়োয়ারী)। নতুন করে শুরু হয় ঢাকায় বৃহৎ ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড। বিশ্ব বাজারে পাটের প্রয়োজন এইভাবে ঢাকাকে দিল নতুন জীবন। প্রশাসনিক ব্যবস্থা, শিক্ষা ও ব্যবসা-বাণিজ্যকে ভিত্তি করে ঢাকা আবার ঘুরে দাঁড়াল (আহমেদ ৩৬)। ১৯০৩-১৯০৫ পর্যন্ত স্যার এন্ড্রু ফ্রেজার (Sir Andrew Frazer) ঢাকার লেঃ গভর্নর ছিলেন (Lieut. Governor)। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর নতুন প্রদেশ পূর্ব বাংলা ও আসামের যাত্রা শুরু হলে ঢাকা নতুন প্রদেশের রাজধানী হয়। স্যার ব্যাম্পফিল্ড ফুলার (Sir Bampfylde Fuller) নতুন প্রদেশের লেঃ গভর্নর হন (East Pakistan District Gazetteers: Dacca 72; Molla 2-56)। রাজধানী হিসেবে ঢাকাকে তখন গড়ে তোলার জন্য পরিকল্পনা নেয়া হয়। সরকারি কর্মচারীদের বাসভবন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনিক ভবনগুলো নির্মিত হয়। রমনা ও তেজগাঁও এলাকা এসময় সমৃদ্ধি লাভ করে। কার্জন হল, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল ছাত্রাবাস, ঢাকা হল, লাট ভবন, সচিবালয় ভবন, ছাপাখানা ভবন প্রভৃতি এ সময়ের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন (গেডেডস ১৭)। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর পূর্ব বাংলার রাজধানী হিসেবে ঢাকার যথেষ্ট পরিবর্তন হয়। তেজগাঁও ও মতিঝিল কেন্দ্রীয় বাণিজ্যিক এলাকা হিসেবে, জিন্নাহ এভিনিউ ও স্টেডিয়াম মার্কেট প্রধান বিপণী কেন্দ্রে, শান্তিনগর, রাজারবাগ এবং ইস্কাটন অভিজাত এলাকা হিসেবে গড়ে উঠে। আর মধ্যবিত্তের আবাসিক এলাকা ছিল মালিবাগ। এই বিস্তৃত এলাকার পশ্চিমে মোহাম্মদপুর এলাকা, উত্তরে তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে খিলগাঁও ও কমলাপুর এবং পূর্বে দিয়াগঞ্জ ও পোস্তগালা (Dani 8-10)। কারণ উন্নয়নশীল এ এলাকাগুলো মধ্যশ্রেণির আয়ের সাথে মানানসই জীবনব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। যা অভিজাত এলাকায় সম্ভব ছিল না।

ঢাকা বিভাগের একটি জেলা ছিল ময়মনসিংহ। ময়মনসিংহ জেলাকেন্দ্রিক বেশ কয়েকটি মহকুমা গড়ে উঠেছিল। ১৯৪১ সালের জনশুমারির তথ্যানুযায়ী পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার সমস্ত জেলার মধ্যে ৫,০০০ বর্গমাইলের বেশি আয়তনের যেসব জেলা ছিল তার মধ্যে সর্ববৃহৎ এবং পূর্ব বাংলার একমাত্র জেলা ছিল ময়মনসিংহ (৬,১৫৬ বর্গমাইল) (Census of India, 62-71)। তবে লক্ষণীয় যে, প্রথম জনশুমারির সময়ে (১৮৭২) পূর্ব বাংলার একমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার আয়তন ছিল ময়মনসিংহের চেয়ে বেশি। কিন্তু ১৯৫১ সালের জনশুমারিকালে ময়মনসিংহ জেলার আয়তন ৬,২৩০ বর্গমাইল ছিল (Census of Pakistan, 1: 4)। নাসিরাবাদে (ময়মনসিংহ) এ জেলার হেডকোয়ার্টার স্থাপিত হয় ১৭৮৬ সালে। ১৮৪৫ সালে জামালপুর মহকুমা, ১৮৬০ সালে কিশোরগঞ্জ

মহকুমা সৃষ্টি হয়। ১৮৭২ সালে ময়মনসিংহ জেলার চারটি মহকুমা ছিল- সদর, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ ও আটিয়া (টাঙ্গাইল)। পরবর্তীতে নেত্রকোনা (১৮৮১-৮২) মহকুমা হলেও তা সেসময় সদর মহকুমার এলাকাভুক্ত ছিল। আটিয়া মহকুমা ও তার হেডকোয়ার্টার স্থাপিত হয় ১৮৬৯ সালে। তার পূর্ব পর্যন্ত আটিয়া মহকুমা জামালপুর মহকুমার অন্তর্ভুক্ত ছিল। জামালপুর মহকুমা স্থাপিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র জেলা নাসিরাবাদ হতে শাসিত হতো (Hunter vol. v: 474-476)। আর বৃহত্তর বরিশাল জেলার পূর্ব নাম ছিল বাকেরগঞ্জ। ১৭৯৭ সালের রেগুলেশন (vii) এর আওতায় বাকেরগঞ্জ একটি পৃথক জেলায় পরিণত হয়। ১৮১৭ পর্যন্ত এটি ঢাকা কালেক্টরের আওতাধীন ছিল কিন্তু এর নিজস্ব বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেট ছিল (*Population Census of Pakistan: Bakerganj* I-9)। নদী ভাঙনের কারণে এবং অধিকতর ভৌগোলিক সুবিধা পাওয়া যাবে বিবেচনায় দুটি দপ্তরই ১৭৯২ সালের দিকে নদীর সঙ্গমস্থল বাকেরগঞ্জে স্থানান্তরিত হয়েছিল (বাকেরগঞ্জ তুলনামূলকভাবে জেলার অনেকটা মধ্য স্থানে অবস্থিত ছিল)। অবশ্য তখন এর বাণিজ্যিক খ্যাতিও ছিল যথেষ্ট (ভূইয়া ২৫৮)। দক্ষিণ শাহবাজপুর আগে বাকেরগঞ্জেরই অংশ ছিল। ১৮২২ সালে বাকেরগঞ্জ থেকে এটিকে আলাদা করে নিয়ে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল নোয়াখালীর সঙ্গে। ১৯৩১ সালে প্রথম দক্ষিণ শাহবাজপুর মহকুমা ভোলা নামে পরিচিত হয় (*Census of India*, 263-264)। এ অবস্থা ব্রিটিশ শাসনামলের শেষ অবধি একই ছিল (৪টি)।

ঢাকা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত বৃহত্তর ফরিদপুর জেলা প্রাচীন বাংলার অংশ ছিল। ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বের গতিপথ এবং ভাগিরথী নদীর মধ্যবর্তী পদ্মা নদীর দক্ষিণাংশে এই অঞ্চল অবস্থিত। ১৭৬৫ সালে কোম্পানি যখন দিওয়ানি লাভ করে তখন ফরিদপুর জেলা কোম্পানির রাজস্ব প্রশাসনের অধীনে চলে যায়। ১৭৯৩ সালে স্থায়ী বন্দোবস্তের সময় গোয়ালন্দ ও গোপালগঞ্জ যশোহর জেলার সাথে এবং ফরিদপুরের অবশিষ্ট অংশ ঢাকা-জামালপুর, ফরিদপুর ও বাকেরগঞ্জ (সদরদপ্তর ঢাকা)-এ যুক্ত হয়। ১৭৯৭ সালে আবার বাকেরগঞ্জকে আলাদা করা হয়। ঢাকা-জামালপুরের সদরদপ্তর ফরিদপুর শহরে স্থানান্তর করা হয়। আর ঢাকা শহরকে বর্তমান ঢাকা জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। নতুন ফরিদপুর জেলার সঙ্গে যশোরের একটি অংশ যুক্ত হয়। ব্রিটিশ প্রশাসনিক স্তর হিসেবে ফরিদপুর জেলা বা কালেক্টরশিপ স্থাপিত হয়েছিল ১৮১১ সালে। ১৮৫০ সালে ফরিদপুরের প্রশাসনিক কাঠামোতে পরিবর্তন আসে। ১৮৫৯ সালে এর আয়তন ছিল ১,৩১২ বর্গমাইল। এসময় মানিকগঞ্জ মহকুমাকে ঢাকা জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ১৮৭১ সালে গোয়ালন্দ মহকুমা সৃষ্টি করা হয় (ভূইয়া ৮-৯)। ১৮৭২ সালের ফরিদপুর জেলা মাত্র দুটো মহকুমায় বিভক্ত ছিল (*Census of Bengal* xv)। ১৮৫৪ সাল নাগাদ মাদারীপুর মহকুমা গঠিত হলেও এটি ফরিদপুরভুক্ত হয়েছিল ১৮৭৩-৭৪ সালের দিকে (*Census of Bengal*, 593-594)। বিশ শতকের গোড়ায় (১৯০১ সালে) জেলার বিদ্যমান প্রশাসনিক অধিক্ষেত্র ছিল সদর, মাদারীপুর ও গোয়ালন্দ- এই তিনটি মহকুমায় বিভক্ত (*Census of India*, 73)। আনুষ্ঠানিকভাবে জেলায় গোপালগঞ্জ মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৯ সালে (*Bangladesh District Gazetteers: Faridpur* 2) ফলে ১৯১১ সালে জেলাটি বিভক্ত হয়েছিল ৪টি মহকুমায় (*Census of India*, 409)। ১৯৪১ সালের জনশুমারির রিপোর্টেও দেখা যায় জেলায় ৪টি মহকুমা ছিল (*Census of India*, 68-69)। দেশভাগের পর এর প্রশাসনিক অধিক্ষেত্রের তেমন পরিবর্তন হয়নি।

দুই

পূর্ব বাংলার অন্যতম প্রধান বিভাগ ছিল চট্টগ্রাম। বস্তুত চট্টগ্রাম একটি অতি প্রাচীন শহর এবং এর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও নাগরিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে এটি বন্দর শহর হিসেবে বেড়ে উঠে। সতেরো শতক পর্যন্ত চট্টগ্রাম একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ছিল, কিন্তু এর পরে আরাকানী মগদের ঘন ঘন আক্রমণ এবং পর্তুগীজ জলদস্যুদের হামলার

কারণে এর উন্নয়ন ব্যাহত হয় (আহমেদ ১৮৫)। লর্ড কর্নওয়ালিসের সময় থেকে নিয়মিত ইংরেজ কালেক্টর নিয়োগের ব্যবস্থা শুরু হয়। ১৮৪৫ সালে মহকুমা প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার নিয়ে গড়ে উঠেছিল এ জেলার মহকুমা প্রশাসন। পরে ১৮৫৪ সালে কক্সবাজারে কয়েকটি থানা (কক্সবাজার, চকোরিয়া, মহেশখালী ও টেকনাফ) নিয়ে কক্সবাজার মহকুমা গঠিত হয়। ১৮৭২ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রামে দুটো মহকুমা ছিল (*Census of Bengal xvii*)। জেলা ও মহকুমার প্রশাসন ব্যবস্থা কালেক্টরের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। চট্টগ্রাম পোর্টের প্রশাসন ব্যবস্থার জন্য ১৮৮৭-৮৮ সালে 'A Port Trust' সৃষ্টি করা হয়। প্রশাসনিক সংস্থার চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন যথাক্রমে কমিশনার ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। চট্টগ্রাম পোর্টের প্রশাসন ব্যবস্থার জন্য পোর্ট ট্রাস্ট কমিশনার এবং বন্দর অফিসার, একজন কার্যনির্বাহী অফিসার, একজন বন্দর প্রকৌশলী, একজন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, একজন সরকারি প্রকৌশলী এবং জাহাজ নির্মাতা শীঘ্রই নিয়োগ দেয়া হয় (*Eastern Bengal District Gazetteers: Chittagong 157; Khan 105*)। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর নতুন প্রদেশে চট্টগ্রামের গুরুত্ব বাড়তে থাকে যদিও এ বিভাজন বেশি দিন স্থায়ী হয়নি।

চট্টগ্রাম বিভাগের অপর জেলা ত্রিপুরা ঐতিহাসিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ। ১৭৬৫ সালে কোম্পানি দিওয়ানি লাভের পর ত্রিপুরাকে দুই ভাগে ভাগ করে। এক: চাকলা রৌশনাবাদের দায়িত্বে থাকে ইংরেজ রেসিডেন্ট। দুই: ত্রিপুরা ও নোয়াখালী ঢাকার রাজস্ব কর্মচারীর হাতে অর্পিত হয়। ১৭৮১ সালে কোম্পানি বর্তমানের কুমিল্লা ও নোয়াখালী নিয়ে ত্রিপুরা (Tippera) নামে একটি জেলা গঠন করেন। জেলা গঠনের পর থেকে বহুবার আয়তন রদবদল হয়েছে। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পর কুমিল্লা বা ত্রিপুরা নতুন প্রদেশের মধ্যে পড়ে। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত এটি ত্রিপুরা জেলা নামেই পরিচিত থাকে। ১৯৬০ সালের ১ অক্টোবর এক প্রশাসনিক আদেশ বলে ত্রিপুরা নাম পরিবর্তন করে নাম দেয়া হয় কুমিল্লা (চৌধুরী, চৌধুরী ও যাকারিয়া ২-৩)। ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত ত্রিপুরা চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারের অধীনে বাংলার ১৬ তম জেলা ছিল। এসময় ত্রিপুরাকে (কুমিল্লা) ঢাকা বিভাগে যুক্ত করা হয়। কিন্তু ১৮৮০ সালে তা আবার চট্টগ্রামে ফিরে যায়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের পূর্ব বাংলা অংশের একটি জেলা হয় কুমিল্লা (*Population Census of Pakistan: Comilla I-8*)। ১৭৯০ সালে জেলা গঠনের পর জন বুলার প্রথম কালেক্টর নিযুক্ত হন। ১৮২১ সালে জেলার দক্ষিণাংশ নিয়ে নোয়াখালী কালেক্টর সৃষ্টি হয়। কোম্পানি আমলে কয়েকটি প্রাচীন জমিদার পরিবারের উত্থান ও নতুন জমিদারির উত্থান কুমিল্লার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কোম্পানির রাজস্বনীতি এই পরিবারগুলোর ভাঙ্গাগড়ার জন্য অনেকাংশে দায়ী। পশ্চিম গাঁয়ের জমিদার নবাব ফয়জুল্লাহ কুমিল্লার (১৮৩৪-১৯০৩) অন্যতম জমিদার। যিনি নারী শিক্ষার জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করেন (চৌধুরী, চৌধুরী ও যাকারিয়া ১৬৯)। চট্টগ্রাম বিভাগের একটি জেলা হলো নোয়াখালী। নোয়াখালীর নাম আগে ছিল ভুলুয়া (*Bangladesh District Gazetteers: Noakhali 1*)। ১৮২১ সালে ভুলুয়া বৃহত্তর ত্রিপুরা জেলা থেকে আলাদা হয়ে একটি স্বতন্ত্র জেলার মর্যাদা লাভ করে। এর প্রায় ৫০ বছর পর ১৮৬৮ সাল থেকে সরকারি নথিপত্রে ও জনসাধারণের মধ্যে ভুলুয়া নাম পরিবর্তিত হয়ে জনপ্রিয় নোয়াখালী নামটি চালু হয়। স্বতন্ত্র জেলা হিসেবে গঠিত হওয়ার সময় জেলা সদর সুধারাম বা নোয়াখালী টাউন বঙ্গোপসাগরের উপকূল থেকে প্রায় ৮ মাইল দূরে ছিল। জেলা সদরের ছয় মাইল দূরে তজাখালী বাজারের পাশ দিয়ে জালছিঁড়া নদী প্রবাহিত হতো। তারও দু'তিন মাইল দক্ষিণে ইছাখালী ঘাটে ছিল শেষ রেলস্টেশন ও স্টীমার স্টেশন। ১৯২২ থেকে ১৯৩২ এবং ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে ৪টি ভাঙ্গনের পর (*Bangladesh District Gazetteers: Noakhali 49-50*) নোয়াখালী তার নিজস্ব স্থানসহ দর্শনীয় সৌধগুলো সমুদ্রগর্ভে হারিয়ে ফেলে।

১৮৬৭ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে তথা সরকারি গেজেট বা প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে সিলেট জেলাকে মোট ৪টি মহকুমা, যথা- সিলেট সদর, সুনামগঞ্জ, করিমগঞ্জ ও হবিগঞ্জ-এ বিন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। ১৮৭৭ সালের জানুয়ারি মাসে প্রথম গঠিত হয়েছিল সুনামগঞ্জ মহকুমা। এর পরের বছর (১৮৭৮) গঠিত হয়েছিল হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ মহকুমা। সিলেট সদর মহকুমা বড় হওয়ায় ১৮৮২ সালে ‘মৌলভীবাজার’ নামক মহকুমায় বিভক্ত হয় যাকে দক্ষিণ সিলেট বলা হতো। ১৯০৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর বহুল আলোচিত বঙ্গভঙ্গ হলে সিলেট নবসৃষ্ট পূর্ব বাংলা ও আসাম (Eastern Bengal and Assam) প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ রদ হলে সিলেট আবার আসাম প্রদেশের অন্তর্গত হয় এবং ১৯৪৭ সালের দেশভাগ পর্যন্ত আসামের অন্তর্গত জেলা ছিল (*East Pakistan District Gazetteers: Sylhet* 352-354)। আসাম ও তার আশপাশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলো পাকিস্তানের অংশ হবে কিনা সে ব্যাপারে রেফারেন্ডামের ব্যবস্থা করা হয় ১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ জুলাই। এই রেফারেন্ডাম উপলক্ষে পূর্ব বাংলাসহ ভারতের বিখ্যাত মুসলিম নেতাগণ এসময় সিলেট অবস্থান করে জনগণকে পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দানে উদ্বুদ্ধ করেন। এই উত্তেজনাপূর্ণ গণভোটে সিলেট ও তার পার্শ্ববর্তী মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাসমূহের জনগণ পাকিস্তানে যোগদানের পক্ষে তাদের রায় দেন। কিন্তু বাটোয়ারার সময় পার্শ্ববর্তী মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলো এমনকি মূল সিলেট জেলার করিমগঞ্জ ও বাতাবাড়িসহ চারটি থানা আসামের অংশরূপে ভারতের অঙ্গীভূত করা হয় (মান্নান ২৮৯)। সিলেট বরাবরই একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা। বিশ শতকের গোড়াতেই সিলেট মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে পরিণত হয়েছে।

তিন

রাজশাহী মুসলিম আমলের পূর্ব থেকেই একটি ঐতিহাসিক জনপদ। পদ্মা নদীর উত্তর পাশে রাজশাহী অবস্থিত। এটি ব্রিটিশ আমলে রামপুর-বোয়ালিয়া নামে পরিচিত ছিল। রাজশাহীর রামপুর-বোয়ালিয়ায় জেলার সদরদপ্তর স্থানান্তরিত হয় ১৮২৫ সালে। ১৮২৫ সাল পর্যন্ত রাজশাহী জেলার সদরদপ্তর ছিল এ অঞ্চলের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী দীঘাপতিয়া জমিদারির প্রধান কেন্দ্রস্থল নাটোর। কিন্তু নিচু জমি ও জলাবদ্ধতার কারণে নাটোর বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়েছিল। ফলে জেলার সদরদপ্তর স্থানান্তরিত হয়েছিল পদ্মার উত্তর-তীরের ‘রামপুর-বোয়ালিয়া’ অঞ্চলটিতে। সদরদপ্তর স্থানান্তরিত হওয়ার থেকে নাটোর মহকুমা সদরদপ্তর হিসেবে পরিচিত হয়। আর নওগাঁ মহকুমা গড়ে উঠে ১৮৭৭ সালে (*Bangladesh District Gazetteers: Rajshahi* 38)। ১৯২১ সাল পর্যন্ত কাগজে-কলমে এ নামটি লক্ষ করা যায় (*Census of India: part-ii*, 12)। এ স্থানান্তরের সাথে সাথে এখানে প্রশাসনিক কাজের প্রয়োজনে ব্রিটিশ কর্মচারীরা আসেন। রাজা ও জমিদারদের সাথে তাঁদের সম্পর্ক তৈরি হয়। ক্রমেই জনসংখ্যাও বাড়তে থাকে (রহমান ১৩৫১-১৩৫২)। তবে ১৮২৫ সালে বিভাগীয় সদরদপ্তর স্থাপিত হলেও অন্যান্য জেলার সাথে রেল যোগাযোগ না থাকায় বিভাগীয় কমিশনার ১৮৮৮ সালে তার দপ্তর স্থানান্তরিত করেন জলপাইগুড়িতে। তা সত্ত্বেও রাজশাহীর বিকাশ ব্যাহত হয়নি। ফৌজদারী ও দিওয়ানি আদালত, পুলিশ প্রশাসন ও অন্যান্য সরকারি অফিস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে সরকারি কর্মচারী, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য পেশাজীবীদের আগমন ঘটে। ১৯১২ সালে স্যাডলার কমিশন কর্তক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ থেকে শিক্ষা ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে রাজশাহীর স্বীকৃতি মেলে। নাটোর জমিদারিকে কেন্দ্র করে মূলত নাটোর শহরের প্রতিষ্ঠা। বাংলার সুবাদার মুর্শিদকুলী খানের (১৭০১-১৭২৭) সময়ে রঘুনন্দন নিজ যোগ্যতায় সুবে বাংলার অর্থবিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বা দেওয়ান/দিওয়ান পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি সুবেদারের প্রিয়ভাজন হলে তার পুরস্কারস্বরূপ ১৭০৬ সালে ভাই রামজীবনের নামে জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন। নাটোর উন্নতির শীর্ষে পৌঁছে রামজীবনের দশক পুত্র রাজা রামকান্তের স্ত্রী রাণী ভবানীর রাজত্বকালে। ব্রিটিশ আমলের জমিদারগণ

সবাই ছিলেন কলকাতাকেন্দ্রিক। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর নাটোরের জমিদারগণ কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলে ঐ বাড়িগুলো ক্রমেই ভগ্নদশায় পরিণত হয় (সরকার ১৭-৫৭)। রাজশাহী জেলা ১৯৪৭ সালে দেশভাগের ফলে মালদা জেলার ৫টি থানা- নবাবগঞ্জ, নাচোল, গোমস্তাপুর, ভোলাহাট এবং শিবগঞ্জ লাভ করে। এই ৫টি থানা নিয়ে ১৯৪৭ সালে নবাবগঞ্জ মহকুমা গঠিত হয়। এর আগে এটি শুধু থানা ছিল (*Bangladesh District Gazetteers: Rajshahi* 282)। রাজশাহী বিভাগের অন্তর্গত বগুড়া জেলার প্রধান শহর হিসেবে বগুড়া পরিচিত। এটি করতোয়া নদীর পশ্চিম দিকে বগুড়া জেলার প্রধান শহর ও প্রশাসনিক কেন্দ্র। ১৮২১ সালে যুগ্ম ম্যাজিস্ট্রেটসির প্রতিষ্ঠাকালে জেলার সদরদপ্তর ঘোষণা করা হয় (Hunter vol. viii: 186)। ১৮৭২ সালের প্রথম জনশুমারির কাল থেকে শুরু করে ব্রিটিশ আমলের শেষ জনশুমারির (১৯৪১) সময় অবধি এই সাত দশকেও জেলা হিসেবে বগুড়া ছিল অখণ্ড, জেলা সদরকেন্দ্রিক বা মহকুমাবিহীন (*Census of India*, 66; *Census of Pakistan*, S1-13)। সুতরাং এ থেকে বলা যেতে পারে, বস্তুত বগুড়াই হচ্ছে পূর্ব বাংলার একমাত্র জেলা, যেটি পর্যালোচ্য সময়ের মধ্যে অখণ্ডিত অর্থাৎ মহকুমাবিহীন অবস্থায় ছিল।

পূর্ব বাংলার উত্তরের জেলা হলো দিনাজপুর। এটি ছিল জেলার প্রশাসনিক সদরদপ্তর যা পুনর্ভবা নদীর তীরে অবস্থিত (Hunter vol. vii: 384)। ১৮৬৬ সালে জেলার সদর মহকুমা ও ১৮৮২ মতান্তরে ১৮৮৭ সালে ঠাকুরগাঁও মহকুমা সৃষ্টি হয় (ইসলাম ২১৮)। বিশ শতকের গোড়ায় (১৯০১) চতুর্থ জনশুমারিকালেও জেলার মহকুমা সংখ্যা পরিবর্তিত হয়নি (*Census of India*, 59)। ১৯১১ সালের জনশুমারিতে বালুরঘাট নামে আরেকটি মহকুমার পরিচয় মেলে (*Census of India*, 430)। দেশভাগের পর দিনাজপুর সদর ও ঠাকুরগাঁও এ দুটি মহকুমাই বিদ্যমান থাকে (*Census of Pakistan*, 1-4)। কারণ জেলা দিনাজপুর ১৯৪৭ সালে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছিল সীমানা কমিশন দ্বারা। এসময় র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ দ্বারা অবিভক্ত দিনাজপুরের ৩০টি থানার মধ্যে ৯টি থানার পুরো অংশ আর একটি থানার অংশ বিশেষ পশ্চিম বাংলার সাথে যুক্ত হয়। ২০টি থানা পূর্ণাঙ্গভাবে পূর্ব বাংলায় থাকে এবং একটি থানার অংশ বিশেষ পূর্ব বাংলায় যুক্ত হয় (*Population Census of Pakistan: Dinajpur* I: 8)। রাজশাহী বিভাগের আরেকটি বড় ও প্রাচীন জেলা হলো রংপুর। ১৮৫৭ সালে ভবানীগঞ্জ নামে একটি মহকুমা সৃষ্টি করা হয়েছিল। যা পরে গাইবান্ধা নামে পরিচিত হয় (Hunter vol. vii: 345)। পরে সদর মহকুমা ভেঙ্গে প্রথমে ‘কুড়িগ্রাম’ (১৮৭২) ও ‘নীলফামারী’ (১৮৭৫) নামে দুটো নতুন মহকুমা সৃষ্টি করা হয়েছিল। স্বভাবতই তখন জেলায় মহকুমার সংখ্যা উন্নীত হয়েছিল ৪টিতে। ১৮৮১ সালের দ্বিতীয় জনশুমারির রিপোর্টে সেটাই প্রতিফলিত হয়েছে (*Census of Bengal*, 582-585)। ১৯৪১ সালে এই মহকুমা ৪টির অধীনে থানা ছিল ৩০টি; এগুলোর নামও আগের মতোই ছিল (*Census of India*, 65-66)। রংপুর জেলার রংপুর সদর, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা ছিল মহকুমা। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় পূর্ব বাংলার অপর কয়েকটি জেলা খণ্ডিত ও সঙ্কুচিত হলেও জেলা হিসেবে রংপুর সেই তালিকায় পড়েনি।

রাজশাহী বিভাগের তথা উত্তর বাংলার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জেলা হলো পাবনা ও বগুড়া। ১৮২৮-৩২ সালের মধ্যে রাজশাহী থেকে থানা শাহজাদপুর, খেতুপাড়া, রাণীগঞ্জ, মথুরা ও পাবনা এবং যশোর থেকে কুষ্টিয়া, মধুপুর, দিরামপুর ও খোকসা থানা নিয়ে গঠিত হয় পাবনা জেলা (Hunter vol. viii: 21)। জেলা হিসেবে পাবনার গঠন প্রক্রিয়া ১৮২৮ সালে শুরু হলেও আনুষ্ঠানিকভাবে জেলা গঠিত হয় ১৮৩২ সাল নাগাদ। গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে ১৮৫৫ সালে যখন ময়মনসিংহ থেকে সিরাজগঞ্জ নিয়ে পাবনার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় এবং ১৮৬২-৬৩ সালে কুষ্টিয়াকে পাবনা থেকে নদীয়ায় স্থানান্তর করা হয় (Hunter vol. ix: 269-270)। মোটামুটি এই ছিল ১৮৭২

সাল পর্যন্ত পাবনার প্রশাসনিক অধিক্ষেত্র। বিশ শতকের তৃতীয় দশকে (১৯২১ সাল) মহকুমার সংখ্যা ছিল একই রকম (*Census of India: part-iii*, 70)। ব্রিটিশ যুগের শেষ দশকের তথা ১৯৪১ সালে সম্পন্ন অষ্টম ভারতীয় জনশুমারির রিপোর্ট থেকে প্রতীয়মান হয়, তখনও জেলার মহকুমা ও থানার সংখ্যা আগের মতো একই অর্থাৎ অপরিবর্তিত ছিল। ১৯৪৭ এর দেশ ভাগের সময়ও পরিবর্তন হয়নি (*Census of India*, 66; *Census of Pakistan*, 1: 1-10)। সমগ্র ব্রিটিশ যুগে অবিভক্ত বাংলায় খুলনা নামে কোন বিভাগ ছিল না। বর্তমান খুলনা বিভাগের প্রধান বা মূল জেলাগুলো তখন প্রেসিডেন্সি বিভাগের অন্তর্গত ছিল। ১৯৪৭ সালের দেশভাগকালে পাকিস্তানের পূর্ব বাংলা অংশে পড়েছিল খুলনা জেলা সম্পূর্ণ এবং যশোহর ও নদীয়া জেলা খণ্ডিতরূপে। শেষোক্ত জেলা দুটির কয়েকটি মহকুমা মাত্র পূর্ব বাংলাভুক্ত হয়েছিল। আবার জেলার নাম খুলনা ও যশোহর বহাল থাকলেও নদীয়ার অন্যতম মহকুমা কুষ্টিয়া পূর্ব বাংলার জেলা হিসেবে স্ব-নামে গৃহীত হয়েছিল (ইসলাম ২৪০)। অবিভক্ত বাংলার প্রথম মহকুমা খুলনা গঠিত হয় ১৮৪২ সালে (Hunter vol. vii:318)। আর এই ঘটনার ৪-দশক পরে, ১৮৮২ সালের ১৪ এপ্রিলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল খুলনা জেলা (ইসলাম ২৪১)। ১৮৬১ সালে যশোহর জেলার অধীনে সাতক্ষীরা মহকুমা গঠিত হয়। ১৮৮২ সালে এ মহকুমাকে খুলনা জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১৭৮৬ সালে যশোহর জেলার সৃষ্টি হয়। ১৮৪৫, ১৮৬০-১৮৬১, ১৮৬২ ও ১৮৬৩ সালে যথাক্রমে ‘মাগুরা’, ‘নড়াইল’, ‘ঝিনেদা’ ও ‘বাগেরহাট’ মহকুমা সৃষ্টি করা হয় (Hunter vol. vii: 318-319)। ১৮৭২ সালের প্রথম জনশুমারিতে প্রেসিডেন্সি বিভাগের যশোহর জেলায় সদর, ঝিনেদা, মাগুরা, নড়াইল, খুলনা ও বাগেরহাট মহকুমা ছিল (*Census of Bengal ix*)। ১৮৭১-৭২ সাল পর্যন্ত যশোহর জেলার সঙ্গে খুলনা ও বাগেরহাট মহকুমা একীভূত ছিল। ১৮৮২ সালে যখন খুলনা জেলা সৃষ্টি হয়েছিল তখন যশোহর থেকে এ দুটি বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল। বিশ শতকের শুরুতে ১৯০১ সালে জেলার প্রশাসনিক অবস্থা মোটামুটি এরকমই ছিল (*Census of India*, 30)। ১৯১১ সালে যশোহর সদর, ঝিনেদা, মাগুরা, নড়াইল ও বনগাঁও মহকুমা ছিল। শেষোক্ত মহকুমাটি সীমানা কমিশন দ্বারা প্রভাবিত হয় (*Census of India*, 405-406)। ব্রিটিশ যুগে কুষ্টিয়া বলে কোন জেলা ছিল না অবিভক্ত বাংলায়। দেশভাগের পূর্বে এটি নদীয়া জেলার অংশ (মহকুমা) ছিল। ১৮৭২ সালে কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর মহকুমা নিয়ে অবিভক্ত নদীয়া জেলা গঠিত হয় (*Census of Bengal viii*)। কুষ্টিয়ার প্রাচীনতম মহকুমা মেহেরপুরের প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৫৪ সাল। ১৮৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল চুয়াডাঙ্গা মহকুমা। তবে ১৮৯২ সালেই আবার বিলুপ্ত করে পুনরায় ১৮৯৭ সালের ১৫ মার্চ একে গড়ে তোলা হয়। আর কুষ্টিয়া মহকুমা গড়ে তোলা হয় ১৮৬০ সালে (*Bengladesh District Gazetteers: Kushtia* 203)। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর পূর্ব বাংলা অংশে কুষ্টিয়া, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা নিয়ে কুষ্টিয়া এবং কৃষ্ণনগর ও রাণাঘাট নিয়ে নদীয়া জেলা গঠিত হয় পশ্চিম বাংলায়।

পূর্ব বাংলার ব্রিটিশ প্রশাসকবৃন্দ কখনও স্থানীয়ভাবে আবার কখনও নিজেদের সংস্কার কাজের অংশ হিসেবে প্রশাসনিক অধিক্ষেত্রের পরিবর্তন করেছেন। বৃহৎ প্রশাসনিক ইউনিট ‘বিভাগ’ সৃষ্টির পর পুরো ব্রিটিশ আমলে এর কোন পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে জেলার সংখ্যা পরিবর্তিত হয়েছে। ব্রিটিশ শাসকবর্গের রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে এবং পরবর্তীতে প্রশাসনিক কাজ সহজ করার জন্য এর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া এর সাথে যুক্ত হয় ক্ষুদ্র প্রশাসনিক ইউনিট মহকুমা। বিভাগ পরবর্তী পূর্ব বাংলা অঞ্চলের প্রশাসনিক ব্যবস্থাও ব্রিটিশ শাসকবর্গের সৃষ্ট ব্যবস্থারই অনুরূপ। ক্ষুদ্র প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে গড়ে উঠা মহকুমা পূর্ব বাংলার প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড বাড়িয়ে দেয়। শুধু সংস্কার কাজের অংশ হিসেবে নয়, পূর্ব বাংলার গুরুত্ব বিবেচনা করে তারা বিভিন্ন অঞ্চল গড়ে তোলার

চেষ্টা করেছেন। এই অধিক্ষেত্রগুলোই পূর্ব বাংলার সমস্ত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নানা সামাজিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়।

তথ্যসূত্র

আহমেদ, শরীফ উদ্দিন। ‘নগরায়ণ ও নাগরিক শ্রেণী’, সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)*, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (তৃতীয় খণ্ড)। প্রথম প্রকাশ, ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩।

আহমেদ, শরীফ উদ্দিন। ‘ঢাকা- একটি নগর গড়ে ওঠার কাহিনী’, *সুন্দরম্, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা*। গ্রীষ্ম সংখ্যা, ৩য় বর্ষ ও ৪র্থ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ ১৩৯৬, মে-জুলাই ১৯৮৯।

আলী, কাজী আজহার। *বাংলাদেশের জেলা প্রশাসন*। প্রথম প্রকাশ, ঢাকা: সূচীপত্র প্রকাশন, ২০০৩।

ইসলাম, কাবেদুল। *ইংরেজ আমলে বাংলার প্রশাসনিক সংস্কার ও পুনর্বিন্যাস (১৭৬৫-১৯৪৭)*। প্রথম প্রকাশ, ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিকেশন্স, ২০১০।

জাফর, সিকান্দার আবু। ‘কালের স্বাক্ষরী রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল’, মোঃ মাহবুবুর রহমান (সম্পাদিত), *রাজশাহী মহানগরী: অতীত ও বর্তমান*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, রাজশাহী: ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২।

প্যাট্রিক গেড্ডেস, অনুবাদ ও ভূমিকা আবদুল মোহাইমেন, *ঢাকা নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা*, প্রতিবেদন ১৯১৭, ঢাকা গ্রন্থমালা-৮, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা: ঢাকা নগর জাদুঘর, ১৯৯৯।

ফিরোজা বেগম চৌধুরী, ড. এম. আই. চৌধুরী ও আবুল কাসেম মোহাম্মদ যাকারিয়া। ‘ভূতাত্ত্বিক ভৌগোলিক পরিচয়’, *কুমিল্লা জেলার ইতিহাস*, প্রথম প্রকাশ, কুমিল্লা: জেলা পরিষদ, ১৯৮৪।

ভূইয়া, ড. গোলাম কিবরিয়া। ‘বৃহত্তর ফরিদপুর জেলা: প্রসঙ্গ স্থানীয় ইতিহাস চর্চা’, *কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ বক্তৃতামালা: ২০০৮-২০১২*। গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া সম্পাদিত, চট্টগ্রাম: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২।

ভূইয়া, ড. গোলাম কিবরিয়া (অনূদিত)। *বাকেরগঞ্জ জেলার ইতিহাস (বৃহত্তর বরিশাল জেলা)*। মূল: এইচ. বিভারিজ বি. সি. এস., প্রথম সংস্করণ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়: প্রকাশনা ও গবেষণা সেল, ২০১৪।

মামুন, ড. মুনতাসীর। *১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে প্রতিক্রিয়া*। প্রথম প্রকাশ, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯।

মান্নান, মোহাম্মদ আবদুল। *বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ: ঢাকা-কলকাতাকেন্দ্রিক শত বছরের রাজনীতি ও হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক*। সপ্তম মুদ্রণ, ঢাকা: কথামেলা, ২০১২।

সরকার, সুজিত। *নাটোর জেলার মুন্সিফদের ইতিহাস*। প্রথম প্রকাশ, ঢাকা: গতিধারা, ২০০৯।

Dani, Ahmad Hasan. *Dacca: A Record of its Changing Fortunes*. Dacca: Second revised & enlarged edition, 1962.

Karim, Abdul. *Dacca: The Mughal Capital*. First Published, Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1964.

Khatun, Habiba. ‘Pre-Mughal Dhaka’, Sharif Uddin Ahmed (ed.), *Dhaka Past Present Future*. First Published, Dhaka: The Asiatic Society of Bangladesh, 1991.

Misbahuddin Khan, *History of the Port of Chittagong*, Reprint, Dhaka: University Press Limited, 2002.

The Chittagong University Journal of Arts and Humanities

- Molla, M. K. U. *The New Province of Eastern Bengal & Assam (1905-1911)*. Rajshahi University: The Institute of Bangladesh Studies, 1981.
- Muhit, A. M. A. *The Deputy Commissioner in East Pakistan*. First Edition, Dacca: National Institute of Public Administration, 1968.
- Bangladesh District Gazetteers: Chittagong Hill Tracts*. Dacca: Bangladesh Government Press, 1971.
- Bangladesh District Gazetteers: Faridpur*. Dacca: Bangladesh Government Press, 1977.
- Bangladesh District Gazetteers: Kushtia*, Dacca: Bangladesh Government Press, 1976.
- Bangladesh District Gazetteers: Noakhali*, Dacca: Bangladesh Government Press, 1977.
- Bangladesh District Gazetteers: Rajshahi*, Dacca: Bangladesh Government Press, 1976.
- Eastern Bengal District Gazetteers: Chittagong*, 1908.
- East Pakistan District Gazetteers: Dacca*, Dacca: East Pakistan Government Press, 1969.
- East Pakistan District Gazetteers: Sylhet*, Dacca: East Pakistan Government Press, 1970.
- Hunter, W. W., *A Statistical Account of Bengal*, First Indian Reprint, Delhi: DK Publishing House, 1973.
- Population Census of Pakistan*, District Census Report, Bakerganj, 1961.
- Population Census of Pakistan*, District Census Report, Comilla, 1961.
- Population Census of Pakistan*, District Census Report, Dinajpur, 1961.
- Report on the Administration of Civil Justice in the Province of East Bengal during the period from the 15th August, 1947 to the 31st December, 1947*. Dacca.
- Report on the Census of Bengal, 1872*.
- Report on the Census of Bengal*, Appendix-C, Statements-XXII to XXXI, 1881.
- Report on the Census of India*, vol. vi, part-i, 1901.
- Report on the Census of India*, vol. v, Bengal, part-ii, Tables, 1911.
- Report on the Census of India*, Bengal, vol. v, part-ii, 1921.
- Report on the Census of India*, vol. v, part-iii, 1921.
- Report on the Census of India*, vol. v, part-ii, 1931.
- Report on the Census of India*, Bengal, vol. iv, Tables, 1941.
- Report on the Census of Pakistan*, East Bengal, vol. 3, part-ii., 1951.

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা: সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম

মোঃ জাকির হোসেন *

[প্রতিপাদ্যসার: বাংলাদেশের সাধারণ আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রথম স্তর প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমের সাথে সম্পৃক্ত সহযোগী শিক্ষামূলক কর্মতৎপরতাকে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি হিসেবে অভিহিত করা হয়। শিক্ষাক্রমের আওতায় মৌলিক ও পরিকল্পিত শিক্ষার বাঁধাধরা নিয়মকানুনের আবর্তে কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক বিকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষাক্রমের গতানুগতিক ঘাটতি পূরণে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা, শরীরচর্চা, শিক্ষাসফর, সঙ্গীত, কাবস্কাউটিং, গার্লসগাইড, অভিনয়, গল্পবলা, বিতর্ক, কৌতুক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বার্ষিক ক্রীড়া, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসমূহ উদ্‌যাপন, ইত্যাদি শিক্ষাক্রমের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শিক্ষাবিজ্ঞান, শিক্ষামনোবিজ্ঞান, শিক্ষাবিদ, শিক্ষাগবেষক, শিক্ষাকর্মী, শিক্ষাপরিকল্পনাকারি ও শিক্ষাদার্শনিকগণ সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলিকে শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিসত্তার বিকাশে সমর্থন করেন। একসময়ে এসব ক্রিয়াকলাপকে শিক্ষাক্রমের বহির্ভূত বিষয় হিসেবে গণ্য করা হতো। অথচ এসব কর্মকাণ্ড শিক্ষার্থীর জড়তামোচনে সহায়ক ভূমিকা রাখে। শিক্ষার্থীর মানবিক ও সামাজিক গুণাবলি বিকশিত হয়। পাঠ্যবিষয়ের পাশাপাশি সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি শিক্ষার্থীর শিখন দীর্ঘস্থায়ী ও ফলপ্রসূ করে। উপরন্তু এসব কার্যাবলি কোনো কোনো শিক্ষার্থী ভবিষ্যৎ জীবনে পেশা হিসাবে গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় সহপাঠ্যক্রমিক কর্মকাণ্ডের তাৎপর্য, চলমান ক্রিয়াকলাপের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, সীমাবদ্ধতা ও বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হয়েছে।]

ভূমিকা

বাংলাদেশে প্রচলিত শিক্ষাধারায় শিশু শিক্ষার্থীর প্রস্তুতিমূলক প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষার (formal education) প্রথম সোপান। শিশু শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত অপার বিস্ময়বোধ অসীম কৌতুহল, আনন্দবোধ, অফুরন্ত উদ্যমের মানবিক বিকাশ সাধন ও জীবনভর শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে এ-শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বস্তুত শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক ও নান্দনিক বিকাশ সাধন এবং তাকে উন্নত জীবনের স্বপ্নদর্শনে উদ্বুদ্ধ করাই প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য। একদা এ-শিক্ষা ছিলো নিতান্তই জ্ঞানমুখী। শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক ও মানসিক বিকাশে (intellectual and mental development), পুঁথিকেন্দ্রিক শিক্ষাক্রম (curriculum) বাস্তবায়ন ছিলো শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। আর জ্ঞান আহরণের জন্য সৃষ্টি করা হতো ভাবগম্ভীর পরিবেশ। প্রচলিত গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় বইয়ের বাইরে যে জগৎ, সেসম্পর্কে জানতে শিক্ষার্থীদের কোনো উৎসাহ দেওয়া হতো না। একঘেয়ে নীরস পুঁথির বাইরে আনন্দ আন্বাদনের কোনো সুযোগ ছিলো না। শিক্ষার্থীর প্রবণতা, আগ্রহ, রুচি ও পছন্দের বিবেচনায় শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হতো না। তবে যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নে ক্রমশ শিক্ষা সম্পর্কে ধারণার পরিবর্তন হতে থাকে।

* সহযোগী অধ্যাপক, ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন এন্ড রিসার্চ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষণা পদ্ধতি

প্রবন্ধটি রচনায় বর্ণনামূলক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। সহপাঠ্যক্রমিক কর্মকাণ্ড শিক্ষাব্যবস্থায় কখন, কীভাবে, কেন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তার কারণ অনুসন্ধান করে বিবৃত করার চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণাটি রচনায় বিভিন্ন গ্রন্থ, জার্নাল, সংবাদপত্র, অনলাইন উৎস ও বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার বার্ষিক প্রতিবেদনসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে। বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্ত বিচার বিশ্লেষণ করে সহপাঠ্যক্রমিক কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় কীভাবে প্রসার লাভ করছে, তা ক্ষুদ্র পরিসরে উপস্থাপন করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়নে যেসব সীমাবদ্ধতা রয়েছে তা অতিক্রম করার সুপারিশও বর্ণিত হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

উপর্যুক্ত গবেষণাটি দ্বারা বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় সহপাঠ্যক্রমিক কর্মকাণ্ডের প্রামাণ্য গতি-প্রকৃতি উপস্থাপন করা হয়েছে। উক্ত প্রবন্ধটি দ্বারা শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষাবিদ, লেখক, গবেষক ও শিক্ষা প্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ উপকৃত হবেন। নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নে প্রাথমিক শিক্ষায় সহপাঠ্যক্রমিক কর্মকাণ্ডের ভূমিকা তাৎপর্য ও গুরুত্ব সংশ্লিষ্ট মহল অনুধাবন করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন।

শিক্ষাব্যবস্থায় সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের (co-curricular activities) ক্রমবিবর্তন

আদিমযুগে মানুষ তাঁর অস্তিত্ব রক্ষার্থে দৌড়ঝাঁপ, সাতারকাটা, বৃক্ষেচড়া, যুদ্ধকরা ইত্যাদি শারীরিক ক্রিয়াকলাপে পারদর্শী ছিলেন। আদিম মানুষ তাঁদের এসব কৌশল ভবিষ্যৎ বংশধরদের শিক্ষাদানে ব্যবস্থা করতেন। এ-শিক্ষা অনিয়ন্ত্রিত (informal) হলেও শারীরিক শিক্ষার (physical education) অভিব্যক্তির প্রথমস্তর হিসেবে শিক্ষাবিদগণ গণ্য করেন (রায় ৫৪৬)। কোনো কোনো ঐতিহাসিক, লেখক, শিক্ষাবিদ মনে করেন যে, প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় সহপাঠ্যক্রমিক ক্রিয়াকলাপের অস্তিত্ব ছিলো। তবে তা ছিলো নিতান্তই অনানুষ্ঠানিক (informal) বরং মধ্যযুগের শিক্ষাব্যবস্থায় এটি ছিলো না। বিদ্যা ও জ্ঞান আহরণ যাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করা যায় তজ্জন্য বিদ্যালয়ে শিক্ষা বহির্ভূত কোনো ধরনের কার্যক্রমকে প্রশ্রয় দেওয়া হতো না। কেননা সেসময়ে শিক্ষাবিদদের ধারণা ছিলো যে, ব্যায়াম, খেলাধুলা, ছবিআঁকা, গানবাজনা, অভিনয় শিক্ষার্থীর শিখন মনোযোগ বিঘ্নিত করে (রায় ৫৩৯)। বিদ্যালয় ও সমাজ এসব কর্মকাণ্ডকে বরদাস্ত করত না। উপরন্তু এসব ক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের ‘দূরন্ত’, ‘অবাধ্য’, ‘বদ’, ‘দুর্দান্ত’, ‘পাজি’, ‘নষ্ট’, ‘বদমায়েশ’, ‘দুষ্ট’ (naughty) বলে শাসন ও অবজ্ঞা করা হতো। বরং “ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ”- এই ছিলো শিক্ষার মূলমন্ত্র (রায় ৩১৪)। শিক্ষাবিদ ও শিক্ষকগণ মনে করতেন শিক্ষার্থী যতোই তাত্ত্বিক জ্ঞানের অধিকারী হবে ততোই তার বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটবে। বহুশতাব্দীর পরে এথেন্সবাসী, স্পার্টান ও রোমানরা সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের গূঢ়ার্থ অনুধাবন করেন। প্লেটো ব্যায়াম বা শরীরচর্চা ও সঙ্গীতকে পাঠ্য বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেন (করিম ৩৩২)। ক্রমেক্রমে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি শিক্ষাবিজ্ঞানে স্থান পেলেও প্রাথমিক পর্যায়ে প্রয়োগবিদগণ এধারণাকে সহজভাবে গ্রহণ করেননি। তাঁরা খেলাধুলা, সঙ্গীত, শরীরচর্চা, অভিনয়, বিতর্কসভা, বৃত্তিমূলক কার্যক্রমকে ‘বহিঃপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি’ (extra curricular activities) বলে বিচ্ছিন্ন করে রাখেন। ফলে শিক্ষার তাত্ত্বিক ধারণার সঙ্গে তার প্রয়োগে ব্যবধান শুরু হয়। বিদ্যালয়ে সহপাঠ্যক্রমিক কর্মকাণ্ড খুব একটা গুরুত্ব পায়নি। প্রাচীন যুগ থেকে অদ্যাবধি শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নে এসব কর্মকাণ্ড ‘সহপাঠ্যক্রমিক’ নামকরণ করে শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এখানেও নতুন বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এগুলোর মধ্যে যেগুলো শিক্ষকের নির্দেশনায় শ্রেণিকক্ষে অনুশীলন করা যায় সেগুলোকে ‘শ্রেণিভুক্ত কার্যাবলি’ (class-room activities) আর যেগুলো গতানুগতিক শ্রেণিকক্ষের আবদ্ধতা থেকে মুক্ত পরিবেশে সম্পাদন করা যায় সেগুলো ‘বহিঃশ্রেণিগত কার্যাবলি’ (out-of classroom activities) নামে অভিহিত করা হয়।

বস্তুত এই বহিঃশ্রেণিগত কার্যাবলিই পূর্ববর্তী সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি। শিক্ষাতত্ত্ব, শিক্ষাবিজ্ঞান ও শিক্ষাদর্শনে ‘সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি’ শিরোনামে পৃথক আলোচনা করা হলেও মূলত এটি শিক্ষাক্রমেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ (রায় ৩১৩-৩১৫)। প্রগতিশীল শিক্ষাবিদগণ মনে করেন যে, এসব কর্মকাণ্ড যেহেতু শিক্ষাক্রমের অংশ সেহেতু ‘সহ’ (co) দিয়ে পৃথক করে রাখার প্রয়োজন নেই। তারা এগুলোকে বহিঃশ্রেণি (extra- class) কাজ বলে আখ্যা দিলেন (চট্টোপাধ্যায় ১২৯)।

সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি কী ও কেন?

মনোবিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে, শিক্ষার্থীর কয়েকটি গুণের বিকাশ দ্বারা তার ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে না। শুধু বৌদ্ধিক বিকাশ বা জ্ঞান বিকাশকে ব্যক্তির সামগ্রিক বিকাশ বলা চলে না। সর্বাত্মক জীবন বিকাশে বৌদ্ধিক (cognitive), প্রক্ষেপিক (emotional), সামাজিক (social), নৈতিক ও আধ্যাত্মিক (moral and spiritual) কর্মদক্ষতা (vocational) ও অবসরকাল যাপনের বিকাশ (development of the ability of use leisure time) দ্বারা পরিপূর্ণতা লাভ করে (রায় ৩১৪)। মানবজীবনে দৈহিকবিকাশ (physical development) আচরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। দৈহিকশক্তি দৈহিককর্মক্ষমতা দৈহিকআয়তন শিশু শিক্ষার্থীকে নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। যথার্থ বয়সে শিক্ষার্থীর যথার্থ সঞ্চালনমূলক বিকাশ (motor development) যদি না ঘটে, তা হলে শিক্ষার্থী হীনমন্যতায় ভোগে। তার জীবনের উন্নতির গতিপথ বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে সামাজিক বিকাশের পথও রুদ্ধ হয়ে যায় (রায় ১২৯-১৩০)। সুতরাং শিক্ষার্থীর দৈহিকবিকাশে ব্যায়াম, শরীরচর্চা, খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। শিশু শিক্ষার্থীর মধ্যে যে নানা সম্ভাবনার বীজ সুপ্ত রয়েছে, তার বিকাশে পাঠ্যক্রমে বহুবিচিত্র বিষয়ের সমাবেশ ঘটাতে হবে। সমাজসেবামূলক কাজ, সংগঠনমূলক কাজ, গান, আবৃত্তি, অভিনয়, বিতর্ক, শিক্ষামূলক ভ্রমণ প্রভৃতি শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সুতরাং শিক্ষাক্রমের পাশাপাশি শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশে যেসব কার্যাবলি শিক্ষালয় গ্রহণ করে সেগুলোই সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি।

সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির শ্রেণি বিভাগ

শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশে বিভিন্ন ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম বিভিন্নভাবে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন গুণাবলি বিকাশে সাহায্য করে। যথা:

১. **শারীরিক কার্যাবলি (physical activities):** শারীরিক শক্তি, সামর্থ্য, বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলের মাধ্যমে নিয়মমাফিক খেলাধুলা যথা হাডুডু (a bangali out door game, kabadi), ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ভলিবল, বাস্কেটবল, হ্যান্ডবল, ব্যাডমিন্টন, লনটেনিস, টেবিলটেনিস ইত্যাদি। শরীরচর্চামূলক কাজ, ব্যায়াম, কুস্তি, ডন-বৈঠক, যোগাসন ইত্যাদি।
আত্মরক্ষামূলক খেলা যথা- বক্সিং, লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, ক্যারাট, প্রভৃতি। স্পোর্টস কার্যক্রম (athletic activities) যথা-১০০মিটার, ২০০মি. ৪০০ মি.দৌড়, লংজাম্প, হাইজাম্প, বিস্কুটদৌড়, বস্তাদৌড়, (sack race), হাতবাধাদৌড়, হাঁড়িভাঙ্গা, চেয়ারখেলা, বাজনার তালেতালে বালিশ চালানো ইত্যাদি ক্রীড়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অনাবিল আনন্দ অনুভব করে।
২. **বৌদ্ধিক কার্যাবলি (intellectual activities) :** ক্রমান্বয়ে গল্পবলা, উপস্থিত বক্তৃতা, দেয়ালিকা, সাহিত্যসভা, স্বরচিতকবিতা আবৃত্তি, ম্যাগাজিন প্রকাশ, বিতর্কসভা ইত্যাদি। যা শিক্ষার্থীর স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ঘটায়।

৩. নান্দনিক কার্যাবলি (aesthetic activities) : অঙ্কন, সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয় ও অন্যান্য সৃজনাত্মক কার্যক্রম এই শ্রেণিভুক্ত। এসব কর্মকাণ্ডে শিশু শিক্ষার্থীর মানসিক ও প্রক্ষোভিক বিকাশ ঘটে। তাদের মধ্যে রুচি ও সৌন্দর্যবোধ জাগে।
৪. সামাজিক কার্যাবলি (social activities) : নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বৃক্ষরোপণ, কাবস্কাউটিং ব্রতচারী, গার্লগাইড, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষাদিবস, স্বাধীনতাদিবস, বিজয়দিবস, নববর্ষ উদ্‌যাপন, জাতীয় শিশুদিবস পালন শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক চেতনার বিকাশ ঘটে।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ, সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি নামে পৃথক কোনো অধ্যায় নেই। তবে ১৭, ১৮ ও ১৯ অধ্যায়ে পৃথকভাবে যথাক্রমে ‘কারুকলা ও সুকুমারবৃত্তি’, ‘বিশেষ শিক্ষা স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা, স্কাউট ও গার্লগাইড এবং ব্রতচারী’ ও ‘ক্রীড়াশিক্ষা’ শিরোনামে বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ, বলা হয়েছে-

শিশুকাল থেকে ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে শিক্ষার্থীদের শারীরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার উদ্যোগ নেওয়া হলে তারা শারীরিক ব্যায়ামের মাধ্যমে সুস্থ থাকার দিকে মনোযোগী হবে, নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা শিখতে সমর্থ হবে। ... শিশুদের ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশ ঘটবে। এ উপায়ে তাদের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসতে পারে বরণ্য ক্রীড়াবিদ/খেলোয়াড় (৪৩)।

স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা, কারুকলা ও সুকুমারবৃত্তি ও ক্রীড়া শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

- শারীরিক ব্যায়ামের মাধ্যমে সুস্থ থাকার দিকে মনোযোগী করা। নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টিতে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা।
- প্রাথমিক পর্যায়ে শরীরচর্চা ও খেলাধুলাকে একটি আবশ্যিক বিষয় করা।
- খেলাধুলার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে মাদক দ্রব্যের মতো ভয়াল অভিশাপ থেকে শিক্ষার্থীদের দূরে রাখা।
- শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী করে তোলা।
- পেশা হিসেবে ক্রীড়াকে গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা।
- ছেলেমেয়েরা যেন ক্রীড়া ক্ষেত্রে অবদান রাখার সমান সুযোগ পায়।
- শিক্ষার্থীদের মন ও মননকে বিকশিত করে চিন্তবৃত্তিকে সমৃদ্ধ করা।
- শিক্ষার্থীদের জীবনকে শিল্পিত করে তোলার প্রেরণাদান মূলক শিল্পচর্চায় উদ্বুদ্ধ করা (শিক্ষানীতি ৪১-৪৬)।

সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির গুরুত্ব ও তাৎপর্য

শিক্ষার্থীর মধ্যে যে অনন্ত সম্ভাবনা রয়েছে, সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির মাধ্যমে সেসব সম্ভাবনাময় গুণাবলির বিকাশ ঘটে। বইয়ের বাইরে যে জগৎ, সে জগতে সে যাতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে, সেপথ খুলে দেয় সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি। এটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিম্নরূপ:

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা: সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম

- ব্যায়াম, খেলাধুলা, শরীরচর্চা ইত্যাদি শিক্ষার্থীর দেহকে সুস্থ ও সবল রাখে। শরীর সুগঠিত হলে মানসিক স্বাস্থ্যও ভালো থাকে।
- বিতর্ক, আলোচনাসভা, শিক্ষামূলক ভ্রমণ ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করলে শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটে। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাস্তব জীবনের প্রয়োজনীয় কৌশল ও জ্ঞান আয়ত্ত করে।
- বিভিন্ন প্রকার সহপাঠ্যক্রমিক কার্যকলাপ দ্বারা শিক্ষার্থীর মধ্যে রুদ্ধ আবেগের অভিব্যক্তি ঘটে। ফলে তাদের বিভিন্ন প্রবৃত্তির (instinct) উদ্গতি সাধন (sublimation) হয়ে থাকে।
- দলবদ্ধভাবে কাজ করলে শিশু শিক্ষার্থীর সামাজিক গুণাবলি বিকশিত হয়। বিতর্ক, দলগত অভিনয়, কাবস্কাউটিং, দলগত গান, খেলাধুলা প্রভৃতি দ্বারা ব্যক্তিগত চিন্তা না করে দলের স্বার্থের কথাই চিন্তা করে ও সমষ্টির স্বার্থকে ব্যক্তি-স্বার্থের উপরে স্থাপনের শিক্ষা পায়। এভাবে সুনাগরিক হবার শিক্ষালাভ করে।
- সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে সামাজিক সৌজন্যবোধ, শিষ্টাচার, ব্যবহার, কর্তব্যপরায়ণতা প্রভৃতি গুণাবলির বিকাশ হয়। শিশু শিক্ষার্থীরা গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্ভুদ্ধ হয়।
- সজ্জবদ্ধ হয়ে কাজ করলে দলের রীতিনীতি মেনে চলতে হয়। এই শিক্ষা নিয়মশৃঙ্খলা ও আইনকানুন মেনে চলতে অনুপ্রাণিত করে। এই সামাজিক নীতিবোধ থেকেই তার নৈতিকশিক্ষা ও চরিত্র গঠিত হয়।
- নৃত্য-গীত, অভিনয়, অঙ্কন, খেলাধুলা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর কোনদিকে বিশেষ ঝোঁক রয়েছে তা সহজে নির্ণয় করা যায়। সচেতন শিক্ষক এই বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করে তাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে পারেন।
- সহপাঠ্যক্রমিক কাজ শিক্ষার্থীকে অবসর সময় সার্থকভাবে কাটাবার কতক উপায় বাতলে দেয়। শুধুমাত্র বর্তমানে নয় বরং ভবিষ্যৎ অবসর জীবন কীভাবে যাপন করবে সেশিক্ষাও শিক্ষার্থী বিদ্যালয় থেকে পায়। চিত্রাঙ্কন, ছবিতোলা, স্ট্যাম্প সংগ্রহ, অভ্যন্তরীণ খেলাধুলা (indoor-games যথা- দাবা, ক্যারাম) ইত্যাদি শিক্ষার্থীর সানন্দে অবসর যাপনে সাহায্য করে।
- শ্রেণিকক্ষে আবদ্ধ থেকে পড়াশুনা শিক্ষার্থীর ক্রান্তি ও বিরক্তি সৃষ্টি করে। শেষ ঘণ্টাটি বাজার প্রতীক্ষায় থাকে। বিদ্যালয়ের প্রতি আকর্ষণ হারায়। বৈচিত্রহীন পড়াশুনা একঘেয়ে হয়ে যায়। সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের ব্যবস্থা থাকলে বিদ্যালয়ে আসতে আগ্রহী হয়। ফলে ঝরেপড়া হ্রাস পায়। এসব কার্যক্রম বিদ্যালয়ের প্রতি আকর্ষণ, মমত্ববোধ ও আনুগত্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম

বাংলাদেশে ১,১৮,৮৯১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২,০১,০০,৯৭২ জন শিক্ষার্থী পড়াশুনা করছে (প্রতিবেদন ২০২১-২০২২, ১০)। বর্তমানে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্লাসরুটিনে চার ও কারুকলা, সঙ্গীত, শারীরিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দুইশিফটে পরিচালিত বিদ্যালয়গুলোতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে রবি থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত শেষ পিরিয়ডে শারীরিক শিক্ষা, চার ও কারুকলা সঙ্গীতচর্চা হয়। এছাড়া তৃতীয় থেকে পঞ্চমশ্রেণি পর্যন্ত সোমবার থেকে বুধবার পর্যন্ত উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর অনুশীলন হয়। একশিফটে পরিচালিত বিদ্যালয়গুলোতেও উক্ত কার্যক্রমগুলো অব্যাহত রয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় ‘বঙ্গবন্ধু’ ও ‘বঙ্গমাতা’ গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় টুর্নামেন্ট শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষাকর্মী, শিক্ষাগবেষকদের মধ্যে বেশ সাড়া জাগিয়েছে। দেশের প্রায় সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করছে। ইউনিয়ন, পৌরসভা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়নদলগুলো উপজেলা, জেলা পর্যায়ের চ্যাম্পিয়নদল বিভাগীয় পর্যায়ে এবং বিভাগীয় পর্যায়ের চ্যাম্পিয়নদল জাতীয় পর্যায়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত খেলায় অংশগ্রহণ করে। ২০১০ সালে বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ টুর্নামেন্টের শুভ সূচনার পরের বছরই অর্থাৎ ২০১১ সাল থেকে ‘বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ টুর্নামেন্ট’ চালু করা হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন রানার্সআপ এবং তৃতীয়স্থান অধিকারী সকল খেলোয়াড় কোচ এবং ম্যানেজারকে নগদ অর্থপুরস্কার এবং বিজয়ীদলকে প্রাইজমানি ও ট্রফি দেয়া হয়। জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী ৮টি দলকে সরকারি অর্থে টুর্নামেন্ট চলাকালীন সময়ে ঢাকায় আবাসন, খাওয়াদাওয়া ও যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয় (প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০, ৩৪)।

সারণি-১

বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টের তথ্য:

সাল	অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয় সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়ের সংখ্যা	চ্যাম্পিয়ান	রানার্সআপ
২০১৭	৬৪৬৮৮	১০,৯৯,৬৯৬	পূর্ব উজানটিয়া সপ্রাবি, পেকুয়া, কক্সবাজার	ভুলবাড়িয়া সপ্রাবি, সাথিয়া, পাবনা।
২০১৮	৬৫৭৯৫	১১,১৮,৫১৫	হরিপুর সপ্রাবি, জৈন্তাপুর, সিলেট	দঃ কানিয়ালখাতা সপ্রাবি,সদর,নীলফামারী
২০১৯	৬৫৩৬৭	১১,১১,২৩৯	কোভিড-১৯ এর কারণে জাতীয় পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হয়নি।	
২০২০ ও ২০২১	কোভিড-১৯ এর কারণে খেলা অনুষ্ঠিত হয়নি।			

উৎস: বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০, ২০২১-২০২২, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, পৃ. ৩৪ ও ৩২।

সারণি-২

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট (বালিকা) :

সাল	অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয় সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়ের সংখ্যা	চ্যাম্পিয়ান	রানার্সআপ
২০১৭	৬৪৬৮৩	১০,৯৯,৬১১	দোহারো সপ্রাবি, শৈলকুপা, বিনাইদহ	পাঁচরুখী সপ্রাবি নান্দাইল, ময়মনসিংহ
২০১৮	৬৫৭০০	১১,১৬,৯০০	পাঁচরুখী সপ্রাবি, নান্দাইল, ময়মনসিংহ	টেপুর গাড়ী বি কে সপ্রাবি, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট।
২০১৯	৬৫৩৬৮	১১,১১,২৫৬	কোভিড-১৯ এর কারণে জাতীয় পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হয়নি।	
২০২০ ও ২০২১	কোভিড-১৯ এর কারণে খেলা অনুষ্ঠিত হয়নি।			

উৎস: বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০, ২০২১-২০২২, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, পৃ. ৩৪ ও ৩৩।

সারণি-১ ও ২ এ, লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ২০১৭ ও ২০১৮ সালে বঙ্গবন্ধু ফুটবল টুর্নামেন্টে ছেলে শিক্ষার্থীর চেয়ে বঙ্গমাতা টুর্নামেন্টে মেয়ে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ সংখ্যা কম। তবে ২০১৯ সালে ছেলে শিক্ষার্থীর চেয়ে মেয়ে শিক্ষার্থী বেশী অংশগ্রহণ করেছে। আশাকরা যায়, উভয় টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়েরা ভবিষ্যতে ফুটবল অঙ্গনে তাদের কৃতিত্বের ছাপ রাখতে সক্ষম হবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে।

কাবস্কাউটিং কার্যক্রম

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের নৈতিকশিক্ষা সম্প্রসারণে কাবস্কাউটিং একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। ‘Cub’ এর বাংলায় অর্থ হলো ‘শাবক’ (বাচ্চা)। এঅর্থে সিংহ, বাঘ ইত্যাদির শাবক। Cub (scout) হলো ‘জুনিয়র স্কাউট (Siddiqi 181)। scout শব্দের অর্থ হলো ‘গুপ্তদূত’। ‘boy scout’ হলো চরিত্রগঠন, স্বাবলম্বন শৃঙ্খলা ও জনসেবার মনোবৃত্তি বিকাশের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত ‘the scout association’ এর সদস্য (Siddiqi 581)। সাধারণত ৬-১১ বছরের শিক্ষার্থীরা কাবস্কাউটের সদস্য হতে পারে। কাবদের আইন বা মূলমন্ত্র (motto) :

১. আল্লাহ/ সৃষ্টিকর্তা ও দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করা
২. বড়দের কথা মেনে চলা
৩. প্রতিদিন কারো উপকার করা
৪. আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

বস্তৃত এসব শপথ বাক্য শিশু শিক্ষার্থীর মনে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। কাবদের শিখানো হয় কোনো কাজে বিফল হলে দমে যাওয়া যাবে না। বারংবার চেষ্টা করে সফল হতে হবে। বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে কাবস্কাউটিং (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্পটি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অনুমোদিত এবং বাংলাদেশ স্কাউটস এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে (মেয়াদ জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২৩, প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৫৫৪০.৭৬৯ লক্ষ টাকা)। ২০১৯-২০ অর্থবছরে উপযোজিত আরএএডিপি বরাদ্দের আলোকে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অর্থ ছাড় ১০০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকৃত ব্যয় প্রায় ৯০৪.০০ লক্ষ টাকা (প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০, ৪৪)।

চতুর্থ পর্যায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা:

- ক. ৩০,৭০০টি বিদ্যালয়ে নতুন আরো ৭.৩৫ লক্ষ কাব বয়সী শিশুকে আন্দোলনে সম্পৃক্তকরণ;
- খ. বাংলাদেশ স্কাউটসের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে ৩৬টি নতুন অবকাঠামো নির্মাণ;
- গ. শিক্ষক/শিক্ষিকাকে প্রশিক্ষণ এবং কাবস্কাউটদের গুণগত মানোন্নয়নে বিভিন্ন প্রোগ্রামে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা (প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০, ৪৪)।

চতুর্থ পর্যায় প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

মুজিববর্ষ উদযাপন :বাংলাদেশ স্কাউটস মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করে-

- বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক বেতার টেলিভিশনে ২৪টি বিশেষ অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়।
- ২.৫ লক্ষাধিক ‘মুজিববর্ষের লোগোসহ’ বিশেষ ব্যাজ বিতরণ করা হয়।
- ৩০০০ বেশি প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম ও সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।
- জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণকেন্দ্রে মুজিবচতুর তৈরি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি স্থাপন।
- বিশেষ কর্মসূচি হিসেবে ‘জাম্বুরী অন দ্যা ট্রেন’ আয়োজন করা হয়।
- জাতীয় পর্যায়ে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন/ অটিস্টিক শিক্ষার্থীদের সমাবেশ আয়োজন করা হয় (প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০, ৪৫)।

কাবস্কাউট প্রোগ্রাম ও অন্যান্য কার্যক্রম:

- ৪৮৮টি উপজেলা, ৯৫টি জেলা, ১০টি আঞ্চলিক ও ১টি জাতীয় কাব ক্যাম্পুরীতে ২ লক্ষ ৫০ হাজার কাব অংশগ্রহণ করে। ৯০০টি ষষ্ঠক নেতা কোর্স-বাজ কোর্স, ৫০০টি কাব-হলিডে সাঁতার প্রশিক্ষণ, প্রতিভা অন্বেষণ, শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড বিতরণ, বিলবোর্ড স্থাপন, সেরা কাব লিডারদের পুরস্কৃত করা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইভেন্টে যোগদান, শিক্ষা ভ্রমণ ইত্যাদি সম্পন্ন করা হয়।
- সকল উজেলায় সমাজ সচেতনতা কার্যক্রমের আওতায় ১০ হাজার বিদ্যালয়ে ‘স্কুলগার্ডেন বৃক্ষরোপণ ওয়াশব্লক পরিচ্ছন্ন রাখায় কাবদের নির্দেশনা দেয়া হয়।
- অডিও ভিডিও ক্লিপ তৈরি ও বিতরণ করা হয়।
- কাবস্কাউটিং নীতিমালা সম্বলিত লক্ষাধিক পোস্টার মুদ্রণ ও বিতরণ।

- ৩০,৭০০ কাবস্কাউট ইউনিটকে প্রাথমিক চিকিৎসা বক্স, স্কার্ফ ব্যাজ, ওয়াগল, বই, পুস্তক, খেলার সামগ্রী ও ড্রাম বিতরণ করা হয় (প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০, ৪৫)।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:

প্রাথমিক শিক্ষকদের ১৮৫০টি ওরিয়েন্টেশন কোর্স, জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও প্রতিষ্ঠান প্রধানদের ১৫০টি ওরিয়েন্টেশন কোর্স, ৯৫০টি কাবলিডার বেসিক প্রশিক্ষণ কোর্স, ২৫৫টি অ্যাডভান্সড ও স্কীলকোর্স, ৫০টি আইসিটি কোর্স, ০৯টি আর্থিক ব্যবস্থাপনা কোর্স, ২৫টি গার্ল-ইন-স্কাউটিং লিডার কোর্স, ৩টি কোর্স ফর এএলটি, ২টি কোর্স ফর এলটি। মোট ১,৯১,০০০ জন কাবলিডারকে ২,৪০০টাকা করে বছরে সম্মানী ভাতা প্রদান করা হয় (প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০, ৪৫)।

নির্মাণ ও ক্রয়কার্যক্রম

৩৬টি কাবস্কাউট ভবন ও স্থাপনা নির্মাণ, তাবু, আসবাবপত্র, অফিস সরঞ্জাম, আইসিটি উপকরণ ও মৌচাকে একটি সুইমিংপুল তৈরি করা হয়। উপর্যুক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে কাবস্কাউট সদস্যদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সৎ চরিত্রবান, পরোপকারী, আত্মনির্ভরশীল ও চ্যালেঞ্জ গ্রহণের উপযোগী করে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই কাবস্কাউট আন্দোলনের অভিপ্রায়। বাংলাদেশে ১৯৯৫ সাল থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাবিং-কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে সরকারি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিভারগার্টেন, ইবতেদায়ী মাদরাসা ও সমমানের অন্যান্য শিক্ষালয়ে কাবিং কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ২০১৭ সালের বার্ষিক স্কাউট পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে ১৬,৮২,৭৬১ জন স্কাউট সদস্যদের মধ্যে কাবস্কাউটের সংখ্যা ৭,৬৮,৭৫১ জন। সংখ্যাবিচারে বাংলাদেশ স্কাউটস বিশ্বে পঞ্চমস্থানে রয়েছে। কাবিং কার্যক্রম দ্বারা ক্ষুদ্রে শিক্ষার্থীরা পরিবেশ সুরক্ষা, বৃক্ষরোপণ, দুগ্ধ, প্রতিবন্ধী, বৃদ্ধ, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো, বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার করতে শিখে। (প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০, ৪৫)।

আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা সীমিত আকারে অনুষ্ঠিত হয়। সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উপজেলা, জেলা ও বিভাগ পর্যায়ে মোট ১৬ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। প্রতিযোগিতায় বিদ্যালয়, ক্লাস্টার উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। করোনা পরিস্থিতির কারণে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করা যায়নি। ১৫টি ইভেন্টে বিদ্যালয় হতে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত প্রায় ১,৩০,০০,০০০ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে (প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০, ৩৫)। বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ১৩টি সঙ্গীত নির্ধারণ করা হয়েছে। যথা:

সারণি-৩

ক্রমিক নং	সঙ্গীতের শিরোনাম	যে শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য				
		১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম
০১.	জাতীয় সঙ্গীত	✓	✓	✓	✓	✓
০২.	প্রিয় ফুল শাপলা ফুল	✓	-	-	-	-
০৩.	আমরা সবাই রাজা	-	✓	-	-	-
০৪.	প্রজাপতি! প্রজাতি!	-	✓	-	-	-
০৫.	আমার ভাইয়ের রঙে রাঙানো	✓	✓	✓	✓	✓
০৬.	আমরা করব জয়	-	-	✓	✓	-
০৭.	আল্লাহ মেঘ দে. পানি দে	-	-	✓	-	-
০৮.	নিজের হাতে কাজ করো	-	-	✓	-	-
০৯.	চল চল চল	✓	✓	✓	✓	-
১০.	এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল	-	-	-	-	✓
১১.	আনন্দলোকে মঙ্গললোকে	-	-	-	-	✓
১২.	রক্ত দিয়ে নাম লেখেছি	-	-	-	-	✓
১৩.	ধন ধান্য পুষ্পে ভরা	-	-	-	✓	-

উৎস : রথীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, প্রাথমিক শিক্ষায় মৌলিক বিষয়াবলী, কথা সম্ভার, ২০১৮, পৃ.৫৮।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্ষুদ্রে ডাক্তার কার্যক্রম: প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্ষুদ্রে ডাক্তার টীম গঠন করে, ওরিয়েন্টেশনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে স্বাস্থ্যবিধি অবহিত করা হয়। কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহে (এপ্রিল ও অক্টোবর মাসে) ৫-১২ বছর বয়সী সকল শিশুকে কৃমিনাশক ঔষধ সেবন করানো হয়। প্রত্যেক জানুয়ারি এবং জুলাই মাসে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য- বিশেষত ওজন, উচ্চতা, দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা করা হয়। ক্ষুদ্রে ডাক্তার টীম স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন করে। কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহ ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা কার্যক্রম চলাকালীন তদারকি সহায়তা প্রদান এবং রিপোর্ট তৈরি ও সংরক্ষণে ভূমিকা পালন করে (বিশ্বাস ১১৯)।

সততা স্টোর : দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে একটি চিঠির মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ‘সততা স্টোর’ নামে শিক্ষার্থীদের জন্য স্টোর খোলার নির্দেশ দিলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি পরিপত্র জারি করে। উক্ত পরিপত্রের আলোকে উপজেলা পর্যায়ে পরীক্ষামূলকভাবে কমপক্ষে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সততা স্টোরের শুভ সূচনা হয়। বিদ্যালয়ের কম্পাউন্ডের ভেতরে বিক্রেতাবিহীন সততা স্টোরে শোভা পায় খাতা, কলম, পেন্সিল, রাবার, স্কেল, জ্যামিতি বক্স, রং পেন্সিল, চিপস, বিস্কুটসহ হালকা খাবার সামগ্রী ও শিক্ষাপোষণ। পণ্যের মূল্যতালিকা অনুসারে শিক্ষার্থীরা মূল্যপরিশোধ বক্সে অর্থ পরিশোধ করে। কোনো কোনো সততা স্টোরে দৈনিক ৪০০ থেকে ৫০০ টাকার পণ্য বিক্রি হয়। লভ্যাংশের টাকা গরীব শিক্ষার্থীদের ইউনিফর্ম,

জুতা, ঔষধসহ নানা সহয়তা দেয়া হয় (“সততার দোকান”)। এমন উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেশ আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। কোমলমতি শিক্ষার্থীর সততাচর্চায় বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় এটি নতুন সংযোজন। সততা ও নৈতিকচর্চার বিবেচনায় এটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করতে পারলে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক কর্মক্ষেত্র ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। এভাবে ধীরে ধীরে আলোকিত সমাজ গড়ে উঠবে। নৈতিকতাপূর্ণ শিক্ষা মানবীয় চরম কল্যাণ বয়ে আনে।

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে সীমাবদ্ধতা

সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়ক হলেও বাস্তবক্ষেত্রে অনেক শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবিষয়ে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেন না। আবার অনেক অভিভাবকও এসব কর্মকাণ্ডে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন। যথা:

- অনেক শিক্ষক মনে করেন যে, সাধারণ শিক্ষাক্রমের পাঠ্যবিষয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় পাশ করানোই তাঁদের প্রধান কাজ। সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি শিক্ষার্থীর পাঠে মনোসংযোগে বাধাস্বরূপ। অতএব, পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে হলে কোনোরূপ পাঠ্যতিরিক্ত বিষয়ে সময় নষ্ট করা ঠিক নয়। শিক্ষক শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সহপাঠ্য ক্রমিক কার্যক্রমকে অবহেলা করেন। এধরনের গতানুগতিক মনোভাব এটির বাস্তবায়নে প্রধান অন্তরায়।
- প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাবে বিদ্যালয়গুলোতে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না।
- আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা মোটের উপর পরীক্ষানির্ভর। ফলে অংশীজনেরা বিষয়টিকে গুরুত্ব দেন না।
- অনেক সময় অর্থভাবের কারণে এসব কার্যক্রম নিরবিচ্ছিন্নভাবে সম্পাদন করা যায় না।
- খেলাধুলা ও শরীরচর্চার জন্যে মাঠ আবশ্যিক। অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থানাভাবের জন্যে সহপাঠ্যক্রমিক কাজগুলো পরিচালনা সম্ভব হয় না।

সুপারিশ:

২০৩০ সালের মধ্যে সকল শিশুর জন্য প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে এবং জাতিসংঘ ঘোষিত ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা সফলভাবে অর্জনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার রূপকল্প (vision) অভিলক্ষ্য (mission) বাস্তবায়নে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলিকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে হবে। এলক্ষ্যে-

- প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সঙ্গীত, শরীরচর্চা, ও অঙ্কন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া জরুরি। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে শিক্ষক স্বল্পতা দূর করা আবশ্যিক।
- শরীরচর্চা শিক্ষক না থাকলে আগ্রহী যেকোনো শিক্ষককে কাবস্কাউটিংসহ খেলাধুলা ও অ্যাথলেটিক্ (athletic) কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ দিয়ে উপর্যুক্ত বিষয়ের কার্যক্রম সম্পন্ন করা যেতে পারে।
- বিদ্যালয়ের ‘ব্যবস্থাপনা কমিটি’ ও ‘অভিভাবক-শিক্ষক কমিটিকে’ সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে।
- প্রতিটি বিদ্যালয়কে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি পরিচালনার জন্যে অর্থবরাদ্দ দিতে হবে। যাতে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও জাতীয় দিবসসমূহ উদ্‌যাপন করতে পারে। পিইডিপি-৪

এর আওতায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় ৪টি ক্যাটাগরিতে বিদ্যালয় প্রতি ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত গ্রান্ট হিসেবে যে অর্থপ্রদান করা হয় (প্রতিবেদন ২০২১-২০২২, ৩৩)। তা বৃদ্ধি করে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

উপসংহার

শিশু শিক্ষার্থীর মন ও মননে ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলা, শিষ্টাচার, অসম্প্রদায়িক, মানবাধিকার, সহজীবনযাপন, কৌতুহল, প্রীতি, সোহাদ্য, অধ্যাবসায়ী, সংস্কৃতিমনস্ক, সততা, কুসংস্কারমুক্ত, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত, আনন্দময় অনকূল পরিবেশ তৈরিতে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।। শিক্ষার্থীর মধ্যে কায়িক শ্রমের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারলে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটবে। দেশাত্মবোধ ও দেশগঠনমূলক কাজে উদ্বুদ্ধ হবে। প্রতিটি বিদ্যালয়ের দেয়ালে দেয়ালে শোভা পাক-

‘খেলাধুলা করে যারা
সুস্থ সবল থাকে তারা’।

তথ্যসূত্র

- করিম, সরদার ফজলুল, *প্লেটোর রিপাবলিক*, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০।
- চট্টোপাধ্যায়, ড.সরোজ, *বিদ্যালয় সংগঠন ও শিক্ষা প্রসঙ্গ*, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রাঃ) লিমিটেড. ১৯৯৯।
- জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১১।
- বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০২০।
- বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০২২।
- বিশ্বাস, রথীন্দ্রনাথ, *প্রাথমিক শিক্ষার মৌলিক বিষয়াবলী*, কথা সম্ভার, ২০১৮।
- রায়, সুশীল, *শিক্ষণ ও শিক্ষা প্রসঙ্গ*, সোমা বুক এজেন্সি, ২০১২।
- রায়, সুশীল, *শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন*, সোমা বুক এজেন্সি, ২০১৩।
- রায়, সুশীল, *শিক্ষা মনোবিদ্যা*, সোমা বুক এজেন্সী, ২০১১।
- শাহরিয়ার, আরাফাত, *স্কুলে স্কুলে সততার দোকান*, <https://www.kalerkantho.com.20...>

Accessed 20 January 2023.

Siddiqi, Zillur R. (editor) *English-Bangla Dictionary*, Bangla Academy, 2010.

ইসলামে আত্মোন্নয়ন: পথ ও পদ্ধতি

ড. মুহাম্মদ এনামুল হক *

প্রতিপাদ্যসার: উন্নয়ন ধারণা একটি ব্যাপক ও বহুল অর্থবোধক পরিভাষা ও দর্শন। জীবন পরিক্রমার বহুমাত্রিক কার্যক্রমে এর সক্রিয় উপস্থিতি সর্বদা বিদ্যমান। উন্নয়নের অব্যাহত গতিধারা উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দেয়। মানুষের বস্তুগত দিকের উন্নয়ন যেমন দৃশ্যমান এবং স্বীকৃত, তেমনি তার অবস্তুগত দিকের (আত্মার) উন্নয়ন অপরিহার্য। দেহ (বস্তুগত) ও আত্মা (অবস্তুগত) এ দু'য়ের সমন্বয়েই একজন মানুষ গঠিত। মানুষের উভয় দিকের সুখম উন্নয়ন একজন পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ মানবের স্বীকৃতি দান করে। মূলত আত্মা দেহের মূল পরিচালক। আত্মার উন্নয়নেই তার বস্তুগত উন্নয়নের স্বার্থকতা ও সফলতা নির্ভর করে অনেকাংশে। যে দর্শন ও নীতি আত্মার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা নিঃসন্দেহে উন্নত ও আদর্শ মানব সমাজ গঠনের রোল মডেল হিসেবে চিহ্নিত হবে যুগ-যুগান্তরে অনাগত মানব সভ্যতার কাছে।

ভূমিকা: মানবজাতি আল্লাহর সৃষ্টির সেরা জীব। বিবেক দিয়ে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে মহা অনুগ্রহ করেছেন। অন্যান্য জীব জগতের ন্যায় মানুষের মধ্যেও ছয় উপাদান তথা দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ঘের, বন্ধিষ্ণু শরীর, অনুভূতি, স্বাধীন চলা-ফেরা ইত্যাদি বর্তমান থাকলেও জ্ঞান ও বুদ্ধির মূলশক্তি বিবেকবোধ একমাত্র মানবজাতিকেই দান করেছেন। তাই মানুষকে তার কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। মানুষ বিবেক দ্বারা পরিচালিত হয় আর অন্যান্য জীব-জগত তথা পশু-পাখি, জীব-জন্তু জ্ঞান ও বিবেক দ্বারা পরিচালিত হয় না, তারা পরিচালিত আবেগ দ্বারা। তাই তাদের কৃতকর্মের জন্য নেই কোনো জবাবদিহি। নেই ভাল কাজের পুরস্কার ও মন্দ কাজের তিরস্কার। মানুষ তার অনুসৃত কর্মের মাধ্যমে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে পারে আবার অবনতির শেষ সীমায় পৌঁছতে পারে। মানুষকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির সেরা বা সৃষ্টির সর্ব নিকৃষ্ট জীবে পরিণত করার এ বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছেন। তাই মানুষ যাতে ভাল-মন্দ, উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট ইত্যাদি যাচাই করতে পারে সে জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূলদের পাঠিয়েছেন মানবজাতির শিক্ষকরূপে। তারা মানুষকে আল্লাহ প্রদত্ত ওহীর (প্রত্যাদেশ) আলোকে শিক্ষা দান করেছেন, বিবেকবোধ জাগ্রত করেছেন, পাপ-পঙ্কিলতা থেকে জাতিকে মুক্ত করেছেন এবং আল্লাহর পথের সঠিক দিক-নির্দেশনা দান করেছেন। নবী-রাসূলদের সর্দার বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) মানবজাতির সর্বোত্তম মডেল ও আদর্শ হিসেবে বিশ্বজাতিকে মৌলিক উন্নয়নের যে পথ-নির্দেশনা দিয়েছেন, সেটিই চিরন্তন উন্নয়ন ও সঠিক উন্নতির একমাত্র দিক-নির্দেশনা। মানবজাতিকে সত্যিকার উন্নয়নের সুফল পেতে হলে মহানবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর নির্দেশিত মৌলিক নীতিমালার যথাযথ অনুসরণ একান্ত অপরিহার্য। তাঁর প্রদর্শিত পথে চলার মধ্যেই রয়েছে চূড়ান্ত উন্নতির শেষ ঠিকানা।

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

আত্মোন্নয়ন-এর স্বরূপ

আত্মোন্নয়ন (Self Development): মানুষকে আল্লাহ তা‘আলা আশরাফুল মাখলুখাত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টিকুলের মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দান করেছেন। মানুষ তার কৃত কর্মের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্বের আসন লাভ করে থাকে। উৎকৃষ্ট কর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে আসীন করে, আর নিকৃষ্ট কর্ম নিকৃষ্ট জীবে পরিণত করে। এই কর্ম সম্পাদিত হয় পঞ্চইদ্রিয়ার মাধ্যমে। পঞ্চইদ্রিয়ার মূল পরিচালক আত্মা। মহানবী (সা.) বলেছেন,

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ، صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

“জেনে রেখো! দেহে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে। এটি সংশোধন হলে পুরো দেহ সংশোধন হয়ে যাবে। এটি নষ্ট হলে পুরো দেহ নষ্ট হয়ে যাবে। আর তা হলো কালব বা অন্তর”। (বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাইল, সহীহ, কায়রো: দারুশ শা‘ব, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি. খ. ১, পৃ. ৪৩) আত্মা এবং দেহ উভয়ের সম্মিলনে মানুষ অভিধায় বিভূষিত হয় এবং পরিপূর্ণ মানুষ গঠিত হয়। ইসলাম দেহ ও আত্মা উভয়ের সুষম উন্নয়নের দিকনির্দেশনা দান করেছে। তাই ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে সমাদৃত। বস্তুবাদী ও জড়বাদীরা আত্মার উন্নয়ন বাদ দিয়ে শুধুমাত্র দৈহিক উন্নয়নের বিষয়ে জোর দিতে গিয়ে ভোগবাদের সৃষ্টি করেছে। আর ইসলাম দেহ ও আত্মা উভয়ের উন্নয়নের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পরিপূর্ণতার স্বাক্ষর রেখেছে। সুতরাং আত্মার সর্বনিম্ন শ্রেণি তথা পশু প্রবৃত্তি থেকে উন্নত করে মানুষ প্রবৃত্তিতে পরিণত করার গতিশীল প্রক্রিয়া হল আত্মোন্নয়ন। সাধারণ উন্নয়ন সম্পর্কে বলা হয়-A dynamic process which involves change plus growth “এটি একটি শক্তিশালী গতিশীল প্রক্রিয়া। এটি প্রবৃদ্ধিযুক্ত পরিবর্তন বুঝায়”। (Michael P. Todaro, *Economics for a Developing word*. P. 87) অতএব Self Development বা আত্মোন্নয়ন হল lower self থেকে পরিচর্যার মাধ্যমে Higher Self এ উন্নত করার প্রক্রিয়া। উন্নয়ন বিষয়ে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

لَزَكُّنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ

“অবশ্যই তোমরা আরোহণ করবে এক স্তরের পর অপর স্তর”। (আল কুরআন, সূরা আল ইনশিকাক, ৮৪: ১৯) অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমাজ উন্নয়নের জন্য যেমন সুনির্দিষ্ট নীতি ও আদর্শ রয়েছে ঠিক তেমনি আত্মোন্নয়নের ক্ষেত্রেও কতিপয় পদ্ধতি কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। তন্মধ্যে নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিসমূহ উপস্থাপনের প্রয়াস পাব।

১. নিষ্ঠা (Sincerity)

আত্মোন্নয়নের প্রথম মূলনীতি হলো ইখলাস বা নিষ্ঠা, যা প্রতিটি কর্ম-পদক্ষেপের প্রাণশক্তি। এটি অন্তরের সবচেয়ে মূল্যবান গোপন ক্রিয়া এবং মর্যাদার বিচারে সবার শীর্ষে। ইসলামের সকল বিধি-বিধান ইখলাসের স্তম্ভের উপরই প্রতিষ্ঠিত। বান্দার প্রতিটি কর্ম আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়া এবং না হওয়ার একমাত্র মানদণ্ড হলো ইখলাস। তাই আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে কোন আমল সম্পাদন করাই হলো ইখলাস। আল্লামা ইউসুফ কারযাভী (রহ.) বলেন,

إن أساس القبول لأي عبادة هو إخلاص القلوب لله تعالى

“কোনো ইবাদাত গ্রহণযোগ্য হওয়ার ভিত্তি বা শর্ত হলো আল্লাহ তা‘আলার জন্য অন্তরের একনিষ্ঠতা”। (আল কারযাভী, ইউসুফ, আল ‘ইবাদাহ ফিল ইসলাম, কায়রো: মাকতাবাতু ওয়াহবাহ, ১৪৩০ হি./২০০৯ খ্রি. পৃ. ১৩১) আল্লামা কুশায়রী (রহ.) বলেন,

الإخلاص إفراد الحق سبحانه في الطاعة بالقصد

“ইখলাস হলো অভীষ্ট আনুগত্যে এককভাবে আল্লাহ তা‘আলার আনুগত্য করা”। (আল কুশায়রী, আব্দুল কারীম ইবনু হাওয়াজিন, আর্-রিসালাতুল-কুশাইরিয়্যাহ, কায়রো: আল মাকতাবাতুত তাওফীকিয়াহ, তা. বি. পৃ. ৩০০) আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾

“তাদেরকে কেবল এই আদেশই করা হয়েছিল যে, তারা বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর ইবাদাত করবে”। (আল কুরআন, সূরা আল-বাইয়্যিনাহ, ৯৮: ৫) তিনি আরো বলেন,

﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾

“বলুন, আমি তো কেবল নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর ইবাদাত করতে আদিষ্ট হয়েছি”। (আল কুরআন, সূরা আয-যুমার, ৩৯: ১১) তিনি আরো বলেন,

﴿قُلِ اللَّهُ أَغْبَدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي﴾

“বলুন, আমি তো কেবল নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ তা‘আলারই ইবাদাত করি”। (আল কুরআন, সূরা আয-যুমার, ৩৯: ১৪) সাইয়িদুনা আবু উমামা (রা.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর নিকট এসে বললেন,

...أَرَأَيْتَ رَجُلًا غَرًّا يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالذِّكْرَ مَا لَهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا شَيْءَ لَهُ فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَقُولُ

لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا شَيْءَ لَهُ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتِغَايَ بِهِ وَجْهَهُ

“ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কি বলেন, যে ব্যক্তি সাওয়াব এবং সুনাম অর্জনের জন্য জিহাদ করে, তার জন্য কি রয়েছে? তখন রাসূল (সা.) বললেন, তার জন্য কিছুই নেই। এভাবে লোকটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন। রাসূল (সা.) তিনবারই বললেন, তার জন্য কিছুই নেই। অতঃপর তিনি (সা.) বললেন, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর উদ্দেশ্যে সম্পাদিত খাঁটি বা একনিষ্ঠ আমলই কবুল করেন, যা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়”। (নাসায়ী, আহমাদ ইবনু শু‘আইব, আল মুজতাবা মিনাস্ সুনান, আলেক্সা: মাকতাবুল মাতুবু‘আতিল ইসলামিয়াহ, ২য় সংস্করণ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি. খ. ৬, পৃ. ২৫)। অতএব সর্ব ক্ষেত্রে উন্নতির মূল চাবিকাঠি হলো আল্লাহর প্রতি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা।

২. সুদৃঢ় আস্থা (Strong Confidence)

আত্মোন্নয়নের অন্যতম মূলনীতি হলো সুদৃঢ় আস্থা (Strong Confidence)। ইসলামী পরিভাষায় যাকে ‘ইয়াক্বীন’ বলা হয়। কোন বিষয় অন্তরে এরূপ বদ্ধমূল হওয়া, যার সাথে অন্তরের সম্পর্ক স্থাপিত হয় চোখে দৃশ্যমান সম্পর্কের ন্যায়। যেখানে কোন সন্দেহ কিংবা সংশয় কাজ করে না। আর এটিই ঈমানের চূড়ান্ত পর্যায়। দেহের জন্য যেমন প্রাণ আবশ্যিক তেমনি ঈমানের জন্য ইয়াক্বীন আবশ্যিক। তাই ইয়াক্বীন হলো ঈমানের জন্য রূহ তুল্য। ইয়াক্বীনের প্রকৃতি বিষয়ে শায়খ জুনাইদ আল বোগদাদী (রহ.) বলেন,

اليقين هو استقرار العلم الذي لا يتقلب ولا يحول ولا يتغير في القلب.

“ইয়াক্বীন হলো ইলম বা জ্ঞানের এমন দৃঢ়তা, যা অন্তরে পরিবর্তন ও রূপান্তর হয়না”। (জাওজিয়াহ, ইবনু কায়্যিম শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ আবু বাকর, মাদারিজুস্ সালিকীন, কায়রো: আল মাকতাবাতুত তাওফীকিয়াহ, তা.বি.

তাহকীক: আল বারুদী, খ. ২, পৃ. ১২৫) সাইয়িদুনা আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রা.) বলেন, الْيَقِينُ الْإِيمَانُ كُلُّهُ

“ইয়াক্বীন হলো পূর্ণ ঈমান”। (বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল, সহীহ, কায়রো: দারুশ শা‘ব, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি. খ. ১, পৃ. ৯) আল্লামা ইবনু তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন,

الصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ، وَالْيَقِينُ الْإِيمَانُ كُلُّهُ

“সবর হলো ঈমানের অর্ধাংশ আর ইয়াক্বীন হলো পূর্ণ ঈমান”। (জাওজিয়াহ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৭৪)
ইয়াক্বীন অস্তরের এমন এক উন্নত গুণ, যার মাধ্যমে আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে থাকেন। এই অনন্য গুণটির বদৌলতে মানুষ আমলের জগতে সর্বদা এগিয়ে থাকেন। তাই আল্লাহ তা’আলা কুরআন মাজীদে গুরুত্বপূর্ণ ইয়াক্বীনের গুণে গুণান্বিত সুদৃঢ় বিশ্বাসীদেরকে হিদায়াত ও সফলতার দ্বারা অন্যদের থেকে আলাদা করে বলেন,

﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ * أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

“আর আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে যারা ঈমান আনে এবং পরকালকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে। তারাই নিজেদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সুপথ প্রাপ্ত, আর তারাই যথার্থ সফলকাম”। (আল কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২: ৪-৫) সুতরাং আত্মবিশ্বাস ও সুদৃঢ় আস্থা উন্নয়নের ভিত্তি স্বরূপ।

৩. সদাচরণ (Good Character)

সদাচরণ কিংবা সৎ চরিত্রকে আরবিতে হুসনুস্ সুলুক (حسن السلوك) কিংবা হুসনুল খুলুক (حسن الخلق) বলা হয়। ‘হুসনুল’ অর্থ সৌন্দর্য ও উৎকর্ষ, যা কদর্যতার বিপরীতে ব্যবহৃত হয়। আর ‘খুলুক’ ও ‘সুলুক’ শব্দদ্বয় স্বভাব ও আচরণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং ‘হুসনুল খুলুক’-এর অর্থ দাঁড়ায় সদাচরণ বা উত্তম চরিত্র। আত্মোন্নয়নের অপরিহার্য মূলনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নীতির নাম সদাচরণ। এই উন্নত চরিত্র মানুষকে যেমন শত্রু-মিত্র, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কাছে শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত করে তেমনি আত্মশুদ্ধি অর্জনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। সাইয়িদুনা ‘আলী (রা.) বলেন,

حسن الخلق في ثلاث خصال؛ اجتناب المحارم وطلب الحلال والتوسعة على العيال.

“হুসনুল খুলুক বা সুন্দর চরিত্র তিনটি স্বভাবের মধ্যে বিদ্যমান; ১. হারাম বস্তু বর্জন, ২. হালাল বস্তু সন্ধান ও ৩. পরিবার-পরিজনের প্রতি উদারতা পোষণ”। (মানাহিজু জামি’আতিল মাদীনাতিল ‘আলামিয়াহ, কিতাবু উসূলিদ দা’ওয়া, মালয়েশিয়া: মানাহিজু জামি’আতিল মাদীনাতিল ‘আলামিয়াহ, তা.বি. খ. ১, পৃ. ৩৩৬) রাসূল (সা.) কুরআনের অনুসরণ করেছেন পরিপূর্ণরূপে। তিনি ছিলেন জীবন্ত ও ভ্রাম্যমাণ কুরআন। তিনি সব ধরনের ভালো আচরণ ও গুণের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ তা’আলা তাঁর চরিত্রের প্রশংসা করে বলেন,

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

“আপনি নিশ্চয়ই মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত”। (আল কুরআন, সূরা আল-ক্বলাম, ৬৮: ৪)

তাই রাসূল (সা.)-এর প্রিয়ভাজন হয়ে কিয়ামতের দিবসে তাঁর নিকটবর্তী হওয়ার অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো সদাচরণের গুণটি। সাইয়িদুনা জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা.) বলেন,

إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا

“যে ব্যক্তির চরিত্র ও আচরণ সর্বোত্তম, তোমাদের সেই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় এবং কিয়ামতের দিবসের আমার খুবই নিকটে থাকবে।” (তিরমিযী, জামি’উত্ তিরমিযী, বৈরুত: দারু ইহইয়ায়িত্ তুরাসিল ‘আরাবী, খ. ৪, পৃ. ৩৪৯) শুধু তাই নয়, সদাচরণ ও সচ্চরিত্র এক অনানুষ্ঠানিক উন্নত ইবাদাত, যার চেয়ে অধিক ওজনের আর কোনো আমল পৃথিবীতে নেই। সাইয়িদুনা আবুদ দারদা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলেন,

مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ مِنْ مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ

“কিয়ামতের দিবসে মুমিনের দাঁড়িপাল্লায় সচরিত্র ও সদাচরণের চেয়ে বেশি ওজনের আর কোনো জিনিস হবে না”। (তিরমিযী, প্রাগুক্ত, বাব: হুসনুল খলুক, হা. নং: ২০০২, খ. ৪, পৃ. ৩৬২) অতএব উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণের জন্য সুন্দর চরিত্র ও সদাচরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৪. বিনয় (Humility)

আত্মোন্নয়নের সুন্দরতম মূলনীতির নাম হলো বিনয় ও নম্রতা। এটি মুমিনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং অহংকারের বিপরীত উন্নত স্বভাব। এই গুণটি মানুষের মর্যাদাকে সমুন্নত করে পরস্পর সদ্ভাব গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের অতুলনীয় পরিচায়ক আত্মোন্নয়নের এই অপরিহার্য গুণটি। বিনয় স্বভাবের মুসলিম যেমন আল্লাহ তা‘আলার প্রিয়ভাজন হন তেমনি তিনি সকলের প্রসংশার পাত্রে পরিণত হন। আল্লামা রাগিব ইসফাহানী (রহ.) বিনয় ও নম্রতার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,

رضا الإنسان بمنزلة دون ما يستحقه فضله ومنزلته. وهو وسط بين الكبر والضعف، فالضعف: وضع الإنسان نفسه مكاناً يزي به بتضييع حقه. والكبر: رفع نفسه فوق قدره.

“মানুষ তার প্রাপ্য পদমর্যাদার চেয়ে নিম্ন পদমর্যাদা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা। এটি অহংকার ও হীনতার মধ্যবর্তী স্তর। হীনতা হলো মানুষ আপন অধিকার ক্ষুণ্ণ করে নিজকে ঘৃণ্য স্থানে নামিয়ে ফেলা। পক্ষান্তরে, অহংকার হলো নিজকে স্বীয় মর্যাদার উর্ধ্বে তুলে ধরা”। (ইসফাহানী, আবুল কাসিম, আয-যারী‘আহ ইলা মাকারিমিশ শারী‘আহ, বৈরুত: প্র. বি. ১ম সংস্করণ- ১৪০০ হি./১৯৮০ খ্রি. পৃ. ১৯৬) রাসূল (সা.) বলেন,

ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله

“সাদাকাহ করলে সম্পদ হ্রাস পায় না, আল্লাহ তা‘আলা ক্ষমাশীল ব্যক্তির মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই বিনীত হলে তিনি তার মর্যাদা সমুন্নত করে দেন”। (মুসলিম, সহীহ, বৈরুত: দারুল জীল, তা.বি. খ. ৮, পৃ. ২১) বিনয়ী ও নম্র চরিত্রের লোকদের মর্যাদা আল্লাহ তা‘আলা ইহকাল-পরকাল উভয় জগতে বৃদ্ধি করবেন। দুনিয়াতে মানুষের অন্তরে তাদের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টির মাধ্যমে সম্মানিত করবেন এবং পরকালে অধিক প্রতিদান দিয়ে সম্মানিত করবেন। তাই মানবাত্মাকে বিনয়ী ও নম্রতার গুণে অলঙ্কৃত করা আত্মোন্নয়নের অপরিহার্য দাবী।

৫. সততা (Honesty)

সততা মানবাত্মার সবচেয়ে উন্নত ও মর্যাদাপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের একটি। সততার বীজ মানবাত্মায় রোপণ করা হলে তাতে সব ধরনের মন্দ গুণ উপড়ে ফেলা সম্ভব। আত্মার এই অপরিহার্য গুণটি সাধারণ জন জীবনের খুবই মূল্যবান রত্ন হিসেবে বিবেচিত। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তারের কারণে সততা সব ধরনের আস্থা, স্বস্তি ও প্রশান্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সততার বলে বলিয়ান আত্মা দুনিয়া-আখিরাতের সর্বত্র সফলতা লাভ করে। সৎ ও বিশুদ্ধ আত্মা ব্যতীত মুমিন কখনো কাঙ্ক্ষিত সফলতা পেতে পারে না। তাই আত্মোন্নয়নে সততার গুণ ধারণ করা অত্যন্ত জরুরী। ইমাম রাগিব ইসফাহানী (রহ.) বলেন,

الصدق مطابقة القول للضمير والمخبر عنه معاً، ومتى انخرم شرط من ذلك لم يكن صدقاً تاماً

“সততা বা সত্যবাদিতা হলো মনের কথা ও মুখের বিবৃতি এক এবং সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া। যখন এতদুভয়ের একটি শর্ত ফ্রটিযুক্ত হয় তখন তা পূর্ণ সততার সংজ্ঞাভুক্ত হবে না।” (ইসফাহানী, আয-যারী‘আহ ইলা মাকারিমিশ শারী‘আহ, পৃ. ২৭০) আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামতের দিন সততার পুরস্কার প্রদান পূর্বক সত্যবাদীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবেন,

﴿قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

“আল্লাহ বলবেন, এটা তো সেই দিন, যে দিন সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতা উপকৃত করবে। তাদের জন্য রয়েছে এমন সব উদ্যান, যার তলদেশে নহর প্রবাহমান। তাতে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এটিই মহান সফলতা”। (আল কুরআন, সূরা আল-মায়িদা, ৫: ১১৯) নবী করীম (সা.) বলেন,

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا

“নিশ্চয়ই সততা (মানুষকে) নেকির দিকে পরিচালিত করে আর নেকী জান্নাতে পৌঁছায়। মানুষ সততার উপর অটল থাকে অবশেষে ‘সিদ্দীক’ এর দরজা লাভ করে”। (বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩০)

সততা মানুষকে কল্যাণের পথে, শুদ্ধাচারের পথে পরিচালিত করে। সত্য পথে চলার প্রচেষ্টা এক সময় মানুষকে সত্যবাদী হওয়ার পথ সুগম করে দেয়। যা আত্মোন্নয়নের অপরিহার্য গুণাবলির অন্যতম।

৬. সৎসঙ্গ (Company)

মানুষকে সমাজ বান্ধব জীব হিসেবে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের সান্নিধ্যে আসতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা, বিশ্বাস ও স্বভাব মানুষের জীবনে দারুণভাবে প্রভাব বিস্তার করে। সৎ সান্নিধ্য মানুষের অন্তরাত্মকে পবিত্র করে তোলে আর অসৎ সান্নিধ্য অন্তরকে কলুষিত করে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়। তাই আত্মোন্নয়নের অপরিহার্য গুণাবলির অন্যতম হলো সোহবত বা সান্নিধ্য। ইমাম ইসফাহানী (রহ.) সোহবত প্রসঙ্গে বলেন,

الصاحب: الملازم، إنسانا كان أو حيوانا أو مكانا أو زمانا، ولا فرق بين أن تكون مصاحبته بالبدن أو بالعبادة والهمة، ولا يقال في العرف إلا لمن كثرت ملازمته

“সাথী হলো সহযোগী। হোক সে মানুষ কিংবা প্রাণী কিংবা স্থান বা সময়। সঙ্গ এটি শারীরিক হোক কিংবা গুরুত্ব ও আগ্রহের মাধ্যমে হোক এতে কোন পার্থক্য নেই। তবে অত্যধিক সান্নিধ্য অর্জনকেই কেবল পরিভাষায় সোহবত বলে বিবেচনা করা হয়”। (আল-ইসফাহানী, আল-মুফরাদাত ফী গরীবিল কুরআন, বৈরুত: দারুল ‘ইলমিদ দারিশ্ শামিয়াহ, ১৪১২ হি. খ. ১, পৃ. ৪৭৫) সৎ ও উত্তম সান্নিধ্য সম্পর্কে রাসূলকে (সা.) প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন,

مَنْ دَرَكْتُمُ اللَّهَ وَرُؤْيَيْتُهُ، وَزَادَكُمْ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ، وَدَرَكْتُمُ فِي الْآخِرَةِ عَمَلُهُ

“যার সাক্ষাৎ বা সান্নিধ্য তোমাদেরকে আল্লাহর কথা মনে করিয়ে দেয়, যার উচ্চারিত বাক্য তোমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করে এবং যার কার্যকলাপ তোমাদেরকে আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়”। (আল-হায়ছামী, নূরুদ্দীন, আল-মাজমাউজ্-যাওয়াইদ ওয়া মানবাউল ফাওয়াইদ, বৈরুত: দারুল ফিকর, সংস্করণ-১৪১২ হি. হা. নং: ১৭৬৮৬, বাব: আয়্যুল জুলাসা খায়রুন, খ. ১০, পৃ. ৩৮৯) আল্লাহ তা‘আলা মুমিনদেরকে তাঁকে ভয় করার পাশাপাশি সত্যবাদীদের সাথীত্ব গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾

“হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমরা সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো” (আল কুরআন, সূরা আত-তাওবাহ, ৯: ১১৯) আল্লাহ তা‘আলা স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছেন,

﴿الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾

“সেদিন বন্ধুবর্গ একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে, কেবল মুত্তাকীগণ ছাড়া”। (আল কুরআন, সূরা আয-যুখরুফ, ৪৩: ৬৭) সৎ সোহবত ও অসৎ সোহবতের চমৎকার দৃষ্টান্ত, প্রভাব এবং এতদুভয়ের পরিণতি সম্পর্কে অনুসারীদের সতর্ক করে মহানবী (সা.) বলেন,

مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوِّءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمَسْكِ وَكَبِيرِ الْحَدَادِ لَا يَعْدُمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمَسْكِ إِذَا تَشَتَّرَبَهُ ، أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ وَكَبِيرِ الْحَدَادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ ، أَوْ ثَوْبَكَ ، أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً

“সৎ সঙ্গী ও অসৎ উদাহরণ কস্টুরী বিক্রেতা ও কর্মকারের হাপরের ন্যায়। আতর বিক্রেতা থেকে তুমি শূন্য হাতে ফিরবে না। হয় তুমি আতর ক্রয় করবে, না হয় তার সুঘ্রাণ পাবে। পক্ষান্তরে কর্মকারের হাপরও, হয় তা তোমার দেহ অথবা তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে, না হয় তুমি তার দুর্গন্ধ পাবে”। (বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৮২) অতএব আত্মোন্নয়নের জন্য সৎ ব্যক্তিদের সোহবত অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৭. আত্মসমালোচনা (Self-Criticism)

আত্মসমালোচনাকে ইসলামী পরিভাষায় জবাবদিহির মানসিক প্রস্তুতিকে বুঝায়। যাকে ইহতিসাব বা মুহাসাবাহ বলা হয়। এ বিষয়ে আল্লামা ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেন,

المحاسبة وهي التمييز بين ماله وما عليه، فيصحب ماله ويؤدي ما عليه.

“মুহাসাবাহ হলো তার জন্য কল্যাণকর ও অকল্যাণকর কী তা পার্থক্য করা। যেন সে কল্যাণকর বিষয়কে নিজের জন্য গ্রহণ করতে পারে এবং তার উপর অর্পিত দায়িত্ব আদায় করতে পারে”। (জাওজিয়াহ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২৮) আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

“হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ তা‘আলাকে ভয় করো। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত আগামী কালের জন্য সে কি প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা। আল্লাহ তা‘আলাকে ভয় করতে থাক। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে খবর রাখেন”। (আল কুরআন, সূরা আল-হাশ্র, ৫৯: ১৮) আত্মসমালোচনা এ অনন্য গুণটি মানুষকে সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট পরিয়েছে। আত্মসমালোচনাকারী ব্যক্তি কোনো সাধারণ মানুষ নয়; রবং সেই হলো সবচেয়ে বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি। রাসূল (সা.) বলেছেন,

الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ

“সেই বুদ্ধিমান যে নিজের নার্সকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য কাজ করে”। (ইবনু মাজাহ, আবু আব্দুল্লাহ, সুনান, কায়রো: মাকতাবাতু আবী মু‘আতা, তা. বি., হা. নং: ৪২৬০, খ. ৫, পৃ. ৩২৮) ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন, ‘নার্সকে নিয়ন্ত্রণ’ ও আখেরাতে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করার পূর্বে দুনিয়াতে আত্মসমালোচনা করা অপরিহার্য। (তিরমিযী, জামি‘উত্ তিরমিযী, হা. নং: ২৬৪৭) সুতরাং আত্মসমালোচনা উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছিয়ে দেয়।

৮. সাধনা (Striveness)

আরবী ভাষায় মুজাহাদা-এর শাব্দিক অর্থ প্রচেষ্টা চালানো, শ্রম ব্যয় করা ও সাধনা করা। দীনের পথে যে-কোনো সাধনাকেই মুজাহাদা বা জিহাদ বলা হয়ে থাকে। সশস্ত্র প্রচেষ্টা তথা আল্লাহ তা‘আলার পথে যুদ্ধ করাও এর অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া শান্তিপূর্ণ মেহনত ও আত্মশুদ্ধিমূলক সাধনাও জিহাদেরই অংশ। (উসমানী, তাক্বী, তাফসীরু তাওয়াহীল কুরআন, ঢাকা: মাকতাবাতুল আশরাফ, ২০১৫ খ্রি. (বাংলা অনু: আ. ব. ম. সাইফুদ্দীন), সূরা আল-হাজ্জ, খ. ২, পৃ. ৩৯৯) চেষ্টা-সাধনা ও সংগ্রাম ইসলামী পরিভাষায় ‘মুজাহাদা’ নামে পরিচিত।

আল্লামা রাগিব ইসফাহানী (রহ.) বলেন,

الجهاد والمجاهدة: استنفراغ الوسع في مدافعة العدو.

“জিহাদ ও মুজাহাদাহ হলো শত্রুর মোকাবেলায় সামর্থ্যকে নিঃশেষ করা”। (ইসফাহানী, আল মুফরাদাত ফী গরীবিল কুরআন, বৈরুত: দারুল মা’রিফাহ, ২০০৮ খ্রি., খ. ১, পৃ. ২০৮) তিনি বলেন, মুজাহাদা তিন প্রকার। এক. প্রকাশ্য শত্রুর সাথে সংগ্রাম, দুই. শয়তানের সাথে সংগ্রাম ও তিন. নাফসের সাথে সংগ্রাম। (প্রাণ্ডক্ত) এই তিন প্রকার নিম্নে বর্ণিত আয়াতে কারীমায় অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা’আলা বলেছেন,

﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾

“তোমরা আল্লাহর পথে চেষ্টা সাধনা কর, যেভাবে সাধনা করা উচিত”। (আল কুরআন, সূরা আল-হাজ্জ, ২২: ৭৮) আল্লাহ তা’আলা আরো বলেন,

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾

“যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব”। (আল কুরআন, সূরা আল ‘আনকাবুত, ২৯: ৬৯) রাসূল (সা.) বলেছেন,

جَاهِدُوا أَهْوَاءَكُمْ كَمَا تُجَاهِدُونَ أَعْدَاءَكُمْ

“তোমরা তোমাদের মনের কামনা বাসনার বিরুদ্ধে সাধনা করো, যেদ্বারা তোমরা তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো”। (আল-ইসফাহানী, আল মুফরাদাত ফী গরীবিল কুরআন, প্রাণ্ডক্ত) তিনি (সা.) বলেছেন,

الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

“প্রকৃত মুজাহিদ হলো সে, যে আল্লাহর পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে”। (তিরমিযী, প্রাণ্ডক্ত, হা. নং ১৬২১, খ. ৪, পৃ. ১৬৫) অতএব আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা ও নিরবচ্ছিন্ন সাধনা অতীব প্রয়োজন।

৯. মুরাক্বাবাহ (Islamic Meditation)

আরবী শব্দ ‘মুরাক্বাবাহ’ এর অর্থ একজন অন্যজনকে পর্যবেক্ষণ বা নজরদারি করা। মানুষ তার সর্বাবস্থায় ও কর্মকাণ্ডে এ কথা দৃঢ় বিশ্বাস করা যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা’আলা তাকে নজরদারি করছেন। তিনি অবগত আছেন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কী অর্জন করছে এবং তিনি জ্ঞাত আছেন তার সুপ্ত হৃদয়ের গুপ্ত রহস্যাবলি সম্পর্কে। একজন মুসলিমের আল্লাহ তা’আলার প্রতি এই প্রকারের আকীদা-বিশ্বাস পোষণকে আমরা ‘মুরাক্বাবাহ’ বলতে পারি।

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহ.) বলেন,

دوام علم العبد، وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه فاستدامته لهذا العلم واليقين، هي المراقبة

“গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে আল্লাহ তা’আলার পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে বান্দা স্থায়ী ও সুনিশ্চিত বিশ্বাসের উপর অটল থাকাই হল মুরাক্বাবাহ”। (জাওজিয়াহ, প্রাণ্ডক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৪৮) তিনি আরো বলেন বলেন,

المراقبة هي التبعيد باسمه "الرقيب، الحفيظ، العليم، السميع، البصير" فمن عقل هذه الأسماء، وتبعد بمقتضاها، حصلت له المراقبة

“মুরাক্বাবাহ হলো আল্লাহর নাম আর্ রাক্বীব, আল হাফীয, আল ‘আলীম, আস্ সামী’ ও আল বাছীর ইত্যাদি নামসমূহের ইবাদাত করা। যে এই নামসমূহ (মর্ম) বুঝে নামগুলোর দাবী অনুযায়ী ইবাদাত করবে, তার মুরাক্বাবাহ অর্জিত হবে”। (প্রাণ্ডক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৪৯) আল্লাহ তা’আলা বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন”। (আল কুরআন, সূরা আন-নিসা, ৪: ১) আল্লামা ইবনু কাসীর (রহ.) এই আয়াতের তাফসীর করেছেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সকল কাজ ও অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন”। (ইবনু কাসীর, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০৬) আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى﴾ “সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখেন?” (আল কুরআন, সূরা আল ‘আলাক্ব, ৯৬: ১৪) অর্থাৎ সে (আবু জাহিল) কি জানে না যে, আল্লাহ তা‘আলা যাবতীয় কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করছেন। যখন সে রাসূলকে (সা.) তাঁর ইবাদাত নামাজ হতে বিরত রাখার চেষ্টা করছে। (তাবারী, ইবনু জারীর, জামি‘উল বয়ান ফী তাভীলিল কুরআন, বৈরুত: মুআস্সাতুর্ রিসালাহ্, ১৪২০ হি./২০০০ খ্রি. খ. ২৪, পৃ. ৫১৭) সুতরাং এ ধরনের মুরাক্বাবাহ মানুষকে উন্নতির উচ্চ শিখরে নিয়ে যাবে নিঃসন্দেহে।

১০. পরহেজগারি (Religiousness)

(আল-ওয়ারা‘) অর্থ পরহেজগার হওয়া বা ধার্মিক হওয়া। এমন উন্নত চরিত্র যা মুমিনকে ধর্মীয় বিভিন্ন ফিতনা ও সন্দেহজনক কাজ হতে সুরক্ষা করে এবং এই গুণটির মাধ্যমে মানুষ ঈমানের সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করতে পারে। ‘আল-ওয়ারা‘-এর আসল রূপ হল মুমিনের জন্য আল্লাহ তা‘আলা যে-সব কাজ হারাম করেছেন এবং হারামে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কাজনক কাজও পরিহার করা। পাশাপাশি সর্ব প্রকার আদিষ্ট বিষয় এবং যে সব কাজ এটির প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তা গুরুত্বের সাথে পরিপালন করা। الْوَرَعُ (আল-ওয়ারা‘)-এর পরিচয় প্রসঙ্গে আল্লামা সাইয়িদ জুরজানী (রহ.) বলেন,

الورع هو اجتناب الشبهات خوفاً من الوقوع في المحرمات.

“الْوَرَعُ হলো হারামে পতিত হওয়ার আশঙ্কায় সন্দেহজনক কাজ থেকে বিরত থাকা”। (জুরজানী, ‘আলী ইবনু মুহাম্মাদ, আত-তা‘রীফাত, বৈরুত: দারুল কুতুবিল ‘আরাবী, ১ম সংস্করণ, ১৪০৫ হি. খ. ১, পৃ. ৩২৫) প্রখ্যাত মুহাদ্দিস সুফিয়ান সাওরী (রহ.) বলেন,

مَا رَأَيْتُ أَسْهَلَ مِنْ الْوَرَعِ، مَا خَالَكَ فِي نَفْسِكَ فَأَتَزَكَّهُ

“পরহেজগারীর মত সহজ কোন জিনিস আমি দেখিনি। যা তোমার মনে সন্দেহের উদ্রেক করে তুমি তা পরিহার কর”। (কুশায়রী, আব্দুল করীম ইবনু হাওয়াজিন, আর্-রিসালাতুল-কুশাইরিয়্যাহ, প্র.বি. খ. ১, পৃ. ৫৩) আল্লামা আবু সুলাইমান আদ দারানী (রহ.) বলেন,

الورع أول الزهد، كما أن القناعة أول الرضا.

“আল-ওয়ারা‘ হলো প্রধান যুহুদ (পরহেজগারি) যেভাবে অল্পে তৃপ্তি প্রধান সন্তুষ্টি”। (জাওজিয়্যাহ্, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪১৬) রাসূল (সা.) সাইয়িদুনা আবু হুরাইরাকে (রা.) উপদেশ দিয়ে বলেন,

يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كُنْ وَرِعًا ، تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ

“হে আবু হুরায়রাহ! পরহেজগার হও, তখন তুমি বড়ো ইবাদাতকারী বান্দা হতে পারবে”। (তিরমিযী, প্রাগুক্ত, কিতাবু-যুহুদ, হা. নং: ২৩০০, খ. ৪, পৃ. ৫৫১) প্রখ্যাত সূফী ইবরাহীম ইবনু আদহাম (রহ.) বলেন,

الورع ترك كل شبهة، وترك ما لا يعينك.

“আল-ওয়ারা‘ হলো প্রতিটি সন্দেহ পরিহার করা এবং তোমার জন্য অপ্রয়োজনীয় বিষয়াবলি পরিহার করা”। (কুশায়রী, আর্-রিসালাতুল-কুশাইরিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৩৬)

১১. দুনিয়া বিমুখ হওয়া (Asceticism)

আরবী ‘যুহুদ’ অর্থ উপেক্ষা করা ও বিমুখ হওয়া। দুনিয়ার সৌন্দর্য্য হতে বিমুখ হয়ে দুনিয়াবী বিষয়কে তুচ্ছজ্ঞান করে তাতে অশ্লেষে তুষ্ট হওয়াকে ‘যুহুদ’ বলে। দুনিয়ার মোহ ও চাকচিক্য যার অন্তরে তুচ্ছ, তাকে আরবিতে ‘যাহিদ ফি আদ-দুনইয়া’ বা দুনিয়া বিমুখ ব্যক্তি বলা হয়। আত্মোন্নয়নের জন্য ‘যুহুদ’-এর গুণে ভূষিত হওয়া অপরিহার্য। আখেরাতের অফুরন্ত নিআ‘মতের সামনে দুনিয়ার সৌন্দর্য্য যাদের কাছে অতি নগন্য তারাই দুনিয়া বিমুখতার মত মহৎ গুণে গুণান্বিত হতে পারেন। শায়খ জুনাইদ বোগদাদী (রহ.) বলেন,

الزهد استصغار الدنيا ومحو آثارها من القلب

“দুনিয়াকে হালকা মনে করা এবং অন্তরকে তার প্রভাব মুক্ত করা”। (ইবনু কাইয়িম, মাদারিজুস সালিকীন, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৬) প্রখ্যাত সূফী ইবরাহীম আদহাম (রহ.) বলেন,

الزهد فراغ القلب من الدنيا لا فراغ اليد، وهذا زهد العارفين، وأعلى منه زهد المقربين فيما سوى الله تعالى من دنيا وجنة وغيرها

“যুহুদ হলো অন্তরকে দুনিয়া থেকে মুক্ত করা, (কর্মের) হাতকে নয়। এটি হলো আল্লাহর ‘আরিফীনদের যুহুদ। তবে এর চেয়ে আরো উঁচু পর্যায়ের যুহুদ হলো ‘মুকাররিবীন’ (নৈকট্যপ্রাপ্তদের) যুহুদ আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত দুনিয়া এমন কি জান্নাত ও সব কিছু থেকে বিমুখ থাকা”। (আশ্-শাবারখীতী, ইবরাহীম, আল-ফুতুহাত আল-ওয়াহাবিয়া বিশারহি আল-আরবাসীন হাদীসিন-নাববিয়া, মিসর: মাতবা‘আহ খায়রিয়াহ, ১ম মুদ্রণ ১৩৪০ হি. পৃ. ২৩৬) সাইয়িদুনা সাহল ইবনু সা‘দ আস্-সা‘ইদী (রা.) বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর নিকট এসে বললেন,

دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللَّهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللَّهُ ، وَازْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ

“হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন, যেটি করলে পরে আমাকে আল্লাহও ভালোবাসবে এবং দুনিয়ার মানুষেরা ভালোবাসবে। তখন রাসূল (সা.) তাকে বললেন, “তুমি দুনিয়া বিমুখ হও, তখন আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন এবং মানুষের কাছে যা রয়েছে তা থেকে বিমুখ হও তখন তারা তোমাকে ভালোবাসবে”। (ইবনু মাজাহ, আবু আব্দুল্লাহ, সুনা, কায়রো: মাকতাবাতু আবী মু‘আতা, তা. বি. খ. ৫, পৃ. ২২৫)

এভাবে কুরআনুল কারীমের অসংখ্য আয়াত রয়েছে, যেখানে দুনিয়াকে নিকৃষ্ট ও প্রতারণার জীবন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং বান্দা যেন ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করে আল্লাহ তা‘আলার শক্তি ও কুদরত জেনে দীন প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত থাকার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন,

﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾

“নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য। অতএব, দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত করতে না পারে। আর আল্লাহ সম্পর্কে বড়ো প্রতারক-শয়তানও যেন কিছুতেই তোমাদেরকে প্রতারিত করতে না পারে”। (আল কুরআন, সূরা লুকমান, ৩১: ৩৩) অন্য আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا هُؤُلَاءِ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهيَ الْحَيَوانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾

“এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক ছাড়া কিছুই নয়। আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত”। (আল কুরআন, সূরা আল ‘আনকাবুত, ২৯: ৬৪) সুতরাং আত্মোন্নয়নের জন্য পার্থিব মোহ ও আসক্তি থেকে মুক্ত থাকা অপরিহার্য।

১২. যিক্র (Performing Zikr)

আত্মোন্নয়নের জন্য অপরিহার্য আরেকটি গুণ হল আল্লাহর যিক্র বা স্মরণ। মৃত অন্তরকে উজ্জীবিত করার একমাত্র উপায় হল আল্লাহর যিক্র। আল্লামা ইসফাহানী (রহ.) বলেন,

الذكر تارة يقال ويراد به هيئة للنفس، وتارة يقال لحضور الشيء القلب أو القول ولذلك قيل: الذكر ذكران: ذكر بالقلب، وذكر باللسان

“যিক্রকে কখনো বলা হয় এবং এর দ্বারা অন্তরের একটি রূপকে বুঝানো হয়। কখনো বলা হয় অন্তরে অথবা মুখে কোন কিছুর উপস্থিতিতে। তাই বলা হয়, যিক্র দু’ ধরনের: এক. অন্তরের যিক্র ও দুই. মুখের যিক্র”। (ইসফাহানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯) যিক্র হলো উদাসীন অন্তরকে স্থির ও শান্ত করার কুরআন নির্দেশিত ইসলামী চিকিৎসা। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾

“যারা ঈমান আনে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর যিক্র দ্বারা শান্তি লাভ করে; জেনে রাখো, আল্লাহর যিক্র দ্বারা ই অন্তরসমূহ শান্তি পায়”। (আল কুরআন, সূরা আর্-রা’দ, ১৩: ২৮) সাইয়িদুনা আবু মূসা আল-আশ’আরী (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা.) আল্লাহ তা’আলার যিক্রের নিমগ্ন অন্তর ও যিক্রমুক্ত অন্তরের মধ্যে তুলনা করে বলেন,

مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ

“যে ব্যক্তি তার রবের যিক্র করে এবং যে ব্যক্তি তার রবের যিক্র করে না উভয়ের দৃষ্টান্ত মৃত ও জীবিতের ন্যায়”। (বুখারী, প্রাগুক্ত, বাব: ফাদলু যিকরিলাহ, হা. নং: ৬৪০৭, খ. ৮, পৃ. ১০৭) আল্লামা ফখরুদ্দীন আর্-রাযী (রহ.) বলেন,

إن الموجب لدخول جهنم هو الغفلة عن ذكر الله تعالى، والمخلص من عذاب جهنم هو ذكر الله تعالى

“আল্লাহ তা’আলার যিক্র থেকে উদাসীনতা জাহান্নামকে অবশ্যম্ভাবী করে দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা’আলার যিক্র জাহান্নাম থেকে মুক্তির পথ সুগম করে”। (আর্-রাযী, ফখরুদ্দীন, মাফাতীহুল গায়ব, বৈরুত: দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৪২১ হি./২০০০ খ্রি. খ. ১৫, পৃ. ৫৪) শায়খ হাসান বসরী (রহ.) বলেন,

ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكير، وبالتفكير على التذكر، ويناطقون القلوب حتى نطقت

জ্ঞানীরা এখনো আল্লাহ তা’আলাকে স্মরণের মাধ্যমে গভীর ধ্যানে এবং গভীর ধ্যানের মাধ্যমে স্মরণে রত। তারা অন্তরাত্মার সঙ্গে এখনো কথা বলেন অন্তরও তাদের সঙ্গে কথা বলে”। (জাওজিয়াহ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৩৩) অতএব আত্মোন্নয়নের জন্য যিক্রের কোন বিকল্প নেই।

১৩. তাওবাহ (Penitence)

তাওবাহ-এর অর্থ ফিরে আসা বা প্রত্যাবর্তন করা। ইসলামের দৃষ্টিতে নিন্দিত কাজ হতে ইসলামের নন্দিত কাজে ফিরে আসাকে ‘তাওবাহ’ বলে। এটি আল্লাহ ওয়ালা হওয়ার প্রাথমিক যাত্রা এবং আল্লাহর পথিকদের সফলতার গোপন চাবিকাঠি। তাই তাওবাহ আল্লাহমুখী হওয়ার পূর্বশর্তরূপে স্বীকৃত। আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহ.) বলেন,

التوبة هي رجوع العبد إلى الله ومفارقته لصراط المغضوب عليهم والضالين

“তাওবাহ হলো আল্লাহর দিকে বান্দার প্রত্যাবর্তন এবং ক্রোধভাজন ও বিপথগামীদের পথ থেকে প্রস্থান”। (জাওজিয়াহ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩৬) হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজালী (রহ.) বলেন,

التوبة عبارة عن معنى ينتظم ويلتزم من ثلاثة أمور مرتبة: علم وحال وفعل.

“তাওবাহ এমন এক তাৎপর্যকে বোঝায় যা ধারাবাহিকভাবে তিনটি বিষয়কে সুবিন্যস্ত করে: (তা হলো) ইলম, অবস্থা ও কর্ম”। (গাজালী, আবু হামিদ, ইহইয়াউ ‘উলুমুদ্দীন, কায়রো: আল মাকতাবাতুত তাওফীকিয়াহ, ২০০৮ খ্রি. খ. ৪, পৃ. ৪) তাওবাহ-এর গুণ ধারণ করে বান্দা দুনিয়া ও আখিরাতে চূড়ান্তভাবে সফল হওয়ার উপায় বর্ণনা করে আল্লাহ তা‘আলা বিভিন্ন আয়াতে নির্দেশ দিয়ে বলেন।

﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

“হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার”। (আল কুরআন, সূরা আল নূর, ২৪: ৩১) রাসূল (সা.) নিষ্পাপ হওয়ার পরও উম্মতকে শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রতিদিন তাওবাহ এবং ইস্তিগফার করতেন। সাইয়িদুনা আগার ইবনু ইয়াসার (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা.) বলেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ

“হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবাহ এবং ক্ষমা প্রার্থনা কর। কেননা আমি প্রতিদিন একশ’ বার তাওবাহ করে থাকি”। (কুশায়রী, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৭২) অতএব তাওবাহ আত্মোন্নয়নের মূল চাবি।

১৪. আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা (Depending on Allah)

‘তাওয়াক্কুল’ অর্থ আল্লাহর উপর আস্থা ও নির্ভরশীল হওয়া। আর মুসলমানের ঈমানের সবচেয়ে বড় দান হলো এই তাওয়াক্কুল। মানসিক প্রশান্তি ও জাগতিক সৌভাগ্য লাভের গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো তাওয়াক্কুল। আল্লামা জুরজানী (রহ.) বলেন,

التوكل هو الثقة بما عند الله، واليأس عما في أيدي الناس

“তাওয়াক্কুল হলো আল্লাহ তা‘আলার কাছে যা কিছু রয়েছে তার প্রতি আস্থা রাখা এবং মানুষের কাছে যা রয়েছে তা থেকে নিরাশ হওয়া”। (জুরজানী, আত-তারীফাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮)

‘তাওয়াক্কুল’ এর স্বরূপ বর্ণনায় ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহ.) বলেন,

التوكل عمل القلب، ومعنى ذلك أنه عمل قلبي، ليس بقول اللسان، ولا عمل الجوارح، ولا هو من باب العلوم والإدراكات

“তাওয়াক্কুল হলো অন্তরের আমল। এর অর্থ এই যে, তা আত্মিক কর্ম, মুখের কথা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরও কোনো আমল নয়। তেমনি এটি জ্ঞান ও উপলব্ধিরও কোনো বিষয় নয়”। (জাওজিয়াহ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৮৫) আল্লামা কুশায়রী (রহ.) বলেন,

التوكل محله القلب، والحركة بالظاهر لا تنافي التوكل بالقلب

“তাওয়াক্কুলের স্থান হলো অন্তর। সুতরাং বাহ্যিক কর্মকাণ্ড অন্তরে লালিত তাওয়াক্কুলের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ কিছু নয়”। (কুশায়রী, আর্-রিসালাতুল কুশাইরিয়াহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬)

ইমাম গাযালী (রহ.) বলেন,

قد يظن الجهال أن شرط التوكل ترك الكسب وترك التداوي والاستسلام للمهلكات، وذلك خطأ لأن ذلك حرام في الشرع، والشرع

قد أثنى على التوكل، وندب إليه فكيف ينال ذلك بمحظوره

“মূর্খ লোকেরা কখনো ধারণা করে তাওয়াক্কুলের পূর্বশর্ত হলো আয়-উপার্জন ও চিকিৎসা পরিহার করে নিজেকে সমূহ ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া। এমনটি করা মারাত্মক অন্যায়। কারণ শরী‘আতে এ ধরনের কাজ নিষিদ্ধ। অধিকন্তু শরী‘আতে তাওয়াক্কুল একটি প্রশংসিত গুণ, যা ইসলামী শরী‘আ’র প্রতিনিধিত্বকারী অন্যতম অংশ। অতএব একদিকে ইসলামের নিষিদ্ধ কাজে যুক্ত হয়ে অন্যদিকে (ইসলামেরই বিশেষ অংশ) তাওয়াক্কুলের গুণ লাভ

করা কি আদৌ সম্ভব হবে?” (গাজালী, আবু হামিদ, আল আরবাইন ফী উসূলুদ্-দীন, দামিষ্ক: দারুল কলম, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি. পৃ. ২৪৬)। সুতরাং আত্মোন্নয়নের জন্য আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হতে হবে।

১৫. আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকা (Satisfaction with Allah's Decision)

ইসলামে সবার বা ধৈর্যেরও উর্ধ্বে অন্তরের একটি বিশেষ স্তরের নাম হলো ‘আর্-রিদ্বা বিল কাযা’ বা আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকা। এ স্তরে উন্নীত হতে পারলে তিনি আল্লাহর প্রতিটি সৃষ্টিকে কল্যাণ আর রহমত হিসেবে মূল্যায়ন করেন। রিযা আত্মার এমন একটি স্তর যা নিশ্চিত হলে পার্থিব বড়ো বড়ো বিপর্যয় দৃঢ় ঈমানের সাথে মুকাবিলা করা সম্ভব হয়। বরং তার যত বড়ই বিপদ নেমে আসুক সে আনন্দ চিন্তে গ্রহণ করে নিবে। এটা মূলত আল্লাহ তা‘আলাকে যথার্থ চেনার কারণে এবং তাঁর প্রতি সত্যিকার ভালোবাসার কারণে। তাই আল্লাহর ভালোবাসার সামনে দুনিয়ার সমস্ত কষ্ট তুচ্ছ মনে হয়। ফলে সুখের সময় যেভাবে তিনি আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করেন তেমনি যাবতীয় দুঃখ দুর্দশাকেও হাসিমুখে বরণ করে নেন। বিদ্বানগণ ‘রিযা’-এর স্বরূপ নির্ণয় করে স্ব স্ব বিশ্লেষণ পেশ করেছেন। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত সংজ্ঞা দ্বয় প্রাধান্যযোগ্য। আল্লামা জুরজানী (রহ.) বলেন,

الرضا سرور القلب بمر القضاء

“রিযা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে কষ্টকর সিদ্ধান্তের প্রতি অন্তরে প্রশান্তি অনুভব করা” (জুরজানী, প্রাগুক্ত, পৃ.

৫৭) আল্লামা বারকাভী (রহ.) বলেন,

الرضا طيب النفس بما يصيبه ويفوته مع عدم التغير

“রিযা হলো অর্জন কিংবা হারানোর ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াহীন স্বাচ্ছন্দ্যবোধ” (নাবলুসী, আব্দুল গণী, শারহ-আত-তারীকাতুল মুহাম্মদিয়া (পাভুলিপি), খ. ২, পৃ. ১০৫) রাসূল (সা.) সাইয়িদুনা আবু হুরাইরাকে (রা.) গুরুত্বপূর্ণ যে পাঁচটি উপদেশ দিয়েছেন তন্মধ্যে অন্যতম হল-

وَإِضْ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَعْيَى النَّاسِ

“আল্লাহ তা‘আলা তোমার ভাগ্যে যা নির্ধারণ করেছেন তাতে খুশি থাকলে তুমি লোকদের মধ্যে সবচেয়ে স্বনির্ভর ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হবে”। (তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫৫১) রাসূল (সা.) আল্লাহর ফয়সালায় খুশি থাকাকে ঈমানের স্বাদ অনুভব করার সাথে সংযুক্ত করেছেন। তিনি বলেন,

ذَا قَطَعَ الْإِيمَانُ مِنْ رِضَى بِاللَّهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا ، وَمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا

“সে ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পেয়েছে, যে আল্লাহ তা‘আলাকে প্রতিপালক, ইসলামকে দীন এবং মুহাম্মদকে (সা.) রাসূল হিসেবে সন্তুষ্ট চিন্তে স্বীকার করেছে”। (কুশায়রী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৬) তিনি (সা.) আরো বলেন,

مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ لَهُ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ تَرْكُهُ اسْتِخَارَةَ اللَّهِ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ لَهُ

“আদম সন্তানের জন্য আল্লাহ যা ফয়সালা করে রেখেছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকাই হল তার সৌভাগ্য। আর আল্লাহ তা‘আলার নিকট কল্যাণের প্রার্থনা ছেড়ে দেয়াই হচ্ছে তার দুর্ভাগ্য এবং আল্লাহ তা‘আলার ফয়সালায় উপর নাখোশ হওয়াও তার জন্য দুর্ভাগ্য”। (তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৫৫) আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾

“আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর নিজেদের বিষয়ে কোন অধিকার থাকে না। কেউ আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্যতা করলে সে তো প্রকাশ্য ভ্রষ্টতায় পতিত হয়”। (আল কুরআন, সূরা আল আহযাব, ৩৩: ৩৬) সুতরাং আত্মোন্নয়নের জন্য রিযা বিল কাযা বা আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকা অপরিহার্য।

১৬. পরিতুষ্টি (Contentment)

অল্পে তুষ্ট থাকা মানবিক উন্নত চরিত্রের অন্যতম। এ গুণটির মাধ্যমে মানুষ অল্প কিছুতে তৃপ্তির ঢেকুর তুলে স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন উপভোগ করতে সক্ষম হয়। ইসলামের পরিভাষায় এটিকে ‘কুনা’আহ’ বলে। সাধারণভাবে ‘কুনা’আহ’ বলতে বুঝায় নিজের যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা। আল্লামা সুযুতী [মৃ. ৯১১হি. রহ.] বলেন,

الفنائة: الرضا بما دون الكفاية، وترك التشوف إلى المفقود، والاستغناء بالموجود

“অপর্যাপ্ত কিছুতে সন্তুষ্ট থাকা, হারানো বস্তুর প্রত্যাশা ছেড়ে দেয়া এবং যা আছে তা যথেষ্ট মনে করা”। (আস্-সুযুতী, জালাল উদ্দীন, মুজাম্মু মাক্বালীদিল উলুম ফীল হুদুদি ওয়ার রুসুম, কায়রো: মাকতাবাতুল আদাব, ১ম সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি., খ. ১, পৃ. ২০৫) সাইয়িদুনা ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন,

الفنائة مال لا فناء له

“পরিতুষ্টি এমন এক সম্পদ যা কখনও ফুরিয়ে যাওয়ার নয়”। (ইবনু আব্দু রাব্বিহি, আল ইক্বদুল ফারীদ, প্র.বি. বাব: আল ক্বানা’আহ, খ. ১, পৃ. ৩৩০) সাইয়িদুনা উমর ইবনু আব্দুল আযীয (রহ.) বলেন,

الفقه الأكبر الفنائة، وكف اللسان

“সবচেয়ে বড় উপলব্ধি হলো পরিতুষ্টি ও জিহবার সংবরণ”। (ইবনু আব্দিল বিব্ব, ইউসুফ ইবনু আব্দুল্লাহ, আদবুল মুজালাসাহ ওয়া হামদুল লিসান, তানতা: দারুস সাহাবাহ লিত্ তুরাস, ১ম সংস্করণ, ১৪০৯ হি./১৯৮৯ খ্রি. তাহকীক: সামীর হালবী, খ. ১, পৃ. ৮৭) সাইয়িদুনা ইবনু উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَزُقِيَ كَفَافًا وَقَنَعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ

“যার ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য হয়েছে, যাকে ন্যূনতম প্রয়োজন পরিমাণ রিয্ক দেয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তা’আলা তাকে যা দান করেছেন তার উপর পরিতুষ্টি হওয়ার শক্তি দিয়েছেন, সেই (জীবনে) সফলতা লাভ করেছে”। (কুশায়রী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১০২) তাই যে ব্যক্তি উপরোক্ত গুণাবলি অর্জন করবে, সে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হবে এবং দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে দারুণ সফলতা উপভোগ করবে।

ন্যূনতম প্রয়োজন পরিমাণ রিয্ক বলতে বুঝায়, যা দিয়ে প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করে সংকট দূর করা যায়। (মুবারকপুরী, আব্দুর রহমান, তুহফাতুল আহওয়ায়ী, খ. ৪ পৃ. ৫০৮) অতএব অল্পে পরিতুষ্টি হওয়া আত্মোন্নয়নের মৌলিক বিষয়।

১৭. ধৈর্য (Patience)

‘সবর’ শব্দটি আরবী হলেও সমানভাবে বাংলা ভাষায় ব্যবহার হয়ে আসছে। ‘সবর’ এর আভিধানিক অর্থ আবদ্ধ করা ও নিবৃত্ত হওয়া। যেমন পবিত্র কুরআনের আয়াত-

﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾

“আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহ্বান করে”। (আল কুরআন, সূরা আল কাহ্ফ, ১৮: ২৮) অর্থাৎ আপনি তাদের সাথে নিজেকে আবদ্ধ রাখুন। ঈমান দু’ভাগে বিভক্ত। একভাগ হল ‘সবর’ অপর ভাগ হল ‘শোক্র’। সুতরাং ‘সবর’ বা ধৈর্য হল ঈমানের অর্ধাংশ। (জাওযিয়াহ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫১৩) ‘সবর’ এর সংজ্ঞায় বিশিষ্ট সূফী যুন্নুন মিসরী (রহ.) বলেন,

الصبر هو التباعد عن المخالفات والسكون عند تجرع غصص البلية وإظهار الغنى عند حلول الفقر بساحة المعيشية

“সবর হলো বিপরীত কর্ম থেকে বিরত থাকা, বিপদ মোকবিলায় স্থির ও নিরবতা পালন করা এবং জীবন যাপনে অসচ্ছলতা দেখা দিলে সচ্ছলতা প্রদর্শন করা”। (ইবনু ‘আল্লাহ, মুহাম্মদ ‘আলী ইবনু মুহাম্মদ, দালীলুল ফালিহীন লিতুরুক্বি রিয়াদিস সালিহীন, প্র.বি, খ. ১, পৃ. ১৬৫) আল্লাহ তা‘আলা ‘সবর’-এর আদেশ দিয়ে বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর এবং সীমান্ত রক্ষায় স্থিত থাক”। (আল কুরআন, সূরা আল ইমরান, ০৩: ২০০) সাইয়িদুনা আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলেন,

ما أعطي أحد من عطاء خيرا وأوسع من الصبر

“সবর-এর চেয়ে উত্তম ও ব্যাপক কোনো নি‘আমত কাউকে প্রদান করা হয়নি”। (বুখারী, প্রাগুক্ত, হা. নং: ১৪৬৯, খ. ২, পৃ. ১৫১) সুতরাং সবর আত্মোন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

১৮. কৃতজ্ঞতা (Gratefulness)

শৌকর বা কৃতজ্ঞতা মুমিনের সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন একটি গুণ। কারণ এতে মানুষের অন্তরের পাশাপাশি মুখ ও সমূহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরও সমান অংশগ্রহণ থাকে। শুধু তাই নয়, কৃতজ্ঞতার গুণটি ধৈর্য, আল্লাহর প্রতি সম্বন্ধি ও স্বেচ্ছায় প্রশংসার ন্যায় অসংখ্য দৈহিক ও আত্মিক ইবাদতকে পরিব্যাপ্ত করে। আল্লামা ইবনু ‘উজায়বাহ (রহ.) বলেন,

هو فرح القلب بحصول النعمة مع صرف الجوارح في طاعة المنعم والاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع

“নি‘আমতদাতার আনুগত্যে নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করে সেই নি‘আমত লাভে মনে আনন্দ অনুভব করা। সাথে সাথে অনুগত ও বিনয়ের সহিত নি‘আমতদাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা”। (ইবনু ‘উজায়বাহ, আব্দুল্লাহ আহমদ, মি‘রাজুত তাশাওউফ ইলা হাকায়িকিত তাশাওউফ, কাসাব্লাফা: মারকাজুত তুরাসিস্ সাক্বাফী আল মাগরাবী, তা.বি. তাহকীক: ড. আব্দুল মাজীদ খায়্যালী, পৃ. ২৯) আল্লামা জুরজানীর (রহ.) মতে কৃতজ্ঞতা বা শৌকর হলো-

الشكر هو صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه من السمع والبصر وغيرها إلى ما خلق لأجله

“কৃতজ্ঞতা হলো বান্দার প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত নি‘আমতরাজি তথা কর্ণ, চক্ষুসহ ইত্যাদি নি‘আমত সে কাজে ব্যবহার করা, যার জন্য সে সব সৃষ্টি করা হয়েছে”। (জুরজানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬) আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে তাঁর প্রদত্ত নি‘আমতে কৃতজ্ঞ হয়ে তাঁরই স্মরণে ইবাদত করতে আদেশ দিয়েছেন। তিনি মানুষকে তাঁর অগণিত ও অফুরন্ত নি‘আমতের বর্ণনা উল্লেখপূর্বক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃতজ্ঞতার গুণ ধারণ করতে বলেছেন। তিনি বলেন,

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

“সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; অকৃতজ্ঞ হয়ো না”। (আল কুরআন, সূরা আল বাকারা, ০২: ১৫২) তিনি আরো বলেন,

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا

“তোমরা যদি কৃতজ্ঞ হয়ে যাও এবং (সত্যিকারার্থে) ঈমান আন, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে কী করবেন? আল্লাহ গুণগ্রাহী, সর্বজ্ঞ”। (আল কুরআন, সূরা আল বাকারা, ০২: ১৪৭) সাইয়িদুনা আনাস ইবনু মালিক (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা.) বলেন,

ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ

“আল্লাহ তা‘আলা কোন বান্দাকে যখন যে নিআমতই দান করেন, তাতে সে যদি বলে, “আলহামদুলিল্লাহ”, তবে তা (প্রশংসা) তাকে প্রদত্ত জিনিসের চেয়ে অনেক উত্তম”। (ইবনু মাজাহ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৭১৪) অতএব কৃতজ্ঞতা একটি অসাধারণ গুণ, যা আত্মোন্নয়নের পথ নির্দেশ করে।

১৯. দানশীলতা (Charity)

পবিত্র কুরআন যে সব নৈতিক ও চারিত্রিক সৎকর্মের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে তন্মধ্যে বদান্যতা ও দানশীলতা অন্যতম। মানুষের প্রতি আল্লাহর নিআমত তথা অর্থ-কড়ি, ধন-সম্পদ ও বিত্ত-বৈভব দান করেছেন তা শুধু নিজেই উপকৃত হবে; বরং আল্লাহর অন্যান্য বান্দাগণের জন্যও ব্যয় করবে এবং তারাও উপকৃত হবে। তাই এর পরিধি ব্যাপক। আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনের সূচনাতেই হিদায়াতপ্রাপ্ত মুত্তাকীদের গুণাবলির মধ্যে অন্যতম দান ও বদান্যতা সম্পর্কে বলেছেন-

﴿وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾

“আর আমি তাদের যা কিছু দান করেছি, তা থেকে তারা (আমার রাহে অন্যান্য বান্দাদের জন্যও) ব্যয় করে”। (আল কুরআন, সূরা আল বাকারা, ০২: ০৬) অন্য আয়াতে তিনি বলেন,

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ نَبْثَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

“যারা আল্লাহর রাহে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশ” করে দানা থাকে। আল্লাহ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ”। (আল কুরআন, আল বাকারা, ০২: ২৬১) আল্লামা ইবনু কাসীর (রহ.) বলেন, যারা আল্লাহর রাস্তায় এবং শুধুমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করে, তাদের সেই দানের সাওয়াবকে দ্বিগুণ করে দিবেন তা বুঝাতে এই উদাহরণটি পেশ করা হয়েছে। (ইবনু কাসীর, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৯১) রাসূল (সা.) বলেন,

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ، إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ. فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُتَّقًا خَلْفًا. وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُتْسِكًا نَلْفًا

“প্রতিদিন সকালে দু’জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাঁদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের উত্তম প্রতিদান দিন আর অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করে দিন”। (বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৪২) সাইয়িদুনা আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণিত এক হাদীসে তিনি (সা.) বলেন,

مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ ظَهَرَ، فَلْيُعِدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهَرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ، فَلْيُعِدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ

“যার কাছে আরোহণের কোন অতিরিক্ত বাহন থাকে, সে যেন তা দিয়ে তাকে সাহায্য করে, যার কাছে কোন বাহন নেই। যার কাছে অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য থাকে সে যেন তা দিয়ে তাকে সাহায্য করে, যার খাদ্যদ্রব্য নেই”। (কুশায়রী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৩৮) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নাবভী (রহ.) বলেন, এই হাদীসের মাধ্যমে রাসূল (সা.) মানুষকে দান-সাদকা, বদান্যতা, উদারতা, সহমর্মিতা, অভাবগ্রস্থদের সহযোগিতা, সর্বোপরি সৃষ্টির প্রতি সদয় হওয়ার নির্দেশনা দিয়েছেন। (নাবভী, আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনু শারফ, সারহুন নাবভী ‘আলা মুসলিম, বৈরুত: দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল ‘আরাবী, ২য় সংস্করণ, ১৩৯২ হি, খ. ৬, পৃ. ১৬৬) সুতরাং দানশীলতা ও বদান্যতা এক অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধন করে মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। আত্মিক ও মানবিক উন্নয়নে এর গুরুত্বপূর্ণ অবদান অনস্বীকার্য।

উপসংহার: পরিশেষে উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, মানবজাতির সৃজন অভিপ্রায়ের স্বার্থকতার নিমিত্তে আত্মোন্নয়নের বিকল্প নেই। আত্মোন্নয়নের মাধ্যমেই মানুষ ফেরেশতার চেয়ে অধিক সম্মানের অধিকারী হতে পারে আল্লাহর নিকট। উক্ত মৌলিক বিষয়াবলি যথার্থ প্রয়োগে সাধারণ মুমিন একজন অসাধারণ আল্লাহর নৈকট্য ও সম্ভৃতিপ্রাপ্ত মুত্তাকী বান্দায় পরিগণিত হবে। প্রায়োগিক মাত্রার যথার্থ বিচারে সে আল্লাহর নিকট ইহকাল ও পরকালে বিভিন্ন পুরস্কারে পুরস্কৃত হবে এবং উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বন্ধু হিসেবে গণ্য হবে।

তথ্যসূত্র

১. আল কুরআনুল কারীম
২. বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল, সহীহ, কায়রো: দারুশ শা'ব, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.।
৩. মুসলিম, সহীহ, বৈরুত: দারুল জীল, তা.বি।
৪. তিরমিযী, আবু ঈসা, জামি'উত তিরমিযী, বৈরুত: দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল 'আরাবী।
৫. নাসায়ী, আহমাদ ইবনু শু'আইব, আল মুজতাবা মিনাস সুনান, আলেক্সো: মাকতাবুল মাতুবু'আতিল ইসলামিয়াহ, ২য় সংস্করণ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.।
৬. আল কুশায়রী, আব্দুল কারীম ইবনু হাওয়াজিন, আবু-রিসালাতুল-কুশাইরিয়্যাহ, কায়রো: আল মাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যাহ, তা. বি.।
৭. আল কারযাভী, ইউসুফ, আল 'ইবাদাহ ফিল ইসলাম, কায়রো: মাকতাবাতু ওয়াহবাহ, ১৪৩০ হি./২০০৯ খ্রি.।
৮. জাওজিয়্যাহ, ইবনু কায়িম শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ আবু বাকর, মাদারিজুস সালিকীন, কায়রো: আল মাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যাহ, তা.বি. তাহকীক: আল বারুদী।
৯. জুরজানী, 'আলী ইবনু মুহাম্মাদ শরীফ, আত তা'রীফাত, বৈরুত: মাকতাবাতু লুবনান, নতুন সংস্করণ-১৯৮৫ খ্রি.।
১০. বিনতু 'আব্দিল মুত্তালিব, আমাতুল্লাহ, রিফক্বান বিল ক্বাওয়ারীন- নাসায়িহুন লিল আজওয়ায, মাকতাবাতু মাসজিদুন নাবভী সাইট: www.mktaba.org।
১১. ইবনু মাজাহ, আবু আব্দুল্লাহ, সুনান, কায়রো: মাকতাবাতু আবী মু'আতা, তা. বি.।
১২. ইসফাহানী, আবুল কাসিম, আয-যারী'আহ ইলা মাকারিমিশ শারী'আহ, বৈরুত: প্র. বি. ১ম সংস্করণ- ১৪০০ হি./১৯৮০ খ্রি.।
১৩. আসকালানী, ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, ১৩৭৯ হি.।
১৪. সা'দী, আব্দুর রহমান, তাফসীরুস সা'দী, বৈরুত: মুআস্সাতুর্ রিসালাহ, ২০০০ খ্রি./১৪২০ হি.।
১৫. ইবনু 'আকীল, আল ওয়াযীহ ফী উসূলিল ফিকহ, রিয়াদ: মাকতাবাতুর্ রশদ, ১ম সংস্করণ-২০০৮ খ্রি.।
১৬. আল-ইসফাহানী, আল-মুফরাদাত ফী গরীবিল কুরআন, বৈরুত: দারুল 'ইলমিদ দারিশ শামিয়্যাহ, ১৪১২ হি.।
১৭. আল-হাযছামী, নূরুদ্দীন, আল-মাজমাউজ্-যাওয়াইদ ওয়া মানবাউল ফাওয়াইদ, বৈরুত: দারুল ফিকর, সংস্করণ- ১৪১২ হি.।
১৮. ইবনু কাসীর, আবুল ফিদা ইমাদুদ্দীন, তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম, বৈরুত: দারুল ত্বায়্যিবাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.।

১৯. ‘আফফানী, ড. সাইয়িদ হাসান, *সালাহুল উম্মাহ ফী ‘উলুভিল হিম্মাহ*, বৈরুত: মুআস্সাতুর্ রিসালাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.।
২০. শাওকানী, মুহাম্মাদ ইবনু ‘আলী, *ফাতহুল ক্বাদীর*, বৈরুত: দারুল মা‘রিফাহ, ৪র্থ সংস্করণ-১৪২৮ হি./২০০৭ খ্রি.।
২১. তাবারী, ইবনু জারীর, *জামি‘উল বয়ান ফী তাভীলিল কুরআন*, বৈরুত: মুআস্সাতুর্ রিসালাহ, ১৪২০ হি./২০০০ খ্রি.।
২২. জুরজানী, ‘আলী ইবনু মুহাম্মাদ, *আত-তা‘রীফাত*, বৈরুত: দারুল কুতুবিল ‘আরাবী, ১ম সংস্করণ, ১৪০৫ হি.।
২৩. আশ-শাবারখীতী, ইবরাহীম, *আল-ফুতুহাত আল-ওয়াহাবিয়া বিশারহি আল-আরবাসীন হাদীসিন-নাববিয়া*, মিসর: মাতবা‘আহ খায়রিয়াহ, ১ম মুদ্রণ ১৩৪০ হি.।
২৪. আর-রাযী, ফখরুদ্দীন, *মাফাতীহুল গায়ব*, বৈরুত: দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৪২১ হি./২০০০ খ্রি.।
২৫. গাজালী, আবু হামিদ, *ইহইয়াউ ‘উলুমুদ্দীন*, কায়রো: আল মাকতাবাতুত তাওফীকিয়াহ, ২০০৮ খ্রি.।
২৬. ইবনু হিব্বান, মুহাম্মাদ, *সহীহ*, মুআস্সাতুর্ রিসালাহ, তা.বি.।
২৭. উসায়মিন, মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ, *শারহু রিয়াদিস-সালিহীন*, তা.বি.।
২৮. গাজালী, আবু হামিদ, *আল আরবাসীন ফী উসুলুদ-দীন*, দামিস্ক: দারুল কলম, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.।
২৯. নাবলুসী, আব্দুল গণী, *শারহু-আত-তারীকাতুল মুহাম্মদিয়া*, (পাভুলিপি)।
৩০. আস-সূযুতী, জালাল উদ্দীন, *মু‘জামু মাক্বালীদিল উলুম ফীল হুদুদি ওয়ার রুসুম*, কায়রো: মাকতাবাতুল আদাব, ১ম সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.।
৩১. ইবনু ‘আব্দু রাব্বিহি, *আল ‘ইক্বদুল ফারীদ*, প্র.বি.।
৩২. ইবনু ‘আব্দিল বিরর, ইউসূফ ইবনু আব্দুল্লাহ, *আদবুল মুজালাসাহ ওয়া হামদুল লিসান*, তানতা: দারুস সাহাবাহ লিত তুরাস, ১ম সংস্করণ, ১৪০৯ হি./১৯৮৯ খ্রি. তাহকীক: সামীর হালবী।
৩৩. ইবনু ‘আল্লান, মুহাম্মাদ ‘আলী ইবনু মুহাম্মাদ, *দালীলুল ফালিহীন লিতুরুক্কি রিয়াদিস সালিহীন*, প্র.বি.।
৩৪. উসমানী, তাক্বী, *তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন*, ঢাকা: মাকতাবাতুল আশরাফ, ১ম সংস্করণ, ২০১০ ইং.।
৩৫. ইবনু ‘উজায়বাহ, আব্দুল্লাহ আহমদ, *মি‘রাজুত তাশাওউফ ইলা হাকায়িকিত তাশাওউফ*, কাসাব্লাঙ্কা: মারকাজুত তুরাসিস সাব্বাফী আল মাগরাবী, তা.বি.।
৩৬. জুবাইদী, আবুল ফাইয মুরতাদ্বা, *তা-জুল ‘উরুস মিন জাওয়াহিরিল ক্বামূস*, কুয়েত: দারুল হিদায়াহ, ১৯৬৫ খ্রি.।
৩৭. নাবভী, আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনু শারফ, *সারহুন নবভী ‘আলা মুসলিম*, বৈরুত: দারুল ইহইয়ায়িত তুরাসিল ‘আরাবী, ২য় সংস্করণ, ১৩৯২ হি.।
৩৮. Michael P. Todaro, *Economics For a Developing word*.

আল-কুরআনের নামসমূহ ও নামকরণের কারণ: তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ড. মুহাম্মদ মানজুর রহমান*

প্রতিপাদ্যসার: মানবজাতির মুক্তির সনদ পবিত্র আল-কুরআন অবতীর্ণের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সমাজ ও রাষ্ট্রে জীবন পরিচালনার জন্য চমৎকার ব্যবস্থা করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)কে পৃথিবীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করে তাঁর উপর আল-কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। এটি পৃথিবীর একমাত্র ধর্মগ্রন্থ, যা পরিবর্তন হয়নি এবং হবেও না। আল্লাহ তা'আলা নিজেই স্বয়ং তা সংরক্ষণ করবেন। এ পবিত্র আল-কুরআনের হেকমত ও মর্যাদাপূর্ণ অনেকগুলো নাম রয়েছে এবং প্রতিটি নাম আল-কুরআনের আয়াত দ্বারা নির্ধারিত। পৃথিবীতে আল-কুরআনের চেয়ে অধিক নাম বিশিষ্ট কোনো গ্রন্থ নেই। নামকরণের দিক থেকে এটি সবচেয়ে অর্থবহ গুরুত্বপূর্ণ ও স্বতন্ত্র মর্যাদাসম্পন্ন গ্রন্থ।

ভূমিকা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন গ্রন্থ। যা আল্লাহর তা'আলার পক্ষ থেকে এসেছে। [এরশাদ হচ্ছে, **تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** “এটা দয়াময়, পরম দয়ালুর নিকট হতে অবতীর্ণ (সূরা ফুসিসলাত: ০৩)।]” এ মহাগ্রন্থের অনেক নাম রয়েছে। এদের প্রত্যেকটিই অনন্য মর্যাদার পরিচয় বহন করে। এ ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনো গ্রন্থ অধিক নামে পরিচিতি পাওয়া যায় না। যা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের অনুপম বৈশিষ্ট্য ও স্বতন্ত্র মর্যাদার পরিচয় প্রদান করে। এটি মানব জাতির হিদায়াতের জন্য অবতীর্ণ সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ। এরপর আল্লাহর পক্ষ থেকে আর কোনো কিতাব নাযিল হবে না। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ২৩ বছরের নাবুওয়াতী জীবনে যখন যে নির্দেশ ও উপদেশের প্রয়োজন হয়েছিলো, তখন সেই অনুযায়ী এর আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছিলো। এটি পৃথিবীর সমগ্র মানুষের পথ প্রদর্শক। [হিট্রি বলেন- “The Quran is the most widely read book ever written (History of the Arabs, P.126)।” আল-কুরআন ১৪৪০ বছর পূর্বে নাযিল হলেও সর্বকালের মানুষের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ একমাত্র হিদায়াতের পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। এর ভাষা, শব্দ-চয়ন, উচ্চারণ-পদ্ধতি, এমনকি লিখন-পদ্ধতিও আল্লাহর নির্দেশ মূতাবিক বিভিন্ন সময়ের প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়। এ প্রবন্ধে আল-কুরআনের পরিচিতি, ৬০টি নাম ও নামকরণের কারণ সংশ্লিষ্ট বিষয়টি উপস্থাপন করা হলো।

কুরআন শব্দের শাব্দিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ

الْقُرْآن (আল-কুরআন) শব্দটি **قَرَأَ** থেকে উৎপন্ন। যার অর্থ- ১৫ বা পাঠ করা। এ অর্থে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে- **إِنَّا نَقُودُكَ** (ওহীর কথাগুলো) সংরক্ষণ ও পাঠ আমারই দায়িত্ব। অতপর আমি যখন তা পাঠ করি, তখন আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন। এরপর এ ওহীর বিশদ ব্যাখ্যা আপনার অন্তরে উদ্ধৃত করার দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমারই ওপর (সূরা আল-কিয়ামাহ: ১৬-১৯)।” এ আয়াতে **الْقُرْآن**

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

শব্দটি ‘পাঠ করা’ অর্থে ব্যবহার হয়েছে (আল-মুফরাদাতু ফী গারীবিল কুরআন, পৃ. ৪০২)। কুরআনের পারিভাষিক পরিচিতি প্রদানে স্বয়ং আল্লাহ রাক্বুল ‘আলামীন বলেন-

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ

“নিশ্চয়ই এটা (আল-কুরআন) জগতসমূহের প্রতিপালক হতে অবতারিত। জিবরাঈল (আ.) এটা নিয়ে অবতরণ করেছেন। তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পারো। অবতীর্ণ করা হয়েছে সুস্পষ্ট ‘আরবী ভাষায়। পূর্ববর্তীদের কিতাবসমূহে অবশ্যই এর উল্লেখ আছে (সূরা আশ্ শূ‘রা: ১৯২-১৯৫)।” আল-কুরআনের এ আয়াতে পারিভাষিক পরিচিতি থেকে স্পষ্ট যে, কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল (সা.)-এর ওপর জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে ‘আরবী ভাষায় অবতীর্ণ।

যার বর্ণনা অন্যান্য পূর্ববর্তীদের ওপর নাযিলকৃত তাওরাত, যাবুর ও ইঞ্জিল কিতাবসমূহে উল্লেখ আছে। অপর আয়াতে কুরআনের পরিচয় সম্পর্কে বলা হয়েছে- تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ “নিশ্চয় এটি সম্মানিত কুরআন, যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে, পুত-পবিত্রতা ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করবে না, এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ (সূরা আল-ওয়াকি‘আহ, ৫৬: ৭৭-৮০)।”

আল-কুরআনের নাম ও নামকরণের কারণ

বিশ্বমানবতার মুক্তি সনদ আল-কুরআন অবতীর্ণের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা মানব সমাজে ও রাষ্ট্রে সুন্দর জীবন যাপনের চমৎকার ব্যবস্থা করেছেন। এ পৃথিবীতে রাসূলুল্লাহ (সা.)কে কুরআন দিয়ে প্রেরণ করে আল্লাহ তা‘আলা বলেন- وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ “হে মুহাম্মদ (সা.) আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছি (সূরা আশ্বিয়া: ১০৭)।” পৃথিবীতে এটিই একমাত্র মূলগ্রন্থ, যা আজও অবিকৃত। আল-কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা নিজেই সংরক্ষণের ঘোষণা করেছেন- لَّا يَأْتِيَنَّكَ السَّمُوءُ وَتَرْكُزُ لَّا تَنزِيلًا لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا وَتَأْتِيَنَّهُمُ السَّمُوءُ وَتَكُونُ لَهَا سَافَاوَاتٌ غَضُوبَةٌ وَتُخْرِجُهُم مِّنْهَا فِي سَبَابٍ مُّجْتَمِعٍ “অবশ্যই আমি কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই এর রক্ষক (সূরা আল-হিজর, ১৫: ০৯)।” পৃথিবীতে আল-কুরআনের চেয়ে অধিক নাম বিশিষ্ট কোনো গ্রন্থ নেই। এটিই হচ্ছে সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন গ্রন্থ। মুসলমানদের নিকট এর মর্যাদা ও গুরুত্ব অনেক বেশি। তাই এর পরিচিতি ও নামকরণ নিয়ে তাদের কাছে বেশি আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়, যা পৃথিবীর অন্য কোনো গ্রন্থ সম্পর্কে দেখা যায় না।

আল-কুরআনের অনেকরূপ নাম রয়েছে। ‘আলী ইবনু আহমদ হারালী (ম্. ৬৪৭ হি.) এ বিষয়ে একটি পুস্তিকাও রচনা করেন। তিনি (وأغنى أساميهِ إلى نيف وتسعين) সেখানে কুরআনের ৯০টিরও অধিক নাম উল্লেখ করেন (আল-বুরহান ফী ‘উলুমিল কুরআন, প্রাগুক্ত, খ. ১ম, পৃ. ২৭৩)। কেউ কেউ আল্লাহ তা‘আলার ৯৯টি আসমাউল হুসনার মতো কুরআনেরও ৯৯টি নাম উল্লেখ করেছেন (রাহমাতুল লিল ‘আলামীন, খ. ৩য়, পৃ. ২৪১)। আল-জাহেস ও আল-কাযী আবুল মা‘আনী ‘উযায়যী ইব্ন ‘আবদিল মালেক (রহ. ম্. ৪৯৪ হি.) বলেন- سَمِيَ الْقُرْآنُ “জেনে রাখো নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা ৫৫টি নামে কুরআনকে নামকরণ করেছেন (আল-বুরহান, খ. ১ম, পৃ. ২৭৩)।” এগুলো হলো-

০১. আল-কুরআন (الْقُرْآن): আল্লাহর কালামের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ নাম আল-কুরআন (الْقُرْآن)। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ

“বরং এটা অতি উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন কুরআন (সূরা আল-বুরূজ, ৮৫: ২১-২২)।” অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে-
 “নিশ্চয় এটি সম্মানিত কুরআন (সূরা আল-ওয়াক্বিয়াহ, ৫: ৭৭)।”
 অনুরূপভাবে অপর আয়াতে বলা হয়েছে-
 “আলিফ লাম-রা, এগুলো আয়াত মহা গ্রন্থেও, সুস্পষ্ট কুরআনের (সূরা আল-হিজর, ১৫: ০১)।”
 অপর এক আয়াতে এসেছে-
 “আর আপনি (নবী সা.) যে কোনো স্থান থেকে কুরআন তিলাওয়াত করুন (সূরা ইউনুস, ১০: ৬১)।” সূরা কাফ-এর প্রারম্ভে বলা হয়েছে-
 “কায়, শপথ আল-কুরআন মাজিদ- (সূরা কাফ: ০১)।” আল্লাহ তা'আলা বলেন-

لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتُجَاجِلَ بِهِ، إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ

“(ওহীর কথাগুলো) আপনি তাড়াতাড়ি আয়ত্ব করার জন্য ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে নিজের জিহ্বাবকে সঞ্চালন করবেন না। এর সংরক্ষণ ও পাঠ আমারই দায়িত্ব। অতপর আমি যখন তা পাঠ করি, তখন আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন। এরপর এ ওহীর বিশদ ব্যাখ্যা আপনার অন্তরে উদ্ভূত করার দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমারই ওপর (সূরা আল-কিয়ামাহ: ১৬-১৯)।” এ আয়াতে ওহী অবতীর্ণ হওয়ার প্রাথমিক অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।
 অনুরূপবে হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে-
 “তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম, যে কুরআন শিক্ষা করে ও শিক্ষা দেয় (সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং- ১২৪০)।” সুতরাং আল্লাহর কালামের নাম আল-কুরআন ও হাদীসে الْقُرْآن (আল-কুরআন) নামেই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ বলে মনে হয়। এটি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুওয়াত ও রিসালাতের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ দলীল। এর শব্দ চয়ন, বাক্যবিন্যাস, রচনামূল্য, সূর-মূর্চনা, ভাব-গাভীর্যতা, অন্তর্নিহিত জ্ঞান-বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি, ইসলামের পূর্ণঙ্গ জীবন বিধানের রূপরেখা চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে।

০২. আল-কিতাব (الْكِتَاب): এটি কুরআনের একটি প্রসিদ্ধ নাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন-
 نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ “তিনি আপনার ওপর কিতাব নাযিল করেছেন (আলে ‘ইমরান, ০৩: ০৭)।” অপর আয়াতে বলা হয়েছে-
 “কিতাবে কোনো কিছুই বাদ দিই নাই (সূরা আন‘আমে: ৩৮)।” সূরা বাকারায় বলা হয়েছে-
 “এটা ঐ গ্রন্থ যার মধ্যে কোনোরূপ সন্দেহ নেই (সূরা আল বাক্বারাহ, ০২: ০২)।”

অপর আয়াতে বলা হয়েছে-
 “আমি তো তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি (সূরা আন নহল: ৬৪)।” অপর আয়াতে এসেছে-
 “আমিতো তোমাদের প্রতি নাযিল করেছি কিতাব, যাতে আছে তোমাদের জন্য উপদেশ, তবুও কি তোমরা বুঝবেনা? (সূরা আশ্বিয়া: ১০)।”

অনুরূপভাবে অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে- *هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ* “তিনিই তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সুস্পষ্ট অকাট্য আয়াতসমূহ রয়েছে (সূরা আলে ‘ইমরান, ০৩: ০৭)।”
অপর এক আয়াতে এসেছে- *الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ* “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই যিনি তাঁর বান্দা (মুহাম্মদ সা.)-এর প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন (সূরা আল ক্বাহাফ, ১৮: ০১)।” অনুরূপভাবে অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে-

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ

“যাদেরকে আমি কিতাব প্রদান করেছি, তারা রাসূল (সা.)-কে এরূপভাবে চিনে, যেমন চিনে, তারা আপন পুত্রদের (সূরা আল বাকুরাহ, ০২: ১৪৬)।”

অপর আয়াতে এসেছে- *مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ* “আমি সর্বসাধারণের জন্য এ কিতাবের মধ্যে বর্ণনা করেছি (সূরা আল বাকুরাহ, ০২: ১৫৯)।” অপর আয়াতে বলেন-

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ

“আর আমি এ কিতাব নাযিল করেছি যা হকের সাথে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেরও সত্যতা প্রমাণকারী এবং ঐ সব কিতাবের সংরক্ষকও (সূরা আল-মায়দাহ: ৪৮)।”

আল্লাহ তা‘আলা আল-কুরআনকে ‘আল-কিতাব’ নামে উল্লেখ করে তাতে ইসলামের মৌলিক নীতিমালা জারী করেন-

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

“আমি তো আপনার প্রতি কিতাব (আল-কুরআন) অবতীর্ণ করেছি, যারা এ বিষয়ে মতোবিরোধ করে তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য এবং মু‘মিনদের জন্য পথ নির্দেশ ও দয়াস্বরূপ (সূরা আন-নহল: ৬৪)।” এ আয়াতেও কুরআনকে ‘কিতাব’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং উপরোক্ত আয়াতসমূহের আলোকে আমরা বলতে পারি *الْكِتَابُ* (আল-কিতাব) এটি কুরআনের একটি প্রসিদ্ধ নাম, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

الْجَمْع (জমা করা)। এর মূল অর্থ *كُتِبَ* (এর মাসদার (ক্রিয়ামূল)। *يَكْتُبُ* প্রভৃতি *كُتِبَ* ও *كُتِبَ* *كِتَابٌ* হয়- *تَكْتُبُ بَنُو فُلَانٍ* (অর্থাৎ অমুকের সন্তান-সন্ততিরা একত্রিত হলো।) এ উৎপত্তিগত অর্থের নিরিখে সৈন্যদলকে বলা হয় *الْكُتَيْبَةُ* এবং শব্দ ও বর্ণসমূহ একত্রিকরণকে *الْكُتَابَةُ* বলা হয় (মাবাহিসু ফী ‘উলুমিল কুরআন, পৃ. ১৮)। আল্লাহ তা‘আলা বলেন- *إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْمُبَارَكَةِ* - *حَمْدُ* *وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ*, *إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْمُبَارَكَةِ* - *حَمْدُ* *وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ* “হা-মীম, শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের। আমি এটা অবতীর্ণ করেছি বরকতময় রাতে (সূরা আদ দুখান, ৪৪ : ০১-০৩)।”

‘কিতাব’ যদিও মাসদার; কিন্তু একে অনেক সময় *اسم مفعول* (জমাকৃত) অর্থে ব্যবহার করা হয়। এ জন্য যে কোনো গ্রন্থকেও ‘কিতাব’ বলা হয়। এতে একই বিষয় বা অনেক বিষয়ে বক্তব্যসমূহ জমা করা হয়। কুরআনেও বিভিন্ন ধরনের উপদেশ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস ও বিধি-বিধান জমা করা হয়েছে বলে একেও ‘আল-কিতাব’ নামেও অভিহিত করা হয় (আল-বুরহান, খ. ১য়, পৃ. ২৭৩)।

রাগিব ইস্পাহানী (রহ.) বলেন- کتب এর মূল অর্থ হলো- بالخياطة -“সেলাই করে একটি চামড়াকে অন্য চামড়ার সাথে সংযুক্ত করা।” যেমন বলা হয়، كَتَبْتُ السَّقاء “আমি চামড়ার পানপাত্রের চামড়াগুলোকে সেলাই করে একটির সাথে অন্যটি সংযুক্ত করলাম।” তবে (ضم الحروف بعضها إلى بعض بالخط) এটি লেখার মধ্যে একটি অক্ষরের পাশে অন্য অক্ষর মিলানো অর্থে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয় (আল-মুফরাদাত, পৃ. ৪২৩)। কারো মতে كتاب আরামীয় শব্দ। আরামীয় ভাষায় এর অর্থ বর্ণ লিপিবদ্ধ করা। জাহিলী যুগে আরবরা আরামীয়দের নিকট থেকে এটি গ্রহণ করে (মাবাহিস, পৃ. ১৭)।

আল-কুরআনকে এ নামে অভিহিত করায় একে লিপিবদ্ধকরণের মাধ্যমে সংরক্ষণের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন কুরআন নামের মধ্যে এটি মুখস্থকরণের মাধ্যমে সংরক্ষণের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা কুরআন মূলত কিরা’আতেরই সমার্থবোধক, যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ কিরা’আতের মধ্যে মুখস্থ পড়ার অর্থ নিহিত রয়েছে (মাবাহিস, পৃ. ১৭)।

কুরআন নাম ‘কুরআন’ ও ‘কিতাব’ রাখা প্রসঙ্গে উভয়ের নামকরণের সমন্বয় করে ড. মুহাম্মদ ‘আবদুল্লাহ দাররাজ বলেন (তাহরীমু কিতাবাতিল কুরআন, খ. ১ম, পৃ. ৬১):

روعي في تسميته قرآنا كونه متلوا باللسن، كما روعي في تسميته كتابا مدونا بالأقلام، فكلنا التسميتين من تسمية الشيء بالمعنى الواقع عليه

“কুরআনকে ‘কুরআন’ নামে অভিহিত করার ক্ষেত্রে মানুষের যবান দ্বারা পঠিত হবার দিকটি বিবেচনায় রাখা হয়েছে। অনুরূপভাবে তাকে ‘কিতাব’ নামে আভিহিত করার ক্ষেত্রেও তাকে কলম দ্বারা গ্রন্থাবদ্ধ করার বিষয়টি বিবেচনায় আনা হয়েছে। এ দুটি নাম এমন বস্তুও নামের পর্যায়ভুক্ত, যার অন্তর্নিহিত অর্থকে বিবেচনা করে তার নাম রাখা হয়েছে (‘উলুমুল কুরআন, পৃ. ১৫)।”

ড. মুহাম্মদ ‘আবদুল্লাহ দাররাজ এ প্রসঙ্গে আরও বলেন- “কুরআনকে এ দুটি নামে আখ্যায়িত করে আরও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কুরআনের দাবী হচ্ছে তাকে দুটি সংরক্ষিত স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে। শুধু একটি স্থানে নয়। অর্থাৎ তাকে অন্তরে লিপিকায় এ উভয় পদ্ধতিতেই সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে (‘উলুমুল কুরআন, পৃ. ১৫)।” আল্লাহ তা’আলা বলেন- “যাতে কোনো একটি (ভুলে গেলে) হারিয়ে গেলে অপরটি তাতে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে (সূরা বাকারা: ২৮২)।” উভয় পদ্ধতিতেই কুরআন উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার নিকট সুরক্ষিত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত রক্ষা করা আল্লাহ তা’আলার সিদ্ধান্ত। তিনি বলেন-

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

“আমি (যিক্র) কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই তার সংরক্ষক (সূরা হিজর: ০৯)।”

০৩. আল-কালাম, কালামুল্লাহ (الكلام، كلام الله): আল্লাহ তা’আলা বলেন- حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ “যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায় (আত্ তাওবাহ, ৯ ; ৬)।” আবু জা’ফর আত-তাবারী (রহ.) বলেন- এ আয়াতে কালাম (আল্লাহর কালাম) বলতে القرآن (আল-কুরআনকেই) বুঝানো হয়েছে (জামে’উল বায়ান, খ. ১৪তম, পৃ. ১২৯)। কালাম (কালাম) শব্দটি কالم (কাল্ম) থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ আঘাত করা, রেখাপাত করা। রাগিব

ইস্পাহানী (রহ.) বলেন-الكلم التأثير المدرك بإحدى الحاستين “বচন মানুষের অন্তরে গভীর প্রভাব বিস্তার করে” বলে একেই সচরাচর ‘আরবীতে الكلام (আল-কালাম) বলা হয়। রাগিব ইস্পাহানী (রহ.) আরও বলেন- الكلام يقع على الالفاظ المنظومة وعلى المعاني التي تحتها مجموعة এর অন্তর্নিহিত সম্মিলিত মর্মার্থকেও ‘কালাম’ বলা হয় (আল-মুফরাদাত, পৃ. ৪৩৯)। আল-কুরআনের পাঠক ও শ্রোতাদের অন্তর রাজ্যে অবর্ণনীয় রেখাপাত করে থাকে বলে একে ‘কালাম’ নামে অভিহিত করা হয়। এটি আল্লাহর বাণী বলে একে ‘কালামুল্লাহ’ও বলা হয়।

০৪. আন-নূর (النور): আল্লাহ তা‘আলা বলেন-وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا “আর আমি তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট নূর নাযিল করেছি (সূরা আন নিসা, ৪: ১৭৪)।” আন-নূর (النور) শব্দের অর্থ: জ্যোতি বা আলো। আর সুস্পষ্ট নূর হলো আল-কুরআন। যেমন ‘নূর’ এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবী হাতেম আর-রাযী বলেন-وَهُوَ هَذَا الْقُرْآنُ “সেটি হলো এ কুরআন (তাফসীর আল-কুরআনিল ‘আযীম, খ. ৪র্থ, পৃ. ৪৫৭)।” অর্থাৎ এখানে নূর দ্বারা আল-কুরআনকেই বুঝানো হয়েছে। আর নূর শব্দের অর্থ আলো। এ মহাগ্রন্থের সাহায্যে সঠিক নির্দেশনা ও সত্যের আলো বা দিশা লাভ করা যায় বলে একে النور (আন-নূর) নামে অভিহিত করা হয়।

০৫. আল-হুদা (الهدى): আল্লাহ তা‘আলা কুরআনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় বলেন-هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ “সৎকর্মপরায়ণদের জন্য হিদায়াত ও রহমাত (সূরা লুকমান, ৩১: ০৩)।” হুদী (হুদা) অর্থ- হিদায়েত বা দিকনির্দেশনা। হুদী وَرَحْمَةً এর ব্যাখ্যায় ড. আবদুল্লাহ ইব্ন ‘আবদিল মুহসিন বলেন-هدى ورحمة للذين أحسنوا العمل بما أنزل الله في القرآن، وما أمرهم به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم কুরআনের মধ্যে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, সে অনুযায়ী উত্তমভাবে ‘আমল করে এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশনাবলী পালন করে থাকে (আত-তাফসীরুল মাইসার, খ. ৭ম, পৃ. ৩৪৭)।” আর কুরআনে সত্য ও ন্যায়ের প্রতি সঠিক ও সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে বলে একে الهدى (আল-হুদা) বলা হয়ে থাকে।

০৬. রহমাত (رَحْمَةً): আল্লাহ তা‘আলা কুরআনের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন-وَإِنَّهُ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ “ঈমানদারদের জন্য হিদায়াত ও রহমাত (সূরা আন নহল, ১০: ৭৭)।” আল্লাহ তা‘আলা অপর আয়াতে বলেন-هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ “সৎকর্মপরায়ণদের জন্য হিদায়াত ও রহমাত (সূরা লুকমান, ৩১: ০৩)।” রহমাত অর্থ দয়া, অনুগ্রহ। যারা কুরআন পড়ে, অনুধাবন করে এবং তারা দয়ালু আল্লাহর রহমাত লাভের উপযোগী হয়। এ প্রসঙ্গে তাফসীরে তাবারীতে এসেছে-ورحمة لمن صدق به وعمل بما فيه “রহমাত তাঁদের ওপর যারা কুরআন অনুযায়ী কথা প্রকাশ করে ও আমল করে (জামে‘উল বায়ন, খ. ১৯তম, পৃ. ৪৯৪)।” এ জন্য কুরআনকে ‘রহমাত’ও বলা হয়।

০৭. আল-ফুরকান (الْفُرْقَان): এটি কুরআনের একটি প্রসিদ্ধ নাম। আল্লাহ তা‘আলা বলেন-تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا “তিনি পরম করুণাময়, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ‘ফুরকান’ নাযিল করেছেন (আল-ফুরকান, ২৫: ১)।” ‘ফুরকান’ আধিক্যসূচক গুণবাচক বিশেষ্য (আল-মুফরাদাত, পৃ. ৩৭৮)। কারো মতে এটি মাসদার; কিন্তু এর দ্বারা সিফাত (বিশেষণ) উদ্দেশ্য। আরবী ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী অর্থের আধিক্য

বোঝানোর জন্য বিশেষণ রূপের স্থলে মাসদারের রূপ ব্যবহার করা হয়েছে (আত-তাফসীর, খ. ২য়, পৃ. ০৫)। এটি আরামীয় শব্দ *فَرَقَ* থেকে গৃহীত (মাবাহিস, পৃ. ২০)। এর অর্থ পার্থক্য করা। নামকরণ প্রসঙ্গে ‘মাজাযুল কুরআন’ কিতাবে বলা হয়েছে- *وَبَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ* আল-কুরআন হক ও বাতিল, মু’মিন ও মুনাফিক এবং মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে পার্থক্য করে দেয় বলে একে ‘ফুরকান’ বলা হয় (আল-বুরহান, খ. ১ম, পৃ. ২৮০)।” কারো মতে এটি আকীদা-বিশ্বাসে হক ও বাতিল, হালাল হারাম, সত্য ও মিথ্যা ও কর্মে ভাল ও মন্দের সুস্পষ্ট পার্থক্য করে বলে একে *الْفُرْقَانُ* (আল-ফুরকান) বলা হয় (আল-মুফরাদাত, পৃ. ৩৭৮)।

০৮. **শিফা** (*شِفَاءٌ*): আল্লাহ তা‘আলা বলেন- *وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ* “আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি, যা (প্রতিটি ব্যাধির) মহা নিরাময়ক (সূরা আল-ইসরা’, ১৭: ০১)।” অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে- *يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ* “হে মানব জাতী! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের তরফ হতে সমাগত হয়েছে এক নসিহত এবং অন্তরসমূহের সকল রোগের আরোগ্যবাহী, আর মুমিনদের জন্য পথ প্রদর্শক ও রহমত (সূরার উউনুস, ১০: ৫৭)।” অপর আয়াতে বলা হয়েছে- *فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ* “যাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগমুক্তি (সূরা আন নহল, ১৬: ৬৯)।” ‘শিফা’ অর্থ আরোগ্য। এটি ইসমে মাসদার (ক্রিয়া বিশেষণ); কিন্তু এখানে এর দ্বারা শিফাত (বিশেষণ) উদ্দেশ্য। অর্থে আধিক্য বোঝানোর জন্য বিশেষণরূপের স্থলে মাসদাররূপে ব্যবহার করা হয়েছে। অতএব, এখানে শিফার অর্থ হবে মহারোগ নিরাময়ক। এ পবিত্র গ্রন্থের সাহায্যে মানুষ কুফর, শিরক ও মূর্থতা প্রভৃতি আত্মিক ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ করে থাকে। এর সাহায্যে শারীরিক ব্যাধিসমূহ থেকেও আরোগ্য লাভ করা যায়। এ জন্য একে *شِفَاءٌ* (শিফা) নামেও অভিহিত করা হয় (মা‘আরিফুল কুরআন, পৃ. ৭৮৯)।

০৯. **আল-মাও‘ইযাহ** (*الْمَوْعِظَةُ*): আল্লাহ তা‘আলা বলেন- *قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ* “তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে (সূরা ইউনুস, ১০: ৫৭)।” হযরত লোকমান (আ.) তাঁর পুত্রকে *الْمَوْعِظَةُ* বা উপদেশ দিয়ে বলেন- *لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ لَّظُلْمٍ* “যখন লোকমান (আ.) উপদেশাচ্ছলে তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন, হে বৎস! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না। নিশ্চয়ই শিরক মহা অন্যায় (সূরা লুকমান ৩১: ১৩)।”

الموعظة الحسنة (আল-মুওয়াযাযা) এর প্রকৃত অর্থ প্রসঙ্গে ইউসূফ ইব্ন হায়য়ান (রহ.) বলেন- *والتلطف* “ভীতিজনক অনুশাসন, এমন বিষয় বর্ণনা করা, যা শুনে মানুষের অন্তর কোমল হয় (তাফসীর আল-বাহরিল মুহীত, খ. ৭ম, পৃ. ৩০৭)।” এ পবিত্র গ্রন্থ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ‘মাওয়াযাযাহ হাসানাহ’-এর প্রচারক। এর প্রতিটি জায়গায় ওয়াদা-প্রতিশ্রুতির সাথে ভীতি প্রদর্শন, সাওয়াবের সাথে আযাব, পার্থিব জীবনের কল্যাণ ও ব্যর্থতা বা পথভ্রষ্টতা প্রভৃতি এমন সংমিশ্রিত আলোচনা করা হয়েছে, যা শোনার পর মন আসক্ত হয়ে মন পরিবর্তন হতে পারে (প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১০)। এ জন্য একে *الْمَوْعِظَةُ* (মাও‘ইযাহ) বলা হয়।

১০. **আয-যিকর** (*الذِّكْرُ*): আল্লাহ তা‘আলা বলেন- *إِنَّا نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ* “আমি (যিকর) কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই তার সংরক্ষক (সূরা হিজর: ০৯)।” এখানে কুরআনকে আল্লাহ তা‘আলা যিকর

বলেছেন। অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ “এবং এটা বারকাতময় উপদেশ, যা আমি নাযিল করেছি (সূরা আল-আম্বিয়া, ২১: ৫০)।” এখানে ذِكْرٌ দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে (দুররুল মুনসুর, খ. ৭ম, পৃ. ৬৭)। আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রসঙ্গে তাফসীরে তাবারীতে এসেছে- وهذا القرآن الذي أنزلناه إلى “এ কুরআন যা মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর আমি (আল্লাহ) অবতীর্ণ করেছি উপদেশ স্বরূপ, যারা উপদেশ চায় (জামে'উল বায়ন, খ. ১৮তম, পৃ. ৪৫৪)।”

এ প্রসঙ্গে ‘তাফসীরে খাযেন’ কিতাবে বলা হয়েছে- هو ذكر لمن آمن به “যিকির বা উপদেশ তাদের জন্য যারা ঈমান এনেছে (লুবাবুত তাবীল, খ. ৪র্থ, পৃ. ৪০০)।” আর ‘যিকর’ অর্থ উপদেশ। এ মহাগ্রন্থে বিভিন্ন উপদেশ ও বিগত জাতিসমূহের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় ঘটনাবলীর উল্লেখ রয়েছে বলে একে ذِكْرٌ (যিকর) বলা হয়। এ ছাড়া আরবীতে ‘যিকর’কে মর্যাদা ও সম্মান অর্থেও ব্যবহার করা হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- لَقَدْ أَنْزَلْنَا “আমি তোমাদের প্রতি একটি কিতাব নাযিল করেছি। এতে তোমাদের জন্য মর্যাদা রয়েছে (সূরা আল-আম্বিয়া, ২১: ১০)।” এ কুরআন মুসলিম জাতির মর্যাদা ও সম্মান লাভের উপলক্ষ বলে একে যিকর বলা হয় (আল-বুরহান, খ. ১ম, পৃ. ২৭৯)। অপর বর্ণনায় এর নামকরণ সম্পর্কে ইমাম বায়হাকী (রহ.) বলেন- “যে কুরআন শিক্ষা করলো অতঃপর তা ভুলে গেলো এবং কুরআন থেকে বিমুখ হলে তার জন্য কঠোর ধমকি রয়েছে। আর কুরআনকে উপদেশ হিসেবে বর্ণনা করায় তাকে ذِكْرٌ (যিকির) নামকরণ করা হয়েছে (বায়হাকী: শু'আবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ- تلاوة القرآن, খ. فصل في إيمان تلاوة القرآن, ৪র্থ, পৃ. ৪৭১)।” আল্লাহ তা'আলা বলেন- مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَجْمَلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَرًا “পূর্বে যা ঘটেছে তার সংবাদ আমি এভাবে তোমাদের নিকট বর্ণনা করি এবং আমি আমার নিকট হতে তোমাকে উপদেশ দান করি। এটা হতে যে বিমুখ হবে সে কিয়ামতের দিন মহাভার গ্রহণ করবে (সূরা ত্বা-হা, ২০: ৯৯-১০০)।” অপর আয়াতে বলা হয়েছে- وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا “যে আমার স্মরণে বিমুখ তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করবো অন্ধ অবস্থায় (সূরা ত্বা-হা, ২০: ১২৪-১২৬)।” হাদীসে এসেছে- القرآن أفضل الذكر “কুরআন তিলাওয়াত সর্বোত্তম যিকির (সহীহ ইবন খুযাইমাহ, অনুচ্ছেদ- باب الرخصة في قراءة القرآن, খ. ১ম, হা নং- ২১০, পৃ. ৩৮৪)।” সুতরাং কুরআনের অপর নাম ذِكْرٌ (যিকির) তা উপরোক্ত কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

১১. আল-কারীম (الكَرِيم): আল্লাহ তা'আলা বলেন- إِنَّهُ لَفَرَزٌ كَرِيمٌ “নিশ্চয় এটি সম্মানিত কুরআন (সূরা আল-ওয়াকী'আহ, ৫৬: ৭৭)।” এর ব্যাখ্যায় জালাল উদ্দীন আস-সুয়ূতী (রহ.) اسم جامع لما يحمد، وذلك “আল-কারীম: ইসমে জামে' হয়, যখন প্রসংশা করা হয়, আর নিশ্চয়ই (কুরআন) এর মধ্যে সুস্পষ্ট বর্ণনা, হিদায়াত, হিকমাত রয়েছে এবং এটা পরক্রমশালী আল্লাহর নিকট মহামর্যাদাবান (দুররুল মুনসুর, খ. ৫ম, পৃ. ৪৮০)।” আর ‘কারীম’ অর্থ মহাসম্মানিত, মহামর্যাদাবান। আল-কুরআন মহামর্যাদাবান ও অতি সম্মানিত বলে একে الْكَرِيم (আল-কারীম) বলা হয়।

১২. আল-‘আলিয়্যু (الْعَلِيُّ): আল্লাহ তা‘আলা বলেন- **وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ** “এটা রয়েছে আমার নিকট উন্মুল কিতাবে, এটা মহান, জ্ঞানগর্ভ (সূরা আয-যুখরুফ, ৪৩: ০৪)।” **عَلِيٍّ** (‘আলিয়্যু) একটি গুণবাচক বিশেষ্য। এর অর্থ- **عُلُوٌّ وَرَفْعَةٌ** বা ‘সুউচ্চ ও মহামর্যাদাবান (জামে‘উল বায়ান, খ. ২১তম, পৃ. ৫৬৬)।’ পৃথিবীর মধ্যে আল-কুরআন (**لَعَلِيٍّ فِي قَدْرِهِ وَشَرَفِهِ**) অতি উচ্চ ও মহান মর্যাদার অধিকারী বলে একে **عَلِيٍّ** (‘আলিয়্যু) নামেও অভিহিত করা হয় (আত-তাফসীরুল মাইসার, খ. ৮ম, পৃ. ৪৭৪)।

১৩. হিকমাত (حِكْمَةٌ): আল্লাহ তা‘আলা কুরআনের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন- **حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ** “এটি পরিপূর্ণ হিকমাত (সূরা আল-কামার, ৫৪: ০৫)।” আল-হুসাইন ইব্ন মাস‘উদ আল-বাগভী (রহ.) বলেন- **القرآن حكمة** “কুরআন পূর্ণাঙ্গ হিকমাত বা বিজ্ঞানময় (মু‘আলিমুত তানযীল, খ. ৭ম, পৃ. ৪২৭)।” আর ‘হিকমাত’ বলতে যে কোনো বস্তু বা বিষয়কে যথাস্থানে প্রয়োগ করাকে বোঝানো হয় (আল-ইতকান, খ. ১ম, পৃ. ৬৮)। আল-কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ২৩ বছরের নাবুওয়াতী জীবনে যখন যা প্রয়োজন হয়েছিল তখন সে অনুযায়ী নাযিল হয়েছিল বলে একে **حِكْمَةٌ** (হিকমাত) নামে অভিহিত করা হয়। অথবা হিকমাত বস্তু জগতের জ্ঞান তথা বিজ্ঞান (আল-মুফরাদাত, পৃ. ১২৭)। মানব জীবন যতো দিকের সাথে সম্পৃক্ত, আল-কুরআনে আনুষঙ্গিকভাবে সবই বর্ণিত হয়েছে বলে একে ‘হিকমাত’ বলা হয় (আত তাহযীর, খ. ১৪তম, পৃ. ২২৭)।

১৪. আল-হাকীম (الْحَكِيم): আল্লাহ তা‘আলা বলেন- **تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ** “এগুলো হিকমাতপূর্ণ কিতাবের আয়াত (সূরা ইউনুস, ১০: ০১)।” এ আয়াতের তাফসীরে আবু জা‘ফর আত-তাবারী (রহ.) বলেন- **هذه آيات الكتاب الحكيم بيانا وتفصيلا** “এই হিকমাতপূর্ণ কিতাবের আয়াতসমূহ বিশ্লেষণ ও বর্ণনাকৃত (জামে‘উল বায়ান, খ. ২০তম, পৃ. ১২৪)।” ইমাম কুরতুবী (রহ.)-এর মতে- “কিতাব দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে এবং হাকীম দ্বারা এমন কিতাবকে বুঝানো হয়েছে (**لا خلل فيه ولا تناقض**) যার মধ্যে কোনো কিছুই বাদ পড়েনি এবং অপূর্ণাঙ্গও নয় (আল-জামি‘উ লি-আহকামিল কুরআন, খ. ১৪তম, পৃ. ৫০)।” ‘হাকীম’ বিজ্ঞান অর্থেও ব্যবহার হয়। আর কুরআন মহা প্রাজ্ঞ বিজ্ঞানী আল্লাহর কালাম বলে একে **الْحَكِيمِ** (আল-হাকীম)ও বলা হয় (তাফসীরুল জালালাইন, পৃ. ৩৪৫)। অথবা ‘হাকীম’ অর্থ বিজ্ঞানময় (**ذو حكمة**)। আল-কুরআনে আনুষঙ্গিকভাবে বিজ্ঞানের আলোচনাও এসেছে বলে একে ‘হাকীম’ বলা হয় (আল-মুফরাদাত, পৃ. ১২৭)। ‘হাকীম’ একটি গুণবাচক বিশেষ্য। এর অর্থ সুদৃঢ়। আল-কুরআনের আয়াতসমূহ সব ধরনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংকোচন, পরিমার্জন ও বৈসাদৃশ্য থেকে সুরক্ষিত এবং অপূর্ণ বর্ণনারীতি ও ব্যঞ্জনাভঙ্গির সমন্বয়ে সুদৃঢ় বলে একে হাকীম বলা হয় (আল-ইতকান, খ. ১ম, পৃ. ৬৮)।

১৫ ও ১৬. মুসাদ্দিক (مُصَدِّقٌ) ও মুহায়মিন (مُحَيِّمٌ): আল্লাহ তা‘আলা বলেন- **مُصَدِّقًا لِمَا يَنْزِلُ مِنْ يَدَيْهِ** “যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী (সূরা আল-মাইদাহ, ৫: ৪৮)।” ‘মুসাদ্দিক’ অর্থ সত্যায়নকারী আর ‘মুহায়মিন’ অর্থ রক্ষণাবেক্ষণকারী। এ প্রসঙ্গে আবু জা‘ফর আত-তাবারী (রহ.) বলেন-

مصدقاً لما سلف من كتب الله أمامه، ونزلت على رسله الذين كانوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم. وتصديقه إياها، موافقة معانيه معانيها في الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله، وهي تصدقه

“এ কুরআনকে সত্যায়ন করে পূর্বে নাযিলকৃত আল্লাহর কিতাবসমূহে। যা মুহাম্মদ (সা.)-এর পূর্বে রাসূলগণের ওপর অবতীর্ণ করা হয়েছিলো। আদেশের ব্যাপারে অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ। মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসরণ এবং যা আল্লাহর নিকট হতে এসেছে, সেটাকেই তাসদীক বা তাঁকে সত্যায়ন করে (জামে’উল বায়ন, খ. ২য়, পৃ. ৩৯২)।”

কুরআন পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলকে সত্যায়ন করে বলে একে ‘মুসাদ্দিক’ এবং এটি পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাব আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ হওয়ার সাক্ষ্যবহন করে বলে একে ‘মুহায়মিন’ও বলা হয় (আল-বুরহান, খ. ১ম, পৃ. ২৮০)।

১৭. আল-মুবারাক (المُبَارَك): আল্লাহ তা’আলা বলেন- الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ -আমি এ কল্যাণময় কিতাব নাযিল করেছি, যা তার পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক (সূরা আন’আম: ৯২)। “এটি একটি বারকাতময় কিতাব, যা আমি আপনার নিকট অবতীর্ণ করেছি (সূরা সোয়াদ, ৩৮: ২৯)।” আল-কুরআন অতি বারকাতময় কিতাব বলে একে المُبَارَك (আল-মুবারাক)ও বলা হয়।

১৮. হাবলুল্লাহ (حَبْلُ اللَّهِ): আল্লাহ তা’আলা বলেন- وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا -তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধর (সূরা আল-ইমরান, ৩: ১০৩)। “হাবল’ অর্থ রজ্জু। যে কুরআনকে আঁকড়ে ধরবে সে জান্নাতে যাবে অথবা হিদায়াত লাভ করবে। এ জন্য কুরআনকে জান্নাত বা হিদায়াতের রজ্জু বা الحبل বলা হয়।

১৯. আস-সিরাতুল মুস্তাকীম (الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيم): এর অর্থ সঠিক পথ। আল্লাহ তা’আলা বলেন- وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ -নিশ্চয় এটি আমার সঠিক পথ; সুতরাং তোমরা এ পথেরই অনুসরণ করো। এ ছাড়া অন্য কোনো পথের অনুসরণ করো না (সূরা আল-আন’আম, ৬: ১৫৩)। আল-কুরআন জান্নাত ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সঠিক ও সোজা রাস্তা বাতলিয়ে দেয় বলে একে الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيم (আস-সিরাতুল মুস্তাকীম)ও বলা হয়।

২০. আল-কায়্যিম (الْقَيِّم): আল্লাহ তা’আলা বলেন- قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا -এটি সঠিক গ্রন্থ, যাতে তা একটি ভীষণ বিপদের ভয় প্রদর্শন করতে পারো (সূরা আল-কাহাফ, ১৮: ০২)। আল-কুরআন হিদায়াতের একটি সঠিক ও নিখুঁত গ্রন্থ বলে একে الْقَيِّم (আল-কায়্যিম)ও বলা হয়।

২১. ফাসলুন (فَصْلٌ): আল্লাহ তা’আলা বলেন- إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ -নিশ্চয়ই এটি যথার্থ অকাটি বাণী (সূরা আত-তারিক, ৮৬: ১৩)। “ফাসলুন’ অর্থ যথার্থ ও অকাটি বাণী। কুরআন আল্লাহ তা’আলার নির্ভুল ও অকাটি বাণী বলে একে فَصْلٌ (ফাসলুন) বলা হয়।

২২. আন-নাবাউন ‘আযীম (النَّبَأُ الْعَظِيم): এর অর্থ মহান সংবাদ। আল্লাহ তা’আলা বলেন- عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنْ النَّبَأِ الْعَظِيمِ -তারা পরস্পরে কি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে? মহান সংবাদ সম্পর্কে (সূরা আন-নাবা’, ৭৮: ০১)

০২)।” আল-কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে মানব জাতির প্রতি অবতীর্ণ মহাসংবাদ বলে একে **النَّبَأُ الْعَظِيمُ** (আন-নাবাউন ‘আযীম)ও বলে আখ্যায়িত করা হয়।

২৩. **আহসানুল হাদীস** (أَحْسَنُ الْحَدِيثِ): এর অর্থ সর্বোত্তম বাণী। আল্লাহ তা‘আলা বলেন- **اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ** “আল্লাহ তা‘আলা সর্বোত্তম বাণী নাযিল করেছেন (সূরা আয-যুমার, ৩৯: ২৩)।” আল-কুরআন আল্লাহর বাণী বলে এটি মহাপবিত্র ও সর্বোত্তম বাণী। এ জন্য একে **أَحْسَنُ الْحَدِيثِ** (আহসানুল হাদীস)ও বলা হয়।

২৪. **মুতশাবিহ** (مُتَشَابِه): এর অর্থ পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন- **اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا** “আল্লাহ তা‘আলা সর্বোত্তম বাণী নাযিল করেছেন, যা পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ (সূরা আয-যুমার, ৩৯: ২৩)।” এ ছাড়াও এর বক্তব্যসমূহ পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ, একটি অপরটির সহায়ক বিধায় একে **مُتَشَابِه** (মুতশাবিহ)ও বলা হয়।

২৫. **মাসানী** (مَثَانِي): ‘মাসানী’ অর্থ পুনরাবৃত্ত, পুনঃপুনঃ আবৃত্ত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন- **اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ** “আল্লাহ তা‘আলা সর্বোত্তম বাণী নাযিল করেছেন, যা পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ ও পুনঃপুনঃ পঠিত (সূরা আয-যুমার, ৩৯: ২৩)।” ইব্ন ‘আব্বাস (রা.)-এর মতে- **لَشَيْئَةِ اللَّهِ جَلْ ذَكَرَهُ فِيهَا** “আল-কুরআনে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের সংবাদ, ঘটনাবলী ও উদাহরণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে বলে একে ‘মাসানী’ বলা হয় (জামে‘উল বায়ন, খ. ১ম, পৃ. ২০৩)।” কেননা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও এগুলোর উল্লেখ রয়েছে। আল-কুরআনে যেনো এগুলো দ্বিতীয় বার উল্লেখ করা হলো। কারো মতে- **إِنَّمَا سُمِّيَتْ مَثَانِي لِأَنَّهَا** “এতে বিভিন্ন ফারায়েযের বিধান, শাস্তির সীমা নির্ধারণ, সাওয়াব ও শাস্তির কথা পুনঃপুনঃ উল্লেখ করা হয়েছে বলে একে ‘মাসানী’ বলা হয় (দুররুল মানসূর, খ. ৫ম, পৃ. ২৬২)।” কারো মতে- **يَذْكُرُ اللَّهُ الْقِصَّةَ الْوَاحِدَةَ مَرَارًا** “কুরআনে ঘটনাবলী পুনঃপুনঃ উল্লেখ করা হয়েছে বলে একে ‘মাসানী’ বলা হয় (ফাতহুল কাদীর, খ. ৪র্থ, পৃ. ১৯৭)।” রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট প্রথমে একবার কুরআনের মর্ম নাযিল করা হয়। এরপর দ্বিতীয় বার প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে ক্রমেক্রমে এর মর্ম ও শব্দ উভয়ই নাযিল করা হয়। এ জন্য একে ‘মাসানী’ বলা হয়। কারো মতে- **رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ** “নামাযের মধ্যে প্রত্যেক রাক‘আতে বারবার কুরআন তিলাওয়াতের কারণে একে ‘মাসানী’ বলা হয় (দুররুল মুনসূর, খ. ৪র্থ, পৃ. ৭৩)।” অথবা **مَرَّةً بِالْمَدِينَةِ** “কুরআনের আয়াতগুলো দু’বার মক্কা ও মদীনাতে অবতীর্ণ হওয়ায় একে **مَثَانِي** (মাসানী) নামকরণ করা হয় (মুখতাসারু তাফসীরুল বাগতী, খ. ৪র্থ, পৃ. ৩১৩)।”

২৬. **তানযীল** (تَنْزِيل): আল্লাহ তা‘আলা বলেন- **وَأَنَّهُ لَنَزَّلَ إِلَيْ رَّبِّ الْعَالَمِينَ، نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ** “এই কুরআন তো বিশ্ব জাহানের পালনকর্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ। জিবরাঈল (আ.) তা নিয়ে অবতরণ করেছেন (সূরা আশ-শু‘আরা, ২৬: ১৯২)।” আর এ আয়াতের সত্যতানুযায়ী আল-কুরআন জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট অবতীর্ণ করেছেন বিধায় তাকে **تَنْزِيل** (তানযীল) বলা হয়। আল্লাহ তা‘আলা

বলেন-“اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا” আল্লাহ তা‘আলা সর্বোত্তম বাণী তথা সাদৃশ্যপূর্ণ কিতাব নাযিল করেছেন (সূরা আয-যুমার, ৩৯: ২৩)।”

২৭. রুহ (رُوح): আল্লাহ তা‘আলা বলেন-“وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا” আমি আপনার কাছে আমার আদেশক্রমে রুহ পাঠিয়েছি (সূরা আশ-শূরা, ৪২: ৫২)।” রুহ অর্থ প্রাণ। এর নামকরণ প্রসঙ্গে আর-রাযী আল-জাস্‌সাস (রহ.) বলেন-“وَإِنَّمَا سَمَّاهُ رُوحًا مِنْ حَيْثُ كَانَ فِيهِ حَيَاةُ النَّاسِ فِي أُمُورِ دِينِهِمْ” পবিত্র কালামের তিলাওয়াত, শ্রবণ ও ‘আমলের ফলে মানুষের আত্মসমূহ নতুন প্রাণ ও অপার্থিব জীবন লাভ করে থাকে বলে একে رُوح (রুহ)ও বলা হয় (আহ্‌কামুল কুরআন, খ. ২য়, পৃ. ৩৭৯)।”

২৮. ওয়াহ্বী (وَحْيٍ): আল্লাহ তা‘আলা বলেন-“فُلْ إِنَّمَا أُنْزِلُكُمْ بِالْوَحْيِ” বলুন, আমি তো কেবল ওয়াহ্বীর মাধ্যমে তোমাদেরকে সতর্ক করি (সূরা আল-আম্বিয়া, ২১: ৪৫)।” ‘ওয়াহ্বী’ এর আভিধানিক অর্থ কাউকে কোনো বিষয়ে গোপনে অবহিত করা। তবে নবী-রাসূলগণের প্রতি অবতীর্ণ প্রত্যাদেশ অর্থেই এর বহুল ব্যবহার। আল-কুরআনও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট অবতীর্ণ প্রত্যাদেশ বলে একে ওয়াহ্বী বলা হয়।

২৯. ‘আরাবিয়্যুন (عَرَبِيٍّ): আল্লাহ তা‘আলা বলেন-“فَرَأَى عَرَبِيًّا” আরবী ভাষায় নাযিলকৃত কুরআন (সূরা আয-যুমার, ৩৯: ২৮)।” আল-কুরআন ‘আরবী ভাষায় নাযিল করা হয়েছে বলে عَرَبِيٍّ (‘আরবী)ও বলা হয়।

৩০. বাসাইর (بَصَائِرٍ): আল্লাহ তা‘আলা বলেন-“هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ” এটি মানুষের জন্য শিক্ষা গ্রহণের বাণী (সূরা আল-জাসিয়াহ, ৪৫: ২০)।” ‘বাসাইর’ শব্দটি ‘বাসীরাত’-এর বহুবচন। এর অর্থ শিক্ষা গ্রহণ করা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সকল জ্ঞান, যা থেকে তারা শিক্ষা ও উপদেশ হাসিল করতে পারবে বলে একে بَصَائِرٍ (বাসাইর) বলা হয়।

৩১. কাওল (قَوْلٍ): আল্লাহ তা‘আলা বলেন-“وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ” আমি তাদের জন্য উপর্যুপরি বাণী পৌঁছিয়েছি (সূরা আল-কাসাস, ২৮: ৫১)।” ‘কাওল’ অর্থ বাণী। ‘কুরআন’ আল্লাহর বাণী বলে একে قَوْلٍ (কাওল) নামেও অভিহিত করা হয়।

৩২. বায়ান (بَيَانٍ): আল্লাহ তা‘আলা বলেন-“هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ” এটি মানুষের জন্য যথার্থ বর্ণনা (সূরা আলু-ইমরান, ৩: ১৩৮)।” আল-কুরআনে মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুর যথার্থ বর্ণনা রয়েছে বলে একে بَيَانٍ (বায়ান) বলা হয়।

৩৩. ‘ইল্ম (عِلْمٍ): আল্লাহ তা‘আলা বলেন-“يُعَدِّمُ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ” আপনার কাছে ‘ইলম পৌঁছার পর (সূরা আর-রা‘দ, ১৩: ৩৭)।” এখানে ‘ইলম দ্বারা কুরআন উদ্দেশ্য। কুরআন যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার বলে একে عِلْمٍ (ইল্ম)ও বলা হয়।

৩৪. হক (حَقُّ): আল্লাহ তা‘আলা বলেন- الْقَصَصُ الْحَقُّ “নিঃসন্দেহে এটাই হলো সত্য ভাষণ (সূরা আলু ‘ইমরান, ৩: ৬২)।” ‘হক’ অর্থ সত্য। আল-কুরআন নির্জলা সত্য বাণী বলে একে حَقُّ (হক)ও বলা হয়।

৩৫. আল-হাদী (الهادي): আল্লাহ কুরআনের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলেন- هَذَا الْقُرْآنُ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ “কুরআন এমন পথ প্রদর্শন করে, যা সর্বাধিক সরল (সূরা আল-ইসরা’: ৯)।” কুরআন সঠিক পথ প্রদর্শন করে বলে একে ‘আল-হাদী’ও বলা হয়।

৩৬. সিদক (صِدْق): আল্লাহ বলেন- وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ “যিনি সত্য নিয়ে আগমন করলেন (সূরা আয-যুমার, ৩৯: ৩৩)।” ‘সিদক’ অর্থ সত্য। এর দ্বারা কুরআন উদ্দেশ্য। এটি মহা সত্যগ্রন্থ বলে একে صِدْق (সিদক) নামেও অভিহিত করা হয়।

৩৭. ‘আদল (عَدْل): আল্লাহ তা‘আলা বলেন- وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا “আপনার প্রতিপালকের বাণী পূর্ণ সত্য ও সুষম (সূরা আল-আন‘আম, ৬: ১১৫)।” আল-কুরআন মহাসুখম গ্রন্থ বলে একে (আদল) عَدْل নামেও অভিহিত করা হয়।

৩৮. ঈমান (إِيمَان): আল্লাহ তা‘আলা বলেন- إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ “আমরা একজন আহ্বানকারীকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করতে শুনেছি (সূরা আলু-‘ইমরান, ৩: ১৯৩)।” কারো কারো মতে- এতে لِلْإِيمَانِ (ঈমান দ্বারা) কুরআন উদ্দেশ্য। ঈমানদারদের যেসব বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা প্রয়োজন, তন্মধ্যে কুরআনের প্রতি ঈমান আনা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিধায় একেও ‘ঈমান’ নামে অভিহিত করা হয়।

৩৯. আমর (أَمْر): আল্লাহ বলেন- ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ “এটা আল্লাহর নির্দেশ, যা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন (সূরা আত-তালাক: ০৫)।” কুরআনে আল্লাহর নির্দেশাবলী রয়েছে বলে একে أَمْر (আমর) নামেও অভিহিত করা হয়।

৪০. বুশরা (بُشْرَى): আল্লাহ তা‘আলা বলেন- هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ “মু‘মিনদের জন্য পথনির্দেশ ও সুসংবাদ (সূরা আন- নামাল, ২৭: ০২)।” আর বুশরা (بُشْرَى) শব্দের অর্থ- শুভ সংবাদ। যারা কুরআন পড়ে, অনুধাবন করে এবং এর নির্দেশ মতে চলে তাদেরকে এটি বেহেশতের সুসংবাদ দেয় বলে একে بُشْرَى (বুশরা)ও বলা হয়।

৪১. মাজীদ (مَجِيد): আল্লাহ তা‘আলা বলেন- بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ “বরং এটা সম্মানিত কুরআন (সূরা আল-বুরূজ, ৮৫: ২১)।” ‘মাজীদ’ অর্থ মহামর্যাদাবান, সম্মানিত। আল-কুরআন মহামর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী বলে একে مَجِيد (মাজীদ) বলা হয়।

৪২. যাবূর (زُبُور): আল্লাহ তা‘আলা বলেন- وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ “যিকর এরপর আমরা যাবূরে লিখে দিয়েছি (সূরা আল-আম্বিয়া, ২১: ১০৫)।” যাবূর অর্থ কিতাব। হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রতি অবতীর্ণ বিশেষ কিতাবের নামও যাবূর। এখানে যাবূর বলে কি বোঝানো হয়েছে, তা নিয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। ইবনু ‘আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, আয়াতে যিকর বলে তাওরাত এবং যাবূর বলে তাওরাতের পর অবতীর্ণ আসমানী

গ্রন্থসমূহ যথা- তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ও কুরআনকে বোঝানো হয়েছে। ইবনু যায়দ (রহ.) বলেন, “যিকর দ্বারা লাওহে মাহফুয এবং যাবুর দ্বারা সকল আসমানী গ্রন্থকেই বোঝানো হয়েছে (মা‘আরিফুল কুরআন, পৃ. ৮৯২)।”

৪৩. মুবীন (مُبِين): আল্লাহ তা‘আলা বলেন- فَذُجَاءُكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ “আবশ্যই আল্লাহর নিকট থেকে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট এসেছে (সূরা মায়েদা: ১৫)।” অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন- فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ “জেনে রাখো যে আমার রাসূল (সা.)-এর দায়িত্ব ছিলো শুধু স্পষ্টভাবে (আদেশ) পৌঁছিয়ে দেয়া (সূরা মায়েদা: ১৫)।” আল্লাহ তা‘আলা অপর এক আয়াতে বলেন- تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ “এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত (সূরা ইউসূফ, ১২: ০১)।” আল-কুরআনের বক্তব্যসমূহ অতি স্পষ্ট ও জটিলতামুক্ত বলে একে মুবীন (মুবীন) বলা হয়।

৪৪. বাশীর (بَشِيرٍ): এর অর্থ সুসংবাদদাতা। আল্লাহ বলেন- كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا “এটি একটি কিতাব। এর আয়াতসমূহ জ্ঞানী লোকদের জন্য ‘আরবী ভাষায় কুরআন বর্ণিত হয়েছে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে (সূরা ফুসসিলাত, ৪১: ০৩-০৪)।” আল-কুরআন বিশ্বাসীদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয় বলে একে বাশীর (বাশীর)ও বলা হয়।

৪৫. নায়ীর (نَذِيرٍ): এর অর্থ সতর্ককারী। আল্লাহ বলেন- كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا “এটি একটি কিতাব। এর আয়াতসমূহ জ্ঞানী লোকদের জন্য ‘আরবী কুরআন বর্ণিত হয়েছে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে (সূরা ফুসসিলাত, ৪১: ০৩-০৪)।” আল-কুরআন তার প্রতি অবিশ্বাসীদেরকে জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করে বলে একে নায়ীর (নায়ীর)ও বলা হয়।

৪৬. আযীয (عَزِيزٍ): আল্লাহ তা‘আলা বলেন- وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ “আর এটি অবশ্যই একটি মহাশক্তিমান গ্রন্থ (সূরা ফুসসিলাত, ৪১: ৪১)।” যারা কুরআনের মুকাবিলা করতে চায় তাদেরকে এটি চরমভাবে পর্যদুস্ত ও পরাভূত করে দেয় বলে একে এযীয (আযীয)ও বলা হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন- قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا “বলুন, যদি মানব ও জ্বীন এ কুরআনের অনুরূপ রচনা করে আনয়নের জন্য জড়ো হয় এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়; তবুও তারা কখনও এর অনুরূপ রচনা তৈরি করে আনতে পারবে না (সূরা আল-ইসরা’, ১৭: ৮৮)।”

৪৭. বালাগ (بَلَاغٌ): আল্লাহ তা‘আলা বলেন- هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ “এটি মানুষের জন্য একটি সংবাদনামা (সূরা ইব্রাহীম, ১৪: ৫২)।” এর ব্যাখ্যায় সমরকান্দী (রহ.) বলেন- هذا القرآن إرسال وبيان من الله تعالى “এ কুরআন আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে প্রেরণ ও বর্ণনা করা হয়ে (বাহরুল ‘উলূম, খ. ২য়, পৃ. ৪৪০)।” ‘বালাগ’ অর্থ প্রচার, তাবলীগ। আর কুরআন মানব জাতির নিকট আল্লাহ তা‘আলার আদেশ-নিষেধ ও বক্তব্য প্রচার-প্রসার করে বলে তাকে ‘বালাগ’ও বলা হয়। অথবা ‘বালাগ’ অর্থ পর্যাণ্ততা, যথেষ্টতা। যেমন বলা হয়- فِي هَذَا بَلَاغٌ “এ বিষয়ে পর্যাণ্ততা আছে।” আল-কুরআন মানব জাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ হিদায়াত। দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য এর বিধি-বিধানগুলোই যথেষ্ট। অন্য কিছু প্রয়োজন নেই। তাই একে ব্লাগ (বালাগ)ও বলা হয় (আল-ইতকান, খ. ১ম, পৃ. ৬৮)।

৪৮. কাসাস (قَصَص): আল্লাহ তা‘আলা বলেন- نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ “আমি তোমার নিকট সর্বোত্তম কাহিনী অবতীর্ণ করেছি (সূরা ইউসূফ, ১২: ০৩)।” এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন- فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ هَذَا الْقِصَصَ أَحْسَنَ مِنْ غَيْرِهِ وَأَنْفَعَ لَهُمْ তোমাদের জন্য উপকারী (আল-জামি‘উ লি-আহকামিল কুরআন, খ. ১৭তম, পৃ. ৩৪৯)।” আর আল্লাহ প্রদত্ত আল-কুরআনে অতীত জাতিসমূহের শিক্ষণীয় ইতিহাস ও ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে একে قَصَص (কাসাস)ও বলা হয়।

৪৯. সুহুফুন (صُفُف), সাহীফাহ (صَحِيفَة)। ‘সুহুফুন’ শব্দটি ‘সাহীফাহ-এর বহুবচন। এর অর্থ লেখার পত্র। এর দ্বারা লাওহে মাহফূয উদ্দেশ্য। এটি যদিও একটি বস্তু; কিন্তু সমস্ত আসমানী কিতাব এতে লিখিত আছে বলে একে বহুবচনে প্রকাশ করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন- بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ “বরং এটা সন্মানিত কুরআন, লাওহে মাহফূযে সংরক্ষিত (সূরা আল-বুরূজ, ৮৫: ২১)।” আল-কুরআনও লাওহে মাহফূযে সংরক্ষিত বলে একেও صَحِيفَة (সাহীফাহ) নামে অভিহিত করা হয়।

৫০. ও ৫১. আস্ সফর (السفر) এবং ‘আল-মুসহাফ’ (المُصْحَف): ‘মুসহাফ’ শব্দটি এক বচন। বহু বচনে المصاحف আল-মুসাহিফ। আল-কুরআনের অনুলিপিকে ‘মুসহাফ’ নামে অভিহিত করা হয়। বর্ণিত রয়েছে, আবু বাকর (রা.) কুরআনের সংকলন প্রস্তুত করার পর সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা এর কোনো নাম দাও। তখন কেউ এর জন্য ‘ইঞ্জিল’, আর কেউ ‘সিফর’ প্রস্তাব করলেন। কিন্তু এ নামগুলো সাহাবাগণের মনঃপূত হয়নি। অবশেষে ইবনু মাস‘উদ (রা.) বললেন, আমি হাবশায় তাদের একটি গ্রন্থকে ‘মুসহাফ’ বলতে শুনেছি। অতএব তোমরা কুরআনের অনুলিপিকেও ‘মুসহাফ’ নামে অভিহিত করো। তাঁর এ প্রস্তাবনার ভিত্তিতে কুরআনের অনুলিপিকে ‘মুসহাফ’ নামে অভিহিত করা হয় (আল-ইতকান, খ. ১ম, পৃ. ৬৯)। এ প্রসঙ্গে জালালুদ্দীন আস-সুযুতী (রহ.) ‘মুসহাফ’ নামকরণ নিয়ে ইব্ন শিহাব যুহরী (রহ.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন-
لَمَّا جَمَعُوا الْقُرْآنَ فَكَتَبُوهُ فِي الْوَرَقِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: التَّمَسُّوا لَهُ اسْمًا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: السَّفَرُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْمُصْحَفُ، فَإِنَّ الْحَبِشَةَ يَسْمُونَهُ الْمُصْحَفَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَوَّلَ مَنْ جَمَعَ كِتَابَ اللَّهِ وَسَمَاهُ الْمُصْحَفَ

“সাহাবীগণ যখন কুরআন একত্রিত করেন এবং কাগজে লিপিবদ্ধ করেন। তখন আবু বকর (রা.) তাদের এর একটি নাম অন্বেষণ করতে বলেন। এতে কেউ কেই এর নাম ‘আস্ সফর’ (السفر) রাখার এবং ‘আল-মুসহাফ’ (المُصْحَف) রাখার প্রস্তাব করেন। আবিসিনিয়ার অধিবাসীগণ এ ধরনের গ্রন্থকে ‘আল-মুসহাফ’ (المُصْحَف)ও বলে আখ্যায়িত করতো। আর আবু বকর (রা.)ই আল্লাহর কিতাবকে প্রথম জমা করেন এবং তিনিই এর নাম রাখেন ‘আল-মুসহাফ’ (প্রাপ্ত, খ. ১ম, পৃ. ৫৯)।”

৫২. মুকাররামাহ (مُكَرَّمَة): এর অর্থ- সম্মানিত। কারণ, যাঁরা কুরআনকে পড়বে, পড়াবে এবং এর হুকুমসমূহ জীবনের প্রতিটি স্তরে বাস্তবায়ন করবে, তারাই মুকাররামাহ (مُكَرَّمَة) বা সম্মানিত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ “এটি সম্মানিত, উচ্চ ও পবিত্র পত্রে লিপিবদ্ধ রয়েছে (সূরা ‘আবাসা, ৮০: ১৩-১৪)।”

৫৩. মারফু'আহ (مَرْفُوعَة): এর অর্থ- উচ্চ। কারণ, যাঁরা কুরআন পড়বে, পড়াবে এবং এর হুকুমসমূহ জীবনের প্রতিটি স্তরে বাস্তবায়ন করবে, তারাই দুনিয়া ও আখেরাতে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হয় বিধায় একে মারফু'আহ (مَرْفُوعَة)ও বলা হয়। আল্লাহ বলেন- فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ “এটি সম্মানিত, উচ্চ ও পবিত্র পত্রে লিপিবদ্ধ রয়েছে (সূরা ‘আবাসা, ৮০: ১৩-১৪)।”

৫৪. মুতাহ্হারাহ (مُطَهَّرَة): আল্লাহ তা‘আলা বলেন- لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ “নিশ্চয় এটি সম্মানিত কুরআন, যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে, পুত-পবিত্রতা ব্যতীত অন্য কেই তা স্পর্শ করবে না, এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ (সূরা আল-ওয়াকি‘আহ, ৫৬: ৭৭-৮০)।” আয়াতের ব্যাখ্যায় আবু বকর আর-রাযী আল-জাস্‌সাস (রহ.) বলেন-

لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ؛ فَقَرَأَ الْقُرْآنَ، وَلَمْ يَمَسَّ الْمُصْحَفَ حِينَ لَمْ يَكُنْ عَلَى وَضوءٍ

“পবিত্রতা ব্যতীত কুরআন স্পর্শ করবে না, পবিত্রতা অর্জন হলেই তখন কুরআন তিলাওয়াত কর এবং উযু ব্যতীত (আল্লাহ প্রদত্ত) কোনো মাসহাফ (আসমানী গ্রন্থ) স্পর্শ করবে না (আহ্‌কামুল কুরআন, খ. ৮ম, পৃ. ৪৮৯)।” আর মুতাহ্হারাহ (مُطَهَّرَة) অর্থ- পবিত্র। কারণ, এটি এমন একটি গ্রন্থ যা পবিত্রতা অর্জন ছাড়া স্পর্শ করাও যাবে না। যাঁরা কুরআন পড়বে ও পড়াবে উযু বা পবিত্রতা অর্জন ছাড়া স্পর্শ করাও যাবে না। তাই তাকে মুতাহ্হারাহ (مُطَهَّرَة) বলা হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন- فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ “এটি সম্মানিত, উচ্চ ও পবিত্র পত্রে লিপিবদ্ধ রয়েছে (সূরা ‘আবাসা, ৮০: ১৩-১৪)।” আর এটি (مُكْرَمَة) অতি সম্মানিত, (مَرْفُوعَة) সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী ও (مُطَهَّرَة) মহাপবিত্র বলে একে যথাক্রমে মুকাররামাহ, মারফু'আহ ও মুতাহ্হারাহ প্রভৃতি নামেও ভূষিত করা হয়।

৫৫. তিবয়ান (تَبْيَان): আল্লাহ তা‘আলা বলেন- وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ “আমি আপনার প্রতি এমন কিতাব নাযিল করেছি, যা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা (সূরা আন-নাহাল, ১৬: ৮৯)।” ‘তিবয়ান’ অর্থ সুস্পষ্ট বর্ণনা। এ প্রসঙ্গে আবু জা‘ফর আত-তাবারী বলেন-

هذا القرآن بيانا لكل ما بالناس إليه الحاجة من معرفة الحلال والحرام والثواب والعقاب

“এ কুরআনে মানব জাতির প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি স্তর যেমন হালাল, হারাম, সাওয়াব, শাস্তি ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তৃত বর্ণনা করা হয়েছে (জামে‘উল বায়ন, খ. ১৭তম, পৃ. ২৮৭)।” আর আল-কুরআনে প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে বলে একে ‘তিবয়ান’ও বলা হয়।

৫৬. মুনাদী (مُنَادِي): আল্লাহর ভাষায় আমরা দো‘আ করে থাকি- رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا “হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয়ই আমরা এক আহ্বানকারীকে আহ্বান করতে শুনেছি যে, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো (সূরা আলে ‘ইমরান, ৩: ১৯৩)।” কোনো কোনো তাফসীরকারকের মতে ‘মুনাদী’ দ্বারা কুরআন উদ্দেশ্য। কুরআন মানব জাতিকে ঈমান ও কল্যাণের প্রতি আহ্বান জানায় বলে একে ‘মুনাদী’ও বলা হয়।

৫৭. ‘আজাব (عَجَب): আল্লাহ তা‘আলা বলেন- سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا “তারা বললো, আমরা বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি (সূরা আল-জিনন: ০১)।” এর বিস্ময়কর রচনামূলকতা, অপূর্ব বর্ণনারীতি ও ব্যঞ্জনাভঙ্গি এবং সুদৃঢ় বক্তব্যসমূহের কারণে একে ‘আজাব’ও বলা হয়।

৫৮. তায়কিরাহ (تَذَكُّر): আল্লাহ তা‘আলা বলেন- كَأَنَّهُ تَذَكُّرٌ “কখনও না, এটা তো উপদেশ মাত্র (সূরা আল-মুদাসসির, ৭৪: ৫৪)।” ‘তায়কিরাহ’ অর্থ উপদেশ। সে জন্য বলা হয়- إِنَّ الْقُرْآنَ تَذَكُّرٌ لِلْخَلْقِ “নিশ্চয়ই কুরআন সৃষ্টিজগতের জন্য উপদেশস্বরূপ (আল-ওয়াজীয ফী তাফসীরিল কিতাবিল ‘আযীয, খ. ১ম, পৃ. ১০৬২)।” কাতাদাহ (রা.) বলেন- “এখানে তায়কিরাহ (تَذَكُّر) দ্বারা আল-কুরআনকে বুঝানো হয়েছে (জামে‘উল বায়ন, খ. ২৪তম, পৃ. ৪৪)।” কুরআনে বিভিন্ন উপদেশ এবং অতীত জাতিসমূহের বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় বর্ণিত হয়েছে বিধায় একে ‘তায়কিরাহ’ও বলা হয়।

৫৯. ‘উরওয়াতুল উসকা’ (عُرْوَةُ الْوُثْقَى): আল্লাহ তা‘আলা বলেন- فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى “সে মজবুত হাতল ধারণ করলো (সূরা লুকমান, ৩১: ২২)।” ‘উরওয়াতুল উসকা’ অর্থ মজবুত হাতল। আনাস ইব্ন মালেক (রা.) বলেন- “এখানে ‘উরওয়াতুল উসকা’ দ্বারা আল-কুরআনকে বুঝানো হয়েছে (তাফসীর আল-কুরআনিল ‘আযীম, খ. ২য়, পৃ. ৩৬৮)।” সঠিক পথে থেকে আল্লাহর সম্বন্ধি লাভ এবং জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য এ কুরআনই হচ্ছে শক্তিশালী অবলম্বন। তাই একে ‘উরওয়াতুল উসকা’ নামেও অভিহিত করা হয়।

৬০. রিয়কুর রাব্ব (رِزْقُ رَبِّكَ): আল্লাহ তা‘আলা বলেন- وَرَزَقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَنْفَى “আপনার প্রতিপালকের রিয়কই উত্তম ও স্থায়ী (সূরা তাহা, ২০: ১৩১)।” কোনোকোনো তাফসীরকারকের মতে এখানে ‘রিয়কুর রাব্ব’ দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে (আল-বুরহান, খ. ১ম, পৃ. ১২৮)। ইমাম আস-সাখাবী (রহ.) বলেন, এর অর্থ হলো-

يعنى ما رزقك الله من القرآن خير مما رزقهم من الدنيا

“আল্লাহ তা‘আলা তোমাকে কুরআনের যে রিয়ক দান করেছেন, তা তাদেরকে দুনিয়ায় যে রিয়ক দান করেছেন তার চেয়ে অনেক উত্তম (প্রাগুক্ত, খ. ১ম, পৃ. ২৮১)।” প্রকাশ থাকে যে, কুরআন জানা, পড়া এবং এর হুকুমসমূহ বাস্তব জীবন ‘আমল করা প্রত্যেক জ্ঞানবান মানুষের দরকার। আল্লাহ তা‘আলা পড়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন- اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ “পড়, তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন (সূরা আল-‘আলাক: ০১-০৫)।” জ্ঞান অর্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন- هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَكْمُلُونَ وَالَّذِينَ لَا يَكْمُلُونَ “বলুন, যাদের ‘ইল্ম আছে আর যাদের ‘ইল্ম নাই তারা কি সমান হতে পারে? (সূরা যুমার: ৯)।” ‘ইল্ম তথা জ্ঞান অর্জনকারীর মর্যাদা প্রসঙ্গে তিনি বলেন-

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

“তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছো এবং যাদের ‘ইল্ম দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদায় উন্নত করবেন (সূরা মুজাদিলাহ: ১১)।” রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন- الْحَقُّ أَنَّهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ “যে ব্যক্তি ‘ইল্ম হাসিলের উদ্দেশ্যে পথ চলে, আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন (হাদীস নং- ৩১৫৭, পৃ. ৫১৩)।” রাসূলুল্লাহ (সা.) আরও বলেন- “ইলম অর্জনকারীর জন্য ফিরিশ্তাগণ তাঁদের

জন্য পাখা বিছিয়ে দেন (মাজামা‘উয যাওয়াইদ, খ. ১ম, পৃ. ১৩১)।” তিনি আরও বলেন- “ইলম অর্জনকারী আল্লাহ তা‘আলার রাস্তায় জিহাদকারীর মর্যাদা লাভ করবে (পূর্বোক্ত)।” অপর হাদীসে বলেন- “শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ই সাওয়াবের অধিকারী (জামি‘উ বায়ান, খ. ১ম, পৃ. ২৮)।”

মোটকথা, উপরোক্ত কুরআনের নামসমূহ দ্বারা প্রমাণিত যে, কুরআন সম্পর্কে জানা, পড়া এবং এর হুকুমসমূহ বাস্তব জীবন ‘আমল করলে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে সুপথ পাবে।

উপসংহার

পরিশেষে আমরা সুস্পষ্ট ও নির্দিধায় এ কথা বলতে পারি যে, কুরআনের নামসমূহের মধ্যে অধিকাংশই এ পবিত্র গ্রন্থের গুণবাচক বা বিশেষণ মাত্র। এর প্রত্যেকটি নামই কুরআনের এক-একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও গুণের পরিচয় বহন করে। কোনো কোনো বিজ্ঞানী এ বিশেষণগুলোকে নাম ধরে নিয়ে এর নামের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছেন। মূলত আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে প্রসিদ্ধ পাঁচটি নাম হলো, আল-কুরআন, আল-ফুরকান, আল-কিতাব, আত-তানযীল ও আয-যিকর। এগুলোর মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ নাম হচ্ছে আল-কুরআন। আল-কুরআনের প্রায় ৬১ জায়গায় নিজের কালামকে আল্লাহ তা‘আলা ‘কুরআন’ নামে উল্লেখ করেছেন। কুরআন এ পৃথিবীর সমগ্র মানুষের জন্য পথ প্রদর্শক। যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফুরকান (সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী) নাযিল করেছেন। তাই কুরআন হক ও বাতিল, মু‘মিন ও মুনাফিক এবং মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে পার্থক্য করে থাকে এবং মানব ইতিহাসের প্রতিটি যুগের ও কালের এবং অনাগত ভবিষ্যতের হিদায়েতকারী। পৃথিবীর সমাপ্তিকাল পর্যন্ত তা মানুষকে সঠিক, নির্ভুল ও সরল পথ দেখাবে। তথ্য প্রযুক্তির এ যুগে “আল-কুরআনের নামসমূহ ও নামকরণের কারণ: তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ” শীর্ষক প্রবন্ধটি ইলামের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

তথ্যসূত্র

০১. আহমদ ইব্ন ‘আলী আল-মাক্কী আবী বকর আর-রাযী আল-জাসাস আল-হানাফী: *আহকামুল কুরআন*, প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি।
০২. ড. সুবহী আস-সালিহ: *মাবাহিসু ফী ‘উলুমিল কুরআন*, বৈরুত: দারুল ‘উলুম লিল মালা‘ঈন, ১৯৯০।
০৩. কুরতুবী, মুহাম্মাদ ইব্নু আহমদ (৬৭১হি): *আল-জামিয় লি-আহকামিল কুরআন* (তাফসীরে কুরতুবী), কায়রো, দারুশ শা‘ব, ১৩৭২ হি।
০৪. ‘আবদুর রহমান ইব্ন আবী বকর, জালাল উদ্দিন আস-সুযুতী: *আল-ইতকান ফী ‘উলুমিল কুরআন*, পাকিস্তান: দারু নাশরিল কুতুবিল ইসলামিয়াহ, লাহোর, তা. বি।
০৫. ‘আবদুর রহমান ইব্ন আবী বকর, জালাল উদ্দিন আস-সুযুতী: *আদদুররুল মানসূর ফী তাওয়াযিলি বিল-মাসূর*, প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি।
০৬. আবু দাউদ, সুলায়মান ইবনুল আশ‘আস আস-সিজিস্তানী: *সুনানু আবী দাউদ*, কলকাতা: আসাহুল মাতাবি, তা.বি।

০৭. ইমাম বাইহাকী, আবু বকর আহমাদ ইবন হুসাইন: **শু'আবুল ঈমান**, ১ম প্রকাশ, বৈরুত: দারুল হুসাইন কুতুবিল 'ইলমিয়াহ, ১৯৯০ খ্রি.।
০৮. মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ইবন খুযাইমাহ: **আস-সহীহ**, প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা. বি।
০৯. 'আবদুল্লাহ ইবন আহমদ ইবন 'আলী আয-যাইদ: **মুখতাসারু তাফসীরুল বাগতী**, রিয়াদ: দারুস সালাম লিন-নশর, ১৪১৬ হি.।
১০. মুহীউস সুন্নাহ আবু মুহাম্মদ ইবন মাস'উদ আল-বাগতী: **মু'আলিমুত তানযীল**, দারু তায়্যিবাতি লিন-নশর ওয়াত তাওয়া, ১৯৯৭ খ্রি./১৪১৭ হি.।
১১. ড. 'আবদুল্লাহ ইবন 'আবদিল মুহসিন আত-তুরকী: **আত-তাফসীরুল মাইসার**, প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি।
১২. আবু হায়ান মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ ইবন 'আলী ইবন ইউসুফ ইবন হায়ান: **তাফসীরু আল-বাহরিল মুহীত**, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৪১২/১৯৯২।
১৩. আবুল ফেদা ইসমা'ঈল ইবন 'উমর ইবন কাসীর: **তাফসীরু আল-কুরআনিল 'আযীম, (তাফসীরে ইবন কাসীর)**, ২য় সংস্ক., দারু তায়্যিবাতি লিন-নশর, ১৪২০/১৯৯৯।
১৪. 'আল্লামা আবু জা'ফর আত-তাহাভী, মুহাম্মদ ইবন জারীর ইবন ইয়াযীদ ইবন কাসীর ইবন গালীব আল-আমালী: **আল-জামি'উল বায়ান ফী তাবীলুল কুরআন**, ১ম. সংস্ক. মুয়াসসিসাতুর রিসালাহ, ২০০০/১৪২০।
১৫. আবুল হাসান 'আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন ইব্রাহীম ইবন 'উমর আশ-শায়হী খায়েন: **লুবাবুত তাবীল ফী মা'আনিত তানযীল**, প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি।
১৬. আবুল কাসিম মাহমূদ যামাখশারী: **আল-কাশশাফ 'আন হাকা'ইকিত তানযীল**, কলিকাতা: ১৯৫৬।
১৭. ইবন 'আসুর: **আত তাহযীর ওয়াত তানওয়ীর**, খ. ১৪তম, প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি।
১৮. আবুস সা'উদ মুহাম্মদ, আল-'ইমাদী: **আত-তাফসীর**, দারু ইহয়া'ইত তুরাসিল 'আরাবী, বৈরুত: তা.বি।
১৯. ইবন 'আবদিল বার, আবী 'উমর: **জামি'উ বায়ানিল ইল্ম ওয়া ফাদলাহ**, মিশর: ইদা'রাতুল মাতবা'আতিল মুনীরিয়াহ, তা.বি।
২০. জালালুদ্দীন সুয়ুতী ও জালালুদ্দীন মাহাল্লী: **তাফসীরু জালালাইন**, লাহোর: কাশ্মীরী বাজার, তা.বি।
২১. আশ-শাওকানী, মুহাম্মদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ: **ফাতহুল কাদীর**, বৈরুত: দারুল মা'আরেফাহ, তা.বি।
২২. ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ: **উলুমুল-কুরআন**, রাজশাহী: আল-মাকতাবাতুশ-শাফিয়া, ১৪১১, ২০০১ খ্রি.।
২৩. বাদরুদ্দীন মুহাম্মদ যারাকশী: **আল-বুরহান ফী উলুমিল কুরআন**, প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি।
২৪. মুহাম্মদ সুলায়মান সালমান মানসূরপুরী: **রাহমাতুল লিল 'আলামীন**, দিল্লী: ই'তিকাদ পাবলিসিং হাউস, ১৯৮০ খ্রি.।
২৫. মুফতী মুহাম্মদ শফী': **মা'আরিফুল কোরআন**, অনুবাদ ও সম্পাদনা: মাও. মুহী উদ্দীন খান, মদীনা মুনাওয়ারাহ: খাদেমুল হারামাইন শরীফাইন, বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি.।
২৬. সালেহ 'আলী আল-'উদ ও অন্যান্য: **তাহরীমু কিতাবতিল কুরআন**, আল-মামলাকাতুল 'আরাবিয়াহ আস-সা'উদিয়াহ, ১৪১৬ হি.।

২৭. ‘আলী ইব্ন আহ্মদ আল-ওয়াহেদী আবুল হাসান: *আল-ওয়াজীয ফী তাফসীরিল কিতাবিল ‘আযীয*, প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি।
২৮. হুসায়ন ইবনু মুহাম্মদ আর-রাগিব ইস্পাহানী: *আল-মুফরাদাতু ফী গারীবিল কুরআন*, করাচী: কারখানায় তেজারতে কুতুব, তা.বি।
২৯. Hitti, Philip K, *History of the Arabs*, (Newyork: Martinis Press, 1968).

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নৈতিক শিক্ষা: কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিয়োগ

রীতা রানী ধর *

প্রতিপাদ্যসার: শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আমাদের প্রধান এবং পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছর হল গীতা পরিপূর্ণভাবে বর্তমান আকারে প্রচারিত হচ্ছে। দ্বাপর যুগে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রিয় সখা অর্জুনকে গীতার অমৃতজ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে সারাবিশ্বের সনাতন ধর্মাবলম্বী মানুষ এই জ্ঞান এবং নৈতিক শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছে। এই গীতা সর্বশাস্ত্রের শিরোভূষন এবং সমানভাবে সর্বসম্প্রদায়ের কাছে গ্রহণীয়। গীতা শুধু পাঠ করার জন্য পড়লে হয় না। এই শাস্ত্রের অর্থ এবং নীতি-আদর্শগত শিক্ষা অনুধাবন করে তা আমাদেরকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে হবে। তবেই গীতা পাঠ করা সার্থক। আলোচ্য প্রবন্ধে গীতার নৈতিক শিক্ষার উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উৎপত্তি ও ইতিকথা : শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বহু প্রাচীন কাল থেকে হিন্দু ও বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী আপামর জনসাধারণের কাছে একটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হিসেবে সমাদৃত হয়ে আসছে। আজ থেকে হাজার হাজার বছর পূর্বে দ্বাপর যুগে শ্রীগীতার এ অমৃত বাণী কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ব্যক্ত করেছিলেন। অবশ্য শ্রীগীতার উৎপত্তি আরও অনেক প্রাচীন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের সূচনায় এর উৎপত্তি ও ইতিকথা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে উল্লেখ দেখা যায়। শ্লোকটির শব্দার্থ অনুবাদ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে এ ধর্মগ্রন্থটির উৎপত্তি সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উৎপত্তির শ্লোক ও অনুবাদ :

শ্রীভগবান উবাচ

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবান্‌মব্যয়ম্।

বিবস্বান্‌ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষাকবেহুবীহ। ৪/১

অনুবাদ : পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন- আমি পূর্বে সূর্যদেব বিবস্বানকে এই অব্যয় নিক্রাম কর্মসাধ্য জ্ঞানযোগ বলেছিলাম। সূর্য তা মানব জাতির জনক মনুকে বলেন এবং মনু তা ইক্ষাকুকে বলেছিলেন (বসাক ১৩)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উৎপত্তির ইতিহাস অতি পুরাতন। পরমেশ্বর ভগবান নিজেই শ্রীগীতার ইতিহাস বর্ণনা করছেন। সূর্যকে একটি শক্তিরূপে কল্পনা করে প্রাচীন কাল থেকে তাঁকে দেবতা হিসেবে মনে করা হত। তিনি সকল গ্রহের রাজা। অশেষ তেজবিশিষ্ট এবং জগতের চক্ষুরূপ। মানুষ যেমন চক্ষু ব্যতীত কোন কিছু দেখতে পায় না তেমনি সূর্য ছাড়া সারা পৃথিবী অন্ধকার। তিনি অন্যান্য গ্রহকে তাপ ও আলো দান করেন। ভগবান অতি কৃপা করে প্রথম শিষ্যরূপে সূর্যদেব (বিবস্বান) কে গ্রহণ করেন এবং তাঁকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সমুদয় জ্ঞান দান করেছিলেন এবং পরবর্তীতে বিবস্বানের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রহের রাজাদেরকেও তা দিয়েছিলেন। পৃথিবীতে যখন ত্রেতা যুগের শুরুতে ভগবৎ জ্ঞান বিবস্বান (সূর্যদেব) মানব জাতির জনক মনুকে দান করেন। মনু পরবর্তীকালে এই তত্ত্বজ্ঞান তাঁর পুত্র সসাগরা পৃথিবীর অধিশ্বর এবং রঘু বংশের জনক ইক্ষাকুকে দান করেন।

* সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রঘু বংশে শ্রীরামচন্দ্র আবির্ভূত হন। অতএব এই শ্রীগীতার তত্ত্ববাণীর জ্ঞান গুরু থেকে শিষ্যতে পরম্পরাক্রমে ধারাবাহিকভাবে প্রচারিত ও প্রবাহিত হয়ে আসছে। কিন্তু এক সময় এই পরম্পরা ছিন্ন হয়ে যায় এবং এই জ্ঞান আমরা হারিয়ে ফেলেছি। তাই ভগবান নিজে এসে আবার এই জ্ঞান দান করলেন।

ভগবান যখন সূর্যদেব বিবস্বানকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শোনান তখন অর্জুনও অন্য কোন রূপে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ভগবানের সাথে অর্জুনের পার্থক্য হচ্ছে যে, অর্জুন তা ভুলে গেছেন। কিন্তু ভগবান তা ভোলেননি। তাই ভগবান শ্রীগীতার ৪র্থ অধ্যায়ের ৫ম শ্লোকে বলেছেন

শ্রীভগবান উবাচ

বহুনি মে ব্যাতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।

তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেথ পরন্তপ ॥ ৪/৫

অনুবাদ : পরমেশ্বর ভগবান বললেন- হে পরন্তপ অর্জুন, আমার এবং তোমার বহু জন্ম অতীত হয়েছে। আমি সেই সমস্ত জন্মের কথা স্মরণ করতে পারি কিন্তু তুমি পারো না ৯(বসাক ১৪)।

তাৎপর্য : উপর্যুক্ত শ্লোকের অনুবাদ থেকে অনুধাবন করা যায় যে, মানুষ কখনো পূর্ব জন্মের ঘটনা প্রবাহ জানতে পারে না। তাই দ্বাপর যুগে অর্জুন কুরুক্ষেত্র ধর্মযুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাঁর বিপক্ষীয় কুরুবংশের আত্মীয় স্বজনদের বধ করে রাজ্য লাভ করতে কিছুতেই রাজী হচ্ছিলেন না। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই পূর্বে প্রচারিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বাণী পুনরায় শোনানোর কারণে অর্জুনের জ্ঞান ফিরে আসে এবং যুদ্ধ করতে মনস্তির করলেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উৎপত্তির সময় :

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উৎপত্তির ইতিকথা বিশ্লেষণ করলে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সকল ঘটনা প্রবাহ অতি প্রাচীন যুগের। অন্য কোন উৎস থেকে এ ঘটনা প্রবাহের সময় জানা না গেলেও বিভিন্ন প্রমাণ, ঘটনা অনুষ্ঠিত হওয়ার অবস্থান ও পৌরণিক গ্রন্থ থেকে এ পবিত্র ধর্মগ্রন্থ উৎপত্তির সময় নির্ধারণ করতে হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতার রূপে দ্বাপর যুগে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী যুগ চারটি যথা: সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। প্রতিটি যুগে মানুষের পৃথক পৃথক কার্যাবলী, ধর্মাভাব ও আচরণবিধি পরিলক্ষিত হয়েছিল, যাকে বলা হয় যুগধর্ম। নিম্নে চারটি যুগধর্মের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হলো। (বসাক ১৫)

(ক) সত্যযুগ : এ যুগের ব্যাপ্তিকাল ১৭ লক্ষ ২৮ হাজার বছর। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথি এ যুগের মৎস্য (মাছ), কূর্ম (কচ্ছপ), বরাহ (শূকর), ও নৃসিংহ (অর্ধেক নর ও অর্ধেক সিংহ) প্রমুখ এ যুগে ভগবান চারটি অবতার রূপে পৃথিবীতে এসেছিলেন। এ যুগে বলি, বেন, মাক্কাতা, পুরুরবা, ও কার্তবীর্য- এ ছয় জন রাজা ছিলেন।

সত্য যুগের বৈশিষ্ট্যসমূহ :

১। সত্যযুগে চতুস্পাদ অর্থাৎ পুরোটাই ধর্ম ছিল। সত্য পূর্ণভাবে বিরাজমান ছিল। কেউ শাস্ত্র নিষিদ্ধ উপায়ে অর্থ বা বিদ্যা লাভের চেষ্টা করতেন না।

২। তপস্যাই ছিল এ যুগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

৩। মানুষের আয়ু ছিল ৪০০ বছর। কোন রোগ, দুঃখ ও শোক ছিল না।

৪। মানুষের সকল কামনা পূর্ণ হতো। সকল মানুষ ছিল পুণ্যবান।

৫। মেঘ সময়মত বারি বর্ষণ করত এবং বৃক্ষরাজি ছিল ফলভারে অবনত।

৬। এ যুগের মানুষ দেবতুল্য ছিল।

৭। পরের দ্রব্যকে দেখতো মাটির টেলার মত। চোর, মিথ্যাবাদী বা প্রতারক এ যুগে ছিল না।

৮। এ যুগে অকাল মৃত্যু ছিল না। এমনকি ছিল না রোগভয় ও দুর্ভিক্ষ।

৯। এ যুগে পৃথিবী অতি শস্যশালিনী ছিল।

(খ) ত্রেতা যুগ : এ যুগের ব্যাপ্তিকাল ১২ লক্ষ ৯৬ হাজার বছর। অবশ্য মতান্তরে ত্রেতাযুগের ব্যাপ্তিকাল ১২ লক্ষ বছর। এ যুগের বামন , পরশুরাম ও রাম-এ তিনজন অবতার ছিলেন। সূর্য বংশীয় বাহুক, ককুৎস্থ, ত্রিশঙ্কু, হরিশ্চন্দ্র, মরুত, অনরণ্য, সগর, অংশুমান, রঘু, অজু, দশরথ ও রামচন্দ্র এ যুগে রাজত্ব করেন।

ত্রেতাযুগের বৈশিষ্ট্যসমূহ :

১। এযুগে ধর্মের এক পাদ অর্থাৎ চারভাগের এক ভাগ কমে যায়। এযুগ থেকে অধর্মের সূচনা হয়। এযুগে পুণ্য ত্রিপাদ ও পাপ একপাদ।

২। অধর্মদ্বারা মানুষ ধন ও বিদ্যাাদি এ যুগে অর্জন করতে থাকে।

৩। মানুষের আয়ু ১০০ বছর কমে যায় অর্থাৎ মানুষের মোট বয়স দাঁড়ায় ৩০০ বছর।

৪। এ যুগের প্রধান ধর্ম জ্ঞান।

৫। মহানির্বাণ তন্ত্রের মতে, মানুষ বেদ নির্দেশিত কর্ম দ্বারা ইষ্টসাধনে অসমর্থ হন। ফলে চিন্তা বেড়ে যায়।

৬। এ যুগে মহাদেব বেদধর্মময় স্মৃতিশাস্ত্র প্রবর্তন করেন।

৭। বেদ অধ্যয়নে অক্ষম লোকেরা স্মৃতিশাস্ত্রের চর্চা করে মনুষ্যগণকে দুঃখ, শোক ও পাপ থেকে উদ্ধার করেছিলেন।

(গ) দ্বাপর যুগ : এ যুগের ব্যাপ্তিকাল ৮ লক্ষ ৬৪ হাজার বছর এবং মতান্তরে তা ৮ লক্ষ বছর। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা একাদশীর দিন বৃহস্পতিবার দ্বাপর যুগের সূচনা হয়। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম এ যুগের অবতার। বলরাম এ যুগের অনন্তাবতার। মতান্তরে বলরামকে বিষ্ণুর অবতার বলেও অনেক ধর্মবেত্তা মনে করে থাকেন। শাল্ব, বিরাট, হংসধ্বজ , কংস, ময়ূরধ্বজ, বদ্রস্বাহন, রুক্মঙ্গদ, দুর্যোধন, যুধিষ্ঠির, পরীক্ষিত, জনমেজয়, বিষ্ণুকর্কসেন, শিশুপাল, জরাসন্ধ, উগ্রসেন প্রমুখ এ যুগের রাজা ছিলেন।

দ্বাপর যুগের বৈশিষ্ট্যসমূহ :

১। দ্বাপর যুগে অর্ধপুণ্য ও অর্ধপাপ। অর্থাৎ এ যুগে মানুষ অর্ধেক মাত্র ধর্ম পালন করতে শুরু করলেন।

২। মানুষের আয়ু আরও ১০০ বছর কমে মাত্র ২০০ বছর হলো।

৩। যজ্ঞ ছিল এ যুগের প্রধান ধর্ম।

৪। স্মৃতিসম্মত ক্রিয়াক্রাস পায়।

৫। মনুষ্যগণ নানা প্রকার ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়।

৬। অধর্মের অংশ অর্ধেক হওয়ায় পৃথিবীতে বহু অন্যায় ও পাপাচার দেখা দেয় এবং রাজাগণ অত্যাচারী হয়ে উঠেন।

৭। অত্যাচারী রাজাদের মধ্যে ছিলেন হস্তিনাপুরের দুর্যোধনসহ শত ভ্রাতা, মথুরার রাজা কংস, মগধের রাজা জরাসন্ধ, চেন্দিরাজ শিশুপাল প্রমুখ। এদের অত্যাচারে পৃথিবী ভারাক্রান্ত হয়।

৮। উপরিক্ত অত্যাচারী রাজাদের হত্যা ও দমন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে ধর্ম সংস্থাপন করেন।

৯। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধার্মিক অর্জুনের রথের সারথি হয়ে শ্রীগীতার অমৃতবাণী ঘোষণা করেন।

(ঘ) কলিযুগ : কলিযুগের ব্যাপ্তিকাল ৪ লক্ষ ৩২ হাজার বছর। বর্তমানে এ যুগের ৫ হাজার বছর চলছে বলে ধারণা করা হয়। ৩১০১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে এ যুগের আরম্ভ হয়েছে। এ যুগের শেষে বিষ্ণু কল্কি অবতার রূপে আবির্ভূত হবেন এবং দুষ্কৃতিকারীদের বিনাশ করে ধর্মরাজ্য স্থাপন করবেন। তারপর পুনরায় সত্যযুগের আরম্ভ হবে। দ্বাপর যুগের অবসানে ব্রহ্মার পৃষ্ঠদেশ হতে অধর্মের সৃষ্টি হয়।

কলিযুগের বৈশিষ্ট্যসমূহ :

- ১। কলিযুগে চারভাগের তিনভাগ অধর্ম ও এক ভাগ মাত্র ধর্ম পালন করা হবে।
- ২। দ্বাপর যুগে মানুষের যে আয়ু ২০০ বছর ছিল তা থেকে ১০০ বছর কমে ১০০ বছর হয়।
- ৩। মহারাজ পরীক্ষিতের সময় থেকে এ যুগ শুরু হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয় এবং তা এখনও চলছে।
- ৪। ভাগবতে বলা আছে ছলনা, মিথ্যা, আলস্য, নিদ্রা, হিংসা, দুঃখ, শোক, ভয়, দীনতা, প্রভুত্ব হবে এ যুগের বৈশিষ্ট্য।
- ৫। বিষ্ণু পুরাণের মতে ধনের অধিকারী হয়ে মানুষ এ যুগে বেশি গর্ব করবে। ধর্মের জন্য কেউ অর্থ খরচ করবে না।
- ৬। বেদবাক্যে মানুষের আকর্ষণ থাকবে না।
- ৭। মাতাপিতাকে মানবে না। পুত্র পিতৃহত্যা ও পিতা পুত্রহত্যা করতেও কুণ্ঠিত হবে না।
- ৮। এ যুগের প্রধান গুণ হচ্ছে কম পরিশ্রমে মানুষ পুণ্য অর্জন করবে।
- ৯। দান করাই হবে এ যুগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম।
- ১০। এ যুগের পঞ্চদশ শতকে ধর্ম রক্ষার জন্য মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব এ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে অস্পৃশ্যতা দূর করেছিলেন।
- ১১। চৈতন্য মহাপ্রভুর মতে, হরিনাম সংকীর্তনই হবে কলিযুগের একমাত্র ধর্ম।

উপর্যুক্ত যুগধর্মগুলো বিশ্লেষণ করে প্রভুপাদ মত প্রকাশ করেছেন যে, বর্তমানে কলিযুগের পাঁচ হাজার বছর চলছে। এ যুগের স্থায়িত্ব হচ্ছে ৪ লক্ষ ৩২ হাজার বছর। কলিযুগের পূর্বযুগটা ছিল দ্বাপর যুগ যার স্থায়িত্ব ছিল ৮ লক্ষ (মতান্তরে ৮ লক্ষ ৬৪ হাজার) বছর। দ্বাপর যুগের পূর্বযুগটা ছিল ত্রেতা যুগ। ত্রেতা যুগের ব্যাপ্তিকাল ছিল ১২ লক্ষ (মতান্তরে ১২ লক্ষ ৯৬ হাজার) বছর। এ ভাবে প্রায় ২০ লক্ষ ৫ হাজার (মতান্তরে ২১ লক্ষ ৬৫ হাজার) আগে মানব জাতির জনক মনু তার পুত্র এ পৃথিবীর অধিশ্বর ইক্ষ্বাকুকে কোন এক সময় ভগবৎগীতার জ্ঞান দান করেছেন (বসাক ২২)।

মনুর জন্মের সময় যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিবস্বানকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার জ্ঞান দান করেছিলেন বলে মনে করা হয় তাহলে গীতা প্রথম বলা হয়েছিল ১২ কোটি ৪ লক্ষ বছর আগে এবং মানব সমাজে এ জ্ঞান ২০ লক্ষ বছর ধরে বর্তমান রয়েছে। আজ থেকে প্রায় ৫ হাজার বছর পূর্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবার এ জ্ঞান পুনরায় অর্জুনকে দান করেন। গীতার বক্তা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্য ও বর্ণনা অনুযায়ী এ হচ্ছে গীতার ইতিহাস। অবশ্য পৌরাণিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে জানা যায় যে, প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতেরা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের কিছু বেশি বলে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন- মহাভারত খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় অব্দ থেকে পঞ্চম অব্দের মধ্যে রচিত হয়েছে।

বেদ সনাতন ধর্মের প্রথম মূল ধর্মগ্রন্থ। এই বেদ প্রাচীনত আর্য ধর্মের আর্যসভ্যতার অকৃত্রিম প্রতিচ্ছবি। বেদের ঋক্ বা মন্ত্রগুলো প্রায় সমস্তই ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য, বরুণ প্রভৃতি বৈদিক দেবতাদের স্তবস্ততিতে পূর্ণ। এ সকল মন্ত্র দ্বারা প্রাচীন আর্যগণ দেবতাদের উদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞ করে অভীষ্ট প্রার্থনা করতেন। কিন্তু পরমেশ্বরের জ্ঞান ব্যতীত কেবল কর্মদ্বারাই মোক্ষলাভ হয়, এ মতবাদ সকলের গ্রাহ্য না। আর্য-মনীষীরা এসকল কর্মকাণ্ডে অধিক দিন সম্ভ্রষ্ট থাকতে পারলেন না। অমৃতের সন্ধানের অনুসন্ধিৎসু আর্য-ঋষিগণ শীঘ্রই বেদার্থচিন্তায় নিমগ্ন হয়ে স্থির করলেন যে, নামরূপাত্মক দৃশ্য-প্রপঞ্চের অতীত যে নিত্যবস্তু, জ্ঞানযোগে তাঁকেই জানতে হবে কারণ, বেদ শুধু বিশেষ গ্রন্থ নয়। ইহা একটি সমগ্র সাহিত্য সূচিত করে। এই সাহিত্যকে মোটামুটি চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়-সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। বৈদিক ধর্মের দুইটি স্বরূপ কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ নিয়ে বেদের কর্মকাণ্ড আর আরণ্যক ও উপনিষদ নিয়ে বেদের জ্ঞানকাণ্ড। এই উপনিষদ হচ্ছে বেদের অন্ত বা শেষ ভাগ। এজন্য উপনিষদের আরেক নাম বেদান্ত।

সাংসারিক জীবনের ধন, যশ, মান, প্রতিপত্তির প্রতি বীতস্পৃহা এবং উদাসীন এক শ্রেণির লোক জীবনের প্রকৃত গূঢ় অর্থ নির্ধারণে উৎসুক হয়ে সংসার ত্যাগপূর্বক এ বিষয়ে অরণ্যে বসে গভীর ধ্যান-ধারণা করতেন। তাদের চিন্তাপ্রসূত উক্তিগুলিই উপনিষদে স্থান পেয়েছে। তাঁদের শিষ্য-প্রশিষ্যেরা তাঁদের পদপ্রান্তে বসে শিক্ষালাভ করতেন। এবং নিজেরাও গুরুর নিকট লব্ধ জ্ঞানের ও সাধনার অনুশীলন করে এই চিন্তাধারার উৎকর্ষ সাধন করেন। উপনিষদ হচ্ছে গুরুর নিকট বসে অর্জিত সেই সাধনার জ্ঞান। এরূপে ক্রমে বহু সংখ্যক উপনিষদের সৃষ্টি হয়। উপনিষদে যে তত্ত্বজ্ঞান বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে যেসকল বিষয় হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠ অংশ বলে গৃহীত হয় এবং পরবর্তীকালে যে সমুদয় ধর্ম ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তা এই উপনিষদের ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। “শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা” আজ সমগ্র হিন্দুজাতির শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ বলে বিবেচিত ও সম্মানিত হয় তা উপনিষদ গ্রন্থাবলীর সারমাত্র বলে মনে করা হয়। গীতায় বলা হয়েছে-

সর্বোপনিষদো গাবো দোক্ষা গোপালনন্দনঃ
পার্থো বৎস : সুধীর্ভোজ্ঞা দুষ্কং গীতামৃতং মহৎ” ।। ৪

অর্থাৎ বহু উপনিষদ রূপ গাবীর দুষ্ক দোহন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার সারাংশ দ্বারা “শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা” রূপ ক্ষীর প্রস্তুত করে হিন্দুর বিশিষ্ট ভোজনসামগ্রী প্রস্তুত করেছেন। আবার গীতায় প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে “ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে” একথাটা লেখা আছে, এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, গীতা সকল উপনিষদের সারবস্তু। গীতা কোন সম্প্রদায় বিশেষের ধর্মগ্রন্থ নয়, এটা মানব-ধর্মগ্রন্থ। গীতায় সার্বভৌম ধর্মোপদেশ, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলেই তা গ্রহণ করতে পারে। এখন অষ্টাদশ অধ্যায়ে রচিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিয়োগ এই তিনটি অধ্যায় পর্যায়ক্রমে সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করা হবে।

কর্মযোগ : সাংখ্যযোগ নামক দ্বিতীয় অধ্যায় শেষে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বর্ণনায় আত্মসংযম এবং কামনা ও অহঙ্কারভাব বর্জনাতি উপদেশ দিয়ে শ্রীভগবান বলেছেন স্থিতপ্রজ্ঞতাই-এই অবস্থাই-ব্রাহ্মীস্থিতি বা ব্রহ্মজ্ঞানে অবস্থান। পূর্বে একথাও বলেছেন যে, কর্ম অপেক্ষা সাম্যবুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ হয়, তখন অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন যে, কর্ম অপেক্ষা সাম্যবুদ্ধি যদি শ্রেষ্ঠ হয়, তবে আমাকে তুমি দারুণ হিংসাত্মক কর্মে নিযুক্ত করছ কেন?

সর্বকামনা বর্জনপূর্বক সাম্যবুদ্ধি লাভ করলেই তো জীবের মোক্ষলাভ হয়, কর্মের আবশ্যিকতা কি? তার উত্তরে শ্রীভগবান বললেন, যে সিদ্ধি লাভ হয় তাহা সমস্ত বুদ্ধি বা সম্যক জ্ঞানের ফলে, এই জন্যই তোমাকে কর্মোপদেশ দিচ্ছি অথচ সাম্যবুদ্ধির প্রশংসা করছি, ব্যতীত কর্ম নিকাম হয় না। কিন্তু জ্ঞান শ্রেষ্ঠ হওয়ায় কি তুমি কর্ম ত্যাগ করতে পার? প্রকৃতির গুণে বাধ্য হয়ে তোমাকে কর্ম করতে হবে। দেহধারী জীব একেবারে কর্ম ত্যাগ করতেই পারে না। যারা বাহ্যতঃ কর্ম ত্যাগ করে মনে মনে বিষয়-চিন্তা করে তারা মিথ্যাচারী, কিন্তু যারা ইন্দ্রিয়সকল সংযত করে অনাসক্তভাবে কর্ম করে, কর্ম ত্যাগ অপেক্ষা কর্মই শ্রেষ্ঠ। জগতের ধারণ-পোষণের জন্যই যজ্ঞাদি কর্মের সৃষ্টি হয়েছে। যে কর্ম যার পক্ষে বিহিত তাই তার পক্ষে যজ্ঞস্বরূপ। এইরূপ নিয়ত কর্ম অনাসক্ত চিত্তে ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে করতে পারলে তাই যথার্থ কর্ম হয়, সেটাতে বন্ধন হয় না। আত্মরাম আত্মতৃপ্ত জ্ঞানী পুরুষদের নিজের কোন কর্ম নাই। তাঁদের কর্ম কেবল লোক-শিক্ষার্থ ও লোক-সংগ্রহার্থই হয়।

জনকাদি রাজর্ষিগণ কর্ম দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করেছেন। আমিও লোক-শিক্ষার্থ স্বয়ং কর্মে ব্যাপ্ত আছি, তুমিও তাই কর। নিকাম কর্মের তিনটি লক্ষণ মনে রাখিও- (১) সর্বকর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ, (২) ফলাকাজ্জ্ঞা বর্জন এবং (৩) কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ। তাই তুমি মমত্ববুদ্ধি বর্জনপূর্বক যুদ্ধ কর।

ইন্দ্রিয়গণের অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে বিদ্বেষ অবশ্যজ্ঞাবী। তুমি রাগদ্বেষের বশবর্তী হইও না, তাহলেই ইন্দ্রিয়গণ তোমাকে বিপথে চালিত করতে পারবে না, তারা বশীভূত হবে। এইরূপ আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়গণদ্বারা স্বধর্ম সম্পাদন কর, স্বধর্ম পালন কর। স্বধর্ম অঙ্গহীন হলেও পরধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। লোকে কামনার বশবর্তী হয়ে পাপ আচরণ করে, স্বধর্ম ত্যাগ করে পরধর্ম গ্রহণ করে, কর্তব্যভ্রষ্ট হয়। কামনাই সকল অনর্থের মূল। উহা দুস্পূরণীয় ও দুর্জয়, শ্রেয়োমার্গের শত্রু। মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় উহার অধিষ্ঠান-ভূমি, সুতরাং তুমি বুদ্ধিরও উপরে অবস্থিত পরমাত্মা সম্বন্ধে সচেতন হও, ইন্দ্রিয়কল সংযমপূর্বক আত্মাকে আত্মজ্ঞানের প্রয়োগেই নিশ্চল করিয়া আত্মনিষ্ঠ হও, পরমেশ্বরে চিত্ত সমাহিত কর; তা হলেই কামনা জয় করতে পারবে, নিক্রাম কর্মযোগ সাধনে সিদ্ধিলাভ করতে পারবে।

পূর্ব অধ্যায়ে যে জ্ঞান ও কর্মের বিরোধের উল্লেখ করা হয়েছে, এই অধ্যায়ে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে সেই বিরোধেরই নিরসন করে জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় সাধন করা হয়েছে এবং জ্ঞানীদিগেরও নিক্রামভাবে যথাযথ কর্তব্য-কর্ম করা উচিত, পুনঃ পুনঃ এই উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কেবল তাই নয়, যারা অজ্ঞান, যারা সংসারসক্তিবশত কর্মে নিযুক্ত আছে, তাদেরকেও কর্ম হতে বিচলিত করা কর্তব্য নয়, এই উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই কর্মপ্রবণতার যুগে এরূপ উপদেশ আমাদের নিকট অনাবশ্যক বোধ হতে পারে। কিন্তু সেকালে সন্ন্যাসবাদের প্রভাব বড় বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং কর্মদ্বারা বন্ধন হয়, এই মতটি বড় প্রবল হয়েছিল। তাতে লোক সমাজের অনিষ্টের সম্ভাবনা ছিল। এই জন্যই শ্রীভগবান বলেছেন যে, আমার এই মত অনুসরণ করলেই কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হওয়া যায়। এটাই গীতোক্ত যোগ। এই বিষয়ের কিরূপে উদ্ভব হয়েছে এবং প্রচার হয়েছে, তা পরবর্তী অধ্যায়ের প্রথমে বলা হয়েছে।

কর্ম-মাহাত্ম্য ও কর্ম প্রেরণাই এই অধ্যায়ের প্রধান বর্ণিত বিষয়, সুতরাং এই অধ্যায়ের নাম কর্মযোগ।

জ্ঞানযোগ: তৃতীয় অধ্যায়ে নিক্রাম কর্মযোগের বর্ণনা করে শ্রীভগবান বললেন এই অব্যয় যোগ আমি আদি ক্ষত্রিয় রাজা বিবস্বানকে (সূর্যকে) বলেছিলাম। বিবস্বান স্বপুত্র মনুকে এবং মনু স্বপুত্র ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন। এইরূপে পুরুষপরম্পরায় প্রাপ্ত এই যোগ তোমাকে আমি বললাম। এই প্রসঙ্গে অর্জুনের প্রশ্নক্রমে শ্রীভগবান নিজ অবতার-তত্ত্বের ব্যাখ্যা করে বললেন,- যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি দেহ ধারণ করি। সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতদিগের বিনাশ ও ধর্মসংস্থাপনার্থ আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। আমার লীলাতন্দ্বেবর সম্যক অবধারণ করলে মানবের কর্মবন্ধন ছিন্ন হয়। জ্ঞানী, ভক্ত, কর্মী, সকাম- উপাসক, নিক্রাম উপাসক-যে আমাকে যে ভাবে ভজনা করে, আমি তাকে সেই ভাবেই তুষ্ট করি। এই প্রকৃতিভেদ-বশতঃই সংসারে কর্মবৈচিত্র্য ও উপাসনা পদ্ধতির বিভিন্নতা হয়। এই প্রকৃতিভেদে অনুসারেই আমি বর্ণভেদ বা কর্মভেদ করেছি-তাতেই চতুর্বর্ণের সৃষ্টি। আমি তার কর্তা হলেও তাতে লিপ্ত হই না বলে আমি অকর্তা। আমার এই নির্লিপ্ততা ও নিস্পৃহতা

বুঝতে পারলে মানুষ নিক্রাম কর্মের মর্ম বুঝতে পারে, তার কর্মও নিক্রাম হয়। পূর্ববর্তী জনকাদি রাজর্ষিগণ কর্তৃত্বাভিমান বর্ষনপূর্বক নির্লিপ্তভাবে কর্তব্য-কর্ম সম্পাদন করে গিয়েছেন, তুমিও নিক্রাম ভাবে স্থায়ী কর্তব্য পালন কর। কর্মতত্ত্ব বড় দুরূহ, পণ্ডিতগণ তাতে মোহ প্রাপ্ত হন। যিনি কর্মে অকর্ম দর্শন করেন, অর্থাৎ যিনি কর্ম করেও মনে করেন “আমি” কিছুই করি না, তিনিই বুদ্ধিমান, কেননা কর্তৃত্বাভিমান বর্জন-হেতু তাঁহার কর্মও অকর্মস্বরূপ হয়। আবার অনেকে আলস্য-বুদ্ধিতে বাহ্য-কর্মত্যাগ করে, কিন্তু কামনা ত্যাগ করতে পারে না, তাদের অহংবুদ্ধিও ঘুচে না; এই যে কর্ম ত্যাগ বা অকর্ম ইহা প্রকৃতপক্ষে কর্ম, কেননা ইহা বন্ধনের কারণ। যিনি এইরূপ অকর্মে কর্ম দর্শন করে তিনিই বুদ্ধিমান। বস্তুত যিনি ফলাকাজ্জবর্জিত, রাগদ্বেষাদিমুক্ত, যার চিত্ত ব্রহ্মজ্ঞানে অবস্থিত, তিনি

ঈশ্বরপ্রীতার্থ বা লোকসংগ্রহার্থ কর্ম করিলেও তাঁর কর্মফলের সহিত নিঃশেষ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, যা বন্ধনের কারণ হয় না।

এই ত্যাগমূলক কর্মকেই 'যজ্ঞ' বলে। দ্রব্যসাধ্য যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ তখন হয়, যখন যজ্ঞাঙ্গগুলিকে ব্রহ্মবোধ করা যায়। যিনি যজ্ঞ করতে বসে শ্রুবাদি কিছুই দেখতে পান না, সর্বত্রই ব্রহ্ম দর্শন করে, ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই ভাবনা করতে পারে না, ব্রহ্মে একাগ্রচিত্ত সেই যতিপুরুষ ব্রহ্মই প্রাপ্ত হয়, এটাই কর্মযোগের শেষ কথা। এই অবস্থায় কর্ম ও জ্ঞান এক হয়ে যায়- 'সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে'। এই জ্ঞান লাভ হলে সমস্ত কর্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সকল পাপ বিনষ্ট হয়। তত্ত্বজিজ্ঞাসু হয়ে গুরুপদে প্রণাম আত্মবিষয়ক প্রশ্ন ও গুরুসেবাদি জ্ঞানলাভের বহিরঙ্গ সাধন। শ্রদ্ধা, একনিষ্ঠা ও আত্মসংযম-এইগুলি জ্ঞানলাভের অন্তরঙ্গ সাধন। চিত্তের সংশয়ই সকল অনর্থের মূল, গুরু-বেদান্তবাক্যাদিতে ঐকান্তিক শ্রদ্ধা না জন্মিলে জ্ঞান লাভ হয় জ্ঞান লাভ হয় না, সংশয় ও বিদূরিত হয় না। নিকাম কর্মযোগ দ্বারা যাঁহার কর্ম ঈশ্বরে অর্পিত হয়েছে, আত্মজ্ঞানের দ্বারা যাঁহার সংশয় বিদূরিত হয়েছে, সেই জীবনুজ্ঞ পুরুষ কর্ম করিলেও কর্মফলে আবদ্ধ হন না। সুতরাং অজ্ঞানসম্ভূত হৃদয়স্থ সংশয়রাশি জ্ঞানরূপ খড়্গদ্বারা ছেদ করে নিকাম কর্মানুষ্ঠান কর, স্বধর্ম পালন কর, যুদ্ধ কর। তাতে তোমার পাপ স্পর্শিবে না, জ্ঞানীর কর্মবন্ধন নাই।

এই অধ্যায়ে উল্লিখিত কয়েকটি বিশিষ্ট তত্ত্ব এই-

১। শ্রীগীতায় যে যোগধর্ম অর্জুনকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তার প্রকৃত স্বরূপ কি? এই অধ্যায়ের প্রথম তিন শ্লোকে শ্রীভগবান বলেছেন যে, এই যোগ আমি পূর্বে সূর্যকে বলেছিলাম। দীর্ঘকালবশে তা লোপ পেয়েছে, সেই পুরাতন যোগ আমি তোমাকে পুনরায় বললাম। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, এই যোগ শ্রীগীতার সম্পূর্ণ নিজস্ব, এটা একটি বিশিষ্ট ধর্মমত। তৎকালীন প্রচলিত জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ বা ধ্যানযোগ-এ সকল কিন্তু না, অথচ এই সকল মতের সারতত্ত্ব যা তা এর মধ্যে আছে। সেই সূত্র ধরে প্রচলিত কোন মতবাদের সাহায্যে বা পরিপোষণার্থ এর ব্যাখ্যা করলে তা শ্রীগীতার ব্যাখ্যায় নানারূপ মতভেদ ঘটেছে। ভূমিকায় 'গীতোক্ত ধর্মের প্রাচীন স্বরূপ' এবং পরে গীতোক্ত যোগী ও যোগধর্মী দ্রষ্টব্য।

২। এই অধ্যায়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় অবতার-তত্ত্ব। যুগাবতার কি, অবতারের উদ্দেশ্য ও কর্ম কি, এ সকল বিষয়ে নানারূপ মতভেদ আছে। শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত বাক্যে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়েছে।

৩। এই অধ্যায়ে বর্ণিত আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় চতুর্বর্ণের উৎপত্তি। আমরা হিন্দু-সমাজে যে বর্তমান জাতিভেদ প্রথা দেখি তার কিরূপে উৎপত্তি হল? সেটার মূল কোথায়? এ সম্বন্ধে নানা শাস্ত্রে নানা কথা আছে। সে সকলের মধ্যে শ্রীগীতার কথাই বিশেষ প্রামাণিক এবং উহা প্রকৃতির গুণগত সৃষ্টিতত্ত্বের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, বর্তমান বংশগত জাতিভেদ ও শ্রীভগবানের কথিত গুণগত বর্ণভেদ ঠিক এক কথা নহে। এর আলোচনা তত্ত্বস্থলে দ্রষ্টব্য।

৪। এই অধ্যায়ের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় নিকাম কর্ম-তত্ত্ব এবং জ্ঞান-কর্মের সমুচ্চয়-যে আলোচনা তৃতীয় অধ্যায়ে আরম্ভ হয়েছে। অধ্যায়ের শেষ দুই শ্লোকে এ-কথাটি স্পষ্ট উল্লিখিত হয়েছে। অধ্যায়-শেষোক্ত ভণিতায় এই অধ্যায়ের নাম সাধারণত: জ্ঞানযোগ বলে উল্লিখিত হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, জ্ঞান ও জ্ঞানযোগ এক কথা নহে। নিকাম কর্ম জ্ঞানীর কর্ম। সেই হেতু নিকাম কর্মযোগের উপদেশ প্রসঙ্গে জ্ঞানের স্বরূপ এবং জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা আটটি শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে। কর্মযোগে সিদ্ধ পুরুষ এই জ্ঞান স্বয়ংই অন্তরে লাভ করেন, একথাও বলা হয়েছে। সুতরাং এই অধ্যায়কে 'জ্ঞানযোগ' নাম না দিয়ে 'জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়-যোগ' নাম দিলেই সুসঙ্গত হয়। কেউ কেউ 'জ্ঞানকর্ম-সন্ন্যাসযোগ' দিয়েছেন। এখানে কর্ম-সন্ন্যাস অর্থ ঈশ্বরে কর্ম-সমর্পণ। এ নামও সুসঙ্গত।

ভক্তিযোগ : একাদশ অধ্যায়ের শেষে শ্রীভগবান বললেন^১- যিনি সঙ্গবর্জিত ও মৎপরায়ণ হয়ে অনন্যভাবে আমাকে ভজনা করেন, তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন। এই কথা শ্রবণ করে অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন যে, 'তোমার' অর্থাৎ সগুণ ঈশ্বরের উপাসক এবং নির্গুণ অক্ষরোপাসক-তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

ভক্তিমার্গে সগুণ উপাসনার শ্রেষ্ঠতা- তদুত্তরে শ্রীভগবান বললেন, ভক্তিমার্গে নিত্যযুক্ত হয়ে যারা আমার সগুণ স্বরূপের উপাসনা, করেন তারাই শ্রেষ্ঠ, এই আমার মত। তবে যারা সংযতেন্দ্রিয় ও সর্ববিষয়ে সমতত্ত্ববুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে সর্বভূতহিতে নিরত থেকে অব্যক্ত ব্রহ্মচিন্তা করে, তারাও আমাকে প্রাপ্ত হন, কিন্তু অব্যক্তের উপাসনা দেহাভিমাত্রী জীবের পক্ষে অধিকতর আয়াসসাধ্য, কেননা দেহাত্মবোধ সম্পূর্ণ বিদূরিত না হলে নির্গুণ ভাবে স্থিতি লাভ করা যায় না। কিন্তু যারা সর্ব কর্ম আমাতে অর্পণ করে মচ্ছিত হয়ে অনন্যভক্তিযোগে আমার ব্যক্ত স্বরূপে উপাসনা করেন, আমি অচিরেই তাদেরকে সংসার হতে উদ্ধার করি, সুতরাং তুমি আমাতেই চিত্ত সমাহিত কর।

ব্যক্ত উপাসনার বিবিধ পথ-কর্মফল ত্যাগের শ্রেষ্ঠতা। মন একান্ত চঞ্চল বলে চিত্ত স্থির করা সহজ নয়। যদি আমাতে চিত্ত স্থির করতে না পার, তবে অভ্যাস দ্বারা বিক্ষিপ্ত চিত্তকে পুনঃ পুনঃ বিষয় হতে প্রত্যাহত করে আমাতে সমাহিত করতে চেষ্টা কর। যদি এই অভ্যাস-যোগেও অসমর্থ হও, তবে আমার প্রীতার্থে আমাতে ভক্তির উৎপাদক যে সকল কর্ম-যেমন সাধুসঙ্গ, ভগবত শাস্ত্রাদি পাঠ, আমার লীলাকথা শ্রবণ, গুণানুকীর্তন, পূজার্চনা ইত্যাদি কর্ম করে যাও, তাতেও সিদ্ধিলাভ করতে পারবে। যদি তাতেও তুমি অশক্ত হও, তবে মদ্যযোগে অর্থাৎ আমাতে কর্মার্পণরূপে যে যোগ তা আশ্রয় কর, পরে সংযতচিত্ত হয়ে ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে অনাসক্ত চিত্তে যথাপ্রাপ্ত কর্ম করতে থাক। জ্ঞানবর্জিত অভ্যাসযোগ অপেক্ষা জ্ঞানালোচনা শ্রেষ্ঠ, পরোক্ষ জ্ঞানালোচনা থেকে ইষ্টবস্তুর ধ্যান-ধারণা শ্রেষ্ঠ, আমার ফলাসক্ত চিত্তে ধ্যান-ধারণা অপেক্ষা ফলাসক্তি ত্যাগ করে সর্ব কর্ম করাই শ্রেষ্ঠ। কেননা ত্যাগ থেকেই পরম শান্তি লাভ হয়, সর্ব বিষয়ে সমতত্ত্ববুদ্ধি জন্মে।

এরূপ ত্যাগী ভক্তিমান কর্মযোগীর লক্ষণ কি এবং তিনি লোক ব্যবহারে কিরূপ আচরণ করেন তা শুন - আমার ভক্ত কাকেও ঘেঁষ করেন না, তিনি সকলের প্রতিই মিত্রভাবাপন্ন, দয়ালু ও ক্ষমাবান, তিনি সমবুদ্ধি ও অহঙ্কারবর্জিত, তিনি শত্রু-মিত্র, মান-অপমান, শীত-উষা, শুভ- অশুভ, নিন্দা-স্তুতি, হর্ষ-দ্বेष ইত্যাদি দম্ববর্জিত - সর্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন। তিনি উদাসীন হয়েও অনলস, গৃহে থাকিয়েও গৃহাদিতে মমত্ববুদ্ধিহীন। তুমি এই সকল গুণলাভে যত্নপর হও। যিনি মৎপরায়ণ হয়ে শ্রদ্ধা সহকারে এই অমৃততুল্য ধর্মের আচরণ করেন, তিনিই আমার পরমপ্রিয় ভক্ত। সে হেতু তাকে ভক্তিযোগ বলে।

গীতার নৈতিক শিক্ষা : সার্বভৌম ধর্মোপদেশ

গীতা কোন সম্প্রদায়-বিশেষের ধর্মগ্রন্থ নয়, ইহা মানব-ধর্মগ্রন্থ। গীতায় সার্বভৌম ধর্মোপদেশ জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলেই এটা গ্রহণ করতে পারেন। গীতার সেই সার্বজনীন উপদেশগুলি কি এবং সেই উপদেশের অনুবর্তী হয়ে কি ভাবে স্বকীয় ধর্মজীবন ও কর্মজীবন নিয়মিত করলে সকলেই ঐহিক ও পারলৌকিক কল্যাণ লাভ করতে পারেন, তাই এক্ষণে বিবেচ্য। সংক্ষেপে বলতে গেলে গীতোক্ত উপদেশের সারমর্ম এই-

১। ধর্মে উদারতা ২। কর্মে নিষ্কামতা ৩। জ্ঞানে ব্রহ্মসন্ধান সর্বভূতে ভগবদ্ভাব, ৪। যোগে বা ধ্যানে ভগবানে চিত্ত-সংযোগ, ৫। ভক্তিতে ভগবৎ শরণাগতি, ৬। নীতিতে আত্মোপম্যদৃষ্টি-সাম্যবুদ্ধি, ৭। উপাসনা- ভগবৎকর্ম, জীবসেবা, স্বধর্মপালন, ৮। সাধনা- ত্যাগানুশীলন। এ কথাগুলো সমগ্র গীতার সারোদ্ধার।

১। **ধর্মে উদারতা :** ধর্ম শব্দ “কোন বিশেষ সাম্প্রদায়িক মত বা সাধন-প্রণালী” এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ধর্মমত নিয়ে বাদ-বিতর্ক বিরোধ-বিদ্বেষ কেবল আমাদের দেশে নয়, সকল দেশেই আছে। আমাদের দেশে তবু এই

বিরোধ কেবল বিদ্বেষ-বহিঃ উদগীরণ করে ক্ষান্ত আছে, অন্যান্য দেশে ধর্মের নামে অমানুষিক নির্যাতন ও ভীষণ হত্যাকাণ্ড-সকল সংঘটিত হয়েছে। এটার কারণ, অনেক ধর্মোপদেষ্টাই বলেন- একমাত্র এই ধর্মই সত্য ও মুক্তিদায়ক, অন্য ধর্ম মিথ্যা। বিধর্মীকে পাশবিক শক্তিবলে স্বীয় ধর্মে দীক্ষিত করাও পুণ্যকর্ম বলে গণ্য হয়ে থাকে। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন সম্পূর্ণ বিপরীত কথা- “লোকে যে পথই অবলম্বন করুক সকল পথেই আমাতেই পৌঁছাবে যে আমাকে যে ভাবে ভজনা করে আমি তাকে সেই ভাবে সম্ভুষ্ট করি। অদ্বৈত জ্ঞান বা দ্বৈত ভক্তি, যে পথেই যাও সগুণ-নির্গুণ যেটাই চিন্তা কর, আমাকেই পাবে, কেননা মূলতত্ত্ব একমাত্র আমিই। জ্ঞান, ধ্যান, কর্ম, উপাসনা সকল মাগেই আত্মস্বরূপ আমাকে পাওয়া যায়। নিরাকারবাদী, সাকারবাদী, বৈষ্ণব, শাক্ত, হিন্দু, অহিন্দু-গীতোক্ত ধর্মে সকলেরই স্থান আছে।

২। কর্মে নিষ্কামতা : কর্মশিক্ষা, কর্ম-প্রেরণা, গীতার একটি বিশেষত্ব। গীতার এবং মহাভারতের অন্যান্য স্থলেও শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ কর্ম-মহাত্ম্য কীর্তন করেছেন, সনাতন ধর্ম-সাহিত্যে অন্যত্র তা অধিক দৃষ্ট হয় না। বস্তুত: প্রাচীন ভারতে কর্মকালই শ্রেষ্ঠ হয়েছিল- শৌর্যবীর্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, সুখসমৃদ্ধি, শিক্ষা-সভ্যতায় জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। কিন্তু বর্তমান ভারতবাসী, কর্মবিমুখ, অদৃষ্টবাদী, পুরুষকারহীন, বাক্যবাগীশ বলে উপহাস্যাম্পদ-এরা কেবল ‘ঘরেতে বসে গর্ব করে পূর্ব পুরুষের।’ পক্ষান্তরে দেখা যায়, যীশুখ্রীষ্ট সর্বত্রই সন্ন্যাসের উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু খ্রীষ্টীয় জগৎ এক্ষণে কর্মকেই সারসর্বস্ব করেছেন। খ্রীষ্টীয়ান বাইবেল গুটাইয়া রেখেছেন, আমরা গীতা ভুলিয়াছি। আমরা এক্ষণে পাশ্চাত্যের নিকট কর্ম-মহাত্ম্য শিক্ষা করছি, কর্ম-জীবনে তাঁরাই আমাদের আদর্শ-স্থানীয় হয়েছেন। কিন্তু সে আদর্শ গীতোক্ত কর্মের আদর্শ নয়, উহা ভারতীয় শিক্ষা-সভ্যতার সম্পূর্ণ বিরোধী। পাশ্চাত্যের কর্ম-জীবনের মূলে অভিমান, আত্মপ্রতিষ্ঠা, বিশ্বময় আমিত্বের প্রসার; গীতার কর্মসূত্রের মূল নিরভিমানিতা, অহংত্যাগ, জগতে সচ্চিদানন্দ প্রতিষ্ঠা। পাশ্চাত্য কর্মী রাজস্ব কর্তা-অশান্ত, ফলাকাজক্ষী, সুখাশ্রেষ্টী। গীতোক্ত কর্মযোগী সাত্ত্বিক কর্তা-নিষ্কা, সম, শান্ত, ‘দুঃখেযনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেযু বিগতস্পৃহাঃ’। পাশ্চাত্যের কর্ম-ভোগ, বন্ধন; গীতোক্ত কর্ম-যোগ, মোক্ষ-সেতু। অনেকে গীতোক্ত কর্মযোগের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পাঠকের মানসপটে পাশ্চাত্যের কর্ম-জীবনের উজ্জ্বল আদর্শ অঙ্কিত করে দেন। উহাতে গণেশ গাড়িতে বানর গআ হয়- ‘বিনায়কং প্রকুব্যাণো রচয়ামাস বানরম্।’ পাশ্চাত্যের কর্মসূত্রের যে উচ্চতম আদর্শ, তাঁহাও গীতোক্ত আদর্শের নিম্নে। কথাটা আরো একটু স্পষ্টীকৃত করা প্রয়োজন হয়েছে। ইংরেজীতে একটি সুন্দর কথা আছে-

‘I slept and dreamt that life was Beauty,
I woke and found that life was Duty’
ইহার ভাবানুবাদ এইরূপ করা হয়েছে-
‘নিদ্রায় দেখিনু হায়! মধুর স্বপন,-
কি সুন্দর সুখময় মানব-জীবন।
জাগিয়া মেলিনু আঁখি, চমকিনু পুনঃ দেখি-
কঠোর কর্তব্য বৃত্ত জীবন-যাপন (ঘোষ ২৭)।

এস্থলে কবি বলেছেন, জীবনকে সুখময় মনে করা স্বপ্ন দেখা মাত্র, জীবন কঠোর কর্তব্যময়। এটি অতি উচ্চ কথা, কিন্তু গীতার আদর্শ উচ্চতর। অবশ্য, কর্তব্য-জ্ঞান ও কর্মনিষ্ঠা পাশ্চাত্যের নিকট আমরা এক্ষণে শিখতে পারি, কেননা আমরা তমোগুণক্রান্ত, জড়ভাবাপন্ন, কর্মবিমুখ হয়ে পড়েছি। এক্ষণে প্রথমত: সমাজে রজোগুণের উদ্ভেকের প্রয়োজন এবং পাশ্চাত্য জাতিসমূহই উহার আদর্শস্বরূপ। এই ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েই অনেক আধুনিক কৃতবিদ্যা

ব্যক্তি গীতাকে কর্তব্যশাস্ত্র বলে থাকেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, কর্তব্যপালন ও কর্মযোগ ঠিক এক কথা নয়। কর্তব্যপালনে কর্তার অহংজ্ঞান থাকে, ফলের দিকে সাগ্রহ দৃষ্টি থাকে, অনেক সময় একটা কঠোরতার অনুভূতিও থাকে এবং সর্বদাই অন্যের প্রতি বাধ্যবাধকতার ভাব থাকে। কিন্তু গীতোক্ত কর্মযোগী ও সকলের উপরে। তিনি অনহংবাদী, মুক্তসঙ্গ, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্বিকার। তিনি আত্মারাম, আত্মতৃপ্ত; তাঁহার নিজের কোন কর্তব্য নেই, তিনি সমস্ত কর্তব্য ত্যাগ করে ভগবানে আত্মসমর্পণ করেছেন। ভগবানের কার্য তার মধ্য দিয়ে হচ্ছিল। কর্তা ঈশ্বর, তিনি যন্ত্রমাত্র; এই হেতুই তিনি অনাসক্ত বুদ্ধিতে যথাপ্রাপ্ত কর্ম করতে পারেন। কর্তব্যজ্ঞানের প্ররোচনা থাকতে একেবারে নিষ্কাম হওয়া যায় না।

কথা হচ্ছে এই, গীতা লৌকিক কর্তব্যকর্তব্য-নির্ণায়ক গ্রন্থ নয়, উহার কর্মোপদেশের সহিত গভীর অধ্যাত্মজ্ঞান ও ঐকান্তিক ভগবদ্-ভক্তি মিশ্রিত। কিন্তু পাশ্চাত্যগণ কর্মতত্ত্বের বিচার করে কেবল আধিভৌতিক দৃষ্টিতে; আত্মা, ঈশ্বর, বন্ধ, মোক্ষ, জ্ঞান-ভক্তির সহিত তার কোন সম্পর্ক নাই। পাশ্চাত্য জার্মান-পণ্ডিত নিৎসে কর্ম-মাহাত্ম্য বা শক্তি-সাধনা, যুদ্ধের কর্তব্যতা, আদর্শ মনুষ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক তাত্ত্বিক বিচার করেছেন এবং তৎপ্রসঙ্গে বলেছেন যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে পরমেশ্বর গতাসু হয়েছেন এবং ভবিষ্যৎ আদর্শ মানব-সমাজে খ্রীষ্টের স্থান নাই। গীতায়ও আদ্যোপান্ত কর্মপ্রেরণা, যুদ্ধপ্রেরণা, কিন্তু গীতায় শ্রীভগবান এতৎ প্রসঙ্গে কি বলেছেন? “মামনুষ্মর যুদ্ধ চ’-আমাকে স্মরণ কর আর যুদ্ধ কর, আমাতে চিন্ত রাখ, ফলাশা ত্যাগ কর, আমাতে কর্ম অর্পণ কর, আর যুদ্ধ কর ইত্যাদি। ‘গীতায় আদ্যোপান্ত ঈশ্বরবাদ। পাশ্চাত্যের সর্বোচ্চ আদর্শ ‘অধিক সুখ’। গীতার উপদেশ-সুখদুঃখের অতীত হও-নির্দ্বন্দ্ব, নিত্যসত্ত্বস্থ নির্যোগক্ষেম এবং আত্মবান হও। এটাই অধ্যাত্মতত্ত্বের শেষ কথা। বস্তুতঃ নিষ্কাম কর্ম মানবীয় কর্ম নয়, ঐশ্বরিক কর্ম, উহাতে ঐশ্বরিক প্রকৃতি লাভ করতে হয়। সামাজিক কর্তব্যজ্ঞানের সহিত তার তুলনা হয় না।

‘That which the Gita teaches is not a human but a divine action; not the performance of social duties but the abandonment of all other standards of duty or conduct for a selfless performance of divine will working through our nature.

‘...In other words, the Gita is not a book of practical ethics but of spiritual life.’ – Sree Aurobindo, *Essays on the Gita* (ঘোষ ২৮)।

৩। জ্ঞানে ব্রহ্মসত্ত্ব-সর্বভূতে ভগবদ্ভাব:- সমত্ববুদ্ধি- গীতার অনেক স্থলেই ‘ব্রহ্মভাব’, ‘ব্রাহ্মভূত’ ব্রাহ্মীস্থিতি’, ‘সাম্যবুদ্ধি’ ইত্যাদি কথা আছে এবং এই ভাব লাভ করেই কর্ম করতে হবে এবং এই ভাব লাভ হলেই ভগবানে পরাভক্তি জন্মে, এরূপ কথাও আছে। ‘ব্রহ্ম’ বলতে বুঝায় যা সর্ব-বৃহৎ, যা সব্যব্যাপী; যিনি সমস্ত ব্যাপিয়া

আছেন, যাতে সমস্ত আছে, যার সত্তায় সমস্ত সত্ত্বান্, সেই অদ্বয় নিত্যবস্তুই ব্রহ্ম। এটা পরমেশ্বরের নির্বিশেষে নির্গুণ বিভাব। এই ব্রহ্মসত্ত্বের অনুভূতির নামই ব্রহ্মসত্ত্ব বা ব্রহ্মজ্ঞান। এই জ্ঞান লাভ হলে সমস্ত ভেদবুদ্ধি বিদূরিত হয়, নানাভেদের মধ্যে একত্ব দর্শন হয়, জীব প্রকৃতির বন্ধন হতে মুক্ত হয়, ঈশ্বরের প্রকৃতি লাভ করে, তখন আত্মাতে ও ভগবানে সর্বভূত এবং সর্বভূতে ভগবদর্শন হয়, তখন সাধক ভগবানের মধ্যেই বাস করেন। তখনই ভগবানে পরাভক্তি জন্মে, সর্বভূতে প্রীতি জন্মে, সর্বত্র সমত্ববুদ্ধি জন্মে, নিষ্কাম কর্মে অধিকার জন্মে, তখন তার নিজের কর্ম থাকে না; সর্বকর্ম ভস্মসাৎ হয়ে, বিশ্বময়ের বিশ্বকর্ম তাঁর মধ্য দিয়ে হতে থাকে। কিন্তু মায়াবাদী বেদান্তী ব্রহ্মজ্ঞানের জীব, জগৎ ঈশ্বর সকলেই লোপ পায়; কেননা এ সকল মায়ার বিজৃম্বণ-এক অদ্বয়, নীরব নিষ্ক্রিয়, নির্বিশেষে তত্ত্বই থাকে,- সুতরাং উহাতে কর্ম ও ভক্তির কোন প্রঙ্গই নেই। কিন্তু গীতোক্ত ব্রহ্মভাব নির্গুণ-গুণী পুরুষোত্তম পরমেশ্বরেরই নির্গুণ বিভাব, উহা তাঁতেই প্রতিষ্ঠিত, তিনি অক্ষর ব্রহ্ম হতেও উত্তম, তিনি কেবল

নির্গুণ ব্রহ্ম নই, তিনি জগতের সৃষ্টিকর্তা, পিতা,মাতা, ধাতা, পিতামহ, প্রভু, সখা, শরণ ও সুহৃদ। সুতরাং গীতোক্ত ব্রহ্মভাবে জীবকে নিষ্ক্রিয় নীরবতার মধ্যে স্থাপিত করে না, উহাতে জীবকে নিষ্কাম ভগবৎকর্মের অধিকার দেয় এবং ভগবানে পরাভক্তি প্রদান করে। এই হেতু গীতায় ও ভাগবতে জ্ঞানীকেই ‘শ্রেষ্ঠভক্ত’ ও ‘ভাগবতোত্তম’ বলা হয়েছে। এই গীতোক্ত পুরুষোত্তম- তত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব না বুঝলে গীতার বহু কথা পরস্পর অসমঞ্জস ও অসঙ্গত বলে বোধ হয়।

৪। যোগ বা ধ্যানে ভগবানে চিন্তাসংযোগ :- ‘যোগ’ শব্দ এস্থলে ধ্যানযোগ, আত্মসংস্থা- যোগ বা সমাধি-যোগ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পাতঞ্জল দর্শনে যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগ বিবৃত হয়েছে। চিন্তা স্থির করবার জন্য সকল সাধনায়ই যোগসাধনের প্রয়োজন। গীতায়ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে যোগসাধনের উপদেশ আছে, কিন্তু উদ্দেশ্য ঠিক এক নয়। পাতঞ্জল যোগের উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে যোগ নয়, বিয়োগ,-- প্রকৃতি-পুরুষের বিয়োগ (‘পুংপ্রকৃত্যো-বিয়োগোহপি যোগ ইত্যাদিতো যয়া’-- ভোজবৃত্তি)। এই বিয়োগেই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি-কৈবল্যালাভ। কিন্তু গীতোক্ত যোগের উদ্দেশ্য, বিয়োগের পর আবার যোগ অর্থাৎ প্রকৃতি হতে মুক্ত হয়ে ভগবানে চিন্তাসংযোগ, সুতরাং এটাতে কেবল আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি নয়, এটা আত্যন্তিক সুখেরও অবস্থা। এই সুখ ভগবানে স্থিতিলাভ-জনিত। এইরূপ যোগী যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন ধ্যানস্তিমিতনেত্রে তুষ্টীভাবে অবস্থানই কর বা সংসারী সাজিয়া ভগবানের কর্মই কর, তিনি সর্বদা ভগবানেই অবস্থান করে। এই হেতু যোগোপদেশ প্রসঙ্গে, গীতায় সর্বত্রই এই কথা-মনঃ-সংযম করে চিন্তা আমাতে সমাহিত কর, মচ্ছিন্ত হও, মদ্ভক্ত হও, গীতার কর্ম, জ্ঞান,যোগ সকল মার্গেই ঈশ্বরবাদ জড়িত, সর্বত্রই ভগবান্ -‘আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে।’(ঘোষ ২৯)।

৫। ভক্তিতে ভগবৎ-শরণাগতি:- কর্মে নিষ্কামতা, ব্রহ্মভাব, সমত্ববুদ্ধি, সমাধিযোগ-এ সকল তত্ত্ব পূর্বে বিবৃত হয়েছে। এ সকলেরই মূলকথা হয়েছে প্রকৃতিবা মায়ার হস্ত হতে মুক্ত হওয়া-- মোক্ষলাভ বা ভগবানে স্থিতি লাভ করা। এই মায়া ত্যাগের উপায় সম্বন্ধে শাস্ত্র ও ধর্মোপদেশগণ দুই রকম কথা বলেন। কেউ বলেন মায়া হচ্ছে অজ্ঞান। জ্ঞান ব্যতীত অজ্ঞান বা মায়া দূর হয় না, মোক্ষলাভও হয় না। মোক্ষ বিষয়ে জীবের আত্ম-স্বাতন্ত্র্য আছে, সে সদগুরুর আশ্রয়ে আত্মপ্রযত্নে বা আত্মসংস্থযোগ বা আত্মানাত্ম-বিবেক বিচার দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারে। এটাই জ্ঞানমার্গ। গীতায়ও অনেক স্থলে এই মার্গের উল্লেখ আছে। ইহা পুরুষকার-সাপেক্ষ। পুরুষকারের প্রতিমূর্তি,জ্ঞান-গুরু ভগবান্ বশিষ্ঠদের সর্বত্রই এই মার্গেরই উপদেশ দিয়েছেন এবং ভক্তিমার্গে ভগবৎকৃপার উপর নির্ভর করা অজ্ঞানতার ফল, এই কথা বলেছেন।

‘যাবৎ প্রবোধো বিমলো নোদিতস্তাবদেব সঃ।

মৌর্যাদীনতয়া রাম ভক্ত্যা মোক্ষোহভিবাঞ্ছ্যতে॥’

--রাম, যাবৎ বিমল জ্ঞানের উদয় না হয়, সেই পর্যন্তই লোকে মূর্খতাবশতঃ ভক্তিদ্বারা মোক্ষলাভের বাঞ্ছা করে থাকে।

পক্ষান্তরে, ভক্তিমার্গ ও ভাগবতধর্মের উপদেশটা ভগবান ব্যাসদেব সর্বত্র ভক্তিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, ভক্তিদ্বারাই ভগবৎকৃপায় জ্ঞান হয়, জ্ঞানের মোক্ষ, সুতরাং ভক্তিই মোক্ষদায়িনী- ‘ভক্তির্জনিত্রী জ্ঞানস্য ভক্তির্মোক্ষপ্রদায়িনী। গীতায়ও শ্রীভগবান্ স্পষ্টই বলেছেন-আমার মায়া সুদুস্তরা, যে আমাকে আশ্রয় করে সে-ই মায়া অতিক্রম করতে পারে এবং প্রিয় ভক্তকে শেষে এইরূপ ‘সর্বগুহ্য-তম’ উপদেশ দিয়েছে-তুমি সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র আমার শরণ লও, আমি তোমাকে সর্বপাপ হতে মুক্ত করব। এটাই ভগবৎ-শরণাগতি- ‘আমি তোমারই, তুমি আমার একমাত্র গতি, প্রভো, রক্ষা কর’- এই ভাব অবলম্বন করে একান্তভাবে আত্ম-

সমর্পণ- এটাই গীতার শেষ উপদেশ। ভক্তিমার্গেও আর একটি উচ্চতর ভাব হচ্ছে ‘তুমি আমার’। যেমন-ব্রজাঙ্গনা বলেছেন-(ঘোষ ২৩)

‘হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতেসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্রুতম্।
হৃদয়াদ্ যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তো॥

--হে কৃষ্ণ, তুমি জোর করে হাত ছাড়াইয়া চলে গেলে, এটাতে তোমার পৌরুষ কি? যদি আমার হৃদয় ছাড়িয়া বলপূর্বক চলে যেতে পার, তবেই বুঝি তোমার পৌরুষ।’

এ বড় জোরের কথা। এটাই প্রেমভক্তি-ব্রজের ভাব। এখানে ‘রক্ষা কর’ মুক্ত কর’ ইত্যাদির কোন প্রসঙ্গই নাই, কেননা যিনি ভগবানকে হৃদয়ে বসিয়েছেন, ‘মুক্তি তার দাসী’। এখান কেবল বিশুদ্ধ প্রেম-কেবল রসাস্বাদন। এই রসের পরিপক্বাবস্থায় ‘আমিই তুমি’ এই ভাব উপস্থিত হয়। তখন কেবল ‘আমি কৃষ্ণ, আমি কৃষ্ণ’-কৃষ্ণোহং প্রতি চাপরা’। এটাই ভক্তিশাস্ত্রের অধিরূঢ় ভাব, বেদান্তের সোহহং জ্ঞান, পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলন। এস্থলে বেদান্ত ও ভাগবত এক হয়ে গেছে। এইহেতু বলা হয়েছে, ভাগবত বেদান্তের ভাষ্যস্বরূপ।

৬। নীতিতে আত্মোপম্যদৃষ্টি-সাম্যবুদ্ধি:- ‘নীতি’ শব্দে বুঝায় কর্তব্যাকর্তব্য-নির্ণায়ক সূত্র বা বিধি নিয়ম। আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে ‘ধর্ম’ শব্দই এই অর্থে সাধারনতঃ ব্যবহৃত হয় এবং কর্তব্যাকর্তব্য-নির্ণায়ক শাস্ত্রকেই ‘ধর্মশাস্ত্র’ বলা হয়। ধর্মের দুই দিক - একটি বহির্মুখ বা ব্যবহারিক ধর্ম, অপরটি অন্তর্মুখ বা মোক্ষধর্ম। পারিবারিক, সামাজিক বা জাগতিক সম্পর্কে অপরের সহিত যেসকল ব্যবহার কর্তব্য, তাহারই নাম লৌকিক বা ব্যবহারিক ধর্ম; পাশ্চাত্যগণ এটাকেই ‘নীতি’ বলেন। আর পরমেশ্বরের জ্ঞান বা সাক্ষাৎকার লাভার্থ যে সকল বিশিষ্ট সাধন-প্রণালী নির্দিষ্ট আছে তারই নাম মোক্ষধর্ম; পাশ্চাত্যগণ এটাকে ধর্ম বলেন। আমাদের নীতিশাস্ত্র বা ধর্মশাস্ত্রের বিধি-ব্যবস্থা সকলই মোক্ষানুকূল; এই হেতু প্রাচীন শাস্ত্রে ‘নীতি’ ও ‘ধর্মে’ বিশেষ কোন পার্থক্য করা হয় নাই। কিন্তু পাশ্চাত্যগণের নীতি-তত্ত্বের ভিত্তি আধিভৌতিক, এটা আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এইহেতু তারা নীতি-তত্ত্বকে মোক্ষতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব হতে সম্পূর্ণ পৃথক করে ফেলেছেন। এক্ষণে দ্রষ্টব্য এই, আমাদের শাস্ত্রের এবং গীতাতে নীতির মূলভিত্তি কী? এটা হয়েছে সর্বভূতাত্মিক্য-জ্ঞান। পূর্বে বলা হয়েছে- আমাতে ও সর্বভূতে একই আত্মা-সর্বত্রই ভগবান’- এই জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান, এটাতেই মোক্ষ, এই জ্ঞানলাভ হলে সর্বত্র সমভূ-বুদ্ধি জন্মে; তখনই জীব বুঝতে পারে, আমার যাতে সুখ অপরের তাতে সুখ, আমার যাতে দুঃখ অপরের তাতে দুঃখ। এটাই আত্মোপম্য-দৃষ্টি। এরূপ বিশুদ্ধ সাম্যবুদ্ধি লাভ করলে তাকে আর পৃথক পৃথক উপদেশ দিতে হয় না- ‘পরের দ্রব্য চুরি করিও না’, ‘অপরকে হিংসা করিও না’, ‘প্রতিবেশীকেও আপনার মত ভালবাসবে’ ইত্যাদি। কেননা, তখন

আপন ও পর উভয়ের সমাবেশ ভগবানে, তাই গীতার উপদেশ- এই আত্মোপম্য-দৃষ্টি অবলম্বন করে সকলের সহিত ব্যবহার করবে শ্লোক এবং তাদের বিস্তৃত। কেবল গীতাতেই নয়, উপনিষদে, মহাভারতে, মন্বাদি শাস্ত্রে এই নীতিই পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হয়েছে-

‘ন তৎ পরস্য সন্দধ্যাৎ প্রতিকূলং যদাত্মনঃ।
এষ সংক্ষেপতো ধর্মঃ কামাদন্যঃ প্রবর্ততো॥ (ঘোষ ৩১-৩২)।

--‘আপনার যাহা প্রতিকূল বা দুঃখজনক বলে বোধ কর অন্য লোকের সহিত সেরূপ ব্যবহার করবে না, এটাই সমস্ত ধর্মের সার, অন্য যাহা কিছু কামনা-প্রসূত। পাশ্চাত্য নীতি-শাস্ত্রে নীতি-তত্ত্ব বিষয়ে প্রধানত দুই মত। বিবেকবাদ; এই নীতি সার্বজনীন হতে পারে না, কেনা সকলের বিবেক বা ধর্মবুদ্ধি এক রূপ হয় না। অপর মত হচ্ছে, হিতবাদ বা অধিকতর লোকের অধিকতর সুখ। এই নীতির এক প্রধান দোষ এই যে, এটাতে কর্তার বুদ্ধির কোন বিচারই হয় না, কেবল কর্মের বাহ্যফল দেখে নীতির বিচার করতে হয়। কিন্তু গীতা বলেন, কর্মের বাহ্যফল অপেক্ষা কর্তার বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং তাই নীতি-বিচারের কষ্টিপাথর। কান্ট, গ্রীন, ডয়সন প্রমুখ পাশ্চাত্য নীতি-তত্ত্ববিদগণও এ বিষয়ে গীতার মতেরই অনুবর্তন করেছেন। পাশ্চাত্য হিতবাদের আর একটি ত্রুটি এই যে, অধিক লোকের অধিক সুখের জন্য আমি চেষ্টা করব, স্বার্থ অপেক্ষা পরার্থ শ্রেষ্ঠ কেন-হিতবাদী এটার কোন উত্তর দিতে পারে না; সে উত্তর দিয়েছেন আমাদের বেদান্ত ও গীতা; কারণ; ‘তৎ ত্বম্ অসি’-তুমি তাহাই। সুতরাং সর্বভূতে একই বস্তু, এই জ্ঞানলাভ করে আত্মোপময় দৃষ্টিতে সর্বভূতহিতে রত হও, এটাই গীতার উপদেশ।

৭। উপাসনা-ভগবৎকর্ম, জীব-সেবা, স্বধর্ম পালন:- উপাসনাই ভক্তিমার্গের প্রাণ। গীতার উপদিষ্ট উপাসনা কি?- ভগবৎকর্ম। ভগবৎকর্ম বলতে বুঝায় ভগবানের কর্ম বা ভগবানের উদ্দেশ্যে কৃত কর্ম। সে কর্ম কি?- ‘ভগবৎস্বরূপ’ যিনি যে ভাবে গ্রহণ করেন, ভগবৎকর্ম ও তাঁর সেইরূপই হয়। সাকার উপাসক ষোড়শোপচারে প্রতিমা পূজা করেন। গ্রীষ্মে ব্যজন, শীতে পশমী বস্ত্রদ্বারা শ্রীমূর্তি আবরণ করেন। তিনি মনে করেন এটাই ভগবৎকর্ম; অবশ্য, যিনি শীত-গ্রীষ্মের জন্মদাতা, যার শাসনে চন্দ্রসূর্য, বায়ুবরুণাদি অহর্নিশ স্ব-স্ব কার্যে ব্যাপৃত রয়েছে-তিনি যে শীত-গ্রীষ্মে কষ্ট পান, ইহা কল্পনামাত্র। তবে ভাবগাহী জর্নাদন ভাবের কান্দাল, দ্রব্যের নয়, তাই তিনি ভক্তের ভক্তিভাবটুকুই গ্রহণ করিয়া প্রীত হন। কিন্তু এ উপাসনায় একটি আশঙ্কা আছে। মূর্তিতে ভগবান আছেন, ইহা ঠিক, কিন্তু এই ধারণা অজ্ঞের নিকট হয়ে উঠে, মূর্তিই বাস্তব ভগবান অজ্ঞা যজ্ঞস্তি বিশ্বেষং পাষাণাদিসু সর্বদা। ভগবান কেবল মূর্তিতে নন, ভগবান সর্বভূতে। সুতরাং সর্বভূতের ভজনাই ঈশ্বরের উপাসনা। জ্ঞানীর পক্ষে উহাই ভগবৎকর্ম। এই হেতু ভাগবতশাস্ত্রে মূর্তিপূজা অপেক্ষা জীবসেবার অধিক প্রশংসা। শ্রীভাগবত বলেন- যে সর্বভূতে অবস্থিত নারায়নকে উপেক্ষা করে প্রতিমাতে নারায়ণের অচনা করে, সে ভস্মে ঘৃতাঙ্কিত দেয়। তবে কি প্রতিমা পূজার প্রয়োজন নাই? না ঠিক তাও নয়। যে পর্যন্ত সর্বভূতে নারায়ণ- জ্ঞান না হয়, সে পর্যন্ত উহার প্রয়োজন আছে, কিন্তু উহাই চরম উদ্দেশ্য নয়, উহা চরমে পৌঁছবার উপায় মাত্র।

‘অচাদাবর্চভাবদীশ্বরং মাং স্বকর্মকৃৎ।

যাবন্ম বেদ স্বহৃদি সর্বভূতেশ্ববস্থিতম্॥

“সে ব্যক্তি স্বকর্মে নিরত সে যত দিন আপনার হৃদয়ে সর্বভূতস্থিত ঈশ্বরকে জানতে না পারে ততদিন প্রতিমাদিতে ঈশ্বরকে অর্চনা করবে”(ঘোষ ৩৩,৪৩)।

সুতরাং জীবসেবাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা, নিষ্কামভাবে যথাপ্রাপ্ত স্বধর্মপালন, সর্বভূতেরই ভজনা, কেননা উহার প্রেরণা লোকসংগ্রহ, স্বার্থাভিসন্ধি নয়। এটা প্রকৃতপক্ষে ভগবানের কর্ম, নিজের কর্ম মনে করাটাই অজ্ঞানতা। কেননা যদি সকলেই স্বকর্ম বা স্বধর্মপালনের বিরত হয়, তা হলে বিশ্বলীলা লোপ পায়; বস্তুত: প্রত্যেক জীবেরই স্বকর্ম বিশ্বময়ের বিশ্বকর্ম এবং উহাই তার উপাসনা, এটাতেই সিদ্ধি, কিন্তু এই জ্ঞান চাই যে এটা ভগবানের কর্ম, আমার কর্ম নয়।

৮। সাধনা-ত্যাগানুশীলন: উপাসনা ভক্তিমার্গের সাধনা শ্রবণ-মননাদি জ্ঞানমার্গের সাধনা, প্রাণায়ামাদি যোগমার্গের সাধনা; ত্যাগ সকল মার্গেই সাধনা। ত্যাগ ব্যতীত জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্ম-কোন পথেই সিদ্ধিলাভ হয় না। কেননা

ত্যাগ সকল সাধনার মূল। এই হেতু গীতায় সর্বত্রই ত্যাগানুশীলনের উপদেশ, কিন্তু গীতায় ত্যাগ অর্থ কর্মত্যাগ বা সন্ন্যাসমার্গ নয়, গীতোক্ত ত্যাগ কামনা-ত্যাগ, কর্মফলত্যাগ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বর্ণনায় বলা হয়েছে আদ্যোপান্ত কামনা-ত্যাগের কথা। কর্মযোগে ফলত্যাগই মূল কথা, সুতরাং কর্মযোগপ্রসঙ্গে সর্বত্রই সেই উপদেশ। দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিরোগের বর্ণনা প্রসঙ্গেও পূজার্চনা-ধ্যানাদি অপেক্ষা কর্মফলত্যাগেরই শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করা হয়েছে, তার পরেই ভগবদ্ভক্তের যে সকল লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে, তারও মূল কথা বস্তুতঃ কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি, যোগ সকল মাগেই ত্যাগেরই শ্রেষ্ঠতা এবং গীতোক্ত পূর্ণ যোগধর্মে এ সকলেরই সমন্বয়; সুতরাং গীতার সাধনতত্ত্বের মূলসূত্র ত্যাগ। গীতার প্রকৃত মর্ম কি? এ কথার উত্তরে পরমহংসদেব বলেছেন-‘গীতা’ শব্দটি তিন চার বার উচ্চারণ করলেই এটা পাওয়া যায় অর্থাৎ ‘গীতা’ ‘গীতা’ বার বার বলতে বলতে বর্ণ-বিপর্যয়ে উহার বিপরীত ‘ত্যাগী বা ত্যাগী’ শব্দ উচ্চারিত হয়। এটাই গীতার সারমর্ম। কেমন সুন্দর সরল ভাষায় সারগর্ভ মর্মস্পর্শী উপদেশ।

সচ্চিদানন্দ-তত্ত্ব- সচ্চিদানন্দের ভাব ও শক্তি। সৎ-চিত্ত আনন্দ-কর্ম, জ্ঞান, প্রেম এই তিনটি জীবে অক্ষুট, অপূর্ণ, ঈশ্বরকৃতি-জড়িত অবিশুদ্ধ অবস্থায় থাকে। সাধন-বলে এই তিনটি বিশুদ্ধ ও ঈশ্বরমুখী হয়ে পূর্ণরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হয়ে জীবও ঐশ্বরিক প্রকৃতি বা ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হয়। ভাগবতশাস্ত্রে ইহা পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হয়েছে। জীবের অন্তর্নিহিত এই যে তিনটি শক্তি আছে, তদনুসারে সাধনের তিনটি পথের নামকরণ হয়েছে- কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ। জীবের যে অক্ষুট সদ্ভাব এটার প্রকাশ তার কর্মে, সুতরাং তার কর্ম ঈশ্বরমুখী হলেই উহার বিমুক্ত হয়ে নিক্রাম কর্মযোগ হয়। জীবের মধ্যে যে চিহ্নাব এটার প্রকাশ তার জ্ঞানে, ভাবনায়, এটা ঈশ্বরমুখী হয়ে সমত্ব প্রাপ্ত হলেই জ্ঞানযোগ হয়। জীবের মধ্যে যে আনন্দভাব এটার প্রকাশ তার কামনায়, এটা ঈশ্বরমুখী হয়ে বিশুদ্ধ হলেই প্রেমভক্তিযোগ হয়। এই তিনটি যুগপৎ অনুষ্ঠানই জীবের পূর্ণবিকাশ, সচ্চিদানন্দের সাধর্ম্যলাভ। বেদান্তরত্ন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন, “শ্রীভগবান, সমন্বয়ের উচ্চ চূড়ায় আরুঢ় হয়ে ইহাই প্রতিপন্ন করেছেন যে, জীবকে সচ্চিদানন্দে পূর্ণবিকশিত হতে হলেই এই মার্গত্রয়কে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে হয়। সেই জন্য গীতায় দেখি, কর্মবাদ, জ্ঞানবাদ ও ভক্তিবাদের অপূর্ব সামঞ্জস্য বিধান করে শ্রীকৃষ্ণ এক অদ্ভুত যুক্তদ্বিবেণীসমঙ্গম রচনা করেছেন, যে পুণ্যতর কল্যাণতর ত্রিবেণীতে সরস্বতীর কর্মধারা, যমুনার জ্ঞানধারা এবং গঙ্গার ভক্তিধারা সমান উজ্জ্বল, উজ্জ্বল, সমস্রোত প্রবহমান”

উপসংহার: ‘শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা’র অমৃত বাণী যখন বিশ্বের মানব জাতির সকল ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে এবং মানুষে মানুষে সমভাব, সমদর্শী, সমতা, মমত্ব-জ্ঞান কাজে কর্মে নিক্রামতা আসবে ঠিক তখনই গীতার মহান আদর্শ এবং নৈতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হবে। সমত্বভাব সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গে শ্রীমৎ শ্রীশঙ্করাচার্য ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু মহাসভার সভাপতিরূপে যে অভিভাষণ দিয়েছিলেন, তার নিম্নলিখিত কথা কয়েকটি বিশেষ গণিধানযোগ্য।

“The Aryan principle for instance, has already provided us the practice of equableness as evinced by Bhagavad Gita. If socialist creed are to be imported in the land I should advise.... first of all to adjust them to our national brand of সমত্ব-যোগ which will refine and sublimate the equality of the west.”
..... (The leader) (ষোষ ৪৫)।

তথ্যসূত্র

- ১। ডঃ অমূল্য বিকাশ বসাক, *বিজ্ঞানের আলোকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, ঢাকা: ২০০১ খ্রি:।
- ২। অতুল চন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, মহেশচন্দ্র ঘোষ, *উপনিষদ অখণ্ড সংস্করণ*, কলকাতা, ১৯৯৮।
- ৩। শ্রীজগদীশ চন্দ্র ঘোষ, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, কলকাতা: ২০১৬।

আমির খসরুর পাণ্ডুলিপি : তথ্যানুসন্ধান ও সমীক্ষা

আলতাফ হোসেন*

প্রতিপাদ্যসার: আমির খসরু দেহলভি (১২৫৩-১৩২৫ খ্রি.) ভারতবর্ষের খ্যাতিমান ফারসি কবি ও লেখক। ভারতীয় উপমহাদেশ, রাশিয়া, ইংল্যান্ড, তুরস্ক ও ইরানের বিভিন্ন স্থানে তাঁর ১৮টি পদ্য ও গদ্য পাণ্ডুলিপি রয়েছে। গত সাত শতাব্দীতে তাঁর পদ্য ও গদ্য পাণ্ডুলিপিগুলো ভারতীয় উপমহাদেশের বিখ্যাত গ্রন্থাগারসহ বিশ্বের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে বিদ্যমান। প্রবন্ধকারে আলীগড় ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, খোদাবখশ পাটনা, প্রাদেশিক সরকারী গ্রন্থাগার এবং সালার জং (হায়দরাবাদ), পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় (লাহোর), ভারত ও পাকিস্তানের অন্যান্য গ্রন্থাগার, মজলিস লাইব্রেরি ইরান, লন্ডনের ব্রিটানিয়া মিউজিয়াম এবং ইন্ডিয়া অফিসের লাইব্রেরি, বোদলিইয়ান লাইব্রেরি (অক্সফোর্ড), ন্যাশনাল লাইব্রেরি (প্যারিস), সেন্ট পিটার্সবার্গ (রাশিয়া), তুরস্কের আয়া সোফিয়া এবং হাকিম ওগলু আলিপাশা (ইস্তাম্বুল) গ্রন্থাগারে সংগ্রহে থাকা প্রসঙ্গে আলোচনা করার প্রয়াস রয়েছে।

আমির খসরুর পরিচয়

আমির খসরুর পূর্ণ নাম আমির নাসির উদ্দিন আবুল হাসান খসরু বিন আমির সাইফুদ্দিন মাহমুদ দেহলভি (সাফা ৭৭১)। তাঁর পিতা আমির সাইফুদ্দিন মাহমুদ দেহলভি সুলতান ইলতুতমিশের সামরিক বাহিনীর প্রধান কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করেন। কবি আমির খসরু ১২৫৩ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত ইতাহ জেলার পাতিয়ালিতে (মুমিনাবাদ) জন্মগ্রহণ করেন (সাফা ৭৭১)। আমির খসরুকে ছয় বৎসর বয়সে স্থানীয় মকতবের ওস্তাদ সাদ উদ্দিন খাত্তাতের কাছে পাঠানো হয়। মাত্র এক বৎসরের বিদ্যাভ্যাসেই বালক হাসান ফারসি ভাষায় এমন ব্যুৎপত্তি লাভ করেন যে, খাত্তার পাতায় তিনি কবিতার পর কবিতা রচনা করতে থাকেন। শিক্ষক সে কবিতায় মনোরম ভাষা, ছন্দ ও বর্নশৈলীর পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হন। আট বছর বয়সে তিনি পিতার ইন্তেকালের পর মাতামহের তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হন। তিনি আরবি, তুর্কি ও ফারসি এ তিন ভাষায় পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। হিন্দি ভাষার যন্ত্রসঙ্গীত পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি পারদর্শী ছিলেন। তিনি প্রথমে সুলতান বলবনের ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দিন কিশলু খানের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন। এরপর তিনি বিভিন্ন স্থানে চাকুরি করার পর পুনরায় দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং মালিক আলি সারজানদার হাতেম খানের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন। তিনি ১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লীতে মৃত্যুবরণ করেন (বাদাখশানি ৪৮৭)। তাঁকে খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়ার মাযারের পাশে সমাহিত করা হয়। তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর অধিকাংশ রচনা ফারসি ভাষায় রচিত। এছাড়া তিনি হিন্দি ভাষাতেও অনেক কাব্য রচনা করেন। তাঁর গ্রন্থের বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি বিশ্বের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে ছড়িয়ে আছে।

* সহকারী অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

আমির খসরুর পাণ্ডুলিপি অনুসন্ধান ও সমীক্ষা

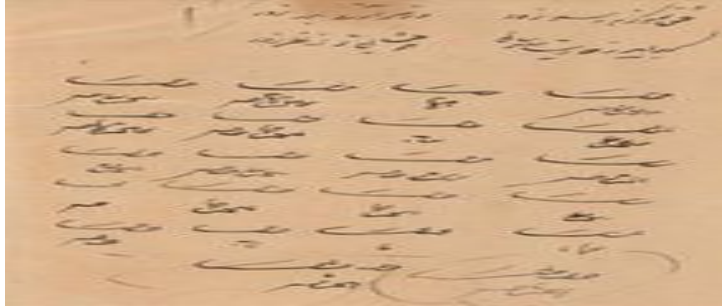
ইরানের কবি আবুল কাসেম ফেরদৌসি, আনওয়ারি, শেখ সাদি এবং হাফিজ শিরাজি যাঁদেরকে ফারসি সাহিত্যের প্রথম সারির কবি হিসেবে বিবেচনা করা হয় তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের কবিতার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট ধারা ব্যবহার করেছেন। ভারতীয় কবি আমির খসরুই একমাত্র কবি যিনি গজল ও মাসনভি ধারায় কবিতা লিখেছেন। তাঁকে অত্যন্ত বাগ্মী কবি হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। পদ্য ও গদ্যে আমির খসরুর অনেক মূল্যবান রচনা রয়েছে। কিন্তু তাঁর কাজ নিয়ে ভিন্ন মত রয়েছে। জিয়াউদ্দীন বারানীর মতে, ৯৯টি, আমিন আহমদ রাজীর মতে, ১০৯টি, একজন ঐতিহাসিক ৫২টি বলে অভিমত পেশ করেছেন। ইউরোপ, তুরস্ক, মিশর এবং ভারতের বিভিন্ন লাইব্রেরি পর্যবেক্ষণ করে নবাব ইসহাক খান আমির খসরুর রচনাগুলির একটি তালিকা তৈরি করেছেন যা পঁয়তাল্লিশটি গ্রন্থ নিয়ে গঠিত। ড. ওয়াহিদ মির্জার মতে, খসরুর ২১টি গ্রন্থ রয়েছে। গ্রন্থগুলোর পরিচয় নিচে তুলে ধরা হলো :

পাণ্ডুলিপির পরিচয়

পাণ্ডুলিপি (Manuscript) শব্দের উৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ মানু স্ক্রিপ্তাস (manu scriptus) থেকে, যার অর্থ ‘হাত দ্বারা লিখিত (ডাগলাস ২০০১ ২০০৭)। অতীতে সমস্ত উপন্যাস, কবিতা এবং অন্যান্য লিখিত কাজ হাতে লেখা হতো। পাণ্ডুলিপি হলো একটি বই-এর প্রথম খসড়া যা সাধারণত অপ্রকাশিত সংস্করণ। এটি মুদ্রণের পূর্বের অবস্থা।

তোহফাতুস সিগার

এটি আমির খসরু দেহলভি'র প্রথম কাসিদা বা প্রশংসামূলক কবিতা সম্বলিত দিওয়ান। যা তিনি পনের থেকে উনিশ বছর বয়সের মধ্যে ১২৭২ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবনের সময়ে রচনা করেন। এ কাব্যগ্রন্থে কাসিদা, গজল, তারজীবান্দ প্রভৃতি কবিতা রয়েছে। গ্রন্থটি ফারসি সাহিত্যের খ্যাতিমান কাসিদা লেখক খাকানির অনুকরণে রচিত। এতে কবি আনওয়ারি ও হাকিম সানায়ির প্রভাবও লক্ষ করা যায়। এ গ্রন্থটি তিনি সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন, তাঁর পুত্র নুসরাত উদ্দীন মুহাম্মদ কাআন, শেখ নিয়াম উদ্দিন আউলিয়া, তৎকালীন বীর শহিদ, উজির ও আদর্শ ব্যক্তিদের প্রশংসায় রচনা করেন (বাদাখানি, তা.বি. ৪৮৮)। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ দিওয়ানটিতে আমির খসরুর নিজের লেখা জীবন পরিস্থিতি রয়েছে। যদিও এই দিওয়ান খাজা সৈয়দ মোহাম্মদ ইসলাম উদ্দিন নিজামি মুদ্রিত এবং এর প্রকাশক কিন্তু এই সংস্করণটি অসম্পূর্ণ এবং কোডকৃত নয়। তবে এর পাণ্ডুলিপি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে পাওয়া যায় (আনসারি ১১)।



তোহফাতুস সিগার পাণ্ডুলিপি

(امير خسرو بن امير محمود دهلوی)

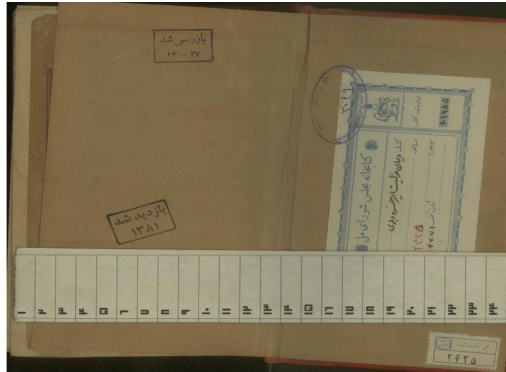
ওসাতুল হায়াত

এ গ্রন্থে আমির খসরুর মধ্যজীবনের কবিতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাঁর এ কাব্যগ্রন্থটি ১২৮৩ খ্রিষ্টাব্দে রচিত হয়েছিল। এটি কবির দ্বিতীয় দিওয়ান যা তিনি বিশ থেকে তেত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে রচনা করেন। কবির এ কবিতাগুলি যৌবনের উন্মাদনাময় আবেগ, মাধুর্য ও জীবনরসে পরিপূর্ণ (হাবিব ৬)। এটি মূলত কবির মুর্শিদ নিয়াম উদ্দিন আওলিয়ার প্রসংশায় রচিত। এছাড়াও এতে পাঞ্জাব ও মুলতানের গভর্নর সুলতান মুইজ উদ্দিন কায়কোবাদ, ইখতিয়ারুদ্দৌলা ছাজ্জু খান-ই মুয়াজ্জাম এবং বলবনের ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রশংসা করা হয়েছে (হাবিব ৫)।

গুররাতুল কামাল

আমির খসরুর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ হলো গুররাতুল কামাল (পূর্ণতার চরমোৎকর্ষ)। এটি তাঁর তেত্রিশ থেকে তেতাল্লিশ বছর বয়সের লিখিত কবিতা। তিনি ১২৯৩ খ্রিষ্টাব্দে এর রচনা সমাপ্ত করেন। এ গ্রন্থটির শুরুতে একটি চমৎকার ভূমিকা রয়েছে। এতে তিনি ইরানের বিখ্যাত কবি হাকিম সানায়ি, খাকানি, শেখ সাদি ও নিয়ামি গাজ্জুবির প্রশংসা করেছেন (সাফা ৭৭২)। ৬৯৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত এ গ্রন্থটির প্রতি পৃষ্ঠায় ১৫টি করে পংক্তি আছে। এ গ্রন্থটিও কবি তাঁর মুর্শিদ নিয়ামউদ্দিন আউলিয়া, জালাল উদ্দিন ফিরোজ শাহ, সুলতান রোকনউদ্দিন ইব্রাহীম, সুলতান মুইজুদ্দিন কায়কোবাদসহ আরও অনেকের প্রশংসায় রচনা করেন। কবির এ গ্রন্থে তাঁর সৃজনশক্তির ছাপ লক্ষ করা যায়। আবেগ-অনুভূতি ও প্রাণরসে নিটোল এবং রসোত্তীর্ণ হিসেবে এগুলো বিশ্বের কবিতা ভাণ্ডারে হীরক খণ্ডতুল্য। এ গ্রন্থে তিনি ফারসি হন্দ ও সুরের প্রাধান্য, কবিতার শ্রেণিবিভাগ ও কবিতার শ্রেষ্ঠত্বের মান সম্বন্ধে চমকপ্রদ বক্তব্য উপস্থাপন করেন (শাফাক ২৯০)।

এই দিওয়ানের একটি সম্পূর্ণ অনুলিপি লন্ডনের ইন্ডিয়া লাইব্রেরিতে বিদ্যমান রয়েছে। (নোসখায়ে খান্দি, ২৩১) এটি ১৩ শতকের শেষের দিকে (১২৯৪-১২৮৬ খ্রি.) সংকলিত হয়েছিল। কিন্তু গ্রন্থাগারের তালিকা অনুসারে, এটি ১৩০২ এর আগে লেখা হয়নি। গুররাতুল কামালের ভূমিকায় আমির খসরু তাঁর কাব্যগ্রন্থ তোহফাতুস সিগার, ওসাতুল হায়াত এবং গুররাতুল কামাল-এর পরিচয় দিয়েছেন। বোদলিইয়ান লাইব্রেরি, ইন্ডিয়া অফিস, খোদাবখশ (পাটনা), সালার জং মিউজিয়ামে এই দিওয়ানের দু'টি পাণ্ডুলিপি রয়েছে, যার মধ্যে প্রথমটি ১৫৯১-১৬ শতকের (১৫৯১ খ্রি.) এবং অন্যটি ১৭ শতকের প্রথম দিকের (আনসারি ১১)।



গুররাতুল কামাল পাণ্ডুলিপি
(امير خسرو بن امير محمود دهلوی)

বাকিয়ে নাকিয়ে

এ কাব্যগ্রন্থটি আমির খসরুর চতুর্থ কাব্য গ্রন্থ। এটি তিনি পঞ্চাশ থেকে ষাট বছর বয়সে (১৩০৭-১৩২১ খ্রি.) মধ্যে রচনা করেন। এতেও কবির মুর্শিদ নিয়াম উদ্দিন আউলিয়া, আলাউদ্দিন, মুহাম্মদ খিলজি, কুতুব উদ্দিন মোবারক শাহ, শামসুল হক, হামিদুল্লাহসহ আরও অনেকের প্রশংসা রয়েছে। এছাড়াও এতে ১৩১৫ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণকারী সুলতান আলা উদ্দীন মুহাম্মদ খিলজী (১২১৫-১৩১৫ খ্রি.) এর শোকগাঁথা, যুবরাজের বিবাহ ও অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা স্থান পেয়েছে (আনসারি ২৯১)।

এই দিওয়ান গ্রন্থটি ১৩২১ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর জীবনের শেষ সময়ে রচিত হয়েছিল। আমির খসরুর চারটি দিওয়ানের পাণ্ডুলিপি শুধু বোদলিইয়ান লাইব্রেরি, ব্রিটিশ মিউজিয়াম, ইন্ডিয়া অফিস, খোদাবখশ গ্রন্থাগারে নেই, বরং সালারজঙ্গ মিউজিয়ামেই এর কপি রয়েছে যা C.A. Store অন্তর্ভুক্ত করেনি। প্রথম সংস্করণ খ্রিষ্টীয় ১৬ শতকে দ্বিতীয় সংস্করণ ১৬ শতকের শেষে (নোসখায়ে খান্দি ৪) তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণ খ্রিষ্টীয় ১৭ শতকে লিপিবদ্ধ করা হয় (নোসখায়ে খান্দি চতুর্থ খণ্ড) এবং ৫ম সংস্করণ ১৭ শতকের শেষের দিকে লিপিবদ্ধ করা হয়। আমির খসরুর চারটি দিওয়ান নির্বাচনের একটি অনুলিপি সালার জং জাদুঘরে লিপিবদ্ধ আছে। ১৫শ শতাব্দীতে এর লেখক হলেন আলী মুহাম্মদ বিন হোসেন আদ-দিলামি।

নিহায়াতুল কামাল

এটি আমির খসরু দেহলভি'র পঞ্চম কাব্য গ্রন্থ। তিনি মৃত্যুর একমাস পূর্বে ১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে রচনা করেন। এতে তিনি গিয়াস উদ্দিন বলবন-এর মৃত্যু এবং মুহাম্মদ তুঘলক-এর সিংহাসনে আরোহণের সময় শ্রেণিবিন্যাস করেছেন। এতে কুতুব উদ্দিন মোবারক শাহ এর মার্সিয়া সম্বলিত গজল লিপিবদ্ধ করেছেন। এতে কবির বৃদ্ধ বয়সের অসহায়ত্ব ও আল্লাহর ইচ্ছার উপর অকুণ্ঠ নির্ভরতার প্রতিধ্বনি ফুটে উঠেছে (মওদুদ ২০১)।

এই কাব্যগ্রন্থটি আমির খসরু তাঁর জীবনের শেষ দিকে রচনা করেছিলেন। সালার জং গ্রন্থাগারে এর অনুলিপি সংরক্ষিত রয়েছে। প্রথম কপি ১৫ শতকে এবং অন্যটি ১৬ শতকে কপি করা হয়েছিল। এই কাব্যগ্রন্থটি দিল্লির খানেহ নিজামিয়েহ (১৯১৪ খ্রি.) প্রকাশ করেছেন। নেভেল কিশোর প্রিন্টিং হাউস থেকে কুল্লিয়াতে আনাসিরে দিওয়ানে খসরু শিরোনামে দু'বার প্রকাশিত হয়েছে। এর চতুর্থ সংস্করণ ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। গজলিয়াতের পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও আমির খসরু "খামসায়ে আমির খসরু বা পাঞ্জগঞ্জ" শিরোনামে পাঁচটি মাসনভিও লিখেছেন যা ছিল খামসায়ে নিজামি গাঞ্জুবি এর অনুসৃত।



নিহায়াতুল কামাল পাণ্ডুলিপি
(امير خسرو بن امير محمود دهلوی)

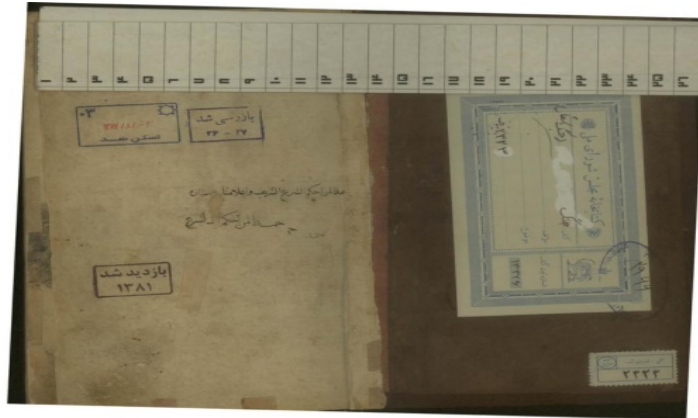
মাতলাউল আনওয়ার

এটি নিজামির মাখযানুল আসরার-এর অনুকরণে ১২৯৮ খ্রিষ্টাব্দে রচিত। এতে তিন হাজার তিনশত দশটি পংক্তি রয়েছে। এ গ্রন্থটি আলাউদ্দীন মুহাম্মদ শাহ-এর নামে উৎসর্গকৃত (মওদুদ ২০৫ ২০১)। এতে আল্লাহর প্রশংসা, রাসুলের (স.) প্রশংসা, মুনাযাত, আমির খসরুর মুর্শিদ নিযামউদ্দিন আউলিয়ার প্রশংসা, তৎকালীন রাজা-বাদশাহদের প্রশংসা এবং বিশটি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু হলো একত্ববাদ, সভ্যতা, শিষ্টাচার, উপদেশবাণী ও আধ্যাত্মিক দর্শন প্রভৃতি (আরবেরি ১৫৮, ২৭৬)।

এটি ১২৯৯ খ্রিষ্টাব্দে রচিত হয়েছিল। গ্রন্থটি আলাউদ্দীন মুহাম্মদ শাহ-এর নামে উৎসর্গীত। এটি প্রথমে ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে এবং পরে দিল্লি থেকে ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। এই মাসনভির দু'টি কপি ইন্ডিয়া অফিসের লাইব্রেরিতে পাওয়া যায় (নোসখায়ে খাতি ১২০১) প্রথম সংস্করণটি ১৫৮১ খ্রিষ্টাব্দে অনুলিপি করা হয়েছে এবং এর অনুলিপিকার হলেন মুহাম্মদ বিন আহমদ জাহেদি। দ্বিতীয় কপি ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে লেখা হয়েছিল এবং সালার জং মিউজিয়ামে সংরক্ষিত (নোসখায়ে খাতি ১২০২)। দু'টি কপির লেখার তারিখ হলো খ্রিস্টীয় ১৭ শতক এবং ১৮ শতক (নোসখায়ে খাতি ১৯৩ ১৪০৪)।

শিরিন ওয়া খসরু

১২৯৮ খ্রিষ্টাব্দে এটি নিযামি গাঞ্জুবি'র খসরু ওয়া শিরিন-এর অনুকরণে বাহরে হাজাজে মোসাদ্দাস ছন্দে রচিত হয়েছে। এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও কাহিনী নিযামির খসরু ওয়া শিরিন গ্রন্থের অনুরূপ। এতে অতীতের বিভিন্ন বিষয়ায়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এ গ্রন্থের অধ্যায়গুলো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সম্বলিত ও দার্শনিক তত্ত্ব সমৃদ্ধ। এ গ্রন্থে কবি প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন যা চমৎকার পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। কবির এ গ্রন্থের কবিতাগুলোর মাঝে নতুনত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। এ গ্রন্থটিও আলাউদ্দীন মুহাম্মদ শাহ-এর নামে উৎসর্গকৃত (বাদাখশানি ৪৯৮)। এর একটি কপি ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে (নোসখায়ে খাতি ১২০৩) একটি কপি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এবং আরেকটি সালার জং মিউজিয়ামে রয়েছে। লিপিকারের নাম সুলতান আলী মাশহাদি (নোসখায়ে খাতি ০৮) এবং লেখার সাল ষোড়শ শতাব্দীর শুরুতে।



শিরিন ওয়া খসরু পাণ্ডুলিপি
(امير خسرو بن امير محمود دهلوی)

মজনুন ওয়া লাইলি

এটি নিয়ামি গাঞ্জুবি'র লাইলি ওয়া মজনুন-এর অনুকরণে ১২৯৮ খ্রিষ্টাব্দে কবির ৪৪ বছর বয়সে রচিত। এতে দুই হাজার ছয়শত ষাটটি পংক্তি রয়েছে (যামানি, দানেশ, ৩৫: ১৭০)। ইতোপূর্বে একই বিষয়ে ফেরদৌসি, মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি প্রমুখ কবি যে ধরনের রোমান্স কাব্য রচনা করেছেন কবি আমির খসরুর এ রচনাকর্মটি সে সব থেকে ব্যতিক্রমধর্মী। এ গ্রন্থটি রচনায় যখন তিনি হাত দেন তখন তাঁর মা ও ছোট ভাই মৃত্যুবরণ করেন (সান্তার ৫৮)।

এটি ১৩ শতকের লেখা। তবে ব্রিটিশ মিউজিয়াম সংরক্ষিত। এটি ১২৯৯ খ্রিষ্টাব্দে লেখা হয়েছিল। ১৮৪৮-৪৯ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এর একটি অনুলিপি ব্রিটিশ মিউজিয়ামের খোদাবখশ গ্রন্থাগারে এবং আরেকটি সালার জঙ্গ জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। (নোসখায়ে খাতি ০৪)।

আইনে সিকান্দারি

এটি বাদশাহ বাহরাম শাহ-এর ঘটনাবলি ও নিয়ামি গাঞ্জুবি'র ইক্কান্দার নামা-এর অনুকরণে বাহরে মোতাকারেবে মোসাম্মান ছন্দে ১২৯৯ খ্রিষ্টাব্দে রচিত হয়েছে। এ গ্রন্থটিও আলাউদ্দিন মুহাম্মদ শাহ-এর নামে উৎসর্গকৃত। এতে চার হাজার চারশত পঞ্চাশটি পংক্তি রয়েছে। এ গ্রন্থের পংক্তিসমূহ কাজী শিহাবউদ্দিন অধ্যয়ন পূর্বক সংশোধন করে দিয়েছেন (নোসখায়ে খাতি ০৪)।

এর পাণ্ডুলিপি ১৬ শতকে ১৫৬৬-৬৭ খ্রিষ্টাব্দেরচিত হয়েছিল এবং এর অনুলিপিকার ছিলেন কামাল আল-দীন হোসেন এবং জালাল আল-দীন মাহমুদ। এর দু'টি কপি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে (শাফাক ২৯০) এবং আরেকটি কপি ইন্ডিয়া অফিসে (নোসখায়ে খাতি, সিরিয়াল, ১৪১০, চতুর্থ খণ্ড) এবং একটি কপি সালার জং মিউজিয়ামে রয়েছে (নোসখায়ে খাতি, সিরিয়াল, ১৩৯৭, ১৩৯৯, ১৪০০, ১৪০১, ১৪০২, ১৪০৩, ১৪০৪)। এর লেখক হলেন মুহাম্মদ বিন মাহবুব। ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে এর নতুন পাণ্ডুলিপি তৈরি করা হয় আর ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে আলিগড় থেকে তা মুদ্রিত হয়।

হাশত বেহেশত

এটি ১৩০১ খ্রিষ্টাব্দে নিয়ামি গাঞ্জুবি'র হাফত পেইকার-এর অনুকরণে রচিত। এতে তিন হাজার তিনশত বায়ান্নটি পংক্তি রয়েছে। এর তিনটি কপি ইন্ডিয়া অফিসে, একটি কপি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এবং একটি কপি সালার জং মিউজিয়ামে বিদ্যমান রয়েছে (নোসখায়ে খাতি সিরিয়াল ১২০৫)। অনুলিপির সময় আনুমানিক ১৭ শতকের ১৬৭৫ খ্রিস্টাব্দে। অনুলিপিকার শেখ কালব শেখ আলম। এর দু'টি সংস্করণের একটি ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে এবং অন্যটি আলীগড় থেকে ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। সালার জং মিউজিয়ামে খামসায়ে খোসরুর ছয়টি কপি রয়েছে (নোসখায়ে খাতি সিরিয়াল ১২০৫)। প্রথম সংস্করণ ১৬ শতকে, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৫ শতকে এবং তৃতীয় সংস্করণ ১৭ শতকে লেখা হয়েছিল এবং এর অনুলিপিকার হোসেইন বিন হায়দার। খ্রিস্টীয় ১৭ শতকে চতুর্থ সংস্করণ এবং ১৬ শতকের প্রথম দিকে পঞ্চম সংস্করণ এবং ১৭ শতকের প্রথম দিকে ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

কেরানুস সাদাইন

এটি সুলতান মুইজ উদ্দিন কায়কোবাদ এবং তাঁর পিতা সুলতান নাসির উদ্দিন বুগরা খানের সঙ্গে অযোধ্যার সারযু নদীর তীরে সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গ নিয়ে রচিত। এটি বাহরে রামালে মোসাম্মান ছন্দরীতিতে লিখিত প্রথম ঐতিহাসিক মাসনভি কাব্যগ্রন্থ। এ গ্রন্থটি কবি ১২৮৯ খ্রিষ্টাব্দে পবিত্র রমজান মাসে রচনা সমাপ্ত করেন (মওদুদ ২০৫ ৪৯৭)। মাসনভিগ্রন্থ হিসেবে এটি কবির অনবদ্য ও শ্রেষ্ঠ অবদান (বাদাখশানি, তা. বি: ৪৯৭)। এ গ্রন্থে বর্ণিত ঐতিহাসিক স্থান ও ঘটনাবলি কবি স্ব-চক্ষে ও স্ব-শরীরে অবলোকন করে নিজস্ব রচনামূল্যে দ্বারা সুনিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন। তাই গ্রন্থটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ঐতিহাসিক চিত্রকলার মর্যাদায় সমুন্নত। গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবনের দুই উত্তরসূরী স্বীয় পুত্র সুলতান নাসির উদ্দিন বুগরা খান ও স্বীয় পৌত্র সুলতান মুইজ উদ্দিন কায়কোবাদ অর্থাৎ পিতা-পুত্রের মাঝে ভ্রাতৃত্ব ধারণার সৃষ্টি অতঃপর তার অবসান সম্পর্কে রচিত। এছাড়াও এতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি ও স্থানসমূহের বর্ণনা যেমন দিল্লি জামে মসজিদের বর্ণনা, কূপের বর্ণনা, নববর্ষের বর্ণনা ইত্যাদি রয়েছে (বাদাখশানি ২০১)।



কেরানুস সাদাইন পাণ্ডুলিপি

(امیر خسرو بن امیر محمود دہلوی)

কেরানুস সাদাইন প্রথম মাসনভি গ্রন্থ যা পিতা ও পুত্রের পুনর্মিলন সম্পর্কে খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে (১২৮৯ খ্রিষ্টাব্দে) মাত্র তিন মাসে রচিত হয়েছিল। এই মাসনভি আঙ্গিকের গ্রন্থটির অনেক সংস্করণের বিভিন্ন তালিকায় বর্ণিত হয়েছে। এর সাতটি সংস্করণ একটি সুশৃঙ্খল তালিকা তৈরি করা হয়েছে ১৫৬২ খ্রিষ্টাব্দে। ১৮ শতকে অনুলিপি করা হয়েছিল। হাকিম ওগলু আলী পাশা খ্রিষ্টীয় ১৫ শতকে (১৪৯৭ খ্রিষ্টাব্দে) ও ব্লোচাট (নোসখায়ে খাতি সিরিয়াল ৩য় খণ্ড) খ্রিষ্টীয় ১৫ শতকে সংস্করণটি অনুলিপি করা হয়েছিল (নোসখায়ে খাতি, সিরিয়াল, ৬৬১)। কিন্তু এই সংস্করণটি কিছুটা অসম্পূর্ণ। ইরানের মশহাদ গ্রন্থাগারের একটি সংস্করণ রয়েছে যা ১৬ শতকে (১৫৬৭ খ্রিষ্টাব্দে) লেখা হয়েছিল। আয়া সোফিয়া গ্রন্থাগারে (ইস্তানবুল) একটি সংস্করণ রয়েছে যা ১৬ শতকের। লেভেসিয়ানা লাইব্রেরিতে (ম্যানচেস্টার) চারটি কপি বিদ্যমান। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, লাহোরের গ্রন্থাগারে এই বইটির দু'টি কপি রয়েছে। পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে (পাকিস্তান) সংরক্ষিত কপিটি ১৭ শতকের। বার্লিন লাইব্রেরিতে এই কপিটি তুলনামূলকভাবে পুরানো। পাটনার খোদাবখশ লাইব্রেরিতেও এর একটি কপি রয়েছে। আলিগড় ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে এর অনেক কপি রয়েছে। সালার জঙ্গ লাইব্রেরিতে কেরান-উস-সাদাইন এর পাঁচটি কপি রয়েছে। এগুলোর মধ্যে প্রথমটি খ্রিষ্টীয় ১৭ শতকের, দ্বিতীয়টি ১৭ শতকের (১৬৮১

খ্রি.), লেখক শেখ ইব্রাহিম, তৃতীয়টি ১৮ শতকের (১৭৩০ খ্রি.), চতুর্থটিও ১৮ শতকের খ্রিষ্টীয় (১৭৮৯ খ্রি.) লেখক সুলতান মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ ইসমাইল আর পঞ্চমটি খ্রিষ্টীয় ১৮ শতকের।

মিফতাহ আল-ফুতুহ

এটি সুলতান জালাল উদ্দীন ফিরোজ শাহ-এর প্রথম সিংহাসনে আরোহণ উপলক্ষে তাঁর চারটি বিজয়ের ঘটনার উপর বাহরে হাযায়ে মোসাম্মান ওয়নে ১২৯১ খ্রিষ্টাব্দে রচিত দ্বিতীয় ঐতিহাসিক মসনভী কাব্যগ্রন্থ (আনুশেহ ২০১)। এ গ্রন্থকে তাঁর অপর গ্রন্থ গুররাতুল কামাল-এর অংশ বিশেষ বলে ধারণা করা হয়। এ গ্রন্থে সুলতান জালাল উদ্দীন ফিরোজ শাহ-এর বিজয়ের ইতিহাস খুবই সহজ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থটি কবির অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ (আনুশেহ ২০১)।

এই মাসনভি সম্পর্কেও অনেক রেফারেন্স উল্লেখ পাওয়া যায়। বোদলিইয়ান লাইব্রেরিতে এটির একটি কপি রয়েছে। যা ঘোরা আল-কামালের অন্তর্গত।

দেবলরাণী ওয়া খিজর খান

১৩১৫ খ্রিষ্টাব্দে রচিত এ গ্রন্থ আলাউদ্দীন খিলজির পুত্র খিজরখান এবং নাহরাওলার রাজা কর্ণের কন্যা দেবলা দেবীর প্রেম কাহিনীমূলক গাথা। এটি বাহরে হাযায়ে মোসাদ্দাস ওজনে রচিত। এ গ্রন্থে কবি দেবলরাণী ও খিজরখানের প্রেমোপখ্যানের মাধ্যমে প্রেমের বিচিত্র লীলা, বিরহ-মিলনের উচ্ছ্বাস এবং মানব হৃদয়ের সূক্ষ্মতম অনুভূতি ও আবেগের বর্ণনা পাওয়া যায় (মওদুদ ২০১)। এতে বর্ণিত শাহজাদা খিজরখান ও তাঁর পিতার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ, গোয়ালিয়ার দুর্গে তাঁর বন্দিদশা এবং মালিক কাফুরের প্ররোচনায় শাহজাদাকে অন্ধ করে হত্যা করার করণ কাহিনী কবির চমৎকার রচনাইশলী, সুর ও মুর্ছনায় পাঠক হৃদয় আকুল হয়ে উঠে। কবি দেবলরাণী ও খিজরখানের সুকরণ প্রেমের কাহিনী রচনা করে গেছেন তা আজও অল্লান রয়েছে। এ গ্রন্থে প্রায় ৪২০০টি পংক্তি রয়েছে। এ কাব্যখানিতে কেবল মানব প্রেমেরই মহিমা বর্ণিত হয়নি বরং জন্মভূমির প্রতি কবির প্রীতি ও ভালোবাসা এবং অধ্যাত্মপ্রেমের দৃষ্টান্তও প্রস্ফুটিত হয়েছে (আসগার ২১৮)।



দেবলরাণী ওয়া খিজর খান পাণ্ডুলিপি
(امير خسرو بن امير محمود دهلوی)

এই মাসনভির প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলো নিম্নরূপ:

রিও দ্বিতীয় খণ্ডে এ গ্রন্থের তিনটি সংস্করণের কথা উল্লেখ করেছে। একটি (নোসখায়ে খাতি সিরিয়াল ১২০৫) ১৭ শতকের এবং অন্যটি (নোসখায়ে খাতি সিরিয়াল ৬১২৯) ১৮ শতকের, তৃতীয়টি খ্রিস্টীয় ১৬ শতকের। এ গ্রন্থের পাঁচটি সংস্করণের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথম দু'টি কপি খ্রিস্টীয় ১৬ শতকের এবং অন্য তিনটি সংস্করণ ১৬ শতক ও ১৮ শতকের। ব্লোচেট তাঁর তালিকায় ছয়টি কপি অন্তর্ভুক্ত করেছেন যেগুলো ১৬ শতক ও ১৭ শতকে লেখা হয়েছিল। খোদাবখশ গ্রন্থাগারে পাণ্ডুলিপিটি ১৬ শতকে সংরক্ষিত। এর লেখক হোসেন বিন আলী। লিভেসিয়ানা লাইব্রেরিতে খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর একটি অনুলিপি রয়েছে। আয়া সোফিয়া লাইব্রেরিতে দু'টি কপি রয়েছে (নোসখায়ে খাতি, সিরিয়াল, ১৩১) যার একটি ১৬ শতকে এবং অন্যটি ১৭ শতকে প্রস্তুত করা হয়েছিল। বোদলিইয়ান লাইব্রেরিতে তিনটি কপি বিদ্যমান রয়েছে (নোসখায়ে খাতি সিরিয়াল ৭৭৭, ৭৭৮, ৭৭৯)। প্রথম ও দ্বিতীয় বইটি ১৭শ শতকে এবং তৃতীয় বইটির সন জানা যায়নি। ইভানোভো তিনি তাঁর তালিকায় এর দু'টি সংস্করণ উল্লেখ করেছেন। সালার জং মিউজিয়াম লাইব্রেরিতে তিনটি কপি রেকর্ড করা হয়েছে। প্রথম বইটি খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে (১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দ) খাজা মাহমুদ লিখেছেন। দ্বিতীয় বইটি ১৭শ শতকে লেখক সাদুল্লাহ। আর তৃতীয় সংস্করণ ১৭ শতকে লেখা হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীতে আলীগড় থেকে এ মাসনভির একটি সংস্করণ ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে লেখা হয়েছে। এর লেখক রশিদ আহমাদ।

নোহ সেপেহর

কবি আমির খসরু ১৩১৮ খ্রিষ্টাব্দে কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থে কুতুব উদ্দীন মোবারক শাহ খিলজি-এর গৌরবোজ্জ্বল শাসনকালের ঘটনাবলি ও ভারতীয় উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে (মওদুদ ২০৫ ২০১)। এ গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে জন্মভূমির প্রতি কবির গভীর প্রেম উৎসারিত হয়েছে। এ উপমহাদেশের মাটি ও মানুষকে কবি শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন করেছেন। তিনি ভারতীয় উপমহাদেশকে ভূ-স্বর্গ এবং এর জনগোষ্ঠীকে অন্য উপমহাদেশের মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করেছেন। কবির এ গ্রন্থখানা চিন্তা-ভাবনার বিশালতায়, রচনামূল্যের শ্রেষ্ঠতায় এবং মননশীল বর্ণনাকুশলতার কারণে মাসনভী কাব্যজগতের মধ্যমণি হিসেবে পরিগণিত হয়।

কবি এটিকে নয়টি ভাগে বিভক্ত করেছেন, তাই এটি নোহ সেপেহর নামে পরিচিত। আলি পাশা তেহরান ম্যাগাজিনে এ গ্রন্থের অনুলিপিগুলো সম্পর্কে আলোচনা করেছেন (নোসখায়ে খাতি ১৫১৭, সিরিয়াল ৬২১)। বোদলিইয়ান লাইব্রেরিতে একটি কপি বিদ্যমান রয়েছে (নোসখায়ে খাতি ১৫২৬, সিরিয়াল ৬৬৪)। ওয়াহিদ মির্জার সম্পাদনায় কলকাতা থেকে ১৯২৮ সালে এ গ্রন্থের একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

তুঘলক নামা

এটি ১৩২০ খ্রিষ্টাব্দে রচিত আমির খসরুর সর্বশেষ ঐতিহাসিক মাসনভি গ্রন্থ। সুলতান আলাউদ্দীন খিলজার মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে স্বার্থান্ধ ক্ষমতালোভীদের চক্রান্ত, অরাজকতা ও রক্তপাতের অবসান ঘটিয়ে গিয়াস উদ্দীন তুঘলক সিংহাসন অলংকৃত করেন এবং কবি আমির খসরুকে পূর্বের ন্যায় সম্মান ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেন। প্রতিদান স্বরূপ কবিও জবরদখলকারী ও অবিশ্বাসী খসরু খানের উপর সুলতান গিয়াস উদ্দীন তুঘলকের বিজয় কাহিনী ও তাঁর অত্যল্পকাল স্থায়ী সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের অতি চমকপ্রদ বর্ণনা প্রদান করেছেন। এ গ্রন্থে যে সমস্ত তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে তা নির্ভরযোগ্য ইতিহাস বলে মনে করা হয়। এ গ্রন্থের রচনামূল্যে খুবই সাধারণ মানের বলে অনুমিত হয় (আসগার ১৯৫ ২১৮)। হাজী খলিফা (নোসখায়ে

খাতি সিরিয়াল ৩১১২, ৩য় খণ্ড ৩২১) এবং নওয়াব হায়দার ইয়ার জং হাবিবুর রহমান খান শেরওয়ানির কপি। ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে হাশেমি ফরিদাবাদীর সংশোধনসহ হায়দাবাদ থেকে এর সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছিল। এই মাসনভির দু'টি ব্যাখ্যা রয়েছে। একটি সাইয়েদ হাশেমী কর্তৃক তুঘলক নামা এবং অন্যটি ওয়াহিদ মির্জা কর্তৃক।

আমীর খসরুর গদ্য গ্রন্থাবলি

আমীর খসরুর গদ্যের তিনটি বই রয়েছে যা বাগী প্রবন্ধ হিসেবে বিবেচিত এবং সাহিত্যিক ও শৈল্পিক মূল্য রয়েছে। সেগুলি হলো :

ইজায খোসরাভি

এই বইটি পাঁচটি পুস্তিকা নিয়ে গঠিত এবং এটি আমীর খসরুর সবচেয়ে মূল্যবান গদ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। রিও (ইসলামিক কালচার ৮ম খণ্ড, সিরিয়াল ২, ৩০১-১২) অনুসারে এটি ১৩১৯ খ্রিষ্টাব্দ এবং ডাবলিউ পার্স অনুসারে ১৩১৬ খ্রিষ্টাব্দে সম্পন্ন হয়েছিল। এর অনুলিপি বিভিন্ন গ্রন্থাগারে পাওয়া যায় ভারতের ন্যাশনাল আর্কাইভস, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, ইন্ডিয়া অফিস এবং বোদলিইয়ান গ্রন্থাগারে; বইটি ১৮৪৭-৪৮ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত। লেখকের নাম রেজা হাসান হাশেমী (নোসখায়ে খাতি সিরিয়াল ১৩৩৭)। সালার জং মিউজিয়ামের লাইব্রেরিতে এটির দু'টি কপি আছে। প্রথম কপি ১৭২৯ খ্রিষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয় কপি উনিশ শতাব্দীর শেষের দিকে।

খাজাইনুল ফুতুহ

এই গ্রন্থটিতে আলাউদ্দিনের বিজয় সম্পর্কে লেখা হয়েছে এবং এটি একই সুলতানের নামে নামকরণ করা হয়েছে। এটি একটি ঐতিহাসিক রচনা যার বিষয়বস্তু ১৩১১-১২ খ্রিষ্টাব্দে লেখা হয়েছিল এবং বিভিন্ন লাইব্রেরিতে এই গ্রন্থের কপিগুলো বিদ্যমান আছে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের লাইব্রেরিতে দু'টি কপি, হায়দারাবাদ লাইব্রেরিতে এর একটি কপি আছে (নোসখায়ে খাতি সিরিয়াল ১৭৮, ১ম খণ্ড ১২২)। সালার জং মিউজিয়ামের লাইব্রেরিতে এর একটি অনুলিপি রয়েছে যা ১৯ শতকের শুরুতে আমির খসরু দেহলভির খাজাইন আল-ফতুহ হিসেবে অনুলিপি এবং সম্পাদনা করা হয়েছিল। পাঠ্যটি আলীগড় থেকে ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে সৈয়দ মোহাম্মদ মঈনুল হক কর্তৃক ফারসি ভাষায় মুদ্রিত ও সংশোধন করা হয়েছে। ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে মোহাম্মদ হাবিব কর্তৃক এর অনুবাদটি বোম্বাই থেকে প্রকাশিত হয়।

আফজালুল-ফাওয়াইদ

খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়ার বয়ান সংকলন এটি। খাজা নিজামুদ্দিন তাঁর খানকায় যে সকল বক্তৃতা, মুরিদদের আত্মসংশোধনমূলক কথামালা বলতেন তাঁর একনিষ্ঠ মুরিদ কবি আমির খসরু তা নিজ ভাষায় রূপ দান করেন। এর একটি কপি সালার জঙ্গ জাদুঘরে পাওয়া যায়। যদিও আমির খসরুর আরোপিত অন্যান্য রচনা আছে। যেমন- *এনশা খসরু*, *কিসসে চাহার দরবেশ*, *কাসেদায়ে খসরু* যা বাদশাদের ঘটনা সম্বলিত। কিন্তু ডক্টর ওয়াহিদ মির্জা তাঁর গবেষণা ও বিশ্লেষণে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এই সমস্ত কাজ খোসরোর নয় বরং তাঁর নামে সংযোজনকৃত। বিভিন্ন লাইব্রেরিতে এগুলোর কপি বিদ্যমান রয়েছে।

উপসংহার

কবি আমির খসরু ফারসি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম কবিদের অন্যতম। সাহিত্য সমালোচকদের মতে, তিনি প্রাচীনকালের কাব্য জগতে অধিপতি ছিলেন। উনসুরি মৃত্যুবরণ করলে আধিপত্যের মুকুট ফেরদৌসির মস্তিকে শোভা পায়। তারপর কবিতা রাজ্যের অধিপতি হন থাকানী। থাকানীর মৃত্যুর পর এ সম্রাজ্যের সম্রাট নির্বাচিত হন নিজামি গাঞ্জুবি। নিজামির তিরোধানের পর এ মুকুট শোভা পায় শেখ সাদির মস্তকে। শেখ সাদির পর কবি আমির খসরু এই দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। আমির খসরু ও কবি হাফিয় সিরাজী সমসাময়িক হলেও সাহিত্য সমালোচকগণ আমির খসরুকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে লালিত-পালিত হন। মাত্র বিশ বছর বয়সে হিন্দুস্থানের বিখ্যাত সুফী সাধক শেখ নিয়াম উদ্দীন আওলিয়ার শীষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর হাতে শপথ নেন। পীরের সদাচার, জীবন পদ্ধতি, কঠোর আত্মসংযম, দরবেশসুলভ জীবন যাপন ও আধ্যাত্মিকতার সহচর্য কবির কাব্য-প্রতিভাও সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠে এবং চিন্তা-ভাবনার চরম বিকাশ সাধিত হয়। কবি আমির খসরু তাঁর পৃষ্ঠপোষকদের আবেগ-অনুভূতি ও মন-মানসিকতাকে বাস্তবে রূপদান করে তাঁদের আনুকূল্য লাভ করেছেন। তিনি খুব সহজভাবে দক্ষতার সাথে ফারসি ভাষার বিখ্যাত কবিদের রচনা পদ্ধতি ও রীতিনীতি গ্রহণ করেন। তৎকালীন ইরানের খ্যাতিমান কবি হাকিম সানায়ি, থাকানি, নিজামি, শেখ সাদি প্রমুখের শব্দ চয়ন ও উপযুক্ত তাৎপর্যসমূহ গ্রহণ করেন। থাকানির কাসিদা হতে শুরু করে নিজামির প্রেমমূলক মাসনভী পর্যন্ত তাঁর রচনায় পরিলক্ষিত হয়। প্রায় সাতশত বছর অতিবাহিত হলেও আজও তাঁর স্মৃতি অলুপ্ত রয়েছে। আজও তাঁর কাওয়ালী উপমহাদেশের মানুষের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। তাঁকে হিন্দুস্তানের 'সানী' বলা হয়। আমির খসরু ভারতবর্ষের ফারসি কবি হলেও তাঁর খ্যাতি জগৎজোড়া। তাঁর গ্রন্থসমূহের পাণ্ডুলিপি বিশ্ব সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ইংল্যান্ড, তুরস্ক, ইরান, হিন্দুস্তানসহ বিশ্বের বিভিন্ন নামকরা গ্রন্থাগারে তাঁর পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ করা হয়েছে। তাঁকে জানতে হলে তাঁর এ সকল পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা অত্যাবশ্যিক।

তথ্যসূত্র

- আব্দুল মওদুদ। মুসলিম মনীষা। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫।
- আব্দুস সাত্তার ফারসি সাহিত্যের কালক্রম (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭।
- আফতাব আসগর (ড.)। তারিখ নেভিসিয়ে ফারসিদার হিন্দ ওয়া পাকিস্তান লাহোর। চাপখানায় সায়েদ সানজ, ১৯৮৫।
- মির্জা মকবুল বেগ বাদাখশানি। আদব নামায়ে ইরান। আসেফ জাভিদ, লাহোর: (তারিখ বিহীন)।
- যাবিহুল্লাহ সাফা (ড.)। তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান ওয় খণ্ড ২য় ভাগ। এন্তেশারাতে অহাঙ্গ। তেহরান: ১৯৯০।
- রেযা যাদেহ শাফাক (ড.)। তারিখে আদাবিয়াতে ইরান। তেহরান এন্তেশারাতে অহাঙ্গ, ১৩৬৯ হি./ ১৯৯০।
- শওকত নেহাল আনসারি (ড.)। আসারে আমির খসরু। মারকাযে তাহকিকাতে ফারসি দানিশ বাহার ৮৮, ১৩৮৬ হি. ইরান ও পাকিস্তান।
- সাজাহান মিয়া। "বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি" সিরাজুল ইসলাম ও আহমেদ জামান। বাংলাপিডিয়া বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষ (২য় সংস্করণ), বাংলাদেশ

এশিয়াটিক সোসাইটি, (২০১২)

হাসান আনুশেহ সম্পাদিত, দানিশ নামায়ে আদাবে ফারসি, ৪র্থ খণ্ড, সাজমানে

চাপ ও এন্টেশারাতে ওয়াযারাতে ফারহাঙ্গ ওয়া এরশাদে ইসলামি, তেহরান, ২০০১।

Harper, Douglas. "Manuscript." Online Etymology Dictionary. November 2001. Accessed 10-11-2007.

বাংলা সনেটের রূপ-রীতি ও উত্তরাধিকার

কাইছার উদ্দিন (কাইছার কবির)*

[প্রতিপাদ্যসার: বাংলা সনেটের আলোচনা প্রসঙ্গে উনিশ শতকের ভারতীয় রেনেসাঁসের প্রথম কবিপুরুষ মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) নাম অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। তিনি আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার অন্যতম বাহন হিসেবে বাংলা সাহিত্যে সনেট প্রবর্তন করেন এবং যার নামকরণ করেছিলেন চতুর্দশপদী কবিতা। আদিযুগের কাহ্নপাদ থেকে যুগসন্ধিকালের ঈশ্বরগুপ্ত পর্যন্ত অনেক কবিই চতুর্দশ পঙক্তি কবিতা রচনা করেছেন, তবে সে-সব কবিতা মূলত সাতটি সমিল পয়ার শ্লোকের সমষ্টি; তাতে সনেটের গূঢ়-গম্ভীরভাব ও সংহত গঠন শৈলী দুর্লভ। তবুও বাংলা সাহিত্যে সনেটের ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রে এ-সব পয়ারের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। মধুসূদন এবং তাঁর পরবর্তীকালের কবিসমাজের অনেকেই বাংলা সাহিত্যে সনেট রচনা করেছেন; কিন্তু পেত্রার্কানির্ভর মধুসূদন সনেট-কলাকৃতি কিংবা অন্য কোনো প্রতীচ্য কবির সনেট শৈলী ওই কবিসমাজের কবিতায় কতটুকু অনুসৃত ও অনুশীলিত হয়েছে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে তা তুলে ধরার প্রয়াস রয়েছে।]

এক

বাংলা সাহিত্যে আদিযুগের কাহ্নপাদ মধ্যযুগের চণ্ডীদাস ও যুগসন্ধিকালের ঈশ্বরগুপ্ত চতুর্দশ পঙক্তি কবিতা রচনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও এই কাল-পরিধিতে আরও অনেক কবি চতুর্দশ পঙক্তি কবিতা রচনা করেছেন। “কিন্তু একটি ভাব বা বিষয় ঠিক চতুর্দশ পঙক্তির আবেষ্টনে প্রকাশ করিবার সচেতন প্রয়াস সে-সকল রচনায় দেখা যায় না। সেকালের সিদ্ধাচার্য বা ভাবুকগণ তাঁহাদের বক্তব্য বা ভাবনা তার রসানুকূল বচনে ও ছন্দে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে রচনার পঙক্তিসংখ্যা কখনও কখনও চৌদ্দ হইয়া গিয়াছে। সেই নির্দিষ্ট সংখ্যক সময়াতন পঙক্তির মধ্যে সুসংহত রাখিয়া রচনার রূপাবয়ব গঠনের তাগিদ তাঁহারা গ্রাহ্য করেন নাই”(কাদির ৯)– চতুর্দশ পঙক্তির সুগঠিত রূপবন্ধে একটি প্রবল ভাব-প্রেরণা বা উচ্ছ্বসিত রস-কল্পনাকে আত্মীকরণ করার ক্ষমতা সেকালের কবিকুলের ছিল না– তাঁরা মূলত অন্তরের আবেগ ও উপলব্ধিকে কথায় ও সুরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করেছেন। “ফলে সে-সকল কবিতায় সুকঠিন ভাস্কর্যের সুডৌল সৌন্দর্য বিকীর্ণ না হইয়া তাহাদের সমগ্র শব্দ-শরীরে মনোহর বনপুষ্পের বিচিত্র আনন্দ-সুরভি বিচ্ছুরিত হয়।”(এ) মধুসূদনের মৌল উদ্দেশ্য ছিল চতুর্দশ পঙক্তির সুনির্ধারিত রূপবন্ধে ভাব-চিন্তা ও অনুভূতির পারস্পর্য বজায় রেখে ইতালীয় সনেটের ছাঁচে বাংলায় সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করা। মধুসূদন কিশোর বয়স থেকেই সনেট সম্পর্কে বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র মধুসূদন হিন্দু কলেজে পাঠকালে তাঁর রচিত কৈশোরিক ইংরেজি কবিতাবলির মধ্যে ষোলোটি সনেটের সন্ধান পাওয়া গেছে। এছাড়া মাদ্রাজ প্রবাসকালেও তিনি টিমোথি পেনপোয়েম (Timothy Penpoem) ছদ্মনামে দুটি সনেট রচনা করেন। মধুসূদনের ইংরেজিতে লেখা এই আঠারোটি সনেটের শিল্পোৎকর্ষ নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও মধুসূদন রচিত সনেটের বিবর্তন ধারায় এগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। কবির প্রকৃতিচিন্তা ও আত্মচিন্তা এই

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

সনেটগুলোর মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর হাতে বাংলা সনেট রচনার প্রথম সূত্রপাত ঘটে ১৮৬০ সালের ৭ সেপ্টেম্বরে। মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় এসে তিনি এই তারিখে বঙ্কু রাজনারায়ণ বসুকে (১৮২৬-১৮৯৯) লেখেন:

... I want to introduce the sonnet into our language and some morning ago, made the following:

কবি-মাতৃভাষা

নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন
অসংখ্য; তা সবে আমি অবহেলা করি,
অর্থলোভে দেশে দেশে করিনু ভ্রমণ,
বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী।
কাটাইনু কত কাল সুখ পরিহরি,
এই ব্রতে, যথা তপোবনে তপোধন,
অশন, শয়ন ত্যজে; ইষ্টদেবে স্মরি,
তাঁহার সেবায় সদা সঁপি কায় মন।

বঙ্গকুললক্ষী মোরে নিশার স্বপনে
কহিলা- “হে বৎস, দেখি তোমার ভকতি,
সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী।
নিজগৃহে ধন তব, তবে কি কারণে
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধনপতি?
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ সদনে?”

What say you to this my good friend! In my humble opinion, if cultivated by men of genius, our sonnet in time would rival the Italian.”(সোম ২৭৩-২৭৪)

উদ্ধৃত কবিতাটি পরবর্তীকালে পুনর্লিখিত হয়ে ‘বঙ্গভাষা’ নামে চতুর্দশপদী কবিতাবলী-তে মুদ্রিত হয়। মধুসূদনের এবং বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যের প্রথম সনেট ‘কবি-মাতৃভাষা’য় মাতৃভাষার প্রতি কবির গভীর অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। ফ্রান্সের ভার্সাই নগরে বাসকালে ইতালীয় ভাষায় বিষয়ভাবে পারদর্শী হয়ে তিনি পেত্রার্কান সনেটের রূপ-রীতি সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেন এবং ভার্সাইতে সনেট রচনায় প্রয়াসী হন। এই প্রসঙ্গে মধুসূদনের জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ সোমের (১৮৭০-১৯৪০) বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য: “যে ক্ষুদ্র কবিতার (সনেট) বীজ ভারতক্ষেত্রে তাঁহার হৃদয় অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তাহাই যুরোপে ইতালীয় কবিতারসে পরিপুষ্ট হইয়া, গৌড়-কাননের অনুচ্চ সৌরভিত পুষ্পকুঞ্জে পরিণত হইয়াছিল।”(সোম ২৭৪-২৭৫) দীর্ঘ পাঁচবছর পর ১৮৬৫ সালের ২৬শে জানুয়ারি ভার্সাই থেকে বঙ্কু গৌরদাস বাসাককে (১৮২৬-১৮৯৯) নতুন চারটি সনেট (‘অল্পপূর্ণার ঝাঁপি’, ‘জয়দেব’, ‘সায়ংকাল’ ও ‘কবতক্ষ নদ’) লিখে পাঠান। সেইসঙ্গে পত্রে লেখেন :

... I have been lately reading Petrarca- the Italian poet, and scribbling some ‘sonnets’ after his manner... I dare say the sonnet ‘চতুর্দশপদী’ will do wonderfully well in our language. I hope to come out with a small volume, one of these days. Believe me, my

dear fellow, our Bengali is a very beautiful language, it only wants men of genius to polish it up. (বসু ৫৭৫-৫৭৬)

এই চিঠিতে কবি বাংলা ভাষায় সনেটের সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন। পরবর্তীকালে কবির লেখা সনেট তাঁর এই ভবিষ্যৎ-বাণীকে সার্থক করে তুলেছে। উল্লিখিত চিঠি দুটিতে মধুসূদনের ইতালীয় কবি পেত্রার্কার সনেটের আদর্শে বাংলা ভাষায় সনেট রচনা করার বাসনা প্রকাশ পেয়েছে। ইতালিতে পেত্রার্ক তাঁর ব্যক্তি অভিজ্ঞতাজাত একান্তই মানবীয় বা নর-নারীর দেহাশ্রিত প্রেমের কলগুঞ্জকে প্রকাশ করবার জন্য চৌদ্দ পঙক্তির কবিতা রচনা করেন, যার মধ্যে দুটি গুরু ভাবগত (Ideological) এবং চরণান্তের মিলগত স্তবক (Verse) ছিল। প্রথম স্তবকটি আট-পঙক্তির, তাকে বলা হয় ‘অষ্টক’ (Octave) এবং দ্বিতীয় স্তবকটি ছয় পঙক্তির, তাকে বলা হয় ‘ষটক’ (Sestet); আট পঙক্তির স্তবক আবার দুটি চার পঙক্তির চতুষ্কে (Quatrain) এবং ছয় পঙক্তির স্তবক দুটি তিন পঙক্তির ত্রিকে (Tercet) বিভক্ত। পেত্রার্কীয়-রীতি অনুযায়ী অষ্টকের প্রথম চতুষ্কে বক্তব্য উপস্থাপন, দ্বিতীয়ে বিশ্লেষণ বা কারণ নির্দেশ; ষটকের প্রথম ত্রিকে বিষয়ের পরিপূরক বক্তব্য এবং দ্বিতীয়টিতে উপসংহার বা সমাধান লক্ষ করা যায়। এ-ধরনের সনেটে চতুষ্কদ্বয় পরস্পর বিযুক্ত এবং ত্রিকদ্বয় পূর্ণভাবযতি (Thought Pause) দ্বারা খণ্ডিত থাকে। চৌদ্দ পঙক্তি সমন্বিত এই সনেট-কবিতায় কবি-হৃদয়ের বিরল অভিজ্ঞতার একটি অখণ্ড ভাবকল্পনা বা অনুভূতি কণার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। খাঁটি পেত্রার্কীয় রীতিতে দু’ধরনের মিল-বিন্যাস (Rhyme-Scheme) রয়েছে; যথা—

ক১. কখখক কখখক গঘগ ঘগঘ

ক২. কখখক কখখক গঘঙ গঘঙ

এছাড়াও পেত্রার্কীয় সনেটের ষটকে আরো চার ধরনের মিল ব্যবহৃত হয়; যথা—

খ১. কখখক কখখক গঘঘ গগঘ

খ২. কখখক কখখক গঘগ ঘঘগ

খ৩. কখখক কখখক গঘঘ গঘগ

খ৪. কখখক কখখক গঘঙ ঙঘগ

নগেন্দ্রনাথ সোম তাঁর মধুস্মৃতি গ্রন্থে মধুসূদনের মোট ১০৮টি বাংলা সনেট মুদ্রিত করেছেন। ভার্সাই থেকে বন্ধু গৌরদাস বসাককে লেখা চিঠিতে মধুসূদন পেত্রার্কার আদলে বাংলায় সনেট রচনা করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন। পেত্রার্কান ১ক. রীতি-অনুসরণে মধুসূদন ৭টি সনেট: ‘সায়ংকালের তারা’, ‘মহাভারত’, ‘ঈশ্বরী পাটনী’, ‘শ্মশান’, ‘সংস্কৃত’, ‘রামায়ণ’, ও ‘কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া’ এবং ক২. রীতি-অনুসরণে কেবল ১টি সনেট: ‘কমলে কামিনী’ রচনা করেন। তাঁর অবশিষ্ট ১০০ টি সনেট ভঙ্গ কিংবা শিথিল পেত্রার্কীয়-রীতিতে নির্মিত। তিনি একটিও নিয়ম-নিরপেক্ষ (Irregular) সনেট রচনা করেননি। তাঁর সনেটের স্বকীয়তা বুঝতে সাহায্য করে ইংরেজ কবি থিওডর ওয়াটস ডানটনের (Theodore Watts Dunton, 1832-1914) নির্দিষ্ট সনেটের সংজ্ঞা:

A sonnet is a wave of melody:
From heaving waters of the impassional soul
A billow of tidal music one and whole,
Flow in the “Octave”; Then returning free,
Its ebbing surges in the “Sestet” roll
Back to the deeps of life’s tumultuous sea. (উদ্ধৃতি, গুপ্ত ২৭৯)

ইতালীয় সনেটে একাদশ দল, ফরাসি সনেটে দ্বাদশ দল আর ইংরেজি সনেটে দশ দলে পঙক্তি হয়। কিন্তু বাংলায় মধুসূদন পঞ্চদ্বিদল পঙক্তিক Heroic Verse-এর বিকল্প চতুর্দশমাত্রক পয়ার-বন্ধকেই বাংলা সনেটের আদর্শ বাহনরূপে গ্রহণ করেছেন। আর সনেটের অষ্টক স্তবক-বন্ধে মাত্র দুটি মিল, ষটক স্তবক-বন্ধে দুটি বা তিনটি মিল বিন্যস্ত করেছেন। অবশ্য অষ্টকের মিলবিন্যাসে তিনি আট প্রকার বৈচিত্র্য (কখকখ কখকখ; কখকখ থকখক; কখকখ কখকখ; কখকখ থকখক; কখকখ থকখক ও কখকখ কখকখ) এবং ষটকের মিলবিন্যাসে নয় প্রকার (গঘগ ঘগঘ; গঘঘ গঘগ; গঘগ ঘগু; গঘঘ গগু; গঘগ গঘগ; গঘঘ গকক; কগক গকক; গখগ থগখ ও গখখ গখগ) বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন।

মধুসূদন তাঁর চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে অষ্টক ও ষটকের বিভাজন পুরোপুরি মানেননি, মিল রচনায় নিয়েছেন স্বাধীনতা; ফলে দেশ-কাল, ভাব ও ভাষার বদলের সঙ্গে সঙ্গে সনেটের প্রকৃতির বদল অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। এই পরিবর্তনের মধ্যে বাংলা সনেটের বিচিত্র প্রাণধর্মিতা, ঋজুতা ও জনপ্রিয়তার বীজ নিহিত। মধুসূদনের সনেট কেবল বাংলাতেই নয় অন্যান্য ভারতীয় ভাষা অসমীয়া, ওড়িয়া এমনকি হিন্দিতেও যথাসময়ে গৃহীত, চর্চিত ও রচিত হয়েছে। মোটকথা মধুসূদনের সনেট প্রবর্তন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পেত্রার্কেস রূপকর্ম অনুসরণে অক্ষয়কুমার বড়ালের (১৮৬০-১৯১৯) ‘শতনাগিনীর পাকে’, ‘সে নেত্রে’, ‘নিত্যকৃষ্ণ বসু’ (ক১) ‘সন্ধ্যায়’ (ক২); ‘হৃদয় সমুদ্র সম’, ‘পূজার পর’ (খ১); কামিনী রায়ের (১৮৬৪-১৯৩৩) ‘সহযাত্রা-৮’(ক১); ‘সিরাজদ্দৌলার সমাধি দর্শন-১’, ‘গৃহদ্বারে দিওনা অর্গল’, ‘সহযাত্রা-৭’, ‘মাঘের চতুর্থ দিন’, ‘শ্মশানপথে দেশবন্ধু-১’, ‘বেহিসাবী দান’, ‘বহুর ভিতরে’, ‘ভাবকের ভুল’, ‘শিশু সেতু’, ‘মাতৃজন্ম’, ‘সোদরার প্রতি-১’, ‘অভব্য দৈব’, ‘অভিমনে’, ‘মানসী প্রতিমা’, ‘বাসন্তাগমে’, ‘বিচ্ছেদের সফলতা’, ‘নিত্যস্মৃতি’, ‘কন্যা বিরহে’, ‘কন্যা বুলবুলের প্রতি’, ‘অদ্ভুত প্রেম’, ‘ঘোর রহস্য (ক২); চিত্তরঞ্জন দাসের (১৮৭০-১৯২৫) ‘ঈশ্বর’ (ক১); সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের (১৮৮১-১৯৪৪) ‘যাযাবর’, ‘জিজ্ঞাসা’, ‘বহুবল্লভ’, ‘মৌন’, ‘প্রাপ্তি’, ‘চিঠি-১’, ‘বিশ্রাম’, ‘পলাতক’, ‘পরাজয়’, ‘বিমুখা’, ‘নিষ্পৃহ’, ‘ব্যর্থচেষ্টা’, ‘নিমেষিকা’, ‘রূপসী-১’, ‘দীপালী’, ‘প্রশ্নোত্তর’, ‘উত্তরা’, ‘অদীনপুণ্যা’, ‘পূর্ণিমা’, ‘এইক্ষণে’, ‘তৃপ্তি’, ‘ভীরা’(ক২); মোহিতলাল মজুমদারের (১৮৮৮-১৯৫২) ‘পয়ার’ (ক১); সুধীন্দ্রনাথ দত্তের (১৯০১-১৯৬০) ‘জাতক’-(১),(২),(ক২) প্রমথনাথ বিশীর (১৯০১-১৯৮৭) ‘প্রাচীন আসামী হইতে-৩২’ (ক২); ‘প্রাচীন পারসীক হইতে-২০’ (খ৪); আবদুল কাদিরের (১৯০৬-১৯৮৪) ‘মৃত্যুস্বপ্ন’(ক১), ‘একাত্মা’(ক২); অজিত দত্তের (১৯০৭-১৯৭১) ‘কবিতা’, ‘শীলাভট্টারিকা’, ‘ইতিহাস’, ‘বিশ্রাম’, ‘পশ্চাতের আমি’, ‘নবজাতক’, ‘যাত্রা’, ‘খেয়া’, ‘অগ্রদানী’(ক২); ‘দুর্লভরাত্রি’, ‘একটি স্বপ্ন’, ‘গুরুজনদের মাঝে’, ‘আকাজ্জা’, ‘নাস্তিক’, ‘জ্বরে’, ‘বার্তা’, ‘প্যারাডাইজ লস্ট’, ‘শরৎ’, ‘প্রার্থনা’, ‘ছায়াসঙ্গিনী’, ‘রাত্রি এলো’, ‘নেশা’ (খ১); ‘শুভক্ষণ’, ‘সনেট’, ‘বাড়ব’, ‘সৈনিক মৈনাক হও’, ‘গোপনীয়’, ‘আশা’, ‘গণ্ডি’, ‘চুরি’, ‘রাজা’, ‘মূর্তি’(খ৪); মতিউল ইসলামের (১৯১৪-১৯৮৪) ‘নতুন জমানা’(ক১); ফররুখ আহমদের (১৯১৮-১৯৭৪) ‘দুর্লভ মুহূর্ত’(খ২); আবদুল হাই মাসরেকীর (১৯১৯-১৯৮৮) ‘চেরাগ’(খ৪); আবদুর রশীদ খানের (১৯২৪-২০১৯) ‘তিমিরাভিসার’; জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর (১৯২৮-২০১৪) ‘সনেট’ (খ৩); শামসুর রাহমানের (১৯২৯-২০০৬) ‘একটি টিনের বাঁশি’(খ৩); আলাউদ্দিন আল আজাদের (১৯৩২-২০০৯) ‘একটি শস্যের শিশু’, আমার মৃত্যুর পরে’ (ক২) ও মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর (১৯৩৬-২০১৩) ‘কবিতার দেশ নেই’ (খ৪) প্রভৃতি সনেট উল্লেখযোগ্য।

দুই

ইংরেজি সাহিত্যের আদি সনেটকার হলেন সার টমাস ওয়াট (Sir Thomas Wyatt, 1503-1542) এবং হেনরি হাওয়ার্ড আর্ল অব সারে (Henry Howard Earl of Surry, 1517-1547)। ১৫২৭ সালে ওয়াট কূটনৈতিক কারণে একবার ইতালিতে যান এবং তিনি পেত্রার্কার কয়েকটি সনেট ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। এ-কারণে ওয়াটকেই ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম সনেটকার রূপে চিহ্নিত করা হয়। ওয়াট এবং সারের জীবনকালে তাঁদের কোনো কাব্যগছ প্রকাশিত হয়নি। এঁদের মৃত্যুর অনেক পরে Richard Tottel (Died, 1594) নামে একজন ব্রিটিশ প্রকাশক ১৫৫৭ সালে Tottel's Miscellany Songs and Sonnets শীর্ষক শিরোনামে অল্প সংখ্যক কবির ৫৪টি কবিতার একটি কাব্য-সংকলন প্রকাশ করেন। এই কাব্য-সংকলনে অজানা লেখকের নয়টি, নিকোলাস গ্রিমাল্ডের ৩টি ওয়াটের ২৭টি এবং সারের ১৫টি সনেট সংকলিত হয়। ১৯৪৯ সালে মুইর (Muir) ওয়াটের ৩০টি সনেট সংবলিত একটি কাব্য-সংকলন প্রকাশ করেন। ওয়াটের অধিকাংশ সনেট বিভিন্ন ইতালিয়ান কবির অনুবাদকল্প রচনা এবং প্রেমই তাঁর সনেটের উপজীব্য ; যদিও কয়েকটি সনেট তৎকালীন সমাজ-জীবনের প্রভাবজাত।

সনেট কলাকৃতির ক্ষেত্রে ওয়াট মূলত পেত্রার্কান। ষটকের মিলবিন্যাসে তিনি পেত্রার্ককে অনুসরণ না করলেও পেত্রার্কান সনেটের অধিকাংশ মৌল-লক্ষণ তিনি যথাযথ অনুসরণ করেছেন। তাঁর সনেটের অষ্টক দুটি সংবৃত চতুষ্কে এবং ষটক একটি চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মকে গঠিত। এই মিত্রাক্ষর যুগ্মকে থাকে সমগ্র ভাব-কল্পনার সারসত্য বা সিদ্ধান্ত। ওয়াটীয় সনেটের রূপবন্ধ দুই ধরনের; যথা—

১. কথখক কথখক গঘঘগ গুঙ
২. কথখক কথখক গঘঘগ গুঙ

ওয়াট সনেটের মিল সংখ্যাকে সর্বক্ষেত্রেই পাঁচ-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। এই প্রকৃতির কলাকৃতিকেই অনুসরণ করে বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম সনেট রচনা করেন রবীন্দ্রনাথের কবিদ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৫-১৯২০)। প্রথম পদ্ধতি অনুসরণে তাঁর ‘পিসিমার সীতাভোগ’, ‘মহাত্মা কম্পিসের প্রতি’, ‘শ্রী গৌরাঙ্গের প্রতি-১’, ‘সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর’; দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসরণে তাঁর ‘উষা’, ‘অপূর্ব কৃষ্ণপ্রাপ্তি’, ‘শেফালি’, ‘শ্রীহরির প্রতি’, ‘ফতে গড়ের মাকালী’, ‘সৌম্য’, ‘বনফুল’ প্রভৃতি সনেট রচিত। দেবেন্দ্রনাথ সনেটের মিল ও শব্দের ক্ষেত্রে মধুসূদন-রবীন্দ্র অনুসারী কবি; যদিও মিলের বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে তাঁর তেমন কোনো দক্ষতা ছিল না। সনেটের কঠিন কাঠামোয় গীতিকবিতা রচনা করতে গিয়ে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের মতই তিনি স্বরাস্ত মিল যোজনায় অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, বাংলা ভাষায় স্বরাস্ত মিলের সংগীতিক আবেদন ও মাধুর্য ব্যঞ্জনান্ত মিলের চেয়ে অনেক বেশি—রূপারূপে এবং ভাবের গাঢ়তায় তাঁর সনেটগুলো আদর্শ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। দেবেন্দ্রনাথের পর সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ওয়াটের দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসরণে রচনা করেন ‘মৃতপ্রেম’, ‘প্রতিহিংসা’, ‘অভিব্যাপ্তি’, ‘পশুশ্রম’, ‘বিকলতা’, ‘বাক্য’, ‘দ্বন্দ্ব’, ‘বিপ্রলাপ’, ‘কঞ্চুকী’, ‘সোহংবাদ’ প্রভৃতি সনেট। এছাড়া মোতাহের হোসেন চৌধুরীর (১৯০৩-১৯৫৬) ‘আজ নয়’ এবং হাবীবুর রহমানের (১৯২২-১৯৭৬) ‘মানব-বন্দনা’ ও ‘ইট’ ওয়াটের দ্বিতীয় পদ্ধতি-অনুসারে রচিত।

ইংরেজি সনেট মূলত উইলিয়াম শেক্সপীয়রের (William Shakespeare, 1564-1616) নামেই পরিচিত। তাঁর ১৫৪টি সনেট-পরম্পরা (Sonnet-Sequence) গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৬১৬ সালে। তাঁর সনেটগুলোর মধ্যে প্রথম ১২৬টি তাঁর কোনো এক যুবাবন্ধুর উদ্দেশ্যে এবং অবশিষ্ট ২৮টি ‘দা ডার্ক লেডি’ (The Dark Lady) নামে কোনো এক রহস্যময়ী কৃষ্ণবর্ণা নারীকে কেন্দ্র করে রচিত। শেক্সপীয়রের সমসাময়িক অনেক কবি বিভিন্ন সময়ে পেত্রার্কীয়-রীতিতে সনেট রচনা করলেও শেক্সপীয়র কিন্তু প্রথম থেকেই তাঁর পূর্ববর্তী সনেটকার সারের রীতিকেই অনুসরণ করে সনেটকে নবরূপ দান করেছেন, যা পরবর্তীকালে পরিচিত হয়েছিল ‘শেক্সপীয়র-রীতি’ বা ‘ইংরেজি-রীতি’ হিসেবে। লেভারের ভাষায়, “It became the stable late-Elizabethan sonnet-form, which Shakespeare too was to adopt.” (The Elizabethan Sonnets 47) শেক্সপীয়র ১৫৪টি সনেট রচনা করেন নিম্নোক্ত ছাঁচে :

কখকখ গঘগঘ ঙচঙচ ছছ

উল্লেখ্য যে, টোটেল মিসেলিনি (Tottel’s Miscellany)- তে সারের যে পনেরোটি সনেটের সন্ধান পাওয়া যায় এর প্রায় সমস্ত সনেটই উপর্যুক্ত মিল-বিন্যাসে রচিত। তিনি পেত্রার্ক তথা ইতালীয় এবং পূর্বসূরী ওয়াটের মৌল আদর্শ থেকে অনেকখানি সরে গিয়ে সনেট-রূপকল্পে সম্পূর্ণ নতুন ছাঁচ তৈরি করেন। এডমন্ড স্পেনসারের (Edmond Spenser, 1552-1599) আমোরেত্তি (Amoretti, 1595) কাব্যের অষ্টম সনেট এবং তাঁর দ্বারা ফরাসি কবি ক্লেমঁ মারোর সনেটের অনুবাদ-সংকলন দা ভিশনস অব পেত্রার্ক (The Visions of Petrarch) গ্রন্থের সনেটও ওয়াটের উল্লিখিত রূপকর্মের অনুরূপ। সনেট-কলাকৃতির ক্ষেত্রে শেক্সপীয়রের মতো স্পেনসার মূলত সারের মিল বিন্যাস-পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। কিন্তু তিনি তাঁর আমোরেত্তি (আমোরেত্তি কাব্যের মোট সনেট সংখ্যা ৮৮টি) কাব্যের ৮৭টি সনেট রচনা করেন নিম্নোক্ত রূপশৈলীতে:

কখকখ খগখগ গঘগঘ ঙঙ

এটিই সনেটের ইতিহাসে স্পেনসারীয় রীতি নামে পরিচিত। স্পেনসারীয়-মিলে রচিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম ‘সনেট’ বিষু দে-র তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ গ্রন্থের ‘সনেট’ শীর্ষক কবিতাটি। কিন্তু এই রীতি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে শেক্সপীয়রের অনুসৃত মুক্তক রীতিটি তাঁর সারস্বত-প্রতিভার স্পর্শে উজ্জ্বল হয়ে ইংল্যান্ডে এবং পরে অন্যান্য দেশে ব্যাপক প্রসার লাভ করে।

শেক্সপীয়র-সনেটের চৌদ্দটি পঙক্তি সাতমিলের তিনটি বিবৃত চতুষ্ক (Quatrain) ও একটি মিত্রাক্ষর-যুগ্মক (Rhymed-Couplet) নিয়ে বিন্যস্ত। প্রথম চতুষ্কে থাকে বক্তব্যের অবতারণা, দ্বিতীয় চতুষ্কে বিষয়ের বিশ্লেষণ, তৃতীয় চতুষ্কে সমগ্র ভাবের মর্ম-রূপায়ণ এবং মিত্রাক্ষর যুগ্মকে সিদ্ধান্ত বা মন্তব্য। মিত্রাক্ষর যুগ্মকটিতে সমগ্র কবিতাটির মূলভাব সংহত হয়ে বিস্ময়কর অপার সৌন্দর্য বিস্তার করে এবং তা মনের মধ্যে প্রগাঢ় রেখাপাত সৃষ্টির মধ্যদিয়ে ভাব ও রূপের পরিপূর্ণতা সাধন করে। পেত্রার্কীয় সনেটের আবর্তন-সন্ধি (Volte) এখানে অনুপস্থিত, অষ্টক ও ষটকের ভেদরেখাও বিলুপ্ত। এছাড়া তরল ব্যঞ্জনধ্বনি ও ধ্বন্যাশ্রয় শব্দের ব্যবহার, পদের মধ্যে ও শেষে মিলের প্রয়োগ প্রভৃতি কারণে সমালোচকদের মতে শেক্সপীয়র-রীতির সনেট অনেক বেশি সাবলীল ও আকর্ষণীয় হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম শেক্সপীরীয়-রীতির সনেট রচনা করেন। তাঁর ‘স্মৃতি’, ‘কেন’, ‘পবিত্রপ্রেম’, ‘অক্ষমতা’, ‘জাগিবার চেষ্টা’, ‘কবির অহংকার’, ‘বিজনে’, ‘সত্য-১’, ‘তবু’, ‘দরিদ্রা’, ‘প্রাণের দান’ মোট ১১টি সনেট খাঁটি শেক্সপীরীয়-রীতিতে রচিত। বাঙালি কবির শেক্সপীরীয়-পদ্ধতিতে সবচেয়ে বেশি সনেট রচনা করেছেন। নিচে বিভিন্ন কবির শেক্সপীরীয়-পদ্ধতিতে রচিত সনেট দেখানো হলো— গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৬-১৯১৮): ‘যুবতী’, ‘বৃদ্ধা’, ‘আমার ঈশ্বর’, ‘ভূতের ভয়’, ‘সংবাদ’, ‘আমি আছি তারি’, ‘বিরক্ত নারী’, ‘প্রেতযোনি’, ‘আগে ছিল মন’, ‘অবশিষ্ট’, ‘শাঁখের করাত’, ‘অনুরোধ’, ‘নাই কি’, ‘স্ত্রীপুরুষের প্রেম’, ‘ব্যবধান’, ‘কিশোরী-১’, ‘পাঠ’, ‘ফুলদানী’, ‘আলিঙ্গন’, ‘চিড়াকুটা’, ‘শরৎ’, ‘বিক্রমপুর’, ‘শরতের উষা’, ‘দুর্ভিক্ষে লক্ষীপূজা’, ‘অবলা ও অনল’, ‘একপদাঘাতে’, ‘জলধর’, ‘আত্মঘাতী’, ‘কোকিল’, ‘মোক্ষদা-১’, ‘কাঁথা সেলাই’, ‘পুষ্প-সজ্জা’, ‘দেবালিকা’, ‘নারী’, ‘ধর্মগ্রন্থ’, ‘অপরাজিতা’, ‘ভাওয়ালে পূজা’; দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৮-১৯২০): ‘সদ্যঃস্নাতা’, ‘সূরা’, ‘নিদাঘের রৌদ্র’, ‘রবীন্দ্রবাবুর সনেট’, ‘আষাঢ়’, ‘হোমায়িনী’, ‘উমামঙ্গল’; অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯): ‘শতাব্দিক’; রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০): ‘বোঝে না’; নবকৃষ্ণ ঘোষ (১৮৬৮-১৯৪১): ‘বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’; রসময় লাহা (১৮৬৯-১৯২৯): ‘রজনীগন্ধা’, ‘শেফালিকা’, ‘সহপাঠী’, ‘বালিকা’, ‘উপহার’, ‘অস্তিত্বে’, ‘কালিদাস’, ‘মেঘনাদ’, ‘চিত্ত-দর্শন’, ‘হেমচন্দ্র’, ‘তপোবন’, ‘রবির প্রেম’, ‘কবিতা’; গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৭০-১৯৩৫): ‘তুলনা’, ‘কল্যাণী’; ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী (১৮৭২-১৯৪০): ‘আত্মদানের শঙ্কা’, ‘লোকাভীত ভূমি’, ‘বাহ্যবিরহিতা’; প্রমথনাথ রায় চৌধুরী (১৮৭২-১৯৪৯): ‘তোরে দেখি এলাহিরে’, ‘শিশুহাস্য চমুকের’, ‘জালিক তোমাকে নিয়ে’, ‘শক্তির দানব’, ‘রোমাঞ্চ ও গানে’, ‘শিখেছি ও হাছা শুনে’; মুণালিনী দেবী (১৮৭৩-১৯০২): ‘বিনিময়’, ‘নিশীতে’, ‘সম্মান’, ‘পৌর্ণমাসী’; সরোজকুমারী দেবী (১৮৭৫-১৯২৬): ‘নববিধবা’, ‘নবকুমার’, ‘নগেন্দ্র’, ‘হেমেন্দ্র’, ‘মহেন্দ্র’, ‘জীবনানন্দ’, ‘বাতায়নে’, ‘অমরনাথ’, ‘নদীতীরে’, ‘পিতৃশ্লেষ’, ‘জনক’, ‘রাজর্ষি’; রমণীমোহন ঘোষ (১৮৭৫-১৯২৮): ‘কল্পনা ভ্রমর’, ‘সন্ধ্যাদীপ’, ‘সাধ’, ‘পূজারিণী’, ‘ঐশ্বর্য’; কিরণচাঁদ দরবেশ (১৮৭৮-১৯৪৬): ‘কর্মের আকাঙ্ক্ষা’, ‘গুরুকে’, ‘মানস-পূজা’, ‘অনর্থ’, ‘অসীমত্ববোধ’; যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৭): ‘দুইপক্ষ’, ‘রজনীগন্ধা’, ‘বয়ঃসন্ধি’; সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২): ‘আলোকলতা’, ‘অরণ্যেরোদন’, ‘ঝড় ও চারাগাছ’, ‘শাহারজাদী’, ‘অক্ষয়বট’, ‘সমাগ্ণে’, ‘কেলিকদম্ব’, ‘নব মেঘোদয়’, ‘লরেল’, ‘মেথর’, ‘ইচ্ছামুক্তি’, ‘কোন নেতার প্রতি’; জীবেন্দ্রকুমার দত্ত (১৮৮৩-১৯২৩): ‘নিবেদন’, ‘প্রেমের বন্ধন’, ‘প্রার্থনা’, ‘আশ্বাস’, ‘অসমাপ্ত’, ‘অতৃপ্ত’; কান্তিচন্দ্র ঘোষ (১৮৮৬-১৯৪৮): ‘মিলনে’, ‘বিরহে’, ‘বাদলে’, ‘অকথিত’, ‘সুরে’, ‘দ্রষ্টলগ্ন’, ‘অনুতপ্ত’; মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬): ‘শান্তি’; কালিদাস রায় (১৮৮৯-১৯৭৬): ‘রজনীশেষে’, ‘শেষ’, ‘তৃষ্ণা’, ‘বিদায় না আহবান’, ‘দরিদ্রা’; বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৫৯): ‘আবাহন’, ‘রজনীকান্তের প্রতি’, ‘প্রকৃতির মহাপ্রাণ’, ‘লহরী’, ‘সূর্যাস্ত’, ‘মধুসূদন’, ‘আগমনী’, ‘নারী’, ‘রবীন্দ্রনাথ’; হেমেন্দ্রলাল রায় (১৮৯২-১৯৩৫): ‘দেহের মহিমা’, ‘বসন্তের আগমন’, ‘দৃষ্টি’, ‘আদি নরনারী’, ‘সিঙ্কুর মাতৃত্ব’; নিরুপমা দেবী (১৮৯৫-১৯৮৪): ‘বিরহ ও মিলন’; সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬১): ‘মহাসত্য’, ‘জাদুঘর’, ‘মাধবীপূর্ণিমা’; মনীশ ঘটক (১৯০২-১৯৭৯): ‘তারা’, ‘ব্যর্থ’; অজিত দত্ত (১৯০৭-১৯৭১): ‘ব্যর্থকবি’, ‘কোনপথে’, ‘বান’; আজিজুল হাকিম (১৯০৮-১৯৬২): ‘আশা’; বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২): ‘গার্হস্থ্য-শ্রম-আত্মজ্ঞান’, ‘এক টিকেটহীন সহযাত্রী’, ‘৭ই নভেম্বর’, ‘সনেট’, ‘ওরে বাছা’, ‘মানুষের দেশ স্বয়ং প্রকৃতি’; সৈয়দ আলী আশরাফ (১৯২৪-১৯৯৮): ‘প্রেম’; শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬): ‘বাড়ি’, ‘খেলনা’, ‘কবিতার সঙ্গে গেরস্থালী’, ‘সন্ধ্যার খালুই থেকে’, ‘ঈদকার্ড’, ‘গৃহ সহবতে’, ‘আমরা ক’জন শুধু’, ‘কাল রাতে স্বপ্ন’, ‘যে-কোনো সকালে’, ‘প্যারাবল’, ‘মাপকাঠি’; ফজল শাহাবুদ্দীন (১৯৩৬-২০১৪): ‘সেই পাণ্ডুলিপি’ ও আল মাহমুদ (১৯৩৬-২০১৯): ‘তরঙ্গিত প্রলোভন’,

‘সোনালি কাবিন’: সনেট পরম্পরা-১,২,৫,৯,১৩,১৪; হুমায়ুন কবির (১৯৪৮-১৯৭২): ‘নবনারী’, ‘সিন্ধুকারা’, ‘ভিক্ষা’ প্রভৃতি।

ওয়াট, সারে ও শেক্সপীয়রের পরে ইংল্যান্ডে তথা ইংরেজি সাহিত্যে অনেকেই সনেট লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এঁদের মধ্যে বহুবিশ্রুত কীর্তিজন মিল্টন (John Milton, 1608-1674), পার্সি বিশি শেলী (Percy Bysshe Shelley, 1792-1822), জন কীটস (John Keats, 1795-1821), এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং (Elizabeth Barrett Browning, 1806-1861), ডি.জি. রসেটি (D.G./ Dante Gabriel Rossetti, 1828-1882), ক্রিস্টিনা রসেটি (Christina Rossetti, 1830-1894), রুপার্ট ব্রুক (Rupert Brook, 1887-1915) প্রমুখ খ্যাতিসম্পন্ন কবি যেমন রয়েছেন, তেমনি অনুজ্জ্বল কবিও আছেন। কিন্তু ইংরেজি সনেটের সুবিশাল জগতে কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ (William Wordsworth, 1770-1850)- এর কিছু বিশিষ্টতা রয়েছে। যদিও অনস্বীকার্য যে, সনেটীয় মাধ্যমের চেয়ে কবিতার অপরাপর ‘ফর্মে’ই তাঁর যুগন্ধর কবিপ্রতিভার দীপ্ত প্রতিফলন সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা যায়। তিনি সর্বমোট ৫২৩টি সনেট রচনা করেছেন। উইলিয়াম হেনার হাডসন তাঁর *Wordsworth and his poetry* গ্রন্থে ওয়ার্ডসওয়ার্থকে ‘The greatest of English sonnet writers’ বলেছেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থের কয়েকটি প্রসিদ্ধ সনেট খাঁটি পেত্রার্কীয় পদ্ধতিতেই নির্মিত; কিন্তু সনেটের ইতিহাসে তাঁর বিশেষ অবদান তাঁর উদ্ভাবিত নতুন রূপবন্ধ। ওয়ার্ডসওয়ার্থীয় সনেটের রূপবন্ধ দু’প্রকার; যথা—

১. কথখক কগগক ঘঙঙঘ চচ
২. কথখক কগগক ঘঙঘঙ চচ

উল্লিখিত প্রথম ছাঁচে দেবেন্দ্রনাথ সেনের ‘প্রিয়তমার প্রতি’ ও ‘স্বপ্ন’ এবং দ্বিতীয় ছাঁচে বেনজীর আহমদের (১৯০৩-১৯৮৩) ‘রৌদ্রদন্ধ’, ‘বসুন্ধরা’; আজিজুর রহমানের (১৯১৪-১৯৭৮) ‘সে’; ফররুখ আহমদের ‘গাওসুল-আজম’, ‘মৃত্যু-সংকট’ ও রিয়াজউদ্দীন চৌধুরীর ‘অমাবস্যা’ প্রভৃতি সনেট নির্মিত। সনেটের মিলবিন্যাসে ওয়ার্ডসওয়ার্থ নানা বৈচিত্র্য দেখালেও কলাকৃতির ক্ষেত্রে তিনি মূলত পেত্রার্কান ও শেক্সপীয়রীয় রীতির অনুগত।

তিন

ফরাসি রেনেসাঁস-পর্বে ফরাসি সাহিত্যে গীতিকাব্যের অন্যতম বাহন হিসেবে সনেটের পেত্রার্কান রীতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ক্লেমঁ মারো (Clement Marot, 1496-1544) পেত্রার্কির ছয়টি সনেটের অনুবাদসহ কয়েকটি মৌলিক সনেট রচনা করে ফ্রান্সে প্রথম সনেট প্রবর্তন করেন (Brereton 174)। এরপর জয়াক্যাঁ দ্য বেল (Joachim du Bellay, 1522-1560), পিয়ের দ্য রোসাঁ (Pierre de Ronsard, 1524-1585), র্যমি বেল্লো (Remy Belleau, 1528-1577), এতিয়েন জলেদ (Etienne Jodelle, 1532-1573) এবং আতোয়ান দ্য বাইফ (Antoine de Baif, 1532-1589) প্রভৃতি প্লেয়াদ কবিগোষ্ঠীর হাতে ফরাসি সনেট রচনার নতুন ধারা সূচিত হয়। এ-প্রসঙ্গে সিডনি লী বলেন:

Very different was the fortune of the Sonnet, which was openly borrowed by the pleiade from Italy and became the chief badge of the new poetic movement (Lee 13).

প্লেয়াদ-কবিকুল ইতালিয়ান সনেটের আদর্শে প্রচুর সংখ্যক পেত্রার্কান-রীতির সনেট রচনা করলেও তাঁদের হাতেই মূলত ফরাসি সনেট বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। ফরাসি সনেট চৌদ্দ পঙক্তি অষ্টক ও ষটক দুটি পর্বে বিভক্ত; আবার অষ্টক দুটি সংবৃত চতুষ্কে ও ষটক দুটি ত্রিকে গঠিত। ষটকের প্রথম ত্রিক এবং দ্বিতীয় ত্রিক-র শীর্ষে দুটি ভিন্ন মিলের যুগ্মক রয়েছে। ফরাসি সনেটের রূপবন্ধ:

কখখক কখখক গগঘ ঙ্গঘ

উল্লিখিত সনেটের মিলবিন্যাসই প্লেয়াদ-কবিকুল ফরাসি সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ-প্রসঙ্গে ফরাসি সাহিত্যের ইতিহাস লেখক জিওফ্রে ব্রেরটনের মন্তব্য:

The French Sonnet is based on the Italian and rhymes abba abba followed by some such combination as ccd eed (Brereton 134).

পরবর্তীকালের ফরাসি কবিরাজ সনেট রচনায় এই মিলবিন্যাস থেকে সবচেয়ে বেশি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বিশুদ্ধ ফরাসি-রীতির সনেট বাংলা ভাষায় খুব কম। বিষ্ণু দে-র উর্বশী ও আর্টেমিস কাব্যের ‘কবিপ্রেম’ শীর্ষক কবিতাটি এই রীতির সনেট। ফরাসি সাহিত্যে কলাকৈবল্যবাদী পারন্যাসিয়ান (Parnassian) কবিগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটলে সনেটের ষটকে গগঘ ঙ্গঘ মিলটিও গুরুত্ব পায়। এ-ক্ষেত্রে ফরাসি সনেটের রূপবন্ধ:

কখখক কখখক গগঘ ঙ্গঘ

উল্লিখিত সনেট-রীতির কবিদ্বয় হলেন লেকোঁৎ দ্য লিল (Leconte de Lisle, 1818-1894) এবং জে. এম. দ্য এরেরিয়া (J. M. de Heredia, 1842-1905)। ফরাসি কবিরাজ সনেটের ষটকে নিজস্ব প্রকৃতির যে মিলবিন্যাস প্রবর্তন করেছেন সনেট-কলাকৃতির দিক থেকে তাও মূলত পেত্রার্কান। পেত্রার্কান সনেটের মতোই তাঁরা মিল সংখ্যাকে পাঁচ-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে সনেটের গভীর ও সুদৃঢ় ভাবমূর্তি রচনায় অধিকতর মনোযোগী হয়েছেন। বিষয়বস্তুর দিক থেকে ফরাসি সনেটে প্রথমদিকে পেত্রার্কান প্রেম-স্বর্গস্থ হলেও পরবর্তীকালে ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি এমনকি ব্যঙ্গ-বিদ্রোহও সনেটের বিষয়াদি হিসেবে স্বীকৃত হয়।

উল্লিখিত দুটি ফরাসি-রীতি ভেঙে বাংলা সাহিত্যে প্রথম চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) নতুন দুটি রূপকল্প প্রবর্তন করেন; যথা—

১. কখখক কখখক গগ ঘঙঙঘ
২. কখখক কখখক গগ ঘঙঘঙ

প্রথম রীতিতে তিনি তাঁর সনেট-পঞ্চাশৎ (১৯১৩) কাব্যের ‘জয়দেব’, ‘বন্ধুর প্রতি’, ‘কাঠ-মল্লিকা’, ‘রূপক’, ‘হাসি’, ‘উপদেশ’; পদচারণ (১৯১৯) কাব্যের ‘বর্ষা’, ‘সনেট-সপ্তক’-(৩), (৬), (৭), ‘শরৎ’; অন্যান্য কবিতা’র (১৯১৩) ‘পঞ্চাশোর্ধ্বে’ এবং দ্বিতীয় রীতিতে সনেট-পঞ্চাশৎ কাব্যের ‘ভর্তৃহরি’, ‘বাংলার যমুনা’, ‘বার্ণার্ড শ’, ‘বালিকা-বধূ’, ‘ব্যর্থ-জীবন’, ‘মানব-জীবন’, ‘হাসি ও কান্না’, ‘ধরণী’, ‘কাঠালী চাঁপা’, ‘করবী’, ‘অপরাজ’, ‘ব্যর্থ-বৈরাগ্য’, ‘অন্বেষণ’, ‘বিশ্বরূপ’, ‘শিব’, ‘বিশ্ব-ব্যাকরণ’, ‘বিশ্বকোষ’, ‘সুরা’, ‘পূরবী’, ‘শিখা ও ফুল’, ‘পরিচয়’, ‘স্মৃতি’, ‘আত্মকথা’; পদচারণ কাব্যের ‘ফসলে গুল্মে ময়মেতোরাত’, ‘অকাল বর্ষা’, ‘বর্ষা’, ‘কবিতা’, ‘কাব্যকলা’, ‘আমার সনেট’, ‘আমার সমালোচক’, ‘সনেট-সপ্তক’-(২), (৪), (৫), ‘দ্বিজেন্দ্রলাল’, ‘স্নেহলতা’,

‘সনেট’, ‘খর্সাৎ; অন্যান্য কবিতা’র ‘দুনিয়া’, ‘ফরমাশি সনেট’ প্রভৃতি রচনা করেন। প্রথম চৌধুরী সনেট-পঞ্চাশৎ-এর প্রথম সনেটে লিখেছেন:

পেত্রার্ক-চরণে ধরি করি ছন্দোবন্ধ,
যাঁহার প্রতিভা মর্ত্যে সনেটে সাকার।
একমাত্র তাঁরে গুরু করেছি স্বীকার,
গুরুশিষ্যে নাহি কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধ!

... ...
ইতালির ছাঁচে ঢেলে বাঙালির ছন্দ,
গড়িয়া তুলিতে চাই স্বরূপ সনেট।
কিঞ্চিৎ থাকিবে তাহে বিজাতীয় গন্ধ

সরস্বতী দেখা দিবে পরিয়া বনেট! (চৌধুরী ১)

কিন্তু কার্যত তিনি সনেট-পঞ্চাশৎ গ্রন্থভুক্ত ৫০টি সনেটের একটিতেও খাঁটি পেত্রার্কীয়-রীতি অনুসরণ করেননি। তাঁর পদচারণ কাব্যের ‘সনেট-সুন্দরী’ ‘বনফুল’ ও ‘চেরীপুষ্প’ পেত্রার্কীয় কথখক কথখক গঘঙ গঘঙ ছাঁচে রচিত। সম্ভবত পেত্রার্কীয়-রীতি তাঁর মনপূত না হওয়ায় এই রীতিতে সনেট রচনায় তিনি খুব বেশি আগ্রহ দেখাননি। ফরাসি কবিরা ব্যঙ্গকৌতুক ও বিদ্রূপ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সনেটের ষটককে দুই ত্রিকে বিভক্ত করেছেন। প্রথম চৌধুরী বাগবৈদম্ব্য ও বক্তোক্তির অধিকারী ছিলেন। হয়তো তিনি তাঁর এই কবি-স্বভাবের প্রতিরূপ দিতে গিয়ে ফরাসি সনেটের দুই ত্রিককে ভেঙে ষটকের শীর্ষে দ্বিপদী গঠনে প্রয়াসী হয়েছেন যা তাঁর সমগ্র সনেটের সবচেয়ে দৃষ্ট অংশ। বলাবাহুল্য, তাঁর সনেটের এই বিশেষ গঠন সনেটের ভারসাম্যের পক্ষে কতটুকু রীতি-সিদ্ধ তা অবশ্য নিরীক্ষার বিষয়।

প্রথম চৌধুরী প্রবর্তিত দ্বিতীয় পদ্ধতিতে রমণীমোহন ঘোষের ‘আয়োজন’; সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ‘বৃন্দাবনে’; কান্তিচন্দ্র ঘোষের ‘প্রেম-সমাধি’; যতীন্দ্রমোহন বাগচীর ‘মাতৃভূমি’; প্রমথনাথ বিশীর ‘প্রাচীন পারসীক ইহতে- (১৫০), (১৫২); রাধারাণী দেবীর ‘সিঁথিমোর’-(৫), (২৬); আশুতোষ ভট্টাচার্যের ‘নিরাশায়’; রিয়াজউদ্দীন চৌধুরীর ‘নিষ্ফল-প্রয়াস’ ও শামসুল হুদার ‘স্কুলিঙ্গ’ প্রভৃতি সনেট রচিত। এ-সকল সনেটের স্তবক গঠন সর্বত্রই ৮+২+৪।

চার

সনেট সাধারণত চৌদ্দ পঙক্তির কবিতা। এই পরিসরেই সমগ্র পৃথিবীতে কবিরা সনেট রচনা করেছেন। প্রখ্যাত ইংরেজ কবি দান্তে গ্যাব্রিয়েল রসেটি তাঁর *দি আরলি ইতালিয়ান পোয়েটস (The Early Italian Poets, 1861)* গ্রন্থে ১৬-পঙক্তির তিনটি ‘প্রলম্বিত সনেট’ (Prolonged Sonnet) সংকলন করেছেন। আদিকালে ইতালিতে ১৬-পঙক্তিতে রচিত হয়েছিল প্রলম্বিত সনেট; যার মিল-নির্মিতি (Rhyme-Structure) নিম্নরূপ:

১. কথখক কথখক গঘগ ঘগঘ ওঙ
২. কথখক কথখক গঘঙ গঘঙ চচ

এই দ্বিবিধ মিল-নির্মিতি থেকে স্পষ্ট যে, খাঁটি পেত্রার্কীয় সনেটের শেষে শ্লেষ (Epigram) রূপে একটি মিত্রাক্ষর দ্বিপদী বিযুক্ত করে আদিকালে ইতালিতে প্রলম্বিত সনেট রচিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এই রীতি পৃথিবীর

অন্য কোথাও আর অনুসৃত হয়নি। তার কারণ : “সনেটের রোমান্টিক ভাব-কল্পনাকে ক্লাসিক্যাল রূপবৃত্তে উজ্জ্বল সুডৌল ও সঙ্গীতময় করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য চৌদ্দ পংক্তির পরিসর অপরিহার্য।” (কাদির ২৯) ইংরেজ কবি জর্জ মেরেডিথ (George Meredith, 1828-1909) সনেটের চতুর্কে আদি-ইতালীয় (কথক) প্রথায় মিল দিয়ে ১৬-পঙক্তিতে তাঁর *মডার্ন লাভ* (Modern Love, 1862) নামক কবিতা-গুচ্ছ রচনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধদেব বসুও ‘সর্বেশ্বরী’, ‘ফাউস্টের গান’, ‘পঞ্চাশের প্রান্তে’, ‘মুক্তির মুহূর্ত’, ‘গ্যেটের অষ্টম প্রণয়’, ‘গ্যেটের নবম প্রণয়’ শীর্ষক ছয়টি ১৬-পঙক্তির সনেট লিখেছেন। ‘গ্যেটের অষ্টম প্রণয়’ কবিতাটির মিল-বিন্যাস হচ্ছে—

১. কথকথ গঘগঘ গুগুচ গছছ চগ

বুদ্ধদেব বসু তাঁর এই সনেটগুলোর চতুর্কে বিশুদ্ধ শেক্সপীরীয় মিল-বিন্যাস রীতি অনুসরণ করলেও ষটক এবং শেষ শ্লোক-পুচ্ছে যথেষ্ট স্বাধীনতা নিয়েছেন।

আমেরিকার প্রসিদ্ধ কবি এডগার অ্যালান পো (Edgar Allan Poe, 1809-1849) ‘সাইলেন্স’ (Silence) শিরোনামীয় ১৫-পঙক্তির সনেট লিখেছেন। জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) ‘নিঃসরণ’ ও ‘উদয়াস্ত’ সনেট দুটিও ১৫-পঙক্তিতে সংরচিত; তবে অ্যালান পো ও জীবনানন্দ দাশের মিল-বিন্যাস এক নয়। বাংলা সাহিত্যে ১৩-পঙক্তিতেও সনেট রচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ‘রাত্রি’ (কড়ি ও কোমল), দেবেন্দ্রনাথ সেনের ‘দুহিতা-মঙ্গল-শংখ-৪’ (অপূর্ব শিশুমঙ্গল), জীবনানন্দ দাশের ‘এখানে ঘুঘুর ডাকে’ (রূপসী বাংলা), ‘অনন্ত জীবন যদি’ (অগ্রহস্ত কবিতা), ‘হেমন্ত কুয়াশায়’ (ঐ) ও ফররুখ আহমদের ‘সন্ধ্যা’ (শ্রেষ্ঠ কবিতা), ‘ঈদের স্বপ্ন’ (ঐ) ১৩-পঙক্তিতে রচিত সনেট। এ-ধরনের ১৩-পঙক্তিবিশিষ্ট সনেটকে ছান্দসিক আবদুল কাদির তাঁর *ছন্দ সমীক্ষণ* গ্রন্থে ‘খন্ডিত সনেট’ রূপে মূল্যায়ন করেছেন।

ইংরেজিতে Iambic Pentameter (দ্বিস্বর-পঞ্চপার্বক) ছন্দে সনেট লেখা হয়। বাংলা ভাষায় সনেট সাধারণ ১৪ বা ১৮-মাত্রার পঙক্তিতে রচিত হয়েছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, গোবিন্দচন্দ্র দাস, প্রমথ চৌধুরী ও কান্তিচন্দ্র ঘোষের সব-সনেট ১৪-মাত্রায় চিত্রিত। আবার দেবেন্দ্রনাথ সেনের সব-সনেট ১৪ বা ১৮-মাত্রার, আবার ১৬-মাত্রার ‘ভালবাসার জয়’ (গোলাপগুচ্ছ) নামে তাঁর একটি সনেট রয়েছে। আবদুল হাই মাশরেকীর ‘উটপাখী কবুতর’ (পূবালী), আ.ন.ম. বজলুর রশীদের ‘আবেদন’ (একঝাঁক পাখী) সনেট দুটি ১৬-মাত্রার প্রলম্বিত পয়ারে লিখিত। ‘আবেদন’ সনেটটি উদ্ধৃত হলো:

‘কেন তুমি যাবে’— বন্লে যখন সময় হলো	১৬	ক
বিদায় নেবার, হেনার গন্ধে উতলা মন,	১৬	খ
ফুল ঝরে গেল ক্লান্ত করণ উদাসী বন	১৬	খ
অশ্রু-বাম্পে বিহ্বল কেন, দু’চোখ তোলো।	১৬	ক
কতদিন ধরে প্রতীক্ষা ক’রে ছিলাম আমি,	১৬	গ
কত দুঃসহ প্রহর কেটেছে কল্পনাতে,	১৬	ঘ
লুক্কাক মেলে লোলুপ দৃষ্টি কেঁপেছে রাতে,	১৬	ঘ
পাখা ঝাপটায় শ্রান্ত মরাল সুদূরগামী।	১৬	গ

আর কেন তুমি পিছে দাও ডাক, বিহঙ্গম	১৬	ঙ
উড়বে এখনি পায়ের বাঁধন ছিঁড়তে দাও,	১৬	চ
ক্ষত হ'য়ে আছে নিদারুণ তার বেদনা কত!	১৬	ছ
ব'লে যাই তবু সুন্দর ছিলে ফুলের মতো,	১৬	ছ
আঘাত তোমার উপেক্ষা যত মধুর তা-ও,	১৬	চ
ক্ষমা ক'রে দিও বাসনা আমার অসংযম। (ঐ:৮০)১৬		ঙ

১২-মাত্রার পঙক্তি নির্মাণের প্রথম পরীক্ষা করেছেন অক্ষয়কুমার বড়াল; তাঁর 'ডুবছে তপন' (ভুল) সনেটের অনন্য দৃষ্টান্ত:

ডুবছে তপন, আলোক-জীবন;	১২	ক
ধরণীর বুক ছাইছে আঁধার!	১২	খ
ফিরিছে পথিক, মলিন বদন;	১২	ক
জগতের কাজ নাহি যেন আর!	১২	খ

যে আলোক গেল, গেল একেবারে?	১২	গ
রহিল না প্রেম, গেল কি সমূলে?	১২	ঘ
ধীরে আসে বায়ু, মুছে শ্রম-ধারে,	১২	গ
যে ভুলে- যেন গো একেবারে ভুলে!	১২	ঘ

ডুবছে তপন, প্রত্যক্ষের আলো;	১২	ঙ
দলে দলে তারা ফুটিছে আবার।	১২	খ
কোটি চক্ষু মেলি' ঘেরে চারি ধার,	১২	খ
সমষ্টির যেন ভগ্নকণা-জাল!	১২	চ

যে আছিল এক, হ'লো শত শত!	১২	ছ
কণায় কণায় প্রেমের জগত!	১২	ছ
(উদ্ধৃতি, কাদির ৩১)		

নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯) তাঁর 'প্রতিকৃতি' (অবকাশরঞ্জিনী) ও 'কবির উপহার' (ঐ) শীর্ষক দুটি কবিতাকে সনেট হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর 'প্রতিকৃতি' সনেটের বহিরঙ্গ শেক্সপীয়রীয় আদলে হলেও পঙক্তি মাত্রায় রয়েছে অসমতা- ৯টি পঙক্তি ১২-মাত্রার এবং ৫টি পঙক্তি ১১-মাত্রার। পরবর্তীকালে এ-ধরনের আরো অসমমাত্রাবিশিষ্ট পঙক্তির সনেট লক্ষ করা যায়। বুদ্ধদেব বসুর 'স্মৃতির প্রতি: ২' (যে-আঁধার আলোর অধিক), 'মরুপথ' (ঐ) মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'উতলা রজনী' (বুলবুল) ও মহীবুল আজিজের 'বাংলার মুখ' (আমার যেরকম প্রভৃতি) প্রভৃতি অসমমাত্রার পঙক্তির সনেট।

আবদুল মান্নান সৈয়দের (১৯৪৩-২০১০) ‘হেমন্তী’ শীর্ষক সনেটটি ১০ মাত্রার পঙক্তিতে রচিত:

হেমন্তের বিশাল গেলান্দে	১০	ক
ছুটেছি একটি শাদা ঘোড়া।	১০	খ
অথবা : পাজামা, শূন্যে ওড়া,	১০	খ
জীবনের মাঠে ও আকাশে; -	১০	ক
ফাল্গুনের রসের আশ্বাসে	১০	ক
বিদ্বৎ হৈমন্তিক ফুল-তোড়া।	১০	খ
নাকি এ-ই শূন্যতায় ঘোরা?	১০	খ
পূর্ণতার নীলিমাসন্ধাশে	১০	ক
শূন্যতার হেমন্তী কুফিয়া	১০	গ
মেলে ধরে চরম পতাকা;	১০	ঘ
রতির পিঞ্জর খুলে টিয়া-	১০	গ
জলে, সিন্ধুর শাড়ির মতো,-	১০	ঙ
মিশে যাবে আকাশসম্মত	১০	ঙ
সম্পূর্ণ জীবন আছে রাখা।	১০	ঘ

(সৈয়দ ৩৯)

এই সনেটটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দের। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনূদিত কবিতা ‘প্রাচীন প্রেম’ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত প্রথম সনেট। কিন্তু এই কবিতাটির সাথে আবদুল মান্নান সৈয়দের ‘হেমন্তী’ কবিতার পার্থক্য হলো এর পঙক্তি-বিন্যাস ২+৪+৭+১=১৪ এবং প্রতিটি পঙক্তিতেই মাত্রাসংখ্যা ১০। অবশ্য এ-প্রচেষ্টা বাংলা সাহিত্যে প্রথম নয়। এর আগে বুদ্ধদেব বসু প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচনা করেছেন দুটি ১০ মাত্রার সনেট: ‘স্মৃতির প্রতি: ৩’ (যে-আঁধার আলোর অধিক) ও ‘আটচল্লিশের শীতের জন্য: ৩’ (ঐ)। দুটি সনেটের পঙক্তি বিন্যাস: ৪+৪+৩+৩। ১৪-মাত্রার সনেটের পরিবর্তে ১০-মাত্রার সনেট এবং সনেটে বিচিত্র স্তবক-সজ্জা ওই দু’জন কবিরই সৃষ্টিশীল প্রতিভার পরিচায়ক। তাঁদের এই সনেটধর্মী নিরীক্ষা-প্রবণতা মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্তের প্রায়োগিক সম্ভাবনাকে অনেকাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০-মাত্রায় পঙক্তি যোগে লিখেছেন ‘যৌবন-স্বপ্ন’, ‘ক্ষণিক মিলন’ ও ‘সন্ধ্যার বিদায়’ শিরোনামযুক্ত সনেট। সিকান্দার আবু জাফরের ‘মুখস্থ গণিত’ ২০-মাত্রার সনেট। বুদ্ধদেব বসুর ‘অসূর্যস্পর্শা’; শামসুল হুদার ‘একটি স্বপ্ন’, ‘ভারমুক্ত’ ও আ.ন.ম. বজলুর রশীদে ‘আষাঢ়’, ‘উর্গনাভ’ ২২-মাত্রার সনেট। জীবনানন্দ দাশের রূপসী বাংলা’র বেশিরভাগ কবিতা ২২ মাত্রার পঙক্তিতে এবং কিছু কবিতা ২৬-মাত্রার পঙক্তিবন্ধে নির্মিত। তাঁর ধূসর পাণ্ডুলিপি’র ‘শকুন’ ও বনলতা সেন’র ‘পথ হাঁটা’ সনেটদ্বয় ২৬-মাত্রার পঙক্তিতে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে সংস্থাপিত। বস্তুত সনেট রচনার ক্ষেত্রে জীবনানন্দ দাশ ইতালীয় কিংবা শেক্সপীয়রীয় কোনো প্রবণতাকে গ্রহণ করেননি; বরং তাঁর সনেটে রয়েছে উভয়ের মিশেল। ছান্দসিক আবদুল কাদির জীবনানন্দ দাশের এসব কবিতাকে ‘সনেটের অযত্নখচিত বিশুদ্ধ রূপ’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বুদ্ধদেব বসুও ২৬-মাত্রার পঙক্তি

ব্যবহার করে ‘সুদূরিকা’ (পৃথিবীর পথে) ও ‘আর কিছু নাহি সাধ’ (ঐ) সনেট দুটি লিখেছেন। এভাবে ১০, ১১, ১২, ১৬, ২০, ২২ বা ২৬-মাত্রার পঙক্তিতে রচিত সনেট ‘ঘনপিনদ্ধ রূপমূর্তি ও সঙ্গীত-সুষমা’ সৃষ্টিতে মোটেই সহায়ক নয় বলে আমাদের বিশ্বাস। এ-প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন:

পয়ারের অক্ষর-সংখ্যা চৌদ্দ। যতই না কেন নব নব ছন্দ আবিষ্কৃত হোক, বাঙ্গালীর মনে সেই সনাতন পয়ার যে গভীর প্রভাব বিস্তার করে আছে, তা কখন হ্রাসপ্রাপ্ত হবে না। ... কিন্তু সনেট রচনার এ কতখানি উপযোগী তা ভাববার বিষয়। চৌদ্দ অক্ষরের চৌদ্দটি লাইনে কতটুকু কথাই বা বলা যায়? ... আমার মনে হয়, আঠারো অক্ষরের ছন্দই বাংলায় সনেট রচনার সব-চেয়ে উপযোগী (কল্লোল ৭৬৯)।

মোহিতলাল মজুমদারের বক্তব্যটিও স্মর্তব্য :

সনেটে চৌদ্দটি এক-ছন্দের পংক্তি থাকে— ইংরাজীতে Iambic Pentameter-ছন্দই সনেটের ছন্দ; বাংলাতেও তাহার অনুরূপ চৌদ্দ-অক্ষরের পয়ারই প্রশস্ত; কখনও বা ঐ ছন্দকেই একটু দীর্ঘ করিয়া লওয়া হয়; তাহাতে ছন্দের সঙ্গীত-গুণ বৃদ্ধি পায়, ভাব একটু ছাড়া পায়— কিন্তু সনেটের সংহতি-গুণ ক্ষুণ্ণ হয়। বাংলায় ঐ পয়ার-পংক্তিই যে সনেটের বিশেষ উপযোগী, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু দীর্ঘ-পয়ারেও (১৮ অক্ষর) সনেটের ছন্দধ্বনি একটু গভীর ও গভীর হইবার অবকাশ পায় বলিয়া, তেমন ছন্দও বাংলা সনেটে গ্রাহ্য হইয়াছে। মধুসূদন বাংলা সনেটের জন্য ১৪-অক্ষরই নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন, এবং কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন এই ১৪-অক্ষরেই সনেটের কাব্যরসকে পূর্ণরূপ দান করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, বাংলা সনেটের পংক্তি উহা অপেক্ষা দীর্ঘতর না হইলেও চলে (মজুমদার ১৪৬)।

মধুসূদন, গোবিন্দচন্দ্র দাস, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল ও প্রমথ চৌধুরী ১৪-মাত্রার পঙক্তিতে সনেটের ভাব-সংযম ও ছন্দ-প্রবাহ সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। অন্যদিকে অজিতকুমার দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, শামসুর রাহমান, ফজল শাহাবুদ্দীন, আল মাহমুদ ও আবদুল মান্নান সৈয়দ ১৮-মাত্রায় অনেক অনবদ্য সনেট রচনা করে এই প্রবণতাকে পরিচিত করে তুলেছেন। ফলে সাম্প্রতিককালে ১৪-মাত্রা অপেক্ষা ১৮-মাত্রার সনেট রচিত হচ্ছে সবচেয়ে বেশি।

বাংলা সাহিত্যে বেশ কিছু কবি নিয়মনিরপেক্ষ (Irregular) ধাঁচের প্রচুর সনেট রচনা করেছেন, যা সনেটের নিটোল গঠন-বিন্যাসের দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ। এ-সব কবি প্রচলিত সমস্ত সনেট-রীতিকে উপেক্ষা করে স্তবক-গঠন ও মিল-বিন্যাসের বিচিত্র পরীক্ষায় ব্রতী হয়েছেন— যেখানে প্রকাশ পেয়েছে তাঁদের রোমান্টিক কবিমানসের অস্থিরতা। নিচে অনিয়মিত ধাঁচের কয়েকটি সনেট উদাহরণস্বরূপ দেওয়া হলো:

কায়কোবাদের ‘প্রেমলীলা’ (অমিয়-ধারা):

কখকখ কগকগ ঘগঘগ ওঙ

সুফী মোতাহার হোসেনের ‘মায়ামৃগ’ (সনেট-সংকলন):

কখখক কখখক গকঘ ঘকগ

মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকার ‘প্রথম ফোটার স্বপ্নে’ (মন ও মৃত্তিকা):

কখখক গঘঘগ ওচগ গচঙ

সৈয়দ আলী আহসানের ‘উত্তর-যৌবন’ (পূর্বমেঘ):

কখখক গঘঘগ গঘঘগ ওঙ

আবুল হোসেনের ‘বিজয়ী’ (নববসন্ত):

কখকখ গঘগঘ ঙ্গচছ ছচঙ

সানাউল হকের ‘একটি রাত’ (নদী ও মানুষের কবিতা):

কখকখ গঘগঘ ঙ্গচঙ চঙচ

হাসান হাফিজুর রহমানের ‘অস্থিষ্ট অসুর’ (অন্তিম শরের মতো):

কখখক গঘগঘ ঙ্গচঙচ ছছ

আবু হেনা মোস্তফা কামালের ‘কোন কবির প্রতি’ (মাসিক মোহাম্মদী):

কখখক গঘগঘ ঙ্গচচঙ ঘঘ

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের ‘সাক্ষ্য উল্লাস’ (বিপ্লব বিবাদ):

কখখক গঘগঘ ঙ্গচচ ঙ্গঘঘ

দিলওয়ারের ‘তোমাকে’ (ঐকতান):

কখখক গককগ ঘঙঙঘ চচ

জিয়া হায়দারের ‘সাপ’ (একতারাতে কান্না):

কখখক কখখক কগগ কঘঘ

ওমর আলীর ‘তোমার সৌন্দর্যবোধ’ (অরণ্যে একটি লোক):

কখখক গঘগঘ ঙ্গকঙক চচ

সৈয়দ শামসুল হকের ‘পরবাসে’ (অপর পুরুষ):

কখখক গঘগঘ কঙঙ কচচ

ফজল সাহাবুদ্দীনের ‘কেন ভালোবাসা’ (আততায়ী সূর্যাস্ত):

কখখক গঘগঘ ঙ্গচচ ঙ্গকক

মুহম্মদ নূরুল হুদার ‘কাকরাজ’ (কুসুমের ফণা):

কখখক কগগক ঙ্গককঙ চচ

এ-সকল নিয়মনিরপেক্ষ বা মিশ্র রোমান্টিক-রীতির সনেট আঙ্গিক ও ভাষারীতির দিক থেকে দুর্বল মনে হলেও উত্তর-পর্বের কবিমানসে নিরীক্ষার উদ্যম সঞ্চার করবে, নিঃসন্দেহে। সনেটের দৃঢ়বদ্ধ প্রকরণরীতি যে নানা নিরীক্ষাকে সহ্য করে, এগুলো তার চমৎকার দৃষ্টান্ত।

পাঁচ

বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন পেত্রাকীয় সনেট-কলাকৃতিকে তাঁর কাব্যের প্রধান বাহন হিসেবে গ্রহণ করে প্রত্যাশা করেছিলেন যে, পরবর্তীকালের প্রতিভাধর কবির সাধনায় এই কলাকৃতি ইতালীয় সমকক্ষ হয়ে উঠবে। কবির এই উচ্চাশা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়নি। অবশ্য তাঁর পরবর্তীকালের কবিসমাজ কেবল পেত্রাকীয়-রীতিতেই সনেট রচনা করেননি—শেখরপীয়রীয়, ফরাসি ও অন্যান্য পরীক্ষামূলক নানা রীতিতেও সনেট রচনায় ব্রতী হয়েছেন। মধুসূদনের পর বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, প্রমথ চৌধুরী ও তিরিশি পঞ্চকবিসহ আরো কিছু অনুজ্জল কবির বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় সনেটের রূপ ও রীতিতে এসেছে নানা বৈচিত্র্য যা তাঁদের উত্তরকালের কবিসমাজকে দারুণ উৎসাহী করে তোলে। শামসুর রাহমানের গদ্য-সনেট, আল মাহমুদের সনেট-পরম্পরা, ফজল সাহাবুদ্দীনের সনেট-গুচ্ছ ও দিলওয়ারের স্বনিষ্ঠ-সনেট এমনকি অতিসাম্প্রতিক কালের কবির কাব্যকলায় সনেটের বিচিত্র

পরীক্ষা-নিরীক্ষা তারই সাক্ষ্য বহন করে। বাংলা সাহিত্যে সনেটের বয়স প্রায় দেড়শো বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই কাল-পরিধিতে বাংলার কবিসমাজ তাঁদের জীবন ও জগতের বিচিত্র অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে সনেট-রূপী কবিতার এই ঘনপিনদ্ধ কলাকৃতিকেই বেছে নিয়েছেন বারবার।

তথ্যসূত্র

কল্লোল। ফাল্গুন, ১৩৩৫।

কাদির, আবদুল (সম্পা.)। “ভূমিকা”, সনেট শতক। বইঘর, ১৩৮০।

গুপ্ত, ক্ষেত্র। মধুসূদনের কবি-আত্মা ও কাব্যশিল্প। জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৮।

চৌধুরী, প্রমথ। সনেট-পঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা। বিশ্বভারতী গ্রন্থাবিভাগ, ১৯৩০।

বসু, যোগীন্দ্রনাথ। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত। ৪র্থ সং., ১৩১৪।

মজুমদার, মোহিতলাল। বাংলা কবিতা ছন্দ। বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫২।

সৈয়দ, আবদুল মান্নান। ‘হেমন্তী’, জ্যেষ্ঠা-রৌদ্রের চিকিৎসা, কবিতা সমগ্র। শিল্পতরু প্রকাশনী, ২০০২।

সোম, নগেন্দ্রনাথ। মধুস্মৃতি। দ্বি.সং., ১৩৬৯।

Brereton, Geoffrey. *A Short History of French Literature*. Pelican, 1954.

Lee, Sir Sidney. *The French Renaissance in England*. Oxford, 1910.

The Elizabethan Sonnet. *The Cambridge History of English literature*. Vol.III. 1964.

Theory of Knowledge and Liberation in Nyāya

Rajpati Das *

Abstract: The theory of knowledge and liberation in the six orthodox (Āstika) systems of Indian philosophy are mainly confined in arguing some philosophical concepts likely, the soul (Ātman), works (Karma), transmigration and salvation (Mokṣa). A diversity of views is also observed in this philosophy on some basic principles viz. the nature of the God, world, individual body, objects, reality, ethics and cognition. The Vaiśeṣika searches for the ultimate particularities (Viśeṣa) and develops an atomistic picture of reality. Sāṃkhya defends a dualistic realism of Puruṣa and Prakṛti, accepts a plurality of individual souls and emphasizes to free these souls from bondage to matter. Yoga accepts Īśvara over the Sāṃkhya view and emphasizes the need of going through austere self-control to realize the God. The Pūrva-mīmāṃsā concerns chiefly with dharma and interprets the principles of the Vedic duties as means to attain desirable goals. The theistic Vedānta believes on personal God whereas the Advaita Vedānta accepts only Brāhmaṇ as the ultimate reality. The Nyāya is the only logical system that offers an edifying theory of knowledge to explore the real truth of the world. It expresses a positive attitude toward an individual soul and its release in the next world. This study investigates the key concept of Nyāya knowledge, causality, reality and its approach to liberation.

Introduction: Nyāya is an orthodox School of Indian Philosophy since it accepts the authority and the infallibility of the Vedas. The focal purpose of all Indian philosophies is the attainment of liberation. This liberation is also the subject-matter of the Nyāya philosophy. It is a pluralistic, rationalistic, realistic and atomistic system. The word Nyāya means the examination of some authoritative notions by means of the recognized *Pramāṇas* (Thakur VII). Its view is to establish the truth by methodical argumentation and valid reasoning. Thus, *Pramāṇaśāstra*, *Tarkaśāstra*, *Nyāyavidya*, *Nyāyaśāstra*, *Hetuvidyā*, *Anvīkṣhikī* etc. are the other names used to denote Nyāya. It is primarily concerned with the fields of logic and secondarily with epistemology. In Nyāya, attaining the absolute freedom from pain is the *Mokṣa* - the highest good for a human being. One can get freedom only when one's falsehood or ignorance is disappeared from the mind by the valid knowledge over the *Prameya* objects. In Nyāya, it is not mainly the attainment of God, but the true knowledge over the soul or the realization of the soul which is the key to salvation. Although the ultimate goal of the human beings is to attain the liberation, the Naiyāyikas also prefer gaining the valid knowledge over objects. Thus, Nyāya philosophy gives priority to the correct methods of understanding theology and to the discussions about the knowledge. Consequently, Nyāya develops a lucid system regarding the interrelations within the nature of the world, reality, logical thought, language and ontology.

* Associate Professor, Department of Sanskrit, University of Chittagong

Literature of Nyāya: The sage Gautama or Akṣhapāda is the founder of Nyāya School who systematised the principles of Nyāya Philosophy around the fourth century BC. (Damodaran 169). His Sūtras are the basic text and the systematic exposition of this philosophy. He was thoroughly followed by a great illustrious commentator named Vātsyāyana (about AD 400). His commentary on Nyāya Sūtra is known as *Nyāya-bhāṣya*. Both were succeeded by a galaxy of brilliant commentators and proponents. Uddyotakara (about AD 650) wrote *Nyāya-vārtika* on *Nyāya-bhāṣya*. Vācaspati (about AD 840) composed an edifying commentary on *Nyāya-vārtika* named *Nyāyavārtika-tātparyatīkā*. Udayana's (about AD 984, Dasgupta 123) *Nyāyakusumāñjalī*, *Nyāya vārtikatātparyapari-śuddhi* and *Kiraṇāvalī* are definitely some scholarly commentaries on Nyāya system. Jayanta's *Nyāya mañjarī* (about 1000 AD), Bhāsarvajña's *Nyāyasāra* (about 1000 AD), Varadarāja's *Goutamīyaprakaraṇa* (about AD 1100), and Gaṅgeśvara Upādhyāya's *Tattva-chintāmaṇi* (about 1200 AD, Vidyabhusana, *Logic* 169) are the other important commentaries and texts of this school. A large quantity of commentaries and sub-commentaries have also been developed by some great Naiyāyikas who defend this school till modern times. Some great works of the Navya-Nyāya school are Vardhamāna Upādhyāya's *Tattva-cintāmaṇi-prakāśa*, Viśwanātha Nyāyapañchānana's *Kārikāvalī*, Bhaskara Śarmā's *Tarka-kaumudī*, Śrīdhara's *Nyāyakaṇḍalī*, Śivāditya's *Sapta-padārthī*, Laugākṣi Bhāskara's *Artha-saṃgraha*, Praśastapāda's *Padārtha-dharma-saṃgraha*, Vāsudeva Sārvabhauma's *Tattva-chintāmaṇi-vyākhyā*, Jayadeva's *Āloka*, Annam Bhaṭṭa's *Tarkasaṃgraha*, Raghudeva Nyāyālaṅkāra's *Dīdhiti-tīkā* etc. (Vidyabhusana, *Logic* XIII-XV).

Theory of knowledge in Nyāya: Nyāya mainly deals with the sources of knowledge and the nature of world, atoms, mind and soul that explores its view of ultimate reality behind all these and leads one to the path of liberation. The Nyāya knowledge is an apprehension of truth that reveals both the subject and object. Satischandra Chatterjee observes:

...knowledge is present in all reality and is manifested in a specific form in man by the subject-object relation. It does not require to be attached as a quality to any other reality, say, matter or mind or soul. It is just the self-expression of reality (Chatterjee 20).

Nyāya is devoted to establish the means of valid knowledge and removing the wrong notions. It holds that attaining valid knowledge is the only approach to free one from one's suffering. It also holds that the very science of reasoning (Nyāya) consists in the true knowledge of the 'Artha' (posteriori aspect). Again, the true knowledge of the objects depends upon the critical examination (Arthavat Pramāṇam) by means of right knowledge (pramāṇato 'rthapratipattau pravṛttisāmarthyād arthavat pramāṇam. -*Vātsyāyana's Nyāya-bhāṣya*, 1.1.1.). Let's discuss below, in details, the theme of Pramāṇa and all other terms related to the theory of knowledge in Nyāya:

Pramāṇa: Nyāya is concerned primarily with *Pramāṇa* that advocates the need for a standard to probe into truth. The knowledge in Nyāya may be either valid or invalid. Valid knowledge (Pramā) here is defined as the right apprehension of an object and invalid knowledge (Apramā) is defined as the wrong apprehension of an object. The only essential means or source for having a valid knowledge is *Pramāṇa* which presents all the features and nature of an object. Both *Pramā* and *Pramāṇa* are strictly linked with each other since to have a *Pramā*, *Pramāṇa* is needed and again, *Pramā* is meaningless without *Pramāṇa*. Vātsyāyana establishes that *Pramāṇa*

is valid as it leads one to a fruit and offers the examination of an object. Any kinds of activity resulting in a fortified fruit, requires a means of *Pramāṇa*. The three concepts such as ‘Pramātṛ’ (cognizer), ‘Prameya’ (cognised object or entity) and ‘Pramiti’ (valid cognition) can only be significant when only *Pramāṇa* (Instrument of valid Cognition) rests in its factual state. Nyāya accepts four *Pramāṇas* (pratyakṣānumānopamānaśabdāḥ pramāṇāni -*Nyaya Sutra* 1.1.3.) as means of knowledge. They are: A. *Pratyakṣa* (perception), B. *Anumāna* (inference), C. *Upamāna* (comparison) and D. *Shabda* (Verbal testimony). All the above means to valid knowledge are explained below:

A. Pratyakṣa (Perception): In Nyāya, *Pratyakṣa* or Perception is that source of valid knowledge which generates from the contact of the external sense organs with their objects being well-defined, unnamable and non-erratic. It is the vital ground and the fundamental basis of all kinds of knowledge and thereby requires no inference or testimony for further verification of it. It is called the first direct source of valid knowledge (*Pratyakṣa*) of the objective world. The Nyāya system accepts mainly two kinds of perception; 1. Ordinary perception and 2. Extraordinary perception.

1. Ordinary (Sādhāraṇa or Laukika): It is the usual sense contact with objects that belongs to or occurs on the perceptual based data or on scientific observation in our ordinary life. By this perception, the cognizer can easily cognize an object with a particular name and characteristics and can distinguish it from other objects. Nyāya segregates three types of ordinary perception, which are: i. *Nirvikalpaka*, ii. *Savikalpaka* and iii. *Pratyabhijñā* (Chatterjee 189).

2. Extra-ordinary (Asādhāraṇa or Alaukika): When an object is not presented before the cognizer, but he indirectly contacts it with his unusual medium of sense organs and gains the knowledge about that object due to his extra-sensory perception is called Extraordinary perception. It is known as *Śhāstrīya anumāna* that deals with self taking data from divine scriptures. *Alaukika* perception is of three types in Nyāya. These are: i) *Sāmānya lakṣana pratyakṣa*, ii) *Jñāna lakṣana pratyakṣa* and iii) *Yogaja pratyakṣa*.

B. Anumāna (Inference): Nyāya strongly believes that, ‘mitena liṅgena liṅgino 'rthasya paścān mānam anumānam’ (*Vātsyāyana's Nyaya-bhāṣya*, 1.1.3.) which means *Anumāna* is a means of attaining valid knowledge through a previous cognition of some sign or mark. It is an illative cognition by which one obtains knowledge about objects instantly unreachable at the time of perception. To constitute an inference at least three propositions (atha tatpūrvakam trividham anumānam pūrvavat śeṣavat sāmānyatodrṣṭam ca. -*Nyaya Sutra* 1.1.5.) are required in Nyāya Philosophy, which are named as:- ‘*Sādhya* or *Liṅgī*’ (major), ‘*Pakṣa*’ (minor) and ‘*Hetu* or *Liṅga*’ (middle). The middle term ‘*Hetu*’ makes a link between ‘*Pakṣa*’ (minor) term and ‘*Sādhya*’ (major) term.

Types of Anumāna (Inference): Based on psychological grounds, Nyāya provides two types of Inferences: i) *Svārtha* (for oneself) and ii) *Parārtha* (for others). On the importance of understanding this type of Inference, Kuppuswāmi Sāstrī offers a remark:

The distinction of anumāna into svārtha and parārtha is not only as old as the Nyāyadarśana itself, but it is also one of the most vital topics in the Nyāya system. It is a natural result of one of the distinctive features of Indian logic and it enables intelligent critics to appreciate duly the pivotal idea on which Indian logic turns both in its scope and its development (Sastri 217).

Svārtha anumāna is intended for oneself to gain correct knowledge. It does not require formal statement in a methodical manner since one protects oneself here from confusion by utilizing his systematic reasoning and finally arrives at correct inferential knowledge. *Parārtha anumāna* is meant to be made for others. It has to be presented in language and has to be done to convince others. Gautama supports five syllogisms (Pañcha-avayava) of *Parārtha anumāna* with the following edifice:

- i. This hill is fiery (*Pratijñā* or proposition): A logical statement.
- ii. Because it has smoke (*Hetu* or reason): A statement of reason.
- iii. Whatever has smoke has fire, as a kitchen has. (*Udāharaṇ* or example): A *Vyāpti* statement that gives the common coexistence supported by an example.
- iv. So is this hill (*Upanaya* or application): An application of the rule.
- v. Therefore this hill is fiery *Nigamana* or conclusion): The conclusion.

Based on the above syllogism, Nyāya Philosophy establishes its exclusive appeal from the point of both formal rationality and substantial truth.

C. Upamāna (Comparison): *Upamāna* is the means of identifying an unknown or unfamiliar object through its resemblance with some common factors available in another familiar or well-known object. In *Upamāna*, ‘Upa’ means similarity and ‘Māna’ means cognition. So, *Upamāna* is the similarity we cognize to an object previously experienced in another thing. It is an independent source of valid knowledge that compares two things with their similarity, dissimilarity or peculiar attributes. So, *Upamāna*, in modern Nyāya, is distinguished from three categories. They are: i. *Sadharmyopamāna* based on similarity, ii. *Vaidharmyopamāna* based on dissimilarity and iii. *Dharmamātropamāna* based on peculiar quality.

D. Śabda or Āptavacana (Verbal testimony): In Nyāya Philosophy, *Śabda* plays a significant role as an independent source of valid knowledge. According to Gautama, it is the knowledge of sensible or supersensible objects derived from words or a sentence (*āptopadeśaḥ śabdaḥ -Nyaya Sutra*, 1.1.7.) which cannot be known by perception and inference. One can cognize an object with its true nature hearing about it from the interpreter or by reading the fact from the Vedic texts. So, it is the right cognition of a trust worthy experienced person constituted by authoritative statements of the scriptures.

Gautama states two types of Testimony - *Drṣṭārtha* and *Adṛṣṭārtha*. (*Nyaya Sutra*, 1.1.8.). *Drṣṭārtha* means a seen object that is accessible in this world by way of normal human experience. Again, *Adṛṣṭārtha* an unseen object that cannot be perceived by an ordinary person or inaccessible in this way but can be found in the next world like heaven or hell. The Modern Naiyāyikas classify the Testimony in two different kinds - *Vaidika* and secular (*Laukika*). (Sinha

565) The *Vaidika* testimony is perfect and dependable that conveys knowledge of supersensible objects. It arises from the Vedic scriptures and from trust-worthy (āpta) persons like Ṛṣis, Sages, Paramhamsas, Siddha Yogīs, Gurus, Āryas or even the Mlecchas who became united with God, experienced the truth. Secular testimony conveys the knowledge of sensible objects that come from the words of human beings who became expert in certain worldly matters but still liable to error.

The sixteen categories: Nyāya begins with a methodical pragmatist attitude. In the beginning of *Nyāyasūtra*, Gautama made a tricky discussion on the Divinity and thereby recognizes 16 categories of logical discussions called ‘Padārtha’. The term ‘Padārtha’ means ‘the intrinsic meaning of a word’. All that can be fixed into the highest class of knowledge are *Padārthas*. It also means a significant object which can be thought (Jñeya) and named (Abhidheya). According to Gautama, liberation depends on a thorough knowledge of these sixteen categories based on the positive objects of the world. He states ‘.....tattvajñānāt niḥśreyasādhigamaḥ’ (*Nyaya Sutra*, 1.1.8.), which means that the knowledge only would lead one to the highest purpose, i.e. liberation. The sixteen categories of Nyāya are: 1. *Pramāṇa* (means of valid cognition), 2. *Prameya* (objects of valid cognition), 3. *Samsaya* (doubt), 3. *Prayojana* (aim), 4. *Drṣṭānta* (example), 6. *Siddhānta* (conclusion), 7. *Avayava* (members of syllogism), 8. *Tarka* (hypothetical reasoning), 9. *Nirṇaya* (demonstrated truth), 10. *Vāda* (discussion), 11. *Jalpa* (disputation), 12. *Vitaṇḍā* (wrangling), 13. *Hetvābhāsa* (fallacy), 14. *Chala* (perversion), 15. *Jāti* (casuistry) and 16. *Nigrahasthāna* (point of defeat).

Among sixteen categories, only *Prameya* discusses on the metaphysical things and all the other *Padārthas* bear an epistemological character. Vātsyāyana explains how each of the sixteen *Padārthas* leads one to final beatitude. He shows it by dividing those sixteen *Padārthas* into three divisions, viz. *Pramāṇa*, *Prameya* and *Pañśayādi*. Theos Bernard remarks, “These sixteen topics are to be used to discover truth. The first nine deal more strictly with logic, while the last seven have the function of preventing and destroying error” (Bernard 24).

The essence of the tenets of Gautama is that, through the correct knowledge of the truth of these categories, one can remove one’s wrong notions and worldly attachment that ultimately brings liberation of his soul. Thus, a flawless knowledge of 16 *Padārthas* brings about a complete termination of pain and leads the aspirant to final beatitude.

Reality in Nyāya: Like *Vaiśeika*, the Nyāya is a metaphysics of realism. It epitomizes a vital substantial realistic and objective position in Indian Philosophy. It deals with God, soul, mind, space, time, numbers, causation, liberation, matter and other *Padārthas* for an all-inclusive dealing of reality. It utterly epitomizes all the knowable objects of this world. Unlike Advaita, it is frankly a pluralistic system. Hence, a personal Self in Nyāya is distinctive from the Absolute reality. It holds that *Jñātā* (knower of knowledge), *Jñāna* (knowledge) and *Jñeya* (object of knowledge) are distinct from one another. Kuppuswami attempts to clear this view:

The Nyāya theorist who recognizes a scheme of external relations finds it easy to point out that through the self-linking relation (svarūpasambandha) of subject and object (viśayaviśayibhāva) the cognized reality (jñeya) and the cognizing reality (jñāna) can be brought together. The secret of the Nyāya conception of svarūpasambandha is that relation is but a phase of reality and every real object involves that phase (Sastri 119-120).

Nyāya maintains that every object is naturally porous produced through the chemical changes and the combination of its integral atoms. Atoms, the universal eternal forms of matter, are the cause of cosmic manifestation or of the objective world. According to it, the constituent part (Avayava) is transcended in the whole (Avayavin), but the whole in some sense resides or is present in the parts of it (na, pratyakṣeṇa yāvat tāvat api upalambhāt- *Nyaya Sutra*, 2.1.32.). In perceiving a part of an object, one perceives the whole of it by his senses directly, since the whole is concurrently inhered in each of its part by the relation of inherence (Samavāya). Satis Chandra Vidyabhusana explains:

The perception of a part does not exclude perception of the whole of which it is a part. If you touch the hand, leg or any other limb of a person you are said to touch the person. Similarly, if you perceive a part of a thing you are said to perceive the thing. A part implies the whole, and perception of a part implies perception of the whole (Vidyabhusana, *Sutras* 32).

To support this point, Nyāya puts forward the theory of atomism (Paramāṇuvāda). This theory assumes ‘sarvāgrahaṇam avayavyasiddheḥ’ (*Nyaya Sutra*, 2.1.35.) that means nothing can be apprehended without apprehending first the whole as a distinct percept. The individual atoms, the constituent parts of a whole, are absolutely imperceptible until at least a gross visible whole is produced by the combination of its minute parts. Thus, Nyāya accepts both the whole and its parts to be equally real.

The pluralistic view of Nyāya holds that, reality is a totality of substratum (Dharmin or Āśraya), properties (Dharma) and relations (Sambandha). All these three are exclusively real, knowable, nameable, intimately interrelated and different in their essence. All things like threads and cloths etc. are different due to their different potencies. Thus, the distinct substratum-property-relation is the vivacious principle in Nyāya, having their different entities with separate kernels and genuine existence where substratum is free and other two depend on it (Carr and Mahalingam 121).

The world: The Nyāya systems primarily elucidates the nature of the physical world from the rational perspective. Nyaya Sūtra states ‘vyaktād vyaktānām, pratyakṣaprāmāyāt’ (*Nyaya Sutra*, 4.1.11.) which interprets that at all manifest things originate from perceptible things. The *Paramāṇus* are the ultimate constituent of material existence, and the insubstantial hollow states of gross matter which are conceivable only by the mind. This theory of the Nyāya School is known as *Ārambha-vāda*. According to this theory, the effect is such a new demonstration which was not existed in the material cause prior to its creation. Hence a human body or any other object or even the world is produced only from distinct matters. The world is the combination of atoms. The Nyāya accepts the four elements of *anus*, viz. earth, water, fire and air. The *anus* are formed from even minor particles called ultimate atoms (Paramāṇu) which have no smaller constituent parts. It contends that in the beginning, the atoms were in a state of motion. There was nothing or no effect whatsoever for some time except the cause in the form of minute round particles named atoms (Anus). It holds that God brings together the *anus* according to the bad and good *Karmas* of the individual souls and by the will of God, the intangible Anus of diverse orders start forming different objects of the world as effects. For example, two *Paramāṇus* start to combine with one another to form one atom or anu. Anus, in turn, combine to form molecules dyads (Dvyānuka), triads (Tryānuka) etc. and so on. It is continued on in

combination giving rise to the numerous objects of the world and gradually grow into the universe (Damodaran 152). The *Paramāṇus* always exist either in obscure or in manifest state. Since they are believed to have been never created, they cannot be destroyed. In reference to this same, Haridas Bhattacharyya says:

The Paramanus, which are the ultimate cause of this world, are eternal. Throughout all the changes from cause to effect, these Paramanus do not change either in number or in any other aspect. They give rise to various products which undergo changes, but they themselves remain unchanged. If any product is destroyed and is reduced to its ultimate particles, it will be found that the number of the Paramanus out of which that object was produced remains as before (Bhattacharyya 503).

Thus, the creation of all objects in the world is the effect of combinations of the *Aṇus* and the entire world is considered as the ultimate composition of the spirit and the matter (made of *Aṇus*). Similarly, the destruction of objects that happens or will happen in this universe is the cessation and disaggregation of their *Aṇus*. This is a never-ending process.

In Nyāya, the cause or *Kāraṇa* is divided into two categories: *Nimitta* and *Upādāna*. A potter needs earth or clay as a material to make a pot. Here, earth is the effect or *Upādāna* for the pot. Again, the potter who shapes the earth is the cause or *Nimitta*. Nyāya considers that as *Īśvara* creates this world with the ultimate *anus* He is the *Nimitta-kāraṇa* and the *Anus* are the *Upādāna-kāraṇa*. In *Arambha-vāda* theory, the term *Arambha* refers to that state where the effect is clearly discrete from its material cause. It comes into being anew – entirely different from the cause, like a dress is different from the fibres from which it is knitted. It is also called as *Asat-kārya-vāda*. *Sat* (the real) means that which exists and *Asat* (the unreal world) that which does not exist. A particular pot is always non-existent before (*prāg-abhāva*) it is made (Mishra 232). Thus it views that the effect (the world) is not pre-existent in the cause (God) before its creation as there is no pot in mere clay. The process of such creation and destruction continues on till the ultimate dissolution of the world (*Mahā pralaya*).

The Soul: A true knowledge of the self is necessary for an adherent to attain liberation in this very life. An individual soul, in Nyāya Philosophy, is basically unconscious, but it gets consciousness when perception occurs in it and becomes an object of correct knowledge. Consciousness here is a property of the soul which can be apprehended only by the mind. Nyāya considers that Intellect (*Buddhi*), apprehension (*Upalabdhi*) and knowledge (*Jñāna*) are all same as says – ‘*buddhiḥ upalabdhiḥ jñānam iti anarthāntaram*’ (*Nyaya Sutra*, 1.1.15.). Here, the mind is a separate sense organ of cognition to experience pleasure and pain. Hence, distinctive qualities like desire, dislike, activity, volition, pleasure, pain, cognition etc. are the qualities or actions of the physical mind. So, the soul is not usually associated with consciousness or activities. Yet, it connects the mind, then the mind with the sense-organ and finally, the sense-organ with an object. The sense-organs and the mind are unconscious but both becomes conscious directed by the self. For this reason, one sense-organ cannot recognize an object perceived by another sense-organ which is possible only by the same self.

Each individual soul here is considered to be both beginningless and endless. The mind, senses and body are not the subject of experience, but the self is the subject of experience in all its forms. It is beyond the body and the sense organs. It is a non-composite, non-material,

incorporeal, eternal and all-pervading entity. It is relatively free in its will but limited by the will of God. *Karma* causes the union of the soul with the body. Each individual Self is the enjoyer or experiencer of his Karmic results. It has pre-existence and undergoes transmigration from a dead body to another birth until it achieves liberation. It enjoys the good result for its virtuous activities and again undergoes bad result for its free evil actions done in this life and in the past births. Satis Chandra Vidyabhusana says:

The soul is an eternal entity which is from time to time connected with a body suitable to its desert (merit and demerit). The connection of the soul with a body is its birth, while their mutual separation is its death. Transmigration, which consists in a series of births and deaths, is the source of all our sufferings (Vidyabhusana, *Sutras* 56).

In this way, the soul faces the circle of birth and death to fulfil its desires. Thus, its liberation basically depends upon the law of *Karman* and the divine will of God.

The idea of God: The idea of God as the creator is precise in the Nyāya systems. Like all other Indian orthodox schools, it looks God as the author of the Veda and the enforcer of *Karma*. Gautama offers three sūtras in support of theism where he says that God is the cause of the world (īśvaraḥ kāraṇam, puruṣakar....tatkāritatvād ahetuḥ. -*Nyaya Sutra*, 4.1.19-21.). In these sūtras he says that God is the cause of everything, since we find fruitlessness in Men's actions. He concludes that a supreme being exists as the efficient cause of the Universe. Vātsyāyana says in his bhāṣya:

As a matter of fact, we find that Man, desiring a certain thing, does not always obtain the fruit of his desire; hence it is inferred that Man's acquisition of the fruits of his actions is dependent upon some other person; and that Person upon whom it is dependent is God; hence it follows that God is the Cause (of the World) (Jha 1457).

Vātsyāyana ornately gives a lengthier commentary on these sūtras in favour of the existence of God. All other syncretic Naiyāyikas are also inherently theistic. They claim it as a complete logical science that raises a deep desire in men to find the absolute God. Vātsyāyana puts God under the category of soul, but the greatest of them having special qualities. God, being a distinct soul, is omniscient and omnipotent. He is, by nature, endowed with eternal conscious, merit, knowledge, intuition, sovereignty and power. He is devoid of pain, pleasure, aversion, demerit, illusion, impression, attachment and also free from all inadequacies. A seeker of truth can perceive Him through inference, logical arguments, cosmology and moral observation.

Nyāya does not recognize any direct relation with the existence of all-pervading God. Yet, it admits Him as the intelligent agent of the world on the basis of Inference. It accepts Him as the ethical conductor of all the individual souls. The atoms neither have consciousness nor power to formulate anything. God brings the atoms together, systemize their diverse combinations and gives motion to them in accordance with the ethical merits and demerits of human beings. Everything is happened in the world by His will. The formation of the world, its

existence and destruction absolutely depend on God's will. To attain exact knowledge of all these, one needs His blessings.

The idea of liberation: The Naiyāyikas target at the realization of *Mokṣa* as their Sumum Bonum. They believe that a man can attain liberation by the grace of God. It also states our material affection of the effects of *Karma* and the usual attraction of the God, which ultimately dismiss our burden of the *Karmas*. Bernard says:

The teachings of the Nyāya are believed to enable us to discern the true from the false, and at the same time, to be our greatest protection when our knowledge is still in the process of growth and has not yet matured into the ripened fruit of enlightenment (Bernard 22).

Gautama presents Nyāya as a free means for liberation considering itself as a separate science from the Vedas. He uses two terms for Liberation, viz. *Nihśreyasa* and *Apavarga*. He teaches that, *Nihśreyasa* arises from *Pramāṇāditattvajñāna* (knowledge of sixteen principles). For Vātsyāyana, *Pramāṇa* drives out one's inner doubt, purifies him and reveals in him the existence of God. He interprets 'Nihśreyasa' in the first sūtra of Nyāya as general that contributes to the path for beatitude (*Svargaprāpti* corresponding to *Mokṣa*) and 'Apavarga' in the second sūtra as particular (*Mokṣa*). Again, he defines 'Prameyatattvajñāna' that offers liberation in particular. He lists 12 things in 'Prameya' category. They are: *Ātman*, body, senses, intellect, mind, activity, defects, rebirth, consequence, pain, and Liberation. The true knowledge of these 12 *Prameyas* dispel all delusions and suffering lead one to liberation from getting him rid of rebirth and suffering. He teaches that one obtains final beatitude through the knowledge of *Atman* and its causal relationship with liberation.

Vātsyāyana categorizes four kinds of science viz. *Trayī* (three Vedas), *Vārtā* (Agriculture), *Daṇḍanīti* (Politics) and *Ānvīkṣikī* (Nyāya). According to him, these are not mutually connected. All are taught in order to help the mankind in attaining different kinds of knowledge. He clarifies that each science has its own independent purpose. For example, with the help of the knowledge of *Trayī*, one can perform dharma which leads one to heaven (*Svargādi Apavarga*). The science of *Vārtā* teaches proper ground and so forth (*Bhūmyādi*), through which one can easily get grains (*Śaṣya*). *Daṇḍanīti* demonstrates pacification (*Saman*) and so forth which leads one to attain supremacy over the world. *Ānvīkṣikī*, the last science, offers the knowledge of sixteen principles, especially those *Prameyas* (*Ātmanādi*) that leads one to attain liberation.

As *Karma* (actions) has a great role through one's entire life cycle, Nyāya maintains that liberation is the very separation of the soul from all *Karmas*. One suffers in this world with his attachment to the fruit of his activities done by the body, organs, ego and mind. So, both bad and good *Karmas* create bondage. To liberate oneself, removal of the results of all types of *Karmas* should be ignored. Again, liberation without performing wishless *Karmas* is impossible. True cognition of the self leads one to liberation through the destruction of both good and bad result of *Karmas* and the consequent cessation of birth. Nyāya tells that the liberation or the 'Absolute good' (*Apavarga*) is the successive annihilation of each one of a chain of five consequences, viz. wrong notion, faults, activity, birth and pain. In order to attain liberation, one needs to break this chain of consequences. One must free oneself from the wrong notion which indirectly causes suffering. On the removal of wrong notions, faults are disappeared and the lack of faults leads one

to the cessation of activity. When there is no activity either merit or demerit, there is no 'birth' as this activity is the cause of birth. When there is a relinquishing of the birth, there is cessation of pain which is followed by final release. Final release is, therefore, the absolute deliverance from pain for human being.

In Nyāya view, a liberated soul becomes free from both pain and rebirth. In this state of liberation, the soul arrives at its original existence free from all constraints including consciousness and bliss. It overcomes all the result of all its past *Karmas* and gets free from the qualities of the attached soul viz., desires and impulses, merits, demerits, pleasure, pain, personified existence, desire, abhorrence, impression, volition etc. Through the valid knowledge, one gets rid himself of all suffering and enjoys perpetual rest in liberation. As an aid of attaining this liberation, Vātsyāyana recommends us to practice Yoga in forests, caves and river-banks, (*Vātsyāyana's Nyaya-bhāṣya*, 4.2.42.) adhere internal discipline, perform duties and try to refrain from sins.

Conclusion: The Nyāya philosophy is a systematic approach to deal a comprehensive way of life by solving our daily problems. It destroys our false knowledge with its potencies, develops self-control, stops re-birth and lead us to systematic way of liberation. It can be noted that even an ordinary materialist can apply the Nyāya theory of knowledge and practice its mode of liberation in this life to overcome sorrows and sufferings of his practical life and thus can attain the highest goal of life.

References

- Bernard, Theos. *Hindu Philosophy*. The Philosophical Library, 1947.
- Bhattacharyya, Haridas. *The Cultural Heritage of India*. The Ramakrishna Mission Institute of Culture, 1953.
- Carr, Brian and Indira Mahalingam. *Companion Encyclopedia of Asian Philosophy*. Routledge - Taylor and Francis Group, 1997.
- Chatterjee, Satischandra. *The Nyaya Theory of Knowledge*. University of Calcutta, 1950.
- Chatterjee, Satish Chandra & Datta, Dheerendramohan. *An Introduction to Indian Philosophy*. Calcutta university press, 1948.
- Damodaran, K. *Indian Thought: A Critical Survey*. Asia Publishing House, 1967.
- Dasgupta, Surendranath. *A History of Indian Philosophy. Volume I-IV*. The Syndics of the Cambridge University Press, 1957.
- Cowell, Edward B. Trans. Udayana's Kusumanjali with the commentary of Hari Dasa Bhattacharya. Baptist Mission Press, 1864.
- Jha, Ganganatha. *The Nyaya Sutras of Gotama*. Motilal Banarsidass, 1984.
- Keith, Arthur B. *Indian Logic and Atomism*. Clarendon Press, 1921.
- Mishra, Umesha. *Conception of Matter according to Nyaya-Vaisesika*. Allahabad Law Journal Press, 1936.
- Sastri, M.V. S. Kuppaswami. *A Primer of Indian Logic*. The Kuppaswami Sastri Research Institute, 1951.
- Sinha, Jadunath. *History of Indian philosophy*. Vol.1, Sinha Publishing House, 1956.
- Thakur, Anantalal. *Gautamiyanyayadarsana with Bhāṣya of Vātsyāyana*. Indian Council of Philosophical Research, 1997.
- Thapar, Romila. *The Penguin History of Early India*. Penguin Books Ltd, 2002.
- Vidyabhusana, Mahamahopadhyaya Satis Chandra. *A history of Indian Logic*. Calcutta University, 1921.
- Vidyabhusana, Mahamahopadhyaya Satis Chandra (Trans.). *The Nyaya Sutras of Gotama*. The Panini Office, 1913.
- Vidyasagara, Pandit Jivananda. Trans. Tarkasangraha by Annam Bhatta. Sarasudhanidhi Press, 1872.

Construction of Place in the Land of “The Handsomest Drowned Man in The World”

Sarjana Akter*

Abstract: “The Handsomest Drowned Man in the World” by Gabriel Garcia Márquez is a short story that tells the story of a remote village somewhere on earth and the transformation of the villagers after the arrival of the dead body of a drowned man. The story is short, but important in the sense that the transformation of the villagers fundamentally changes the spatiality of the village. The belief of the humanistic geography in the way how people and land make each other is depicted in the story. This paper attempts to see how change in certain factors such as human life experiences, perceptions, feelings, social relations, and meanings life contribute to the construction of the place they inhabit.

Introduction:

Robert T. Tally Jr. observes that both in literary and cultural studies space has gained renewed status with the emergence of postmodern and postcolonial theories that the quote, stated below, perfectly captures, “in recent literary and cultural studies, notably with the advent of postmodernism and postcolonial theory, but also in other interdisciplinary approaches to literature, space has reemerged as a principal concern” (2). Along with this, globalization also contributes to spatialize culture and politics of today’s world (Agnew and Duncan 3). However, in discussions about space, specifying space and place theoretically always gets problematized (Hubbard and Kitchin 4). Keeping this debate apart, the study is more interested in the presence of place in human life. Place, to define sensibly, designates ‘any geographical site (of any size, scale and type)’ and it is again ‘meaningful to someone, for whatever reason’ (Prieto 13). The combination of geography and meaning is what makes a place. In accordance with this definition, place is again considered to be “a reality” that people give “meaning” to (Tuan 387). Therefore, what a place needs to have are people, geography and meaning. Here geography is a natural attribute and people give meaning to it; therefore, people actively participate in the construction of a meaningful geography. In light of this proposition, the study has anatomized the short story “The Handsomest Drowned Man in The World” by Gabriel Garcia Márquez in Gregory Rabassa’s translation.

The story is set in a land far from modern civilization and is stretched between the cliff and the sea. A small number of people reside in the village land to whom the sea is the only resource for economic survival. The villagers live a mundane life in a sense that there is no mention of any kind of celebrations in their life. Such routine-boundness of life gets a spatial expression through the infrastructure and aesthetics of the village space. However, after the arrival of the drowned man everything changes, and the villagers urge for a new life through the reconstruction of the

*Assistant Professor of English, Faculty of Arts & Humanities, University of Chittagong.

village's spatiality. The study here is interested to see which factors contribute to the spatial reconstruction of the village. For this, the study has mainly based its theoretical understanding on the humanistic geography tradition. How the village in the story spatially changes due to the change of certain realizations of the people living in it is the question to which the study has attempted to give an answer.

Genealogy of place in context:

Different disciplines across humanities and social sciences are attentive to the study of place out of which consequentially develops the stream of thought, that is, humanistic geography. Place, in this field, is more focused on the issues of "subjectivity" and "experience" (Cresswell 19-20). Theorists belonging to this line of thought attempt to connect place to humankind from myriad perspectives. Yi-fu Tuan reflects while differentiating between space and place that the transformation of space into place occurs when "we get to know it better and endow it with value" (6). In Tuan's words, experience and meaning gradually give identity to a place. Doreen Massey, on the other hand, believes that spatiality, in its "very material sense," needs to address "an analysis of the economy and society" (22). Here connecting space with material sense refers to the physicality of it; therefore, to understand it properly, in the language of Massey, it is essential to discuss the social and economic factors embedded in it. Setha Low, meanwhile, while quoting Cresswell, Sen and Silverman, asserts that to become a place, it is needed to be "inhabited and appropriated through the attribution of personal group meaning, feeling, sensory perceptions and understanding" (32). Considering all the definitions of place stated above, it can be summarized that a place becomes a space for human life embracing the attributes such as experience, meaning, society, feeling and sensory perceptions. It, therefore, can be discerned that change in one of these attributes will contribute to the change in the spatiality of any community.

Spatial Analysis of "The Handsomest Drowned Man in the World:"

The title of the story invokes thoughts as Marquez addresses the drowned man as the handsomest in "the world." Whose world is it? Is it everyone's world or is it the confined world of the people residing in isolation? Does the storyteller imagine the whole world in the microcosm of the village or he wants to suggest the inability of the villagers to go beyond their little village world? The story does not provide any geographical knowledge that can determine the location of the village or assume any connection to the real world, except the mere identification of the place as "Esteban's village" where "the wind is so peaceful" and "the sun's so bright" at the end of the story (Marquez 319). The village is a barren land beside sea without specific geographical information, but after the arrival of the drowned man the village will now let others know about its existence through "smell" (319), peaceful wind, and the bright sun. It can be inferred how a village, bereft of geographical location, ventures into a journey that aims at attaining a recognizable geographical identity as "Esteban's village" (319).

The story can chronologically be divided into two parts: before the arrival and after the arrival of the drowned man. The study here investigates how experience, feeling, perception, meaning and society of the villagers undergo two different phases during these two periods of time.

The spatiality of the village before the arrival of the drowned man comprises “only twenty-odd wooden houses” and “so little land” beside “the sea” (314). It is accompanied with an unaesthetic nature of the village, that is, “the stone courtyards with no flowers,” “desert like cape” (314), “the desolation of their streets, the dryness of their courtyards” (318). It is noticeable that before the arrival of the drowned man, the writer uses select words to describe the village that refer to some sort of inadequacy, insecurity and artlessness, such as “odd” for “houses,” “little” for “land,” “stone” and “no flowers” for “courtyards” and “fear” for “cliffs” (314-315). On the other hand, after the arrival of the drowned man, the villagers are now committed to redecorate their houses with “wider doors, higher ceilings, and stronger floors,” “springs among the stones,” and “planting flowers on the cliffs” (319). Therefore, the village is about to experience a change in its physicality. Yet, this change is not sudden or unbiased; instead, the spatial change of the village is preceded by the change the villagers confront in their everyday experience, meaning, feeling, perception and society due to the arrival of the drowned man. Consequently, it gets reinstated how the spatial life and the human life correspond to each other.

Experiential transformation resulting in spatial reconfiguration: The villagers are accustomed to a living limited by the little land and the sea. They live a collective average life as they fail to accommodate the dead body of the drowned man in any bed as these are not “large enough” or any table as these are not “solid enough” (315). Such vulnerability and inadequacy of their life get spatial reflection in the story as they feel determined to build houses after the funeral of the drowned man with “wider doors, higher ceiling and stronger floors” (319). Before the arrival of the drowned man, they experience an unaesthetic, measured, dehumanized life which their streets, courtyards, house witness to. However, after the arrival of the drowned man they experience an inexplicable kinship, empathy and humanity out of which they are resolute enough to change the spatial structure of the land as well as to enhance the beauty of it. Change in the villagers’ experience plays a crucial role to restructure the spatiality of the village.

Change in perception and reconstruction of place: In accordance with experience which comes eventually is the matter of perception of the villagers. Experiencing the dead body of the drowned man, they come to discover a world beyond their knowledge and understanding. Due to their short-sighted perception of the world, the spatiality of the land conforms to only necessities of human life. It becomes “no flowers” land with no spacious “door sideways” and “crossbeams” (314-315). The construction of the land, up until the arrival of the dead body, corresponds to the shortsightedness of the villagers which the infrastructure of the village portrays in abundance. However, after the arrival of the drowned man the villagers perceive a new world where it requires new measurement, beautification to reflect a state of new realization.

Shift in feelings reflected through the remaking of place: The story delineates life as a process as it is confined to “work at sea” (315) and maintain a family. The feelings of the women are much more customary than being deeply immersed in any passionate bond. The women dismiss their husbands as “the weakest, meanest and most useless creatures on earth” (316), comparing them with the drowned man. They imagine that if the drowned man lived in their village, his house would have “the widest doors, the highest ceiling and the strongest floor,” “his bedstead...from a midship frame,” and his authority over the land would be so strong that there would be “springs...among the rocks” and “flowers on the cliffs” (315). The women in the story

cannot find strength and valor in their husbands that they dream of; therefore, this absence finds a way of expression in the spatiality of the village. The men, on the other hand, feel “mistrust in their livers” at the beginning as the women are spending time doing “main-altar decorations for a stranger” (317). It appears that the lack of trust and feeling in relationships is responsible for “the desolation of their streets, the dryness of their courtyards” (318). However, at the end of the story, “the splendor and beauty of their drowned man” enchant both men and women so deeply that to keep the hope of the return of the drowned man alive, they will give their best in “digging for springs among the stones and planting flowers on the cliffs” (318-319).

Change in social relations and accordingly in place: It is noticeable from the beginning of the story that the social atmosphere of the village is driven by necessity. The villagers work at the sea for survival. Once the life ends, they throw the dead body “off the cliffs” (315). This cycle of life and death that meets nothing beyond what is necessary gets a spatial reflection in the architecture of the village and the aesthetics of the land. However, the whole scenario changes after the arrival of the drowned man. From the moment the drowned man is “carried...to the nearest house” (314) to the moment “they let him go without an anchor” (318), all the events happening in the village tell about an unacknowledged life of the villagers. In this period of time whatever they perform is not necessity driven; instead, it is the manifestation of their untold mind. Most importantly, they partake in these rituals collectively that results in a change in the societal psychology of the village. That is why, at the end of the story, the villagers come to understand that “everything would be different from then on” (319). The reflection of such transformation will again be spatial through the inclusion of “wider doors, higher ceilings, and stronger floors,” “gay colors” “to paint their house fronts,” “springs” and “flowers” (319).

New realization of meaning of life and reconstruction of place: Understandably, the meaning of life changes after the arrival of the drowned man in the village. Before the arrival of the drowned man, life means nothing beyond survival to the villagers. The spatial structure of the village keeps no space for anything beyond the necessity for survival. However, the same place opens new meanings to their life after the arrival of the drowned man. The spatiality of the village is also going to change in accordance with the new meanings of life.

The correspondence between human and place in the story: In the theoretical part of the study, it has been mentioned that there are certain deciding matters, to be specific, experience, perception, feeling, society, meaning in the humanistic geography tradition responsible for the spatialization of the human life. In the story, “The Handsomest Drowned Man in the World” by Marquez these factors contribute to make and change place in a village situated between the cliffs and the sea, and almost unaware of the world outside this territory.

The people in this village witness a life of emotional barrenness before the arrival of the drowned man at the land. Such desolation gets depicted in the spatial reality of the villagers. Their houses are measured with no room for any outsider, and their streets are lonely, their courtyards flowerless, their rocks without springs. All these instances, even in the short periphery of the narrative, resemble a land where survival outweighs feelings, emotions. Due to the villagers’ experience of a social life with little perception, lack of feelings, the meaning of their life gets

Construction of Place in the Land of “The Handsomest Drowned Man in The World”

restricted to necessity and survival. The spatial structure, therefore, accordingly reflects the philosophy of their life with dryness and narrowness.

After the arrival of the drowned man, therefore, everything changes. They come to discover a world beyond necessity and survival where the whole village feels drawn toward a stranger's dead body. The women and men endear the drowned man to their heart and hope for his reemergence even at his funeral. Out of such strength of their emotion toward a stranger, they think of restructuring their old village with wider doors, ceiling, floor, with flowers and spring, with color at the house front.

How the villagers get suddenly transformed is thought-provoking, but for this study, how their emotional change makes a difference in the spatial character of the village, is more important.

It, therefore, can be concluded that human beings make place in accordance with their beliefs, and change in it brings visible alterations in the spatiality they inhabit.

Conclusion:

The story revolves around the drowned man whose appearance changes everything in the village. Such change gets a spatial expression through the beautification, extension and reconstruction of the village land. It refers to a connection between human life and spatiality as these are not isolated phenomena; instead change in one of them substantially alters the other. The study here has tried to establish, based on the short story, that human experience, feeling, perception, meaning, society all these things together determine how the spatial structure of their inhabited land will be.

References

- Agnew, John A, and James S. Duncan. “Introduction.” *The Wiley-Blackwell Companion to Human Geography*, edited by John A. Agnew and James S. Duncan, Blackwell Publishing Ltd, 2011, pp. 1-8.
- Cresswell, Tim. “The Genealogy of Place.” *Place: a short introduction*. Blackwell Publishing, 2004, pp. 19-20.
- Hubbard, Phil, and Rob Kitchin. “Introduction: Why Key Thinkers?” *Key Thinkers on Space and Place*, edited by Phil Hubbard and Rob Kitchin, 2nd Edition, Sage Publications Ltd., 2011, pp. 1-17.
- Low, Setha. “Genealogies: the Concepts of Space and Place.” *Spatializing Culture*. Routledge, 2017, pp. 11-34.
- Márquez, Gabriel G. “The Handsomest Drowned Man in the World.” Translated by Gregory Rabassa, <https://public.wsu.edu/~bryanfry/Marquez,%20The%20Handsomest%20Man.pdf>
- Massey, Doreen. “Space and Social Relations: Introduction.” *Space, place, and gender*. University of Minnesota Press, 1994, pp. 19-24.
- Prieto, Eric. “Introduction.” *Literature, Geography, and the Postmodern Poetics of Place*. Palgrave Macmillan, 2012, pp. 1-14.

The Chittagong University Journal of Arts and Humanities

- Tally Jr., T. Robert. "Introduction." *The Routledge Handbook of Literature and Space*, edited by Robert T. Tally Jr., Routledge, 2017, pp. 1-6.
- Tuan, Yi-Fu. "Space and Place: Humanistic Perspective." *Philosophy in Geography*, edited by Stephen Gale and Gunnar Olsson, D. Reidel Publishing Company, 1979, pp. 387-427.
- Tuan, Yi-Fu. "Introduction." *Space and Place*. The University of Minnesota Press, 1977, pp. 3-7.

أنس بن مالك رضي الله عنه: حياته ومساهمته في الحديث
(আনাস ইবন মালিক (রা.): জীবনী ও হাদীসে তাঁর অবদান)

ড. আ.ম. কাজী মুহাম্মদ হারুন উর রশীদ*

[**Abstract:** Anas Ibn Malik (R.), a prominent companion of the great prophet Mohammad (Sm.), was a narrator of numerous Hadiths. He served Mohammad (Sm.) for about 10 years until the death of the great prophet. He fought eight wars and took part in the Treaty of Hudaibiyyah. His original name was Anas, but his nicknames were Abua Hamza and Abu Ubama, and he got the title of Khademur Rasul. Mohammad (Sm.) prayed to Allah for his wealth, children, and forgiveness. He served Islam using a mosque in Bosra to preach Hadiths until the last moment of his life. He narrated two thousand two hundred and eighty-six hadiths. In their two Hadith books, Imam Bukhari and Imam Muslim (R.) included one hundred and sixty-eight Hadiths narrated by Anas Ibn Malik (R.). He was the most meritorious, wisest, and eldest of all companions of Mohammad (Sm.). Because of the supplication of Mohammad (Sm.), Allah blessed Anas Ibn Malik (R.) with wealth, children, long life, and wisdom. He died at Bosra in 93 Hijri.]

المقدمة

أنس بن مالك خادم الرسول وأمه أم سليم بنت ملحان، وأخوه البراء بن مالك فصحب أنس النبي صلى الله عليه وسلم وأتم الصحبة، ولأزمه أكمل الملازمة منذ هاجر إلى أن مات، وغزا معه ثمانين غزوات، وباع تحت الشجرة. ويعد من مفسري الصحابة الذين ليس لهم تصانيف، ورحل إلى دمشق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها إلى البصرة، فكان آخر من مات في البصرة من الصحابة.

تعارفه : هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد ابن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار ويكنى بأبي حمزة وأبي ثمامة الأنصاري النجاري.^١ (ابن عساعر، ١٩٩٥، ص ٣٣٢) وأمه أم سليم بنت ملحان، وقال علي بن المديني اسمها مليكة بنت ملحان الرميطة، وأم سليم بنت ملحان تلقب بالرميصاء.^٢ (مصفى بن عبد الله، ٢٠١٠م، ص ٣٤٧) كنيته أبو حمزة.^٣ (محمد بن

* প্রফেসর, আরবি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

حبان التيمي، ١٩٩١م، ص ٦٥) كناه النبي صلى الله عليه وسلم ببقرة كان يجتنبها، وأمه أم سليم بنت ملحان، وكان يخضب بالصفرة، وقيل: بالحناء، وقيل: بالورس، وكان يخلق ذراعيه بخلوق للمعة بياض كانت به، وكانت له ذؤابة، فأراد أن يجرها فنهته أمه.^٤ (عز الدين ابن الأثير، ١٩٩٤م، ص ٢٩٤) ويكنى بأبي ثمامة أيضا.^٥ (الزركلي، ٢٠٠٢م، ص ٢٤)

ولادته ونشأته

ولد أنس قبل الهجرة ١٠ سنوات في المدينة الموافق ٦١٢ - ٧١٢م ونشأ فيها وهاجر إلى دمشق والبصرة ومات فيها. وقال العتقي في «تاريخه»: ولد في السنة الرابعة من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وزعم الجاحظ في كتاب «البرصان»: أن ولده لا ينفكون في كل زمن أن يكون فيهم رؤساء إما في الفقه، وإما في الزهد وإما في الخطابة، ومع ذلك فلم يكن يعتري ولده عطاس.^٦ (مغلطاي بن قليح بن عبد الله، ٢٠٠١م، ص ٢٧٩)

وروى عن أنس قال: «خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ، وَقُبِضَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرِينَ سَنَةً».^٧ (الطبراني، ١٩٩٥م، ص ٢٧٩)

وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابن عشر سنين وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن عشرين سنة وانتقل إلى البصرة وتوفي بها سنة إحدى وتسعين وقيل سنة ثلاث وتسعين وكان يصفر لحيته بالورس.^٨ (محمد بن حبان بن أحمد، ١٩٧٣م، ص ٤)

صفاته

كان نقش خاتم أنس رضي الله عنه صورة أسد رابض، وكان يشد أسنانه بالذهب، وكان أحد الرماة المصبيين، ويأمر ولده أن يرموا بين يديه، وربما رمى معهم، فيغلبهم بكثرة إصابته، وكان يلبس الخنز، ويتعمم به.^٩ (عز الدين ابن الأثير، ١٩٩٤م، ص ٢٩٤)

وعن محمد بن قيس قال: كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ إِذَا حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَقَرَعَ مِنْهُ، قَالَ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.^{١٠} (أحمد بن محمد بن حنبل، ١٩٩٨م، ص ٢٩٤)

أنس بن مالك رضي الله عنه: حياته ومساهمته في الحديث
(আনাস ইবْن মালিক (রা.): জীবনী ও হাদীসে তাঁর অবদান)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشَبَّهَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ابْنِ أُمِّ سُلَيْمٍ»
يَعْنِي: أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ. ^{١١} (الطبراني، رقم الحديث: ٧٧٤٥).

خدمته وقربه مع النبي ص

كان أنس رضي الله تعالى عنه خادما أميناً للنبي صلى الله عليه وسلم، خدمه أحسن خدمة، ولازمه أكمل ملازمة منذ أن هاجر إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، خدمه سفراً وخضراً، سلماً وحرباً، قال أنس رضي الله عنه: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، أَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ يَدَيَّ، فَأَنْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَنَسًا غُلَامٌ كَيِّسٌ فَلْيَخْدُمَكَ، قَالَ: «فَخَدَّمْتُهُ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَوَاللَّهِ مَا قَالَ لِي لَشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لَمْ صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا، وَلَا لَشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعُهُ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا هَكَذَا». ^{١٢} (البخاري، ١٩٨٧م، رقم الحديث: ٦٩١١).

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: "خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ، وَاللَّهِ مَا قَالَ لِي: أَقَا قَطُّ، وَلَا قَالَ لِي لَشَيْءٍ: لَمْ فَعَلْتَ كَذَا؟ وَهَلَّا فَعَلْتَ كَذَا؟" زَادَ أَبُو الرَّبِيعِ: لَيْسَ مِمَّا يَصْنَعُهُ الْخَادِمُ، وَلَمْ يَذْكُرْ. ^{١٣} (مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، رقم الحديث: ٢٣٠٩).

وَعَنْ أَنَسٍ، قَالَ: "خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا لَأَمْنِي فِيْمَا نَسِيتُ وَلَا فِيْمَا ضَيَّعْتُ فَإِنْ لَأَمْنِي بَعْضُ أَهْلِيهِ قَالَ: «دَعُوهُ فَمَا قُدِّرَ فَهُوَ كَائِنٌ»». ^{١٤} (أبو نعيم أحمد الأصبهاني، ١٩٧٤م، ص ١٢٤)

وامتلاً قلب أنس بحب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو ذا يقول: ما من ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيبي يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم (في النوم بعد موته)، وكانت لأسرته في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة خاصة، فأمه أم سليم، وخالته أم حرام بنت ملحان، وعمه أنس بن النضر بطل أحد، وعمته الربيع بنت النضر كلهم يلازمون النبي عليه السلام. ^{١٥} (علي بن نايف الشحود، د.ت، ص ١٤٧)

نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم له

نصح النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك قال: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بخمس خصال قال: يا أنس أسبغ الوضوء يزد في عمرك وسلم على من لقيت من أمي تكثر حسناتك، وإذا دخلت، يعني: بيتك فسلم على أهل بيتك يكثر خير بيتك وصل صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين قبلك، يا أنس: ارحم الصغير ووقر الكبير تكن من رفقائي يوم القيامة.^{١٦} (البيهقي، ٢٠٠٩م، رقم الحديث: ٧٣٩٦)

عن أنس بن مالك، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، فقال: أنا فاعلٌ قال: قلت: يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال: قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: فاطلبي عند الميزان. قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبي عند الخوض فإنني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن. هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.^{١٧} (الترمذي، ١٩٩٨م، رقم الحديث: ٢٤٣٣)

دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنس

أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له لأنه خدمه كما روي عن أنس، قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا، وأمي، وأُمُّ حرام خالتي، فقال: «فوموا فلاصلي بكم في غير وقت صلاة»، فصلى بنا، فقال رجلٌ لثابت: أين جعل أنسا منه؟ قال: «جعلته على يمينه، ثم دعا لنا أهل البيت بكل خيرٍ من خير الدنيا والآخرة»، فقالت أمي: يا رسول الله حوِّدْكَ ادعُ الله له، قال: «فدعا لي بكل خيرٍ، وكان في آخر ما دعا لي به» أن قال: «اللهم أكثِرْ ماله وولده، وبارك له فيه».^{١٨} (مسلم، رقم الحديث: ٦٦٠)

وعن أنس قال: جاءت بي أمي أم أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أَرزَني بنصف خمارها، ورَدَّتْني بنصفه، فقالت: يا رسول الله، هذا أنيس ابني، أتيتك به يخدمك فادعُ الله له، فقال:

أنس بن مالك رضي الله عنه: حياته ومساهمته في الحديث
(আনাস ইবْن মালিক (রা.): জীবনী ও হাদীসে তাঁর অবদান)

«اللَّهُمَّ أَكْثَرُ مَالِهِ وَوَلَدَهُ» قَالَ أَنَسٌ: فَوَاللَّهِ إِنَّ مَالِي لَكَثِيرٌ، وَإِنَّ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي لَيَتَعَادُونَ عَلَى نَحْوِ الْمِائَةِ الْيَوْمَ. ١٩ (مسلم، رقم الحديث: ٢٤٨١)

وزاد أحمد بن منصور وأطل حياتي فأكثر الله مالي حتى أن كرما لي يحمل في السنة مرتين وولد لصلبي مائة وستة ودعا لي النبي صلى الله عليه وسلم وكان له بستان يحمل في السنة الفاكهة مرتين وكان فيها ريحان يجيئ منه ريح المسك. ٢٠ (ابن عساکر، ص ٣٤٩)

وعن أنس بن مالك قال: سمعت أم سليم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لو دعوت الله له دعوات، قال أنس: «فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث دعوات»، قد رأيت ثنتين في الدنيا، وأرجو أن أرى الثالثة في الآخرة، وحكم حسين سليم أسد: إسناده صحيح. ٢١ (أبو يعلى، ١٩٨٤م، رقم الحديث: ٤٣٥٤)

ويقول: إن أرضي لتثمر في السنة مرتين، قيل: كان له أربعمائة حديقة من نخل ودعا له أيضا بطول الحياة والمغفرة، فطال عمره وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة ولم يبق بعده من رأى النبي عليه السلام غير أبي الطفيل. ٢٢ (مصطفى بن عبد الله القسطنطيني العثماني، ص ٣٤٧)

دعاء أنس رضي الله عنه

وإنه يدعو بدعوات كما تلي

١. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ إِذَا سُئِيَ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرُهُ قَامَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ عَبْدُكَ رَدَّ إِلَيْكَ فَارَأْفَ بِهِ وَارْحَمْهُ اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبِهِ وَافْتَحْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ لِرُوحِهِ وَتَقَبَّلْهُ مِنْكَ بِقَبُولِ حَسَنِ اللَّهِمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَضَاعِفْ لَهُ فِي إِحْسَانِهِ، أَوْ قَالَ: فَرِّدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ. ٢٣ (ابن أبي شيبة، د.ت، رقم الحديث: ١١٨٢٧)

٢. عن ثابت البناني، قال: «كان أنس بن مالك، إذا أشفى على ختم القرآن بالليل، بقي منه شيئا حتى يصبح فيجمع أهله فيختمه معهم»، [تعليق المحقق] إسناده ضعيف وهو الإسناد الأسبق. ٢٤ (الدارمي، ٢٠٠٠م، رقم الحديث: ٣٥١٦)

٣. وقال جعفر عن ثابت: كنت مع أنس فجاء قهرمانه فقال: يا أبا حمزة عطشت أرضنا قال: فقام أنس فتوضأ وخرج إلى البرية فصلى ركعتين ثم دعا، فرأيت السحاب تلتئم قال: ثم أمطرت حتى ملأت كل شيء، فلما سكن المطر بعث أنس بعض أهله فقال: انظر أين بلغت السماء، فنظر فلم تعد أرضه إلا يسيراً وذلك في الصيف.^{٢٥} (إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقائي، ٢٠١١م، ص ٦١)

أساتذته وتلاميذه

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعبد الله بن مسعود حذيفة بن اليمان وأبي ذر ومعاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وغيرهم وروى عنه قتادة وثابت البناني وعبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل وأبو قلابة الجرمي والحسن البصري ومحمد بن سيرين وجماعة كثيرة من أهل البصرة وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ومحمد بن شهاب الزهري ومحمد المنكدر وعبد الله بن عبد الرحمن أبو طوالة في جماعة من أهل المدينة وعبد الرحمن بن أبيليلى وعامر الشعبي وأبو مالك الأشجعي وغيرهم من أهل الكوفة وإسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر ومكحول الفقيه وسعيد بن خالد بن طويل الشاميون وجماعة سواهم.^{٢٦} (ابن عساكر، ص ٣٣٣)

فضل أنس بن مالك

كان أنس خادماً للنبي صلى الله عليه وسلم فله فضل عظيم في الأمة، وبعض ذلك فيما يلي:
١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ابْنِ أُمِّ سُلَيْمٍ»
يَعْنِي: أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ^{٢٧} (الطبراني، رقم الحديث: ٧٧٤٥).

٢. عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ أَنَسٌ، أَحْسَنَ النَّاسِ صَلَاةً فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ.^{٢٨} (أحمد، رقم الحديث: ٤٠٨٢).

٣. في «تاريخ» ابن عساكر: يكنى أبا ثمامة، وكان صاحب نعل النبي صلى الله عليه وسلم وأداته.^{٢٩} (مغلطاي بن قليح بن عبد الله، ص ٣٨٣)

أنس بن مالك رضي الله عنه: حياته ومساهمته في الحديث
(আনাস ইবন মালিক (রা.) : জীবনী ও হাদীসে তাঁর অবদান)

٤. وقال الأنصاري: حدثني أبي، عن ثمامة، قال: كان أنس يصلي حتى تقطر قدماه دما مما يطيل القيام وقال همام بن يحيى، حدثني من صحب أنسا قال: لما أحرم لم أقدر أن أكلمه حتى حل من شدة اتقائه على إحرامه. ٣٠ (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي، ٢٠٠٣م، ص ١٠٥٧)

٥. وقال محمد بن عبد الله الأنصاري: حدثنا ابن عون، عن موسى بن أنس أن أبا بكر لما استخلف بعث إلى أنس ليوجهه إلى البحرين على السعاية، فدخل عليه عمر فاستشاره، فقال: ابعته فإنه لبيب كاتب. قال: فبعته، ومناقب أنس. ٣١ (أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، ١٤٤٥هـ، ص ٢٧٨)

٦. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «أَسْرَ إِلَيَّ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِرًّا، فَمَا أَخْبَرْتُ بِهِ أَحَدًا بَعْدُ، وَلَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْهُ أُمُّ سُلَيْمٍ فَمَا أَخْبَرْتُهَا بِهِ» ٣٢ (مسلم، رقم الحديث: ٢٤٨٢).

غزوة أنس رضي الله عنه

لما شرع الجهاد بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أنس يومئذ في سن تمكنه من الجهاد، وما كان صلى الله عليه وسلم يسمع للصغار أن يشتركوا في الجهاد، ولهذا لم يشارك أنس رضي الله عنه في الجهاد في بدر ولا أحد، ولكنه حضرهما كخادم النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم معنا ما يدل على ذلك، ووصفه بجهاد أم سليم وعائشة رضي الله عنهما في أحد يؤكد حضوره فيهما، وقال أبو بكر السمعاني في كتاب «الأمالي»: غزا أنس مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلثي غزوات. ٣٣ (مغلطاي بن قليج بن عبد الله، ص ٢٨١)

خدم كثير مع أنس رضي الله عنه

ومن خدم النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك بن النضر الأنصاري وهند وأسماء ابنا حارثة وربيعة بن كعب الأسلميون وكان عبد الله بن مسعود صاحب نعليه كان إذا قام ألبسه إياهما وإذا جلس جعلهما في ذراعيه حتى يقوم وكان عقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته يقود به في الأسفار وكان بلال بن رباح المؤذن وكذلك عمرو بن قيس الأعمى المدعو ابن أم مكتوم وأبو مخذولة أقره مؤذنا بمكة وسعد القرظ مؤذن بالمدينة ومن خدمه سعد مولى أبي بكر الصديق وذو مخمر ابن أخي النجاشي

ويقال ابن أخته ويقال ذو مخبر وبكير بن شداح الليثي وأبو ذر الغفاري وخطيبه ثابت ابن قيس بن الشماس وفارسه أبو قتادة الأنصاري وكانت أم أيمن دايتة وبلال بن رباح على نفقاته وقيس بن سعد بن عباد بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير وذؤيب بن حلحلة والد الفقيه قبيصة صاحب بدنه التي أهداها والناظر عليها وحجمه أبو طيبة.^{٣٤} (صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي، ٢٠٠٠م، ص ٨٨)

كثرة أولاده

إن النبي عليه السلام دعا للأنس لكثرة الأولاد فكان له أولاد كثيرة كما روى عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَتْ أُمِّي: يَا رَسُولَ اللَّهِ، خَادِمُكَ أَنَسٌ، ادْعُ اللَّهَ لَهُ، قَالَ: «اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ، وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ».^{٣٥} (البخاري، رقم الحديث: ٦٣٤٤)

ويقال: إن أنس بن مالك قدم من صلبه من ولده وولد ولده نحو من مائة قبل موته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له فقال: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. قال أنس: فإني لمن أكثر الأنصار مالا وولدا. ويقال: إنه ولد للأنس بن مالك ثمانون ولدا منهم ثمانية وسبعون ذكرا، والبنات الواحدة تسمى حفصة والثانية تكنى أم عمرو.^{٣٦} (أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النعمري القرطبي، ١٩٩٢م، ص ١١١)

قال محمد بن عبد الله الأنصاري: خرج أنس مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى بدر وهو غلام يخدمه. قال ابن قتيبة في المعارف: ثلاثة من أهل البصرة لم يموتوا حتى رأى كل واحد منهم مائة ذكر من صلبه: أنس بن مالك، وأبو بكرة، وخليفة بن بدر.^{٣٧} (أبو زكريا يحيى الدين يحيى بن شرف النووي، ص ١٢٨) وقال أبو اليقظان: مات للأنس في طاعون الجارف ثمانون ابنا. وقيل: سبعون.^{٣٨} (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، ١٩٨٥م، ص ٤٠٥)

ولايته

وفي «الأوائل» للعسكري: ولّى الحجاج أنسا نيسابور من فارس فأقام فيها سنين يقصر الصلاة ويفطر، ويقول: ما أدري كم مقامي؟ ومتى يوافيني العزل؟ قال أبو هلال هذا إسناد صحيح.^{٣٩} (مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري المصري الحكري الحنفي، ص ٢٨٠)

موته

قال عبد الله بن إسحاق المدائني حدثنا قعنب بن الحر بن قعنب الباهلي: مات أنس بن مالك بالبصرة وجابر بن زيد سنة ثلاث وتسعين وفي جمعة واحدة.^{٤٠} (ابن عساکر، ص ٣٨٤)
وعن قتادة قال: «عجز أنس بن مالك عن الصوم قبل أن يموت بسنة فأفطر، وأطعم ثلاثين مسكيناً». ^{٤١} (ابن سعد، ١٩٦٨م، ص ١٨)

وقال محمد بن سعد: سألت محمد بن عبد الله الأنصاري، ابن كم كان أنس بن مالك يوم مات؟ فقال: ابن مائة سنة وسبع سنين.

وقال أبو اليقظان: صلى عليه قطن بن مدرك الكلابي. وقال الحسن بن عثمان: مات أنس بن مالك في قصره بالطرف على فرسخين من البصرة سنة إحدى وتسعين. ودفن هناك. وقد قيل: إنه مات وهو ابن بضع وتسعين سنة، وأصح ما فيه ما حدثنا به عبد الله بن محمد، قال حدثنا أحمد بن سليمان، قال حدثنا عبد الله ابن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا معتمر بن سليمان عن حميد: أن أنس ابن مالك عمر مائة سنة إلا سنة.

قال أبو عمر: يقال إنه آخر من مات بالبصرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أعلم أحدا مات بعده ممن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبا الطفيل عامر بن وائلة.^{٤٢} (أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، ١٩٩٢م، ص ١١١)

وعن الحسن قال: «أنس بن مالك آخر من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالبصرة». ^{٤٣} (ابن سعد، ص ٢٦)

وكان عنده عصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما مات أمر أن تدفن معه، فدفنت معه بين جنبه وقميصه. ^{٤٤} (عز الدين ابن الأثير، ص ٢٩٤)

وقال النووي: اتفق العلماء على مجاوزة عمره مائة سنة، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه توفي سنة ثلاث وتسعين، وقيل: سنة تسعين، وقيل: إحدى وتسعين، وقيل: اثنتين وتسعين، وقيل: خمس وتسعين، وقيل: سبع وتسعين. وثبت في الصحيح أنه كان له قبل الهجرة عشر سنين، فعمره فوق المائة

كما ترى. وأما ما نقل عن حميد، أن عمر أنس مائة إلا سنة، فشاذ مردود. وتوفى بالبصرة خارجها على نحو فرسخ ونصف، ودفن هناك في موضع هناك يُعرف بقصر أنس، رضى الله عنه.^{٤٥} (النووي، ص ١٢٨)

مساهمته في علم الحديث

روى ألفى حديث ومائتين وستة وثمانين حديثاً، اتفق البخارى ومسلم منها على مائة وثمانية وستين، وانفرد البخارى بثلاثة وثمانين، ومسلم أحد وسبعين.^{٤٦} (النووي، ص ١٢٧) وهو أحد الستة المشهورين برواية الحديث.^{٤٧} (مصطفى بن عبد الله القسطنطيني العثماني، ص ٣٤٨)

بعض مروياته

١. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَذَفَ فِي النَّارِ" ^{٤٨} (البخاري، رقم الحديث : ١٦)
٢. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَسِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا» ^{٤٩} (البخاري، رقم الحديث : ٦٩)
٣. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَتُبَتَّ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْحَمْرُ، وَيُظْهَرَ الزِّنَا" ^{٥٠} (البخاري، رقم الحديث: ٨٠)
٤. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعِيَهُ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ» ^{٥١} (البخاري، رقم الحديث: ٨٢٢)
٥. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ» وَتَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَحَزْبٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ أَنَسٍ جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ^{٥٢} (البخاري، رقم الحديث: ١١٠٨)

أنس بن مالك رضي الله عنه: حياته ومساهمته في الحديث
(আনাস ইবন মালিক (রা.): জীবনী ও হাদীসে তাঁর অবদান)

٦. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنَ النَّاسِ مُسْلِمٌ، يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ». ٥٣ (البخاري، رقم الحديث: ١٣٨١)

٧. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطُوهُ الدَّجَالُ، إِلَّا مَكَّةَ، وَالْمَدِينَةَ، لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَائِهَا نَقَبٌ، إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافِينَ يَحْرُسُونَهَا، ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ، فَيُخْرِجُ اللَّهُ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ». ٥٤ (البخاري، رقم الحديث: ١٨٨١)

٨. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُتْلَى بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ فِي مَرَضِهِ كُلِّ عَمَلٍ صَالِحٍ كَانَ يَعْمَلُهُ فِي صِحَّتِهِ". ٥٥ (الطحاوي، ١٩٩٤م، رقم الحديث: ٢٢١٣)

صفات النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أنس رضي الله عنه

وبيان صفات النبي صلى الله عليه وسلم على لسان أنس رضي الله فيما يلي:

١. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، قَالَ: «كَانَ إِبْرَاهِيمُ مُسْتَرْضِعًا لَهُ فِي عَوَالِي الْمَدِينَةِ، فَكَانَ يَنْطَلِقُ وَنَحْنُ مَعَهُ فَيَدْخُلُ الْبَيْتَ وَإِنَّهُ لَيَدْخُنْ، وَكَانَ ظِفْرُهُ قَيْنًا، فَيَأْخُذُهُ فَيُقْبِلُهُ، ثُمَّ يَرْجِعُ» قَالَ عَمْرُو: فَلَمَّا تُوفِّيَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِي وَإِنَّهُ مَاتَ فِي النَّدْيِ وَإِنَّ لَهُ لَظْفَرَيْنِ تُكْمِلَانِ رِضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ» ٥٦ (مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، ب.ت، ص ٢٣١٦)

٢. عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا، وَلَا لَعَنًا، وَلَا سَبَابًا، كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْمُعْتَبَةِ: «مَا لَهُ تَرَبَّ جَبِينُهُ». ٥٧ (البخاري، رقم الحديث: ٦٠٤٦)

٣. أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ، وَلَا بِالْقَصِيرِ، وَلَا بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ، وَلَا بِالْأَدَمِ، وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ الْقَطِطِ، وَلَا بِالسَّيْطِ، بَعَثَهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ

أَرْبَعِينَ سَنَةً فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا، وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلَحْيَتِهِ عَشْرُونَ شَعْرَةً بَيَضَاءً.^{٥٨} (الترمذي، رقم الحديث: ٣٦٢٣)

٤. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْجَعَ النَّاسِ، وَأَحْسَنَ النَّاسِ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ. قَالَ: فُنِزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْلَةً، قَالَ: فَانْطَلَقَ النَّاسُ قَبْلَ الصَّوْتِ، فَتَلَقَّاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَبَقَهُمْ، وَهُوَ يَقُولُ: لَمْ تُرَاعُوا؟ قَالَ: وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ، عُرِّيَ فِي عُنُقِهِ السَّيْفُ، فَجَعَلَ يَقُولُ لِلنَّاسِ: لَمْ تُرَاعُوا؟ قَالَ: وَقَالَ: إِنَّا وَجَدْنَاهُ بَحْرًا، أَوْ إِنَّهُ لَبَحْرٌ يَغْنِي الْفَرَسَ.^{٥٩} (أحمد بن حنبل، رقم الحديث: ١٣٩٠١)

٥. عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ صَبِيَّانُ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا.^{٦٠} (ابن أبي شيبة، رقم الحديث: ٢٦٢٨٨)

٦. عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ حَاتِمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرُ وَمَعَ عُثْمَانَ سِتَّ سِنِينَ يَعْمَلُ بِمِثْلِ عَمَلِهِمَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَانَ نَفْسُهُ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ: مُحَمَّدٌ سَطْرٌ، وَرَسُولٌ سَطْرٌ، وَاللَّهُ سَطْرٌ.^{٦١} (مسند البزار، رقم الحديث: ٧٣١٥)

٧. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) فضلت على الناس بأربع في السخاء والشجاعة وكثرة الجماع وشدة البطش.^{٦٢} (ابن عساکر، ج ٤، ص ٢٢)

٨. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً، ثُمَّ رَقِيَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ فِي الصَّلَاةِ وَفِي الرُّكُوعِ: «إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَائِي كَمَا أَرَاكُمْ».^{٦٣} (البخاري، رقم الحديث: ٤١٩)

٩. عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا فَحْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَحْرَ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَا فَحْرَ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ بِيَدِي لَوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آدَمُ وَمَنْ دُونَهُ تَحْتَ لَوَائِي فَأَيُّ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَيُقَالُ لِي: مَنْ؟ فَأَقُولُ: أَحْمَدُ فَيُفْتَحُ لِي، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ خَرَرْتُ لَهُ سَاجِدًا فَأَحْمَدُهُ بِحَامِدٍ لَمْ يَحْمَدْهَا أَحَدٌ قَبْلِي، وَلَا بَعْدِي يُلْهِمْنِيهَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.^{٦٤} (البزار، رقم الحديث: ٦٤١٣)

أنس بن مالك رضي الله عنه: حياته ومساهمته في الحديث
(আনাস ইবন মালিক (রা.): জীবনী ও হাদীসে তাঁর অবদান)

الأحاديث الموقوفة لأنس رضي الله

١. قال أنس بن مالك: «توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ستين سنة ليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء»^{٦٥} (أبو يعلى أحمد بن علي، ١٩٨٤م، رقم الحديث: ٣٦٤١)

٢. قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ؛ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يَوْمِئِذٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، وَقَدْ رَفَعَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ بِرَقَاعٍ ثَلَاثٍ. لَبَدَ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ.^{٦٦} (مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، ٢٠٠٤م، رقم الحديث: ٣٤٠٠)

٣. قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «كُنْهَنَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ».^{٦٧} (البخاري، رقم الحديث: ٢١٦١)

٤. أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: إِنَّ خِيَاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَطْنِ صَنْعَةٍ، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزًا وَمَرَقًا، فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالِي الْقَصْعَةِ»، قَالَ: «فَلَمْ أَزَلْ أَحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ».^{٦٨} (البخاري، رقم الحديث: ٢٠٩٢)

٥. قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِهَذِهِ الْآيَةِ: آيَةُ الْحِجَابِ " لَمَّا أُهْدِيَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَتْ مَعَهُ فِي الْبَيْتِ صَنَعٌ طَعَامًا وَدَعَا الْقَوْمَ، فَقَعَدُوا يَتَحَدَّثُونَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ ثُمَّ يَرْجِعُ، وَهُمْ قُعُودٌ يَتَحَدَّثُونَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَاطِرِينَ إِنَّهُ { [الأحزاب: ٥٣] إِلَى قَوْلِهِ { مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ } [الأحزاب: ٥٣] فَضُرِبَ الْحِجَابُ وَقَامَ الْقَوْمُ^{٦٩} (البخاري، رقم الحديث: ٤٧٩٢)

٦. قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: «أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَجَاءَ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُخْبِرَنَا بِهَا، فَسَمِعَ لَعَطًا فِي الْمَسْجِدِ» لَمْ يَزِرْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا قُرْآنُ^{٧٠} (الطبراني، رقم الحديث: ٨١٨٦)

٧. قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: مَا مَسِسْتُ شَيْئًا قَطُّ خَرْأً، وَلَا حَرِيرًا، أَلَيْتَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا شَمَمْتُ رَائِحَةً أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.^{٧١} (أحمد، رقم الحديث: ١٢٠٧١)

بعض ملحوظاته

لما قدم أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم من العراق إلى المدينة كانت تعجبه صلاة عمر بن عبد العزيز وكان عمر أميرها فصلّى أنس خلفه فقال ما صليت خلف إمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يتم الركوع والسجود ويخفف القعود والقيام^{٧٢} (عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث بن رافع، ١٩٨٤م، ص ٣٣).

وأيضا قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : مَا رَأَيْتُ إِمَامًا أَشَبَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِمَامِكُمْ هَذَا قَالَ : وَكَانَ عُمَرُ، يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ.^{٧٣} (أحمد، رقم الحديث: ١٣٧٥٦)

الخاتمة

فالصحابي الجليل أنس رضي الله عنه هو خادم الرسول قد خادم عشر سنوات في الحضر والسفر وأوصى عند موته بأن يوضع في فمه شعر من شعر النبي عليه السلام إذا مات، وذلك تفاؤلا وبركة. وساهم في الحديث والسنن وعلمنا به سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.

المراجع والمصادر

١. ابن عساکر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله، تاريخ دمشق، (الناشر: دار الفكر، ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م)، ج ٩، ص ٣٣٢.
٢. مصطفى بن عبد الله القسطنطيني العثماني المعروف بـ «كاتب جلبي» وبـ «حاجي خليفة»، سلم الوصول إلى طبقات الفحول، (تركيا: مكتبة إرسیکا، إستانبول، ٢٠١٠ م)، ج ١، ص ٣٤٧.
٣. محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مغبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي، مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار، (المنصورة: دار الوفاء، الطبعة: الأولى ١٤١١ هـ - ١٩٩١ م)، ص ٦٥.
٤. عز الدين ابن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م)، ج ١، ص ٢٩٤.
٥. الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الدمشقي، الأعلام، (الناشر: دار العلم للملايين، ٢٠٠٢ م)، ج ٢، ص ٢٤.

أنس بن مالك رضي الله عنه: حياته ومساهمته في الحديث
(আনাস ইবন মালিক (রা.): জীবনী ও হাদীসে তাঁর অবদান)

- ٦ . مغلاطي بن قليج بن عبد الله ، إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، (الناشر: الفاروق الحديثة ، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١)، ج٢، ص٢٧٩.
- ٧ . الطبراني، المعجم الأوسط، (القاهرة: دار الحرمين، ١٩٩٥م)، رقم الحديث: ١٦٢٦.
- ٨ . محمد بن حبان بن أحمد، الثقات، (بجيدر آباد الدكن الهند: دائرة المعارف العثمانية، الطبعة: الأولى، ١٣٩٣هـ = ١٩٧٣م)، ج٣، ص٤.
- ٩ . عز الدين ابن الأثير، المرجع السابق، ج١، ص٢٩٤.
- ١٠ . أحمد بن محمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل، (بيروت: عالم الكتب، ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م)، رقم الحديث: ١٣١٥٥.
- ١١ . الطبراني، المعجم الأوسط، المرجع السابق، رقم الحديث: ٧٧٤٥.
- ١٢ . البخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع الصحيح، (القاهرة: دار الشعب، ١٤٠٧ - ١٩٨٧م)، رقم الحديث: ٦٩١١.
- ١٣ . مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، المسند الصحيح، (بيروت: دار إحياء التراث العربي)، رقم الحديث: ٢٣٠٩.
- ١٤ . أبو نعيم أحمد الأصبهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، (مصر: السعادة - بجوار محافظة مصر، ١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م)، ج٧، ص١٢٤.
- ١٥ . علي بن نايف الشحود، من مشاهير الصحابة رضي الله عنهم، (د.ت)، ص١٤٧.
- ١٦ . البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو، مسند البزار، (المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم ٢٠٠٩م)، رقم الحديث: ٧٣٩٦.
- ١٧ . الترمذي، محمد بن عيسى ، سنن الترمذي، (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ١٩٩٨م)، رقم الحديث: ٢٤٣٣.
- ١٨ . مسلم، رقم الحديث: ٦٦٠.
- ١٩ . مسلم، رقم الحديث: ٢٤٨١.
- ٢٠ . ابن عساکر، المرجع السابق، ج٩، ص٣٤٩.
- ٢١ . أبو يعلى، مسند أبي يعلى، (دمشق: دار المأمون للتراث، ١٤٠٤ - ١٩٨٤م)، رقم الحديث: ٤٣٥٤.
- ٢٢ . مصطفى بن عبد الله القسطنطيني العثماني، المرجع السابق، ج١، ص٣٤٧.
- ٢٣ . ابن أبي شيبه، أبو بكر العبسي الكوفي، مصنف ابن أبي شيبه، (د.ت)، رقم الحديث: ١١٨٢٧.
- ٢٤ . الدارمي، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن، سنن الدارمي، (دار المغني، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١٢هـ - ٢٠٠٠م)، رقم الحديث: ٣٥١٦.
- ٢٥ . إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني، أبو الإمداد، برهان الدين المالكي، تهجئة المخافيل وأجمل الوسائل بالتعريف برواة

- الشَّمائل، (اليمن: مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية، ١٤٣٢هـ - ٢٠١١م)، ج ١، ص ٦١.
٢٦. ابن عساكر، المرجع السابق، ج ٩، ص ٣٣٣.
٢٧. الطبراني، المعجم الأوسط، رقم الحديث: ٧٧٤٥.
٢٨. أحمد، المرجع السابق، رقم الحديث: ٤٠٨٢.
٢٩. مغلطاي بن قليج بن عبد الله، علاء الدين، المرجع السابق، ج ٢، ص ٢٨٣.
٣٠. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، (دار الغرب الإسلامي، ٢٠٠٣م)، ج ٢، ص ١٠٥٧.
٣١. أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، (بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ)، ج ١، ص ٢٧٨.
٣٢. مسلم، رقم الحديث: ٢٤٨٢.
٣٣. مغلطاي بن قليج بن عبد الله، علاء الدين، المرجع السابق، ج ٢، ص ٢٨١.
٣٤. صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي، الوافي بالوفيات، (الناشر: دار إحياء التراث، ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م)، ج ١، ص ٨٨.
٣٥. البخاري، رقم الحديث: ٦٣٤٤.
٣٦. أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، (بيروت: دار الجيل، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م)، ج ١، ص ١١١.
٣٧. أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تهذيب الأسماء واللغات، (بيروت: دار الكتب العلمية)، ج ١، ص ١٢٨.
٣٨. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاتماز الذهبي، سير أعلام النبلاء، (بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م ج ٣، ص ٤٠٥).
٣٩. مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري المصري الحنفي، أبو عبد الله، علاء الدين، المرجع السابق، ج ٢، ص ٢٨٠.
٤٠. ابن عساكر، المرجع السابق، ج ٩، ص ٣٨٤.
٤١. ابن سعد، أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي، الطبقات الكبرى، (بيروت: دار صادر، الطبعة الأولى، ١٩٦٨م)، ج ٧، ص ١٨.
٤٢. أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، (بيروت: دار الجيل، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م)، ج ١، ص ١١١.

أنس بن مالك رضي الله عنه: حياته ومساهمته في الحديث
(আনাস ইবন মালিক (রা.) : জীবনী ও হাদীসে তাঁর অবদান)

- ٤٣ . ابن سعد، المرجع السابق، ج٧، ص٢٦.
- ٤٤ . عز الدين ابن الأثير، المرجع السابق، ج١، ص٢٩٤.
- ٤٥ . النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، **تهذيب الأسماء واللغات**، (بيروت: دار الكتب العلمية)، ج١، ص١٢٨.
- ٤٦ . النووي، المرجع السابق، ج١، ص١٢٧.
- ٤٧ . مصطفى بن عبد الله القسطنطيني العثماني، المرجع السابق، ج١، ص٣٤٨.
- ٤٨ . البخاري، المرجع السابق، رقم الحديث: ١٦.
- ٤٩ . المرجع السابق، رقم الحديث: ٦٩.
- ٥٠ . المرجع السابق، رقم الحديث: ٨٠.
- ٥١ . المرجع السابق، رقم الحديث: ٨٢٢.
- ٥٢ . المرجع السابق، رقم الحديث: ١١٠٨.
- ٥٣ . المرجع السابق، رقم الحديث: ١٣٨١.
- ٥٤ . المرجع السابق، رقم الحديث: ١٨٨١.
- ٥٥ . الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن سلمة الأزدي الحجري المصري، **شرح معاني الآثار**، (مصر: عالم الكتب، ١٤١٤هـ، ١٩٩٤م)، رقم الحديث: ٢٢١٣.
- ٥٦ . مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، **المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم**، (بيروت: دار إحياء التراث العربي)، ص٢٣١٦.
- ٥٧ . البخاري، المرجع السابق، رقم الحديث: ٦٠٤٦.
- ٥٨ . الترمذي، المرجع السابق، رقم الحديث: ٣٦٢٣.
- ٥٩ . أحمد بن حنبل، المرجع السابق، رقم الحديث: ١٣٩٠١.
- ٦٠ . ابن أبي شيبة، أبو بكر العباسي الكوفي، **مُصنف ابن أبي شيبة**، (د.ت)، رقم الحديث: ٢٦٢٨٨.
- ٦١ . مسند البزاز، المرجع السابق، رقم الحديث: ٧٣١٥.
- ٦٢ . ابن عساكر، المرجع السابق، ج٤، ص٢٢.
- ٦٣ . البخاري، المرجع السابق، رقم الحديث: ٤١٩.
- ٦٤ . البزار، المرجع السابق، رقم الحديث: ٦٤١٣.
- ٦٥ . أبو يعلى أحمد بن علي، **مسند أبي يعلى**، (دمشق: دار المأمون للتراث، الطبعة الأولى، ١٤٠٤ — ١٩٨٤م)، رقم الحديث: ٣٦٤١.

٦٦. مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، *الموطأ*، (الإمارات: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م)، رقم الحديث: ٣٤٠٠.
٦٧. البخاري، المرجع السابق، رقم الحديث: ٢١٦١.
٦٨. المرجع السابق، رقم الحديث: ٢٠٩٢.
٦٩. المرجع السابق، رقم الحديث: ٤٧٩٢.
٧٠. الطبراني، المعجم الأوسط، رقم الحديث: ٨١٨٦.
٧١. أحمد، المرجع السابق، رقم الحديث: ١٢٠٧١.
٧٢. عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث بن رافع، أبو محمد المصري، *سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه*، (بيروت: عالم الكتب، الطبعة السادسة، ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م)، ص ٣٣.
٧٣. أحمد، المرجع السابق، رقم الحديث: ١٣٧٥٦.

أهمية الوحدة والترابط في القصيدة: دراسة نقدية (ক্বাসিদায় অর্থের সঙ্গতি ও ঐক্যের গুরুত্ব: একটি সমালোচনামূলক অধ্যয়ন)

ড. মুহাম্মদ জুনাইদুল ইসলাম *

প্রতিপাদ্যসার: মানুষ ভাষার মাধ্যমে পরস্পর মনের ভাব প্রকাশ করে থাকে- কখনো গদ্যে কখনো ছন্দবদ্ধ কবিতায়। ভাবের সঠিক বিনিময়ের জন্য তাতে ঐক্য ও সঙ্গতি থাকা একান্ত প্রয়োজন। উক্ত ‘ঐক্য’ গদ্যে স্পষ্টরূপে প্রতিবিম্বিত হলেও কবিতায় তেমনিভাবে হয়না। ফলে এ ক্ষেত্রে অনেকেই অনেক ধরনের ধারণা পোষণ করেন। এর ফলশ্রুতিতে আধুনিক আরবি সাহিত্যসমালোচনায় ‘কবিতায় ভাবের ঐক্য’ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। সমালোচকগণ তাতে দুটি ‘ঐক্য’ নিয়ে আলোচনা করেছেন। একটি হলো ‘وحدة البيت’ অর্থাৎ একটি চরণ পরিপূর্ণ ভাব প্রকাশে সমর্থ হওয়া; যাকে ‘البيت المقلد’ নামে অভিহিত করা হয়। দ্বিতীয়টি হলো ‘وحدة الأبيات’ অর্থাৎ ক্বাসিদার চরণসমূহ সূচনা থেকে অন্ত পর্যন্ত মিলেমিশে একটি বোধগম্য অর্থ প্রকাশ করা; যেন, ক্বাসিদাটি একটি দেহ এবং চরণসমূহ উক্ত দেহের একাধিক অঙ্গতুল্য। এ প্রসঙ্গে অধিকাংশ প্রাচীন সমালোচক ‘وحدة البيت’ অর্থাৎ প্রতিটি চরণ পরিপূর্ণ অর্থের অধিকারী ও স্বতন্ত্র হওয়া-কে উত্তম বলেছেন। এদের মধ্যে ইবনু সালাম আল-জুমাহী, আল-মারযুবানী, কুদামা ইবনু জা’ফর, ইবনু রাশীক আল-কায়রওয়ানী- এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অপরদিকে প্রাচীন সমালোচকদের মধ্যে যারা ‘وحدة الأبيات’ কে উত্তম বলেছেন তাদের সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়। তন্মধ্যে বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক আফলাতুন ও তার শিষ্য এরিস্টটল, আবু উছমান আল জাহিয়, ইবনু কুতাইবা, ইবনু তবাতেবা প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে আধুনিক যুগের অধিকাংশ সমালোচক ‘وحدة الأبيات’-কে অধিক বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- আল-বারুদী, আদ-দাসুকী, ‘আব্দুর রহমান শুকরী, ‘আব্দুল কাদের আল-মাযেনী, ‘আব্বাস মাহমুদ আল-‘আক্কাদ। উল্লেখ্য যে, ‘আব্বাস মাহমুদ আল-‘আক্কাদ ক্বাসিদায় ভাবের ঐক্য অর্জনের ক্ষেত্রে যেসব শর্তসমূহ জুড়ে দিয়েছেন তা শুকরী ও মাযেনীর তুলনায় অনেক বেশি কঠিন ও দুরূহ। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে উক্ত বিষয়ে বিশদ পর্যালোচনার প্রয়াস চালানো হবে। আল্লাহই একমাত্র তাওফীকদাতা।

المقدمة

الشعر شقيق النثر في الكلام، وكلُّ كلامٍ طويلاً كان أو قصيراً لا بد فيه من الوحدة والترابط بين معانيه ومفاهيمه، فالنثر يتركب من الجُمْل والفقرّة، والشّعر يتركب من الأبيات، والأبيات قد تكثر وقد تقلُّ، أما إذا زادت على سبعة فهي تُسمّى قصيدة، والترابط بين أبياتها قد يكون واضحاً وقد يكون خفياً، وقد في أشد

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

الخفاء، حتى لا يقدر أن يطلع عليه أكثر القارئين والسامعين، فأصبحت هذه الوحدة والترابط من القضايا المهمة في النقد العربي الحديث، فتكاثرت فيها الآراء والأفكار وتطاول فيها الكلام من نواحي مختلفة: من ناحية وجودها في القصيدة القديمة، ومن ناحية أنها قضية نقدية حديثة أو قديمة، والعلماء والنقاد قد تناولوها باهتمام بالغ، حتى كتبوا فيها مقالات وتصنيفات مستقلة، فإننا في هذا المقال سنحاول لإلقاء الضوء على مفهومها وأهميتها عند النقاد والعلماء، كما سنحاول للتفريق بين "وحدة البيت" و "وحدة الأبيات" مع توضيح أيهما أحسن في القصيدة في نظر النقاد والعلماء.

أولاً: معنى القصيدة

القصيدة مشتقة من "قصد يقصد قصداً ومقصداً"، من باب (ض)، قصد الطريق قصداً: استقام، والشاعر: أنشأ القصائد، وله وإليه: توجه إليه عامداً، وفي الأمر: توسط، وفي الحكم: عدل ولم يمل ناحية، وفي النفقة: لم يسرف ولم يقتدر، وفي مثله: اعتدل فيه (إبراهيم مصطفى وزملاؤه، ج ٢، ٧٣٨)، وفي هذا المعنى جاء قوله تعالى: "وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ" (القرآن الكريم، السورة: ٣١، الآية: ١٩) أى "امش مشياً مقتصداً ليس بالبطيء المتنبط، ولا بالسريع المفرط، بل عدلاً وسطاً بين بين" (ابن كثير، ج ٦، ٣٣٩) والقصيد والقصيدة على وزن "فعليل" والفعل قد يكون فى معنى "مفعول" مثل: جريح فى معنى مجروح، دقيق فى معنى مدقوق أى مطحون، وقد يكون فى معنى "فاعل"، مثل: إن الله سميع عليم أى سامع عالم، وهكذا قسيم فى معنى قاسم، وييس فى معنى يابس؛ فالقصيد إن كان فى معنى "مفعول" فهو ما يكون مقصوداً ومطلوباً، وإن كان فى معنى "فاعل" فهو ما يكون كاملاً معتدلاً مستقيماً، وجمعه قصائد. وقال الجوهري: القصيدُ جمعُ القصيدة كسفين جمعُ سفينة. (ابن منظور، ج ٣، ٣٥٤).

القصيدة في مصطلح الشعر العربي

إننا نرى القصائد في الشعر العربي أن عدد أبياتها قد تولى وقد تكثر، وكذا نرى أنها قد تسمى قصيدة وقد مقطوعة، فما هي القصيدة؟ وما هي المقطوعة؟ وما الفرق بينهما؟ وما هو أقل مقدار الأبيات في القصيدة؟ ففيه آراء بين الأدباء وهي كما يلي.

يقول الأعشى: أول من قصد القصائد مهلهل خال امرئ القيس؛ والقصيد ما زاد على سبعة أبيات. (أحمد الفزاري، ج ١، ٤٩٣)، ويقول ابن منظور: "و في العادة أن يُسمى ما كان على ثلاثة أبيات أو عشرة أو خمسة عشر قطعة، فأما ما زاد على ذلك فإنما يُسميه العربُ قصيدة". (ابن منظور، ج ٣، ٣٥٥)، وفي

أهمية الوحدة والترابط في القصيدة: دراسة نقدية

(ক্লাসিদায় অর্থের সঙ্গতি ও ঐক্যের গুরুত্ব: একটি সমালোচনামূলক অধ্যয়ন)

معجم اللغة العربية: "القصيدة: مجموعة من الأبيات الشعريّة متّحدة في الوزن والقافية والرّويّ وهي تتكوّن من سبعة أبيات فأكثر". (احمد مختار، ج ٣، ١٨٢٠)، ويقول ابن رشيق القيرواني: "وقيل: إذا بلغت الأبيات سبعة فهي قصيدة، ولهذا كان الإيطاء بعد سبعة غير معيب عند أحد من الناس ... ومن الناس من لا يُعَدُّ القصيدة إلا ما بلغ العشرة وجاوزها ولو ببيت واحد.. ويستحسنون أن تكون القصيدة وترّاً، وأن يتجاوز بها العقد، أو توقف دونه؛ كل ذلك ليدلوا على قلة الكلفة، وإلقاء البال بالشعر". (ابن رشيق، ج ١، ١٨٨) فعلمنا مما مرّ من التعريفات أنه ليس أحد تنازل في عدد أبياتها من سبعة، فنستفيد منه أنه ما نقص منها فهي مقطعة وما تكون سبعة أو أكثر فهي قصيدة.

ثانياً: مفهوم الوحدة والترابط في القصيدة

نحن نرى هناك عدداً من المصطلحات في هذا الموضوع، فمنها "وحدة القصيدة"، و"وحدة المشاعر في القصيدة"، و"الوحدة العضوية في القصيدة"، و"وحدة الأبيات في القصيدة" و"وحدة الأغراض في القصيدة"، و"وحدة البيت في القصيدة"، وهذه المصطلحات بعضها مترادفة وبعضها متقاربة، وفي حين بعضها مختلفة عن بعض كلياً، والسرُّ وراء هذه الاختلافات والتكرُّر في المصطلحات يرجع إلى أمر آخر وهو أن فن "النقد الأدبي" ليس شأنه كشأن الفنون الأخرى من النحو والصرف وأصول الفقه والحديث، فإن هذه العلوم لها مصطلحات خاصة مثبتة، اتفق أهلها على أسمائها و مدلولها مع اتفاق كلي أو خلاف يسير محدود، أما فن "النقد الأدبي" ليس كذلك، قليلاً ما نرى هناك إجماع النقاد في مصطلحاتها وقضاياها، والسبب في ذلك يعود إلى أن الأدب والنقد في أكثر الأحيان يعتمدان على الذوق، والأذواق تختلف باختلاف الأشخاص كما تختلف باختلاف الأمكنة والعصور، ففي أكثر القضايا النقدية - إن اتفقوا في أسماءها فاختلّفوا في مفاهيمها، وإن اتفقوا في مفهومها فاختلّفوا في أسماءها، وشأنهم هذا لم يختلف في قضية "الوحدة والترابط في القصيدة" أيضاً، فسموها بأسماء مختلفة على مرضاهم، وحدّد لها المعني على رضاهم، فالقضية التي نحن بصددّها الآن وهي قضية "الوحدة والترابط في القصيدة" من أهم القضايا النقدية في العصر الحديث يقصد بها نقاد الأدب الحديث -عامة- أن تكون القصيدة مترابطة الأجزاء متماسكة الأعضاء، وأن تكون بنية واحدة تامة الخلق، وأن يكون كل بيت فيها كجزء خاضع ومُكْمَل لجزء آخر، فتكون القصيدة عملاً فنيّاً تامّاً، يكْمُل فيه تصوير خاطر أو خواطر متجانسة، كما يكْمُل التمثال بأعضائه، والصورة بأجزائها، فلا يتقدّم فيها بيتٌ عن موضعه ولا يتأخّر، وكذا لا يُحذف منها شيءٌ ولا يُنقل إلى مكان

آخر فهي كجسم حي لا تغني فيه الأذن عن العين ولا القدم عن الأكف، ولا يُنقل فيه عضو إلى مكان عضو آخر.

ثانيا: نشأة مصطلح "الوحدة والترابط في القصيدة"

مصطلح "الوحدة والترابط في القصيدة" مصطلحة حديثة في الشعر العربي، لم يعرفها قدماء النقاد ، لا باسمها ولا بمدلولها، فإنهم لم يستعملوا هذا المصطلح في نقدهم، لا في هذا المفهوم ولا في غيره، كما لم يعرفوا مدلولها، لا بهذا الاسم ولا بغيره؛ و لم يهتم الشعراء القدماء هذه الوحدة في قصائدهم شرطاً والتزاماً، بل تركها حيناً وأتاها حيناً، ونظّموا القصائد الشعرية كيفما تيسّر لهم من وحدة المعنى مع مراعاة الوزن والقافية، ومعظم النقاد القدماء لم يلتفتوا إلى هذا المصطلح بهذا المعنى، بل اكتفوا عند تقديرهم الشعرَ بمجرد أحسن التشبيهات والاستعارات أو بمجرد وجود "وحدة البيت" الذي سمّوه بـ "البيت المقلد"، أو بمجرد وجود الوحدة في القافية والوزن ، ويقولون في حد الشعر: أنه كلام موزون مقفى قصداً.

رابعاً: الوحدة في القصيدة في نظر النقاد

إذا التفتنا إلى العلماء والنقاد قديماً وحديثاً فنرى القدماء أصبحوا في طائفتين: طائفة تحب "وحدة البيت" في القصيدة ، وطائفة تحب "وحدة الأبيات" فيها، أما النقاد في العصر الحديث فنرى معظمهم يحبون "وحدة الأبيات" في القصيدة، وما لا يكون كذلك فهم ينقدونها نقداً لاذعاً.

(1) معظم النقاد القدماء يستحسنون "وحدة البيت" في القصيدة

جُلّ النقاد القدامى كانوا يهتمون بوحدة البيت واستقلاله، ويستحسنونها في الشعر، وأحسن البيت عندهم ما يكون مستغنياً عن الآخر، حتى لا يتوقف فهمه على أبياتٍ سبقته أو تلحقه، فمنهم من نصّ على هذا بصراحة ومنهم من أشار إليه بتلميح ، فأول من نصّ إلى هذا بصراحة هو الناقد ابن سلام الجمحي^١، هو حينما يُعرّف عن "البيت المقلد" يقول: "هو البيت المستغني بنفسه، المشهور الذي يضرب به المثل" (الجمحي، ج ٢، ٢٦١) وكان من شأنه أنه عند الموازنة بين الشعراء كان يبحث عن مقلداتهم، فمن تكون مقلداته أكثر فهو عنده أشعر ممن تكون مقلداته دونه، فكثرة المقلدات عنده من أبرز الأسباب في تفضيل الشعراء أحدهم على أحد، وقال جرير لأبي عمرو بن العلاء بعد أن ذكر له أبو عمرو بيتين من شعر مجنون بن الملوح: "وهذا من أرق الشعر كلّهُ وألطفه، لولا التضمن الذي فيه، والتضمن: أن يكون البيت معلّقاً بالبيت الثاني، لا يتّم معناه إلا به، وإنما يُحمَد البيت إذا كان قائماً بنفسه" (ابن عبد ربه، ج ٦، ٢٢٢) وكلما تقدّم الزمن كانت الفكرة تزداد وضوحاً، وجاء كلام النقاد فيه أكثر وضوحاً من السابق، فينقل أبو أحمد

أهمية الوحدة والترابط في القصيدة: دراسة نقدية

(ক্লাসিদায় অর্থের সঙ্গতি ও ঐক্যের গুরুত্ব: একটি সমালোচনামূলক অধ্যয়ন)

العسكري^٢ (ت- ٣٨٢هـ)، عن الصولي : "أن خير الشعر ما قام بنفسه، وكُمّل معناه في بيته، وقامت أجزاء قسمته بأنفسها" (أبو أحمد العسكري، ج ١، ٩)، وابن رشيق القيرواني (ت- ٤٦٣ هـ) يقول : "ومن الناس من يستحسن الشعر مبنياً بعضه على بعض، وأنا أستحسن أن يكون كل بيت قائماً بنفسه لا يحتاج إلى ما قبله ولا إلى ما بعده، وما سوى ذلك فهو عندي تقصير، إلا في مواضع معروفة، مثل الحكايات وما شاكلها، فإن بناء اللفظ على اللفظ أجود هنالك من جهة السرد." (ابن رشيق، ج ١، ٢٦١)، والناقد الشهير ابن خلدون (ت- ٨٠٨ هـ) يقول في تعريف الشعر : " هو كلامٌ مفصّلٌ قطعاً قطعاً، متساويةً في الوزن، متحدةً في الحرف الأخير من كل قطعة... وينفرد كل بيت منه بإفادته في تراكيبه، حتى كأنه كلام وحده، مستقلّ عما قبله وما بعده. " (ابن خلدون، د-ت، ج ١، ٢٦٧) ثم بعد أن تقدم شيئاً أتى تلخيص تعريف الشعر وقال: " الشعر هو الكلام البليغ المبني على الاستعارة والأوصاف، المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي، مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده عما قبله وبعده، الجاري على أساليب العرب المخصوصة به" (المرجع السابق، ج ١، ٢٧٠).

مما سبق من الأقوال والآراء يتضح لنا أن كثيراً من النقاد القدامى كانوا يهتمون باستقلال البيت واستغنائه، فالشعر الجيد عندهم ما استقل وقام بنفسه، لا يحتاج إلى ما فوقه ولا إلى ما بعده، فهم لا يعرفون من الوحدة إلا "وحدة البيت" ويقصدون منها استقلال البيت في المقصد، وعند ابن رشيق هذا إذا ما كان في غير الحكايات، أما إذا كان في الحكايات و في ما شاكلها فعند ذلك بناء اللفظ على اللفظ أجود، وأكثر النقاد وإن ذكروا اهتمامهم بـ "استقلال البيت ووحدة"، لكنهم لم يُخصّصوها بغير الحكايات والقصص، ولم يفرقوا بين الحكايات وبين غير الحكايات، بل ذكروها مطلقاً. ولا غرابة في أنهم قد أرادوا هناك بالشعر النوع الكامل منه لا الشعر المطلق الذي يعم القصصي والوجداني معاً، والنوع الكامل في الشعر هو الشعر الوجداني لا الشعر القصصي والملحمي؛ لأن الشعر ليس إلا ما يكون فيه بياناً عن شعور الشاعر وعواطفه، وبياناً عن حُزنه وفرحه وما سوا ذلك من شعر الملحمة والقصص ليس هو إلا سردٌ محضٌ، خالية عن التأثير والتأثر.

(2) طائفة من القدماء يستحسنون "وحدة الأبيات"

على الرغم مما تقدّم من أمر "وحدة البيت" في النقد القديم، فقد كان هناك عددٌ كبير من الشعراء والنقاد الذين يقفون ضد "وحدة البيت" وهم لا يعدونها مقياساً للشاعرية الحقّة، بل هم يعتقدون بوحدة أخرى سوى "وحدة البيت"، وذاك تقرّب من مفهوم "وحدة الأبيات" للعصر الحديث وهي وحدة الترابط و التماسك بين الأبيات

أو باسم آخر وحدة التأخي بين الأبيات، فمن نراه أولَ لافتٍ إلى هذه الوحدة هو الفيلسوف اليوناني أفلاطون (ت-٤٣٧ ق. م.) ، فهو يقول في حوارهِ مع فايدروس: " أحسبُ أنك توافقني على أن كلَّ حديثٍ يجب أن يكون منظماً مثلَ الكائنِ الحيِّ، له جسم خاص به بحيث لا يكون مبتور الرأس أو القدم، ولكنه في جسده وأعضائه مؤلفٌ تتحقق الصلةُ بين عضوٍ وآخر، ثم بين الأعضاء جميعاً" (بكار، ٢٧٧) فإنه لم يفرّق في "الحديث" (الكلام) بين النثر والشعر، بل كل حديث عنده – نثراً كان أو نظماً- يجب أن يكون مُنظماً مثل الكائن الحي، وتابعه تلميذه أرسطو (ت- ٣١٢ ق. م.) في كتابه "فن الشعر" إلا أنه هدّبها ونقّحها، فخصّصها بالمأساة، ويقول: "إن المأساة عمل فني تام، له مقدمة ووسط ونهاية، وأنه متماسك الأجزاء، يودي كل جزء فيه إلي ما يليه...، وحدة المأساة شبيهة بوحدة الجسم الإنساني، الذي إذا انتزع منه جزء تضعع الكل" (د. محمد أحمد صوالحة وزميله، ١٠)

وروى أبو العباس المبرد (ت- ٢٨٥هـ) في هذا قولاً لعمر بن لجأ^٣ (ت- نحو ١٠٥هـ)، و يقول : "وُخِرتُ أن عمر بن لجأ قال لابن عمِّ له: أنا أشعر منك، قال له، وكيف؟ قال: لأنني أقول البيت وأخاه، وانت تقول البيت وابن عمه." (المبرد، ج ٢، ١١٩) ويوافق هذا ما نقله المرزباني برواية عمارة بن عقيل، فهو يروي: "قال عمُّ عبید الراعي للراعي : أينا أشعر أنا أم أنت؟ قال: بل أنا يا عم. فغضب وقال: بم ذاك؟ قال: بأنك تقول البيت وابن أخيه وأقول البيت وأخاه." (المرزباني، ج ١، ٢٠٧) ويقول المرزباني: "كان أبو العباس المبرد يفضّل الفرزدق على جرير ويقول: الفرزدقُ يجيء بالبيت وأخيه، وجريرٌ يأتي بالبيت وابن عمه." (المرجع السابق، ج ١، ١٦١)

فما سبق من الأقوال في تفضيل البيت وأخيه فإنها تدل صراحة علي أن أجود الأبيات ما يكون فيها نصيب وافر من الترابط والتماثل، لأن الإخوة والأخوات يكون فيها التشابه والتماثل أكثر مما في العم وابن عمه. فهذا يدل على أن الترابط و التماسك بين الأبيات محمود ومستحسن بالنسبة إلى استقلالها واستغنائها. و يقول الجاحظ: "وأجودُ الشعر ما رأيته متلاحمُ الأجزاء، سهلَ المخرج، فتعلم بذلك أنه قد أفرغ إفراغا واحداً، وسبك سبكا واحداً، فهو يجري على اللسان كما يجري الدهان." (الجاحظ، ج ١، ٧٥) ويقول ابن قتيبة: "أنَّ مقصدَ القصيد إنّما ابتدأ فيها بذكر الديار والدّمن والآثار، فبكى وشكا، وخاطب الرّبع، واستوقف الرقيق ليجعل ذلك سببا لذكر أهلها الطاعنين...، ثم وصل ذلك بالنسيب، فشكا شدّة الوجد وألم الفراق، وفرط الصبابة والشوق...، فإذا استوثق من الإصغاء إليه والاستماع له عَقِبَ بإيجاب الحقوق...، " (ابن قتيبة،

أهمية الوحدة والترابط في القصيدة: دراسة نقدية

(ক্লাসিদায় অর্থের সঙ্গতি ও ঐক্যের গুরুত্ব: একটি সমালোচনামূলক অধ্যয়ন)

ج ١، ٧٥-٧٦)، فإن كلام ابن قتيبة تدل على أنه لا بد من الترابط بين أبيات القصيدة، حتى ينزل الشاعر من معنى إلى معنى مثل انحدار الماء من الأعلى إلى الأسفل.

ثم يتابعهما في هذا ابن طباطبا العلوي^٤ (ت- ٣٢٢ هـ) أحد كبار النقاد في القرن الرابع، فيقول: "وينبغي للشاعر أن يتأمل تأليف شعره وتنسيق أبياته، ويقف على حسن تجاوزها أو قبحة فيلائم بينها لتنظم له معانيها ويتصل كلامه فيها، ولا يجعل بين ما قد ابتدأ وصفه وبين تمامه فضلا من حشو ليس من جنس ما هو فيه فينسى السامع المعنى الذي يسوق القول إليه." (ابن طباطبا، ج ١، ٢٠٩)، ويقرب من هذا ما نقله الحصري (ت- ٤٥٣ هـ) إسناداً إلى الحاتمي^٥ في كتابه "زهر الآداب وثمر الألباب" تحت فصل "وحدة القصيدة واتساقها" يقول الحاتمي: "مَثَلُ القصيدة مَثَلُ الإنسان في اتصال بعض أعضائه ببعض، فمتى انفصل واحدٌ عن الآخر وباتَّه في صحة التركيب، غادرَ الجسمَ ذا عاهةٍ تتخَوَّنُ محاسنه، وتعفي معالمه، وقد وجدتُ حدائقَ المتقدمين، وأربابَ الصناعة من المحدثين يحترسون في مثل هذه الحال احتراساً يجنبهم شوائب النقصان، ويقف بهم على محجة الإحسان" (الحصري، ج ٢، ١٦)

(3) الوحدة عند النقاد المحدثين

الواقع أن "وحدة القصيدة" أو "وحدة الأبيات" من المشاكل الأدبية التي تردد صداها مع مطلع القرن العشرين عند النقاد والشعراء، وأصبحت الدعوة إلى هذه الوحدة ثورةً على نظام الشعر العربي الذي كان البيت فيه وحدة مستقلة، ودعا إليها كثير من النقاد والشعراء من أمثال البارودي و خليل مطران، و تركوا فيه بحثاً مطولاً وآراء قيمة، فيقول البارودي (ت- ١٩٠٤م): "وخير الكلام ما انتلفت ألفاظه وانتلفت معانيه، وكان قريب المأخذ، بعيد المرمى، سليماً من وصمة التكلف،" (الدسوقي، ج ١، ١٨٥) ويقول الدسوقي: "أول تجديد دعا إليه مطران هو وحدة القصيدة، وتماسك أبياتها بعضها ببعض لأنه لم يجد في الشعر العربي ارتباطاً بين المعاني التي تتضمنها القصيدة الواحدة، ولا تلاحماً بين أجزائها، ولا مقاصد عامة تقام عليها في أبنيتها، وتوطد أركانها" (المرجع السابق، ج ٢، ٢٨٥)

أما أول من اهتم بها اهتماماً بالغاً وأوضح ملامحها وحدد مقوماتها، ثم طبَّقها على شعراء هذا القرن وسابقيه، هم أصحاب مدرسة الديوان^٦، من أبرزهم عبد الرحمن شكري (ت- ١٩٥٨م)، إبراهيم عبد القادر المازني (ت- ١٩٤٩م) وعباس محمود العقاد^٧ (ت ١٩٦٤م)، وآراءهم فيها كما يلي-

(1) يقول عبد الرحمن شكري: "قيمة البيت في الصلة التي بين معناه وبين موضوع القصيدة؛ لأن البيت جزء مكمل، لا يصح أن يكون البيت شاذاً خارجاً من مكانه من القصيدة، بعيداً عن موضوعها، وينبغي أن ينظر إلى القصيدة

من حيث هي شيء فرد كامل لا من حيث هي أبيات مستقلة، ومثل الشاعر الذي لا يعني بإعطاء وحدة القصيدة حقها، مثل النقاش الذي يجعل نصيب كل أجزاء الصورة التي ينشأها من الضوء نصيبا واحدا" (2) ويقول المازني: "الشاعر لابد له أن يلائم بين أطراف كلامه، ويساوق بين أغراضه، ويبني بعضاً منها على بعض" (بحي خان، 104). (3) أما العقاد فقد كان أكثر الثلاثة حديثاً عن الوحدة في كتاباته، فقد نقل الدكتور أحمد صوالحة في مقالته "الوحدة العضوية في القصيدة العربية" كلاماً طويلاً للعقاد فيها، فهو- العقاد- يقول: "إن القصيدة ينبغي أن تكون عملاً فنياً تاماً، يكمل فيه تصويرُ خاطر أو خواطر متجانسة، كما يكمل التمثال بأعضائه والصور بأجزائها،... فالقصيدة الشعرية كالجسم الحي يقوم كل قسم منها مقام جهاز من أجهزته ولا يغني عنه غيره في موضعه،... أو هي كالبيت المقسم، لكل حجرة منه مكانها وفائدتها وهندستها ولا قوام لفن بغير ذلك" (محمد أحمد صوالحة وزميله، 12). فوحدة القصيدة عنده وعند ابن طباطبا تقوم على تشبيه القصيدة بالجسم الحي؛ حتى لا يجوز أن يتقدم بيت عن موضعه أو يتأخر.

الباحث يحيى خان أتى بتلخيص لآراء "مدرسة الديوان" وعرض آرائها عرضاً غير مفرط. فيقول أن مفهوم الوحدة عند شكري والمازني كان مفهوماً يكاد أن يكون واحداً واتجاهاً متقارباً يقوم على أسس ثلاثة: الأول: أن تدور أبيات القصيدة كلها حول موضوع واحد لا تتعداه إلى غيره حتى تسمى القصيدة بعنوان يُستفاد من موضوعها. والثاني: وحدة المشاعر والعواطف ووحدة الآمال والأحاسيس في القصيدة. والثالث: أن تترايط أبيات القصيدة بحيث يؤدي كل بيت دوره في نمو القصيدة ولا يكون شاذاً خارجاً عن مكانه من القصيدة، فهذه الأسس الثلاثة يتفق فيها شكري والمازني مع العقاد، أما العقاد يختلف عنهما في أساس رابع زائد على هذه الثلاثة، وهي ترابط الأبيات ترابطاً عضوياً بحيث لا يمكن الاستغناء عن بيت من أبيات القصيدة، ولا يجوز تقديمه وتأخيره عن مكانه، وشكري والمازني لم يرضيا بهذا الشرط في مفهوم الوحدة؛ لأن الترابط بهذه الصفة عندهم صعب جداً، فإنه وإن يُمكن في الشعر المسرحي والملحمي و القصصي، لكن لا يُمكن في الشعر الوجداني والغنائي، لأن التعبير عن الأحاسيس والمشاعر لا ينحصر في ترتيب واحد حتى يخل عند التقديم والتأخير، بل يتسع للشاعر هناك إنشاء التماسك والترابط بترتيبات مختلفة على اختلاف أدواقهم.

خامساً: الفرق بين القصيدة القصصية والوجدانية

يجدر بنا هنا توضيح أمرهم آخر وهو أن "الوحدة والترابط في القصيدة" مثل ما وصفها العقاد (وهو أكثر النقاد كلاماً عنها)، هل يُمكن إنشائها وإثباتها في جميع أنواع القصيدة من القصصي والوجداني أم لا يُمكن في جميعها على الاستواء؟

أهمية الوحدة والترابط في القصيدة: دراسة نقدية

(ক্বাসিদায় অর্থের সঙ্গতি ও ঐক্যের গুরুত্ব: একটি সমালোচনামূলক অধ্যয়ন)

في هذه الوقفة نقف في وجه العقاد خصوصا في الشرط الأخير ونوافق فيه مع شكري والمازني في عدم اشتراطها؛ لأن "الوحدة والترابط" بالشرط الأخير (وهو عدم جواز التقديم والتأخير في الأبيات) من الوحدة الصعبة الشاقة، فإنها وإن قد يجوز حيناً في الشعر القصصي والملحمي لاقتضائه الترتيب بين الوقائع والأحداث إلا أنها مستحيلة في الشعر الوجداني والغنائي، لأن أمر الوجدان والشعور ليس كذلك، فإن الأمور فيها خيالي يندمج في نفس الشاعر كالأمواج المتزاحمة في آن واحد، يصعب الفرق فيها بين متقدم ومتأخر، حتى لا تأخذ هذه المعاني شكلاً وترتيباً إلا إذا لجأ الشاعر إلى تعبيرها في قالب لفظي، ولمزيد التوضيح نستطيع أن نمثله بمثال حسي، فنقول أن مثل القصيدة الغنائية والوجدانية مثل دارٍ أو حُجرة نريد بناءه؛ فرسامٌ يرسم خريطةً ورسام آخر يرسم خريطة أخرى، أو دارٍ نريد تزخرفه؛ فمُزخرفٌ يزخرفه بهيئة وشكل، ومُزخرفٌ آخر يزخرفه بشكل آخر وهيئة أخرى، وكلها مستحسن وجيدٌ، فلا يعيب في الخريطة الثانية أن يُقدّم شيئاً كان متأخراً في الخريطة الأولى، وكذا الحال في الشعر الوجداني فإنه يعتمد كثيراً على العاطفة، والعاطفة لا تطلب ترتيباً خاصاً في المعاني أما أنه يطلب الترابط والتلاحم فيها في أي ترتيب كان، فعاطفة الشاعر وشعوره فيه يتدفق تدفقاً كبيراً، فيتولد من معني واحدٍ معاني كثيرة ومن مفهومٍ واحدٍ مفهوماتٌ عديدة، يتزاحم بعضها على بعض، بعضها كالسبب والعلة وبعضها كالمسبب والمعلول، بعضها كالمُقَدِّمة وبعضها كالنتيجة، و الأبيات فيها إما متولّدة من السابق وإما مولّدة لللاحق حتى يستوفيه الشاعر إلى آخره، وينتهي به إلى خاتمة القصيدة، فكل قصيدة من القصصي والوجداني لا بد فيه من الترابط بين معانيه لكنه في الوجداني لا يتيسّر بقدر ما يتيسر في القصصي.

سادساً: تشبيه القصيدة بالجسم الحي والقلادة

الذين يستحسنون "وحدة البيت" في القصيدة، فهم يُشبهون القصيدة بالعقد والقلادة، فالقصيدة تشتمل على أبيات كثيرة من الشعر، كما تشتمل العقد والقلادة على حبات كثيرة من الدرر، وحبات الدرر تكون دائماً ذات قيمة؛ لا فرق بين أن يكون في العقد أو يكون منفصلاً عنه، فأبيات القصيدة تكون أحسن وأجود إذا كانت ذات معنى كامل في الحالين: عند كونها في القصيدة وعند انفصالها منها، أما الذين يستحسنون "وحدة الأبيات" فهم يُشبهون القصيدة بالجسم الحي ويُشبهون أبياتها بأعضائه، ومن المعلوم أن أعضاء الإنسان والحيوان تكون ذات قيمة وأثر إذا كان في محله بين شقائقه، فإن ترك المحل ونزع من بين شقائقه فلا جمال فيه ولا قيمة له، وحال أبيات القصيدة مثل ذلك حيث أن لها منفعة عظيمة إذا كان في القصيدة ولا فائدة له إذا نزع منها.

سابعاً: الخاتمة

بعد البحث والدراسة في هذا الموضوع يُمكن لنا أن نصل إلى نتائج تالية-

- 1- القصيدة هي مجموعة الأبيات الشعرية التي تتكون من سبعة أبيات فأكثر، وما تقل عن سبعة أبيات فهي تسمى مقطوعة. والشعر كل كلام موزون مقفى، سواء كان ذا بيت أو أبيات، فالشعر أعم من القصيدة والقصيدة أخص منه.
- 2- المراد من الوحدة والترابط في القصيدة هي أن تكون القصيدة مترابطة الأجزاء متماسكة الأعضاء، وأن تكون بنية واحدة تامة الخلق، وأن تكون كل بيت فيها كجزء خاضع ومكمل لجزء آخر.
- 3- الوحدة نوعان: "وحدة البيت" و "وحدة الأبيات"، وحدة البيت هي تمام البيت في المعنى واستغنائه عن الآخر، ويسمى مثل هذا البيت عند الأدباء بـ "البيت المقلد"، ووحدة الأبيات هي أن تكون الأبيات خواطر متجانسة، ويكون كل بيت منها متمماً لبيت آخر حتى يكون مجموع القصيدة كجسم حي.
- 4- النقد في استحسان الوحدة أصبحوا طائفتين: طائفة تستحسن "وحدة البيت"، أكثرهم من النقد القدامي، وطائفة تستحسن "وحدة الأبيات" معظمهم من النقد المحدثين.
- 5- إن كانت القصيدة قصصياً أو ملحمياً أو مسرحياً فلا بد فيها من وجود الوحدة بين الأبيات، وإن كانت وجدانياً وغنائياً ففيها يكفي وجود الوحدة في مصراعي البيت وهي تُسمى بـ "وحدة البيت"؛ لأن القصص وما يكون مثل ذلك يطلب الترتيب، أما الوجدان والشعور ليس كذلك.
- 6- أول من اهتم كثيراً بهذه القضية /صاحب مدرسة الديوان/، من أبرزهم شكري والمازني والعقاد، فشكري والمازني اتفقا مع العقاد في ثلاثة شروط لوجود "وحدة الأبيات"، وهي وحدة الموضوع ووحدة الشاعر، وتأدية كل بيت دوره في نمو القصيدة، وزاد العقاد شرطاً رابعاً فيه وهو عدم جواز التقديم والتأخير في الأبيات.
- 7- وجود وحدة الأبيات بالمعنى المطلوب على شرط العقاد عسير جداً خصوصاً في الشعر الوجداني؛ لأنه لا يكون هناك ترتيب خاص، فما قاله شكري والمازني أقرب إلى الصواب مما قاله العقاد.

أهمية الوحدة والترابط في القصيدة: دراسة نقدية

(ক্লাসিদায় অর্থের সঙ্গতি ও ঐক্যের গুরুত্ব: একটি সমালোচনামূলক অধ্যয়ন)

١. هو أبو عبد الله محمد بن سلام بن عبيد الله الجُمحي (٢٣٢ هـ)، إمام في الأدب، من أهل البصرة، مات ببغداد سنة ٢٣٢ هـ، من أشهر كتبه "طبقات فحول الشعراء"، "بيوتات العرب"، "غريب القرآن"، كان يقول بالقدر [الزركلي، ج٦، ١٦٦]
٢. هو أبو أحمد بن عبد الله بن سعيد العسكري؛ أحد الأئمة في الآداب والحفظ، وهو صاحب أخبار ونوادر، وله رواية متسعة، وله التصانيف المفيدة: من أشهرها "الزواجر والمواعظ" و "التفضيل بين بلاغتي العرب والعجم" و "الحكم والأمثال" [المرجع السابق، ج٢، ٨٣]
٣. هو عمر بن لجأ (وقيل: لحأ) بن حدير ابن مصاد التيمي، من بني تيم بن عبد مناة: من شعراء العصر الأموي: اشتهر بما كان بينه وبين "جرير" من مفاخرات ومعارضات. [الزركلي، ج٥، ٥٩]
٤. محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم طباطبا، الحسني العلوي، أبو الحسن: شاعر مفلح وعالم بالأدب، مولده ووفاته بأصبهان. له كتب، منها "عيار الشعر - ط" و "تهذيب الطبع" و "العروض" قيل: لم يسبق إلى مثله. وأكثر شعره في الغزل والآداب. [الزركلي، ج٥، ٣٠٨]
٥. هو أبو علي محمد بن الحسن بن المظفر الحاتمي (ت- ٣٨٨ هـ)، نسبته إلى جد له اسمه (حاتم)، أديب نقاد، من أهل بغداد، [الزركلي، ج٦، ٨٢]
٦. تعد هذه من المدارس الشعرية الجديدة بعد مدرسة البارودي، ومن زعماء البارزين لهذه الحركة التجديدية عبد الرحمن شكري، إبراهيم عبد القادر المازني، عباس محمود العقاد، وقد أسهم الثلاثة بدور كبير في نشر حركة التجديد في الشعر العربي الحديث، واطلق على مدرستهم "مدرسة شعراء الديوان" نسبة إلى الكتاب النقدي المشهور "الديوان" الذي ألفه كل من المازني والعقاد وأوصحا فيه اتجاههما الجديد، حتى لم يسلم من نقدهم أمثال شوقي وحافظ والمنفلوطي من كبار الشعراء. [عبد التواب صلاح الدين، ١٤٧]
٧. هو عباس بن محمود بن إبراهيم بن مصطفى العقاد، إمام في الأدب، مصري، من المكثرين كتابة وتصنيفا مع الإبداع. أصله من دمياط، كان موظفا بالسكة الحديدية وبوزارة الأوقاف بالقاهرة ثم معلما في بعض المدارس الأهلية. وانقطع إلى الكتابة في الصحف والتأليف، وأقبل الناس على ما ينشر، وظل اسمه لامعا مدة نصف قرن أخرج في خلالها من تصنيفه ٨٣ كتابا. [الزركلي، ج٣، ٢٦٦]

المصادر والمراجع

القرآن الكريم

إبراهيم مصطفى وزملاؤه، *المعجم الوسيط*، القاهرة: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة، دت.

ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد، *المقدمة*، موقع الوراق.

ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد، *وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان*، بيروت: دار صادر، 1900م.

ابن رشيق القيرواني *بالعنة في محاسن الشعر وآدابه* (المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد)، بيروت: دار الجيل، 1981م.

ابن طباطبا، محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم، *عيار الشعر* (المحقق: عبد العزيز بن ناصر المانع)، القاهرة: مكتبة الخانجي، دت.

ابن عبد ربه، أبو عمر شهاب الدين الأندلسي: *العقد الفريد*، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1: 1404هـ.

ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، *الشعر والشعراء*، القاهرة: دار الحديث، 1423هـ.

ابن كثير ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، *تفسير القرآن العظيم*، المحقق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، 1999م.

ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، *لسان العرب*، بيروت: دار صادر، 1414هـ.

ابن الأثير الكاتب، نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني، *المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر*، المحقق: أحمد الحوفي، بدوي طبانة ، القاهرة: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، دت.
أبو أحمد العسكري، الحسن بن عبد الله بن سعيد، *المصون في الأدب*، المحقق: عبد السلام محمد هارون، الكويت: مطبعة حكومة، ط2: 1984م.

أحمد الفزاري، *صبح الأعشى في صناعة الإنشاء* ، بيروت: دار الكتب العلمية، دت.

الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني، *البيان والتبيين*، بيروت: دار ومكتبة الهلال، 1423هـ.

الجُمحي، محمد بن سَلَم ، *طبقات فحول الشعراء*، المحقق: محمود محمد شاكر، جدة: دار المدني، دت.

الْخُصري، أبو إسحاق إبراهيم بن علي، *زهر الأدب وثمر الألب*، تحقيق: أ. د. يوسف على طويل، بيروت / لبنان: دار الكتب العلمية ، 1417 هـ - 1997م.

الدسوقي، عمر ، *في الأدب الحديث* ، بيروت: دار الفكر العربي، 2000م.

الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد، *الأعلام*، بيروت: دار العلم للملايين، 2002م.

المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد، *الكامل في اللغة والأدب*، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة: دار الفكر العربي، ط3: 1997م.

المرزباني، أبو عبيد الله بن محمد بن عمران بن موسى، *الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء*، دت.

بكار، الدكتور يوسف حسين، *بناء القصيدة العربية*، بيروت: دار الأندلس، 1982م.

د. أحمد مختار عبد الحميد عمر، *معجم اللغة العربية المعاصرة*، عالم الكتب، 2008م.

د. محمد أحمد صوالحة وزميله، *الوحدة العضوية في القصيدة العربية*، المجلة العلمية بكلية الآداب جامعة بنها، عدد13، 2013م.

عبد التواب صلاح الدين، *مدارس الشعر العربي الحديث*، القاهرة: مطبعة السعادة، 1982م، ص ١٤٧.

قدامة بن جعفر، *نقد الشعر*، قسطنطينية: مطبعة الجوائب، ط1: 1302هـ.

يحيى خان ، *الوحدة العضوية في القصيدة العربية قديما وحديثا*، مجلة العلوم الإسلامية والدينية، جامعة سوات، المجلد:1، العدد:2 يوليو- ديسمبر 2016م.

حياة محمد حسين هيكل: مساهمته في الأدب والرواية

[মুহাম্মদ হুসাইন হায়কল-এর জীবনী : সাহিত্য ও উপন্যাসে তাঁর অবদান]

ড. হুমায়ুন কবির*

প্রতিপাদ্যসার: [মুহাম্মদ হুসাইন হায়কল আধুনিক যুগের একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সাংবাদিক, নাট্যকার, ইতিহাসবিদ ও মিসরী রাজনৈতিক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পিতার নাম হুসাইন বিন সালিম। তিনি ১৮৮৮ খ্রি. ২০ই আগস্ট মিসরের সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ও ৮ই ডিসেম্বর ১৯৫৬ খ্রি. মৃত্যু বরণ করেন। পাঁচ বছর বয়স থেকে তাকে গ্রামের মন্ডবে ভর্তি করানো হয়েছিল। তিনি ১৯০৯ খ্রি. আইন বিভাগে পাশ করেন। তিনি ১৯১২ খ্রি. রাজনৈতিক অর্থনীতিতে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। মুহাম্মদ বিন হুসাইন কিছু দিনের জন্য আইন পেশায় নিজেকে নিয়োগ করেছিলেন। তিনি ইসরা ও মিরাজ স্বশরীরে অস্বীকার করেন। ফলে তাঁকে নাস্তিক আখ্যায়িত করা হয়েছিল। পরবর্তীতে তিনি অবশ্যই তা থেকে ফিরে আসেন। তাঁর লিখিত রচনাবলী হলো: হায়াতু মুহাম্মদ, আদওয়াউন আলাস সুন্নাতিল মুহাম্মদিয়া, মানজিলুল ওয়াহয়ী, ছাওরাতুল আদাব, সিদ্দিক আকবর (রা.), ওমর ফারুক (রা.), আশরাতু আইয়ামিন ফিস সুদান, ওয়ালাদী, তারাজিমু শারকিয়া ওয়া গারবিয়া, ফি আওকাতিল ফেরাগ, জানজুক রুসু, জায়নাব, আবীস, হা-কাযা খুলিকাত, ইসলামি সাম্রাজ্য ইত্যাদি। তিনি রাজনৈতিক অবদানের সাথে সাথে সাহিত্য জগতে বিশাল অবদান রেখেছেন। তিনি প্রথম আধুনিক আরবি উপন্যাসের জনক। তাঁর রচিত জয়নব নামক উপন্যাসটি আরবি সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস হিসেবে পরিচিত। যা ১৯১৩ খ্রি. প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে আলোচিত ব্যক্তি হলেন: বাগানের মালিক মাহমুদ, মাহমুদের ছেলে হামেদ, হামেদের প্রেমিকা জয়নব, মাহমুদের ম্যানেজার ইবরাহীম, হামেদের দ্বিতীয় প্রেমিকা আজিজা, হাসান যিনি জয়নাবকে বিবাহ করেন, খলিল হাসানের বাবা প্রমুখ।]

التقديم

محمد حسين هيكل أديب شهير وصحافي، وروائي ومؤرخ وسياسي مصري كبير، وكاتب، وباحث ترك مجموعة من الكتب الأدبية والدراسات الإسلامية، ويعتبر محمد حسين هيكل رئيس تحرير جريدة "السياسة" في الفترة الأولى من حياته من أبرز المستعربين، وقد أنكر الإسراء بالروح والجسد معا انطلاقا من نظرة عقلانية في كتابه "حياة محمد"، وقد روى عدله عن ذلك في آخر حياته، وكتب ذلك معبرا عن توجهه الجديد في مقدمة كتابه "في منزل الوحي".

* Associate Professor, Department of Arabic, University of Chittagong

تعارفه

هو محمد بن حسين بن سالم هيكل كاتب صحفي، مؤرخ من أعضاء المجمع اللغوي، ومن رجال السياسة، بمصر. (الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الدمشقي (المتوفى: ١٣٩٦ هـ). **الأعلام**. دار العلم للملايين، أيار/ مايو ٢٠٠٢م، ج ٦، ص ١٠٧).

ولادته

ولد محمد بن حسين في ٢٠ أغسطس ١٨٨٨م الموافق ١٢ ذو الحجة ١٣٠٥ هـ في قرية كفر غنام في مدينة المنصورة، لمحافظة الدقهلية، بمصر لأسرة ريفية مصرية صميمة، لها بعض الواجهة والثراء. (الزركلي، ج ٦، ص ١٠٧).

حياته العلمية

لما بلغ الخامسة من عمره ألحقه أبوه بكتّاب القرية، فتعلم القراءة والكتابة وحفظ نحو ثلث القرآن الكريم، وتحول من هذا الكتّاب في السابعة من عمره إلى القاهرة، فالتحق بمدرسة الجمالية الابتدائية، ثم بمدرسة الخديوية الثانوية، ولما أتم هذه المرحلة انتظم في مدرسة الحقوق، وتخرج منها سنة ١٩٠٩م، وظهر فيه ميله إلى الأدب منذ أن كان طالبا في الحقوق، فعكف على قراءة الآثار العربية القديمة، واتصل بلطفي السيد، محرر الجريدة، وفتح له صدر هذه الصحيفة ليكتب الحقوقي الصغير، ورعاه خير رعاية، وكان لهذه الرعاية أثرها البعيد في نفسه، فقد التقى بمعلم الشباب الناهض مباشرة، أصبح من مريديه وممن يتلقون عنه دروسه في السياسة والاجتماع والأخلاق، وشعر شعورا كاملا بما كان يدعو إليه لطفي من الإيمان بالمصرية والعمل على إبرازها في حياتنا السياسية والأدبية واللغوية، كما شعر شعورا عميقا بما كان يدعو إليه من وصل حياتنا العقلية بالغرب والتزود من ينابيعه، وظهر أثر ذلك فيما كان يكتبه بالجريدة. فلما تخرج من الحقوق رأى أن يتم تعليمه في فرنسا، فسافر إلى باريس، والتحق بكلية الحقوق فيها، وحصل منها على الدكتوراه في الاقتصاد السياسي سنة ١٩١٢م. (شوقي ضيف، أحمد شوقي عبد السلام ضيف (المتوفى: ١٤٢٦ هـ). **الأدب العربي المعاصر في مصر**. دار المعارف، الطبعة: الثالثة عشرة. ص ٢٧٠).

حياة محمد حسين هيكل: مساهمته في الأدب والرواية
[মুহাম্মদ হুসাইন হায়কল-এর জীবনী : সাহিত্য ও উপন্যাসে তাঁর অবদান]

وحصل على الدكتوراه في الحقوق من السربون بفرنسة ١٩١٢م وافتتح مكتبا للمحاماة بالمنصورة. وأكثر من الكتابة في جريدة (الجريدة) وترأس تحرير جريدة السياسة اليومية عام ١٩٢٢م ثم الأسبوعية، ودرّس القانون المدني في الجامعة المصرية القديمة. وكان من أركان الحزب الدستوري المناوئ لسعد زغلول وحزبه. (الزركلي، المرجع السابق، ج٦، ص١٠٧).

حياته العملية:

اشتغل محمد حسين هيكل بالمحاماة في مدينة "المنصورة". ومنذ سنة ١٩١٧م أخذ يلقي بعض المحاضرات في الجامعة المصرية الأهلية، حتى إذا أنشأ حزب الأحرار الدستوريين جريدة "السياسة" سنة ١٩٢٢م تولى تحريرها. وطبعيا أن ينضم إلى هذا الحزب وأن يتولى تحرير جريدته؛ لأنه امتداد لحزب الأمة الذي كان يحرق أستاذه لطفي السيد صحيفته "الجريدة". وانضم إليه في هذا التحرير زميل من تلاميذ لطفي السيد، عاد هو الآخر إلى مصر من باريس، هو طه حسين، فنهضا معا بتحرير صحيفة الأحرار الدستوريين. وغلبت على هيكل في كتاباته النزعة السياسية، بينما غلبت على طه حسين النزعة الأدبية. وأخرج هيكل في سنة ١٩٢١م جزءا عن جان جاك روسو وأتبعه بجزء ثانٍ في سنة ١٩٢٣، فتم له بذلك كتاب طريف عن روسو وآرائه وتعاليمه. (شوقي ضيف، المرجع السابق، ص٢٧١)

وولي أيضا وزارة المعارف مرتين، ثم رئاسة مجلس الشيوخ (١٩٤٥ - ١٩٥٠م) وكان أول ما أصدر مجلة (الفضيلة) يطبعها على (البالوطة)، ويوزعها في قريته. (الزركلي، ج٦، ص١٠٧).

وقد أخذ في أثناء ذلك يتولى شؤون بعض الوزارات، وكان أول ذلك في سنة ١٩٣٧م حين جعله محمد محمود في وزارته وزيرا للدولة، ثم جعله وزيرا للتربية والتعليم، وما زال يتولى هذه الوزارة من حين إلى حين حتى عُين في سنة ١٩٤٥م رئيسا لمجلس الشيوخ، وظل في هذه الرئاسة حتى سنة ١٩٥٠م. (شوقي ضيف، ص٢٧٣).

زندقته

قال سفر بن عبد الرحمن: وممن أنكر الإسراء والمعراج مُحَمَّد حسين هيكَل نص ذلك في كتابه "حياة محمد"، وهذا الرجل يفسر سيرة النبي صَلَّى الله عليه وسلَّم تفسيراً عصرياً وليس هو وحده في هذا الحقل، لكن هو أشهر من كتب في ذلك، والسبب أن كثيراً من الكتاب اتبعوا بعض المستشرقين.

ومن خطط المستشرقين تجريد النبي صلى الله عليه وسلم من وصف النبوة فرأى المستشرقون أن الصواب في الخط من قدر النبي صلى الله عليه وسلم هو إنكار نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وغمط ما أظهره الله تعالى على يده من الحق، وجحد ذلك، والطعن في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم سباباً وشتماً كما كانت تفعل الكنيسة ورجال الدين، الغربيون في القرون الوسطى منذ الحروب الصليبية وقبلها وبعدها، فلقد كان هم كل منهم أن يخطب فيشتتم النبي صلى الله عليه وسلم ويسبه سباً فاحشاً وحاشاه صلى الله عليه وسلم عما يقولون.

ومن قولهم: إنه كذاب ودجال وليس بنبي فعل وفعل وهكذا، حتى أوجدوا في العقلية الغربية الأوروبية مناعة غريبة جداً، فلا تريد أن تسمع عن هذا النبي أي شيء، كما هو حالهم إلى اليوم، ولا يريدون أن يقرؤا بأي فضل له صلى الله عليه وسلم.

هذا المنهج وجده بعض الناس من المفكرين الغربيين أنه أولاً: غير علمي، لأنه مجرد شتم.

تأثر العصريين والعقلانيين بمنهج المستشرقين بعض الناس، وهم الذين ينتهجون المنهج العقلي أو المنهج العصري من المسلمين، وهم من تلاميذ أو من أتباع مدرسة الشيخ محمد عبده العقلية، ومنهم محمد حسين هيكَل هذا، ومنهم أيضاً عبد الرحمن عزام وغيرهم.

فكتب أحدهم بطل الأبطال، والآخر كتب الرسالة الخالدة، وآخر كتب حياة محمد، وآخر كتب محمد هكذا فقط، وطه حسين كتب على هامش السيرة، كل هذا الكلام يكتبونه على أساس أن هذا رجل مفكر، داهية، سياسي، عسكري، عبقر، إلى آخر ذلك، إلا أنه لا يعمل بأمر من الله أو بوحى من الله، فهذا وإن كانوا لا يصرحون بإنكاره لكنهم لا يكادون يأتون عليه ولا يذكرونه. (سفر بن عبد الرحمن الحوالي، شرح العقيدة الطحاوية، (د.ت)، ص ١٨٠٧).

حياة محمد حسين هيكل: مساهمته في الأدب والرواية
[মুহাম্মদ হুসাইন হায়কল-এর জীবনী : সাহিত্য ও উপন্যাসে তাঁর অবদান]

يقول محمد حسين هيكل: إن الإسراء والمعراج، هو استجماعة نفسية وروحية، حصلت ولا تحصل إلا لمن بلغ درجة عالية من الروحانية، فكأنه استجمع في نفسه الوجود منذ أول الوجود إلى آخره، وإذا جئت تنظر في معاني ألفاظ هذه الكلمات لا تجد تحتها أي معنى، ولا تجد لها أي قيمة، إلا أن المقصود هو أن مجرد الإسراء والمعراج عن كونه آية جعلها الله لهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد رد عليه الشيخ محمد الغزالي، وأنكر عليه ذلك، لكن الشيخ نفسه فيه نوع من التأثير بالمنهج العصري، فلهذا جاء في كلامه أيضا ما يلمح بأن من الممكن أن يفسر الإسراء والمعراج تفسيراً مادياً أو شبه مادياً، لأنه يقول: إن كلمة البراق مشتقة من البرق. (الحوالي، سفر بن عبد الرحمن، ص ١٨٠٨).

مؤلفاته

وله مؤلفات كثيرة منها ما يلي:

١. «حياة محمد»: هي سلسلة من المقالات، كتبها محمد حسين هيكل في "السياسة الأسبوعية" من وقت الآخر خلال أعداد الأعوام ٣١ / ٣٢ / ١٩٣٣ م. تناولت حياة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم في كل مرحلة من مراحلها، بعد أن تناول بلاد العرب قبل الإسلام، مفصلاً سيرة الرسول من ميلاده إلى زواجه، ثم بعثته بأسلوب يجمع بين روعة التحليل ودقة التعليل، مع حسن السرد وجودة العبارة، حتى يصل إلى الفصل الحادي والثلاثين المسمى "دفن الرسول". وعلى هذا دارت مقالات الكتاب حول السيرة النبوية التي تحجب كل ما عداها.

وتعد مقالات الكتاب دراسة واعية للإسلام ورسوله ومميزاته في التزام الطريق نحو إيجاد نهضة فكرية وحضارية، لا تتحقق إلا ببعث الماضي الكريم، والحضارة الشريفة التي هي ثمرة لفهم الدين الإسلامي، وغرس من عمل الرسول الكريم. وتجمع مقالات الكتاب بين منطقية العلم ورقة العاطفة. (السيد مرسى أبو ذكري، **المقال وتطوره في الأدب المعاصر**، دار المعارف، الطبعة: ١٩٨١-١٩٨٢ م، ص ١٠١).

وينكر فيه معجزاته صلى الله عليه وسلم، ويطعن في السنة ويشكك في صحتها وفي صدق الأحاديث التي انطوت عليها بصورة. (مشاري سعيد المطرفي، **آراء محمد رشيد رضا العقائدية في أشرار الساعة الكبرى وآثارها الفكرية**، مكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع، ١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م، ص ٣٣٠).

قد قيل حول كتاب حياة محمد أن الخلاصة هذا كتاب مسموم، إذ قام على أساس منهار، إذ صرح مؤلفه في "مقدمته": "إنني لم آخذ بما سجلته كتب السيرة والحديث لأنني فضلت أن أجري في هذا البحث على الطريقة العلمية، بل تراه يطمئنك إلى أنه لم يأخذ حتى بما ثبت في الصحيحين، حفظا لكرامته، والتزاما بمنهجه وجادته فاعتمد فيه على العقل، وكاد أن ينكر صلة الوحي بالنبي صلى الله عليه وسلم وها هو مقرظه الشيخ مصطفى المراغي "شيخ الأزهر" إذ ذاك يكتب في أوله قائلا: "لم تكن معجزة محمد صلى الله عليه وسلم القاهرة إلا في القرآن، وهي معجزة عقلية". ولذا فالكتاب قائم على ترويج صفة العبقرية والعظمة والقيادة وما شاكلها للنبي صلى الله عليه وسلم تعويضا عن صفات النبوة والوحي والرسالة وتغطية لها وإبعادا للفكر عنها. وحسبك يقينا بالقيمة العلمية الرفيعة في كتاب يحلل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون هو الكتاب الذي يقع عليه اختيار اليهود ليستفاد منه في تغطية برامج دينية للمسلمين في إذاعتها الموجهة. (أرشيف منتدى الألوكة - ٤، تم تحميله في: المحرم ١٤٣٢ هـ = ديسمبر ٢٠١٠ م، هذا الجزء يضم: أخبار الكتب، ص ٨٧٧١).

٢. «أضواء على السنة المحمدية أو دفاع عن الحديث»: من بعد الدكتور محمد حسين هيكل جاء المدعو محمود أبو ريه، والذي تأثر بآراء رشيد رضا في السنة النبوية، فأصدر كتابا سماه «أضواء على السنة المحمدية أو دفاع عن الحديث»، مألؤه من أوله إلى آخره بالطعن في السنة النبوية وإنكار حجيتها مع إلقاء أفضع السباب والشتائم على رواتها وناقليها لاسيما على ناقليها الأول أبي هريرة رضي الله عنه، ثم يزعم بعد هذا أنه يدافع عن السنة النبوية. (مشاري سعيد المطرني، ص ٣٣١).

٣. في منزل الوحي: هنا أن يُقدّم لنا وثيقة تاريخية وأدبية فريدة في أسلوبها، عظيمة في أثرها، غنية ووفيرة بما تحمله من معاني جمّة، ورؤحانيات عالية، تسمو بالنفس لتطوف بها حيث طاف النبي وصحبه. يحمل لنا كثيرا من المعاني التي جاءت في خاطره أثناء زيارته لمهبط الوحي وموطن الرسالة المحمدية. (<https://www.hindawi.org/books/18175075/>)

٤. ثورة الأدب: وفي سنة ١٩٣٣ م نشر كتابه "ثورة الأدب"، وهو في هذا الكتاب يتحدث عن نهضتنا الأدبية منذ ثورة عرابي، ويبدأ حديثه بفصل عن "الطغاة وحرية القلم"، وكأنه يرد على الحرب العلنية التي شنها صدقي على كُتّاب الصحف والسياسة. ثم يتحدث عن المراحل المختلفة لشعرنا ونثرنا ويعرض بالتفصيل لما

أصاب النثر من تطور بينما جمد الشعر ولم يستطع اللحاق به، وأكَّـد في غير موضع ضرورة تثقف الأديب المصري الناشئ بالأدب الغربية؛ حتى نستطيع أن نحصل على مراتب الكمال الفني. وعرض في إسهاب لنواحي النقص عندنا في الإنشاء الأدبي وخاصة في بابي القصة والمسرحية. ورفع صوته مجلجلاً بضرورة إقامة أدب مصري وطني، وقَدَّم نماذج قصصية استلهم فيها أساطيرنا الفرعونية. (شوقي ضيف، ص ٢٧٣). فهي مجموعة من المقالات الأدبية الممتعة، نشرت بالسياسة اليومية لمحمد حسين هيكل. تناولت الثورات التي شهدتها نصف القرن الأخير في شؤون الكتابة والأدب، وجمود أصحاب المذاهب. ومن هنا تناولت الأدب المصري الخالص، ودعوة صريحة لبعض النقاد إلى تمصير أدبنا والاتجاه به اتجاها قوميا. وتعتبر مقالات الكتاب من أخطر ما كتب هيكل في النقد؛ لأنها "تتحدث عن الثورات التي شهدتها نصف القرن الأخير في شؤون الكتابة والأدب"، ولذا تعد مقالات الكتاب مرجعا لمن يستطلع الاتجاهات الفنية والنقدية لتلك الفترة، وتضم آراء قيمة في الأدب والفن لها وزنها وخطرها. (السيد مرسي أبو ذكري، ص ٩٩).

٥. الصِّدِّيق أبو بكر رضي الله عنه. هو كتاب يدرس شخصية الخليفة الإسلامية مع ذكر أعماله والحروب والغزوات والفتوحات التي كانت بعهد وأهم الأحداث بعصره وغير ذلك.

٦. الفاروق عمر ١٩٤٥/١٩٤٤ م. جزآن، وهذا أحدث كتاب أخرجه سعادة الدكتور محمد باشا هيكل في التاريخ الإسلامي، على النهج الذي سار عليه منذ عشر سنين، فكان عملا جيدا، أفادت منه الطبقة المحدثه من المثقفين، وقد ألف كثير منهم سهل الكلام ولينه، واستعصت عليهم كتب المتقدمين ونفروا منها، حتى جهلوا كثيرا من تاريخ قومهم، فجاءت كتب سعادة المؤلف عملاً جديداً، نهجا وسطا، بين كتب المتقدمين القوية الرائعة، وبين ما ابتليت به العربية، من القصص والروايات، الغالي منها والرخيص، والقوي منها والسخيف. عرض فيه التاريخ الإسلامي عرضاً شائفاً منظماً، في لغة جيدة رائعة، رصعها بكثير مما اقتبس من عبارات المؤرخين السابقين؛ فقرب إلى المتوسطين ما بعد عنهم، وراض لهم ما استعصى عليهم، حتى إن الكتاب ليأخذ بلب القارئ، فلا يكاد يستطيع أن يضعه من يده إلا أن يأتي على آخره. أحمد محمد شاكر، **جمهرة مقالات العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر**، دار الرياض، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م، ج ١، ص ٢٦٠).

٧. **عشرة أيام في السودان:** وأخرج في سنة ١٩٢٧ كتابه "عشرة أيام في السودان"، وهو إلى أن يكون مناسبات صحفية أقرب منه إلى أن يكون فصولاً أدبية. (شوقي ضيف، ص ٢٧٢).
٨. **ولدي:** وهو كتاب تذكاري لابنه المتوفى سنة ١٩٢٥م. وفي هذا الكتاب يصف رحلاته إلى أوروبا مع زوجته في شهور الصيف من سنة ١٩٢٦ إلى سنة ١٩٢٨، ونراه يصف وصفاً بارعاً مصاييف سويسرا، ويقارن مقارنة طريفة بين باريس الحديثة وباريس القديمة أيام دراسته بها، ويتحدث عن إستانبول وما بعث فيها حكم مصطفى كمال من حياة حرة قوية.
٩. **تراجم شرقية وغربية:** بين الأديب فيه صورة حية وناضجة عن الحياة السياسية المصرية في العصر الحديث.
١٠. **في أوقات الفراغ:** هي مجموعة رسائل أدبية تاريخية أخلاقية فلسفية.
١١. **جان جاك روسو:** هذا الكتاب يناقش قضايا عن جان جاك روسو وهو كاتب وفيلسوف فرنسي، ولد بسويسرا بجنيف.
١٢. **وثلاث قصص، هي (زينب) و(أبيس) و(هكذا خلقت) و(الإمبراطورية الإسلامية) (الزركلي الدمشقي، ج ٦، ص ١٠٧).**
- فأخرج في سنة ١٩٥٥ قصة "هكذا خلقت"، وهي قصة طويلة تقص حياة امرأة مصرية عصرية أصيبت بشذوذ الغيرة، واضطربت بهذا الشذوذ في محيط الدعوة الجديدة إلى الحرية النسوية، وسلطته على حياتها الزوجية فحطمتها مرتين كما يحطم الطفل لعبته. ونراه يقول عنها بلسانها. (شوقي ضيف، ص ٢٧٢).
١٣. **ومنذ سنة ١٩٢٦م كان يصدر ملحقاً لصحيفة السياسة اليومية باسم "السياسة الأسبوعية"، وكاد هذا الملحق أن يكون قاصراً على مباحث في الأدب والنقد.**
١٤. **وفي سنة ١٩٢٩م نشر مجموعة من مقالاته باسم "تراجم مصرية وغربية"، وتبدأ تراجمه الأولى بكليوباترا، ثم يتبعها بتراجم لكبار المصريين السياسيين والمصلحين مثل: مصطفى كامل وعبد الخالق ثروت وبطرس غالي، أما التراجم الغربية فقصرها على بيتهوفن، وتين، وشكسبير، وشيلي. ويوضح هذا الكتاب امتلاء نفسه بحب وطنه ورجاله الأفاضل وحب الغرب وأعلام الفن والشعر والنقد فيه. (شوقي ضيف، ص ٢٧٣).**

حياة محمد حسين هيكل: مساهمته في الأدب والرواية
[মুহাম্মদ হুসাইন হায়কল-এর জীবনী : সাহিত্য ও উপন্যাসে তাঁর অবদান]

١٥. تراجم مصرية وغربية:

مجموعة من المقالات، نشرتها "السياسة الأسبوعية" لمحمد حسين هيكل. تناول فيها بعض أعلام التاريخ والفن والأدب تحكي صورة صحيحة وصادقة لتاريخ مصر خلال الفترة من عهد إسماعيل حتى ١٩٢٩م، فتحدث عن إسماعيل وتوفيق ومحمد قنديل وبطرس غالي ومصطفى كامل وقاسم أمين وإسماعيل صبري وعبد الخالق ثروت وغيرهم. كما تناولت جماعة من الغربيين من أمثال: بيتهوفن، وتين، وشكسبير، وشيلي. وعند طبعها في كتاب أضاف إليها فصلا عن كليوباترا أراد به أن يصحح الصورة التي زيفها مؤرخو الغرب لتاريخ مصر القديمة.

سلك هيكل في مقالاته طريقا طريفا، وأسلوبا فريدا، لم يألفه معاصروه من الكتاب، فتراه يعرض شخصياته، ويحللها بطريقة علمية داخل إطار الأسلوب الأدبي. (السيد مرسي أبو ذكري، ص ١٠٠).

١٦. كتاب "الحكومة الإسلامية": يجمع هذا الكتاب مقالات حول الأسس التي يقوم عليها النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الاسلام.

١٧. عثمان بن عفان: بين الكاتب شخصية عثمان رضي الله عنه.

١٨. قصائد أندلسية لمحمد حسين هيكل. (السيد مرسي أبو ذكري، ص ٢٧٩).

١٩. مقدمة الشوقيات. (عمر الدسوقي، في الأدب الحديث، (الناشر: دار الفكر العربي، الطبعة: الجزء الأول ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م)، ج ٢، ص ٤٨٦).

رجوعه من العلمانية

أما الدكتور محمد حسين هيكل فقد تراجع عن علمانيته كما يظهر بخاصة من بعض كتبه "في حياة محمد" و "منزل الوحي" "وأبو بكر الصديق" "والفاروق عمر" "والحضارة الإسلامية" (علي بن نايف الشحود، موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة ١-٢٩، الباحث في القرآن والسنة)، ج ١٤، ص ٦).

وفاته

توفي يوم السبت ٥ جمادى الأولى ١٣٧٦ هـ الموافق ٨ ديسمبر ١٩٥٦م عن عمر يناهز ٦٨ عاما
(<https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%>)

مساهمته في الأدب

ولم يقصر هيكل نفسه على السياسة، بل أخذ يكتب مع طه حسين فصولاً في الأدب والنقد، وجمع مجموعة من هذه الفصول ونشرها في كتاب "أوقات الفراغ" سنة ١٩٥٢، والكتاب مقسم إلى ثلاث مجموعات؛ وتتناول المجموعة الأولى مباحث قيمة في النقد، وهو فيها يدل دلالة واضحة على تمثله للثقافة الغربية مع تعلقه بشعبه وثقافته وأمانيه في الحياة الفكرية الراقية. وترجم في هذه المجموعة ترجمة باهرة لأناتول فرانس وبيير لوتي، وتحدث حديثاً طويلاً عن قاسم أمين ودعوته إلى تحرير المرأة، وما كان يكنه لوطنه ودينه من حب وإجلال، ووصف كيف رد في أثناء تعلمه بفرنسا على دوق داركور الذي عزا تأخر المسلمين إلى دينهم، فلما عاد إلى مصر تحول مصلحاً اجتماعياً، يريد أن ينفي عن أمته كل ما يعوق تأخرها، كما ينفي عن الدين كل ما يوصم به من جمود؛ ولذلك دعا دعوة حارة إلى النهوض بالمرأة المصرية المسلمة، حتى تكون على قدم المساواة للمرأة الغربية. وتناول هيكل في المجموعة الثانية بعض الشؤون المصرية بمناسبة كشف مقبرة توت عنخ آمون، وهو يصور هنا إيماناً شديداً بقومه وتاريخهم القديم. وفي المجموعة الثالثة خواطر في التاريخ والأدب، دعا فيها إلى الأدب القومي الذي يمثل بيئتنا وعصرنا وحياتنا؛ حتى تتضح ذاتيتنا، وحتى نفصل في أدبنا بطابع تميزنا من قدمائنا وجيراننا، فلا نكون نسخة من غيرنا أو نسخة مطموسة في النسخ العربية المعاصرة؛ بل يكون لنا وجودنا وكياننا الأدبي المستقل. (شوقي ضيف، ص ٢٧١).

كتب الاستاذ أحمد تمام عن الدكتور هيكل

ينفرد الدكتور محمد حسين هيكل بين أبناء جيله، وكلهم هامات سامقة في عالم الأدب والفكر بأشياء حاز بها السبق والريادة، فسبق غيره في تأليف أول رواية عربية بقصته المعروفة "زينب"، وفتح لأصحاب القلم والبيان كتابة التاريخ الإسلامي على نحو جديد يجمع إلى جانب العمق والتحليل العرض الجميل، والأسلوب الشائق، والربط المحكم بين أحداث التاريخ. وكتب أيضاً أدب الرحلة، وسجل خواطره وما يجول في نفسه في كتابه الرائع "في منزل الوحي"، ودون مذكراته السياسية، وما شاهده وشارك فيه من أحداث في كتابه "مذكرات في السياسة المصرية".

وحاز هذا السبق وهو غير متفرغ للعمل الأدبي، ف قضى حياته كلها إما رئيساً لتحرير جريدة أو وزيراً في وزارة، أو زعيماً لحزب، أو رئيساً لمجلس الشيوخ، أو محامياً في قاعات المحاكم. (أرشيف ملتقى أهل الحديث - ٤،

حياة محمد حسين هيكل: مساهمته في الأدب والرواية
[মুহাম্মদ হুসাইন হায়কল-এর জীবনী : সাহিত্য ও উপন্যাসে তাঁর অবদান]

تم تحميله في: المحرم ١٤٣٢ هـ = ديسمبر ٢٠١٠ م، هذا الجزء يضم: **خزانة الكتب والأبحاث**، قسم المكتبة الشاملة، قسم المخطوطات، قسم البرمجيات الإسلامية، ج ٤٩، ص ٣٧٢).

مساهمته في الرواية

وقد أكد على أن العرب كانوا يميلون إلى القصص القصيرة في الماضي بسبب حبهم للإيجاز، إلى أن جاء العصر الحديث، وترجموا النمط القصصي الجديد المعروف بالرواية، وبدأ هذا الشكل في الظهور في الأدب العربي، وكانت أول قصة عربية حديثة هي قصة زينب لمحمد حسين هيكل. (عبد الرحمن أبو عوف، **بحوث ودراسات من موقع الإسلام اليوم**، (د.ت)، ج ١، ص ٢٨).

كانت القصة الطويلة حظيت في النصف الأول من القرن الحاضر بخمسة من كتاب مصر الكبار هم: المازني والعقاد ومحمد حسين هيكل وطه حسين ومحمود تيمور. (مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة - الأعداد ٨١ - ١٠٢ العدد ١٤، ص ١٣٣).

وكتب وهو في باريس "قصة زينب" وهي أول محاولة قصصية بارعة في أدبنا، عمد فيها إلى وصف حياة الريف والفلاحين بصورة لم يسبقه فيها أحد من المصريين. (شوقي ضيف، ص ٢٧١).

أسلوب هيكل

من خلال مقالاته العديدة تبدو ملامح أسلوبه السياسي العنيف في الدفاع من الحرية والعدل والقانون، وهو أسلوب مرتب ترتيباً دقيقاً، نظراً لدراسته وثقافته القانونية، وأهم ما يميزه السمات التالية:

١. كثرة المقدمات بشكل يلفت النظر في المقال الأدبي والسياسي على حد سواء نتيجة لدراسة القانون، وممارسة البحث العلمي.

٢. صب الأفكار في قالب موضوعي، يعتمد على تحليل الجزئيات، حتى ينتهي لنتيجة حتمية دون إحساس بفتور أو ملل.

٣. يخضع للتقسيم والتحليل والتعليل، وتقديم المقدمات، واستخلاص النتائج.

٤. يجمع بين موضوعية العلم وذاتية الفن، ولذا يحس القارئ بلذّة العقل والذوق معاً.

٥. الجنوح إلى التنظيم والتنسيق الفكري، ما يكشف عن شخصيته.

٦. شيوع الاستطراد في معظم كتاباته، واتخاذ وسيلة لتوضيح الأفكار والتدليل على صحتها، ما يعرب عن اتساع ثقافته. (السيد مرسى أبو ذكري، ص ٢٣٩).

رواية زينب

يحكي الكاتب في هذه الرواية قصة زينب الفتاة المصرية البسيطة القروية التي أحبت إبراهيم الفلاح البسيط الذي يعمل معها في مزرعة السيد محمود، وكان إبراهيم يعبر لها عن مدى حبه لها، لكنهما لم يتمكن من إتمام هذا الحب والزواج لأنّ والدي زينب قررا تزويجها من شخص غني لا تحبه لأنه يستطيع أن يقدم لها المهر وليس كحبيبها الفلاح الفقير، وبالرغم من ألمها وحزنها للبعد والفراق عن حبيبها غير أنّها استسلمت لرغبة والديها.

كما يُذكر الكاتب قصة حامد وحبّه لابنة عمه عزيزة لكنه لم يستطع الزواج بها، ويلتقي مع زينب لفترة وجيزة، فهي من الفتيات اللواتي كان يغازلهنّ حامد لكنه لم يتزوجها، فيعيش حالة من اليأس والإحباط.

(<https://khaerjalees.com/h/%D8%AA%D8>)

كتب هيكل هذه القصة "أول رواية في العربية" نشرت ١٩١٣م كان عنوانها الكامل باللغة العربية "زينب: مناظر وأخلاق ريفية" تصوّر الرواية الحياة في الريف المصري ويتناول العلاقات الزوجية والرومانسية التقليدية بين الرجل والمرأة والتفاعلات بين عمال القطن وأصحاب المزارع. وهو يدرس القانون بباريس، ونراه يقول في مقدمتها: إنّها "ثمرة الحنين للوطن وما فيه، صوّرها قلمٌ مقيمٌ في باريس مملوء مع حنينه لمصر إعجاباً بباريس وبالأدب الفرنسي". وتتخلص حوادث القصة في أن فتى متعلماً يسمى حامداً من أبناء أعيان الريف أحب ابنة عم له تسمى عزيزة، ومنعته تقاليد الريف من الاعتراف لها بحبه، وفوجئ بزواجها. وبحث عن سلوى لحبه فوجدها عند زينب الجميلة، إحدى الأجيال اللائي يشتغلن في حقْل أبيه، وشعرت بحبه لها؛ ولكنها رأت أن زواجها منه غير ممكن لما بين أسرتها وأسرته من فروق اجتماعية، فمنحت قلبها شاباً من وسطها وعلى شاكلتها. وتلعب التقاليد الريفية العتيقة دورها، فلا تبوح الفتاة بحبها لأهلها، وترضخ لرغبتهم في قرانها من

حياة محمد حسين هيكل: مساهمته في الأدب والرواية
[মুহাম্মদ হুসাইন হায়কল-এর জীবনী : সাহিত্য ও উপন্যাসে তাঁর অবদান]

شاب لم تكن تحبه؛ بينما يرحل محبوبها إبراهيم إلى السودان عاملاً في الخدمة العسكرية. ويترك حامد القرية إلى القاهرة لبدأ حياة جديدة، على حين تقع زينب فريسة لآلام نفسية كثيرة، تفضي بها إلى مرض ذات الرئة، ويقضي عليها هذا المرض. والقصة تعرض علينا في أثناء ذلك الريف المصري بعاداته وتقاليده وبساطة أهله ومحاسن حياتهم ومسائرها وما زانَ عليها من اعتقادات في الجن والشياطين ومشايخ الطرق. ونقل ذلك هيكل نقلاً دقيقاً؛ بحيث تمثل قصته واقع حياة الريف المصري في أول القرن تمثيلاً صادقاً. ونراه يقف كثيراً لينقد هذا الواقع، وما فيه من نظم اجتماعية غير متسقة، وخاصة من حيث الزواج، وأن المرأة ليس لها رأي في اختيار زوجها وشريك حياتها. ونشعر هنا بتزايد المؤلف لآراء قاسم أمين ودعوته إلى تحرير المرأة. (شوقي ضيف، ص ٢٧٥).

وهذه رواية ألفها محمد حسين هيكل حين أقامته بباريس ١٩١٠ وأرسلها حلقات إلى أستاذه أحمد لطفي السيد، فكان ينشرها في صحيفة "الجريدة" تصور القصة طبقات الريف المصري، وما يقوم بينها من عوائق اجتماعية، وتكشف النقاب عن استيعاب طبقة الفلاحين والأجراء، الذين يكدحون في سبيل لقمة العيش، وما يقيم رمقهم، ويسد أودهم. وتعتبر أول قصة طويلة فنية من الأدب التحليلي الواقعي، تتضح فيها دعوة قاسم أمين لتحرير المرأة. (السيد مرسي أبو ذكري، ص ٩٩).

مميزات رواية زينب

١. يلاحظ بعد قراءة رواية زينب أنها اتسمت بعدد من السمات والخصائص الفنية، منها على سبيل الذكر لا الحصر ما يأتي:

٢. التخلص من سيطرة السجع وأسلوب المقامات الذي كان شائعاً في فترة ما قبل كتابة هذه الرواية.

٣. استخدام الكثير من الألفاظ والعبارات العامية.

٤. استخدام بعض الإيحاءات التعبيرية التي تُصف منظر الريف وأخلاق الريفيين.

٥. الوصف الدقيق للمجتمع المصري وطبيعته، خاصة الريف المصري.
٦. الاعتماد على المرجعية الاجتماعية في رسم الشخصيات.
٧. التخلص من سيطرة السجع وأسلوب المقامات الذي كان شائعاً في فترة ما قبل كتابة هذه الرواية .
٨. استخدام الكثير من الألفاظ والعبارات العامة.
٩. استخدام بعض الإيحاءات التعبيرية التي تُصِف منظر الريف وأخلاق الريفيين.
١٠. الوصف الدقيق للمجتمع المصري وطبيعته، خاصة الريف المصري.
١١. تأليف القصة الطويلة على النمط الأوربي. (مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة . الأعداد (٨١ - ١٠٢) العدد: ١٣، ص ١٢٣).
١٢. وفي الحق أنه نجح إلى أبعد حد في وصف حياة القرية المصرية.
١٣. وكثير من صفحات قصته يتحول إلى ما يشبه لوحات بديعة، كهذه اللوحة التي عرض فيها صراع حامد النفسي إزاء بَوَحه لابنة عمه بحبه.
١٤. تأثر هيكل في وضع هذه القصة بما قرأه من القصص الفرنسي، ويتبين ذلك في تصويره زينب، فقد جعلها رقيقة أكثر مما ينبغي لفتاة ريفية ساذجة، واختار لها وسيلة تتخلص بها من آلام حبها هي مرض السل، طبقاً لنموذج بعض القصص الفرنسية التي قرأها، والتي تتخذ هذه الوسيلة لتخليص العاشقات المعذبات، وتحريرهن من عذابهن وآلامهن. (شوقي ضيف، ص ٢٧٥).
١٥. يرى النقاد أن الكاتب المبدع محمد حسين هيكل تأثر إلى حد كبير بالفكر الرومانسي، خاصة الفيلسوف جان چاك روسو، وقد بدا ذلك جلياً في رواية "زينب" التي تعد أول رواية عربية باتفاق النقاد،

حياة محمد حسين هيكل: مساهمته في الأدب والرواية
[মুহাম্মদ হুসাইন হায়কল-এর জীবনী : সাহিত্য ও উপন্যাসে তাঁর অবদান]

حيث تدور أحداث الرواية داخل ثنائية (المجتمع/الطبيعة) هذه الثنائية تتجلى بصورة واضحة في شخصيات الرواية.

١٥. وهي رواية تصور الرواية الحياة في الريف المصري ويتناول الكاتب العلاقات الزوجية والرومانسية التقليدية بين الرجل والمرأة. (https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsb2q1q74_1lefWbN9)

الشخصيات الرئيسية

دارت أحداث رواية زينب بين عدد من الشخصيات الرئيسية، وهي:
زينب: هي بطل الرواية والشخصية التي تؤدي دورًا أساسيًا ومحوريًا في أحداثها، وهي فتاة مصرية جميلة تعيش في إحدى القرى الريفية في مصر مع والدها وأخيها وأختها، تعمل في مزرعة السيد محمود وتتعرف على ابنه الشاب (حامد) وتُعجب به.
حامد: يعدّ من الشخصيات المهمة في الرواية، وهو الابن الأكبر للسيد محمود، كان يحب البقاء في البلد وبين الناس، على عكس إخوته الذين كانوا يفضلون التنقل في المزارع، ويشار إلى أنّ حامد يُعجب بجمال زينب وأخلاقها لكنه لا يتزوجها.

الشخصيات الثانوية

دارت أحداث رواية زينب بين عدد من الشخصيات الثانوية، وهي:
إبراهيم: هو أحد العاملين في مزرعة السيد محمود، وهو مسؤول عن الفلاحين وشؤونهم، يقع في حب زينب لكنه لا يتزوجها، وفي ما بعد يسافر للخدمة العسكرية تاركًا بصمته في حياة زينب.
حسن: يعد حسن شخصية بسيطة من عائلة غنية، يعمل في أحد المزارع الموجودة في قريته.
عزيزة: هي ابنة عم حامد، الذي أحبها لكنه لم يتزوجها، وكانت عزيزة تأتي في زيارة إلى القرية للراحة والابتعاد عن فوضى المدينة.

السيد محمود (والد حامد): يعد من كبار رجال القرية وشيوخها وأحد الأغنياء المصريين، يملك مزرعة كبيرة لتنقية القطن، ويمثل السيد محمود الشخصية الطيبة والحنونة في الرواية. خليل (والد حسن): هو من رجال

القرية وشيوخها، يعيش في منزل كبير مع أفراد عائلته، ويقرر أن يزوج ابنه حسن من زينب. والد زينب ووالدتها: هما من ربّا أمر زواج ابنتهما زينب من حسن. (<https://khaerjalees.com/h/%D8%AA%D8>)

نتائج البحث

١. محمد بن حسين هيكل أدي شهير وصحافي، وروائي ومؤرخ وسياسي مصري كبير، وكاتب، وباحث.
٢. ولد محمد بن حسين في ٢٠ أغسطس ١٨٨٨م الموافق ١٢ ذو الحجة ١٣٠٥هـ في قرية كفر غنام في مدينة المنصورة، محافظة الدقهلية، مصر.
٣. حصل على الدكتوراه في الحقوق من السربون بفرنسة ١٩١٢م وافتتح مكتباً للمحاماة بالمنصورة.
٤. اشتغل محمد حسين هيكل بالمحاماة في مدينة "المنصورة". ومنذ سنة ١٩١٧م.
٥. قال سفر بن عبد الرحمن: وممن أنكر الإسراء والمعراج مُحَمَّد حسين هيكل نص ذلك في كتابه حياة محمد، ثم تاب عنه.
٦. من مؤلفاته «حياة محمد»، و«أضواء على السنة المحمدية أو دفاع عن الحديث»، وفي منزل الوحي، وثورة الأدب، والصديق أبو بكر رضي الله عنه. والفاروق عمر، وعشرة أيام في السودان، وولدي، وتراجم شرقية وغربية وفي أوقات الفراغ. وجان جاك روسو. وثلاث قصص، هذي (زينب) و(أبيس) و(هكذا خلقت) و(الإمبراطورية الإسلامية) وغير ذلك.
٧. توفي يوم السبت ٥ جمادى الأولى ١٣٧٦ هـ الموافق ٨ ديسمبر ١٩٥٦م عن عمر يناهز ٦٨ عاماً.
٨. روايته المسماة زينب أول رواية في العصر الحديث.

حياة محمد حسين هيكل: مساهمته في الأدب والرواية
[মুহাম্মদ হুসাইন হায়কল-এর জীবনী : সাহিত্য ও উপন্যাসে তাঁর অবদান]

المراجع والمصادر:

١. الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الدمشقي (المتوفى: ١٣٩٦هـ)، **الأعلام**، الناشر: دار العلم للملايين، أيار/مايو ٢٠٠٢م.
٢. شوقي ضيف، أحمد شوقي عبد السلام ضيف (المتوفى: ١٤٢٦هـ)، **الأدب العربي المعاصر في مصر**، الناشر: دار المعارف، الطبعة: الثالثة عشرة.
٣. سفر بن عبدالرحمن الحوالي، **شرح العقيدة الطحاوية**، د.ت.
٤. السيد مرسي أبو ذكري، **المقال وتطوره في الأدب المعاصر**، الناشر: دار المعارف، الطبعة: ١٩٨١ - ١٩٨٢م.
٥. مشاري سعيد المطرني، **آراء محمد رشيد رضا العقائدية في أشرار الساعة الكبرى وآثارها الفكرية**، (الكويت: مكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع، ١٤٣٥هـ - ٢٠١٤م).
١. **أرشيف منتدى الألوكة - ٤**، تم تحميله في: المحرم ١٤٣٢ هـ = ديسمبر ٢٠١٠ م، هذا الجزء يضم: أخبار الكتب.
٦. أحمد محمد شاكر، **جمهرة مقالات العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر**، الناشر: دار الرياض، ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م.
٦. عمر الدسوقي، **في الأدب الحديث**، الناشر: دار الفكر العربي، الطبعة: الجزء الأول ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠م.
٧. علي بن نايف الشحود، **موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة ١-٢٩**، الباحث في القرآن والسنة.

٨. أرشيف ملتقى أهل الحديث - ٤، تم تحميله في: المحرم ١٤٣٢ هـ = ديسمبر ٢٠١٠ م، هذا الجزء يضم: خزانة الكتب والأبحاث، قسم المكتبة الشاملة، قسم المخطوطات، قسم البرمجيات الإسلامية.
٩. عبد الرحمن أبو عوف، بحوث ودراسات من موقع الإسلام اليوم، (د.ت).
١٠. مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة. الأعداد (٨١ - ١٠٢) .

استراتژی‌های داستان پردازی در گلستان شیخ سعدی

(শেখ সাদির গুলিস্তানে গল্প বলার কৌশল)

ড. মো. নূরে আলম*

প্রতিপাদ্যসার: প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন মহা মনীষী সাধারণ মানুষকে বাস্তব অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন উপাখ্যান, গল্প ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনার মাধ্যমে উপদেশ প্রদান করতেন। তাঁদের মধ্যে পারস্যের কবি শেখ সাদি ছিলেন অন্যতম। তিনি *গুলিস্তান*-এ এমন কিছু কাহিনী বর্ণনা করেছেন যা *তাওরাত*, *বাইবেল*, *কোরআন* এবং মহানবী (সা)-এর হাদিসে বিদ্যমান রয়েছে। নীতিগ্ৰন্থ হিসেবে সাদির গুলিস্তান সারা বিশ্বে খ্যাত। এ গ্রন্থটির আবেদন প্রতিটি সময় ও যুগের সাথে সম্পর্কিত যা নিয়ে গবেষণার ব্যাপক অবকাশ রয়েছে। মানুষের চারিত্রিক উৎকর্ষতা, সামাজিক মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সাদির গুলিস্তান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গুলিস্তানে স্বল্প বাক্যে ব্যাপক বক্তব্য, গল্প লেখার পদ্ধতি, গল্পের মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষা, প্রাচীন গল্পগুলোর পদ্ধতিগত কাঠামো, সময়ের গুরুত্ব ইত্যাদি পর্যালোচনার মাধ্যমে সাদির গুলিস্তানে গল্প বলার কৌশল আলোকপাত করা এ প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

مشرف الدین مصلح بن عبد الله سعدی شیرازی یکی از ستاره‌های درجه اول آسمان ادب ایران است که نظم و نثر بدیع او زبان فارسی را با علی درجه قصاحت رساند و بهتر نمونه بلاغت را پرداخت. (شفق، ۲۶۳) سعدی بی تردید بزرگ‌ترین شاعری است که بعد از فردوسی آسمان ادب فارسی را به نور خیره کننده خود روشن ساخت و آن روشنی با چنان نیرویی همراه بود که هنوز پس از گذشت هفت قرن تمام از تأثیر آن کاسته نشده است، و این اثر تا پارسی برجای است همچنان برقرار خواهد ماند. زبان استادانه فصیح او زبان دل و عشق و محبت و او خود نشانه تمام عیاری است از «آدمیت» به همان معنی بسیار کاملی که بیان کرده است. (صفا، ۵۸۴-۵۸۶)

سعدی، از نابغه‌هاست که چه در عالم لفظ و چه در عالم معنی و چه در بررسی اندیشه‌اش، خطی بر او فرو نتوان کشید. زیرا، اگر سخنی به ایجاز گفته است، اندکی از معنی را فرونگذاشته است و مختصرتر از آن نیز نتوان گفت و اگر واژه‌ای ناموزون به کار گرفته است، چنان آن را در جمله جای داده است که نه تنها خللی بدان وارد نیآورده است، که عالمی زیبایی بدان بخشیده است. (کاسب، ۱۶۲)

*সহযোগী অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

استراتژی‌های داستان پردازی در گلستان شیخ سعدی

(শেখ সাদির গুলিস্তানে গল্প বলার কৌশল)

سعدی در سفر طولانی سی ساله جهانی، گلستان و بوستان را در خلاصه اخلاق نوشت. اگر انسان دارای چه صفات و مثبت در زندگی انسان باشد، معنای نام انسان و سنت خود صحیح است؛ جاه طلبی اخلاقی و شیرینی منش انسان تا چه اندازه می‌تواند او را بالا ببرد؛ در گلستان تصویر واقعی کشیده شده است. عشق به خلق، عشق به خدا و یافتن خدا در آفرینش اثر گلستان سعدی است. (سرکار، ۲۵۴)

سبک گلستان سعدی و ویژگی‌های آن : تمام گلستان که به ترتیب هشت باب است: ۱- در سیرت پادشاهان ۲- در اخلاق درویشان ۳- در فضیلت قناعت ۴- در فواید خاموشی ۵- در عشق و جوانی ۶- در ضعف و پیری ۷- در تأثیر تربیت ۸ در آداب صحبت. مانند آنچه برای نمونه آورده شد دارای نکات نغز اجتماعی و اخلاقی و تربیتی است و این مزایا است که آن کتاب را سر حلقه ادبیات جهان قرار میدهد زیرا در هر باب مطالبی عمیق و سودمند که هر یک سر مشق زندگی تواند بود مندرج است. (شفق، ۲۶۳) وی از طریق داستان در کتاب گلستان خود موعظه کرد.

گلستان سعدی یک متن فارسی معتبر با سبکی متمایز است. حکایات منثور یکنواخت، ایجاز بیان، جملات ساده و کوتاه، شخصیت‌های کم و غلبه عناصر دیالوگ از جمله نمونه‌های موفق «مینی مالیستی» در ادبیات کلاسیک فارسی است. برخی از ساختارهای داستانی گلستان شبیه معیارهای داستانی «مینیمالیستی»^۱ است. این داستان‌های حاوی عناصر داستانی را می‌توان با معیارهای ادبیات داستانی امروز به کوتاه ترین شکل سنجید و تحلیل کرد.

سبک گلستان سعدی را می‌توان در مجموع عراقی دانست. این اثر با نثری فنی و مسجع و همچنین با تکیه بر سبک شخصی سعدی نوشته شد، همین ویژگی باعث تمایز جدی گلستان از سایر کتب ادبی نظیر آن گردیده است. سبک عراقی از نظر زبانی و کاربرد واژه ها با سبک خراسانی متفاوت است، شعر سعدی دارای ویژگی‌های متمایزی است. زبان و رفتار او ساده و پویا است و با معیارهای کامل فصاحت و بلاغت نوشته شده است. (شمیسا، ۲۱۶) سبک شعری او ساده است، زیرا به شاعران سبک سرودن خراسانی گرایش داشت. او به شاعران سبک ساده توجه داشت. از فنون ادبی کم استفاده می‌کرد و جایگاه مخاطب را در همه جا در نظر داشت. او به دلیل ماهیت هنری اشعار و زبان ساده و روان آنها، معلم روش‌های ساده و روان به شمار می‌رود. به دلیل سادگی و غیر رسمی بودن زبانش، انتخاب واژگان او در شعر طبیعی به نظر می‌رسد و سبکی متمایز در شعر او محسوب می‌شود. تأثیر روانی شعر سعدی بی نظیر است. زیرا خواننده می‌تواند به سرعت با او ارتباط برقرار کند. خواننده پاسخی جز ابراز تحسین

و تعجب ندارد. ساختار دستوری در *گلستان* سعدی حاوی نوعی محتوای عاطفی است. همچنین شامل توصیفی از انواع تجربیات متنوع است. گاهی از اتحاد می‌گفت، گاهی از جدایی؛ گاهی ابراز غم و گاهی ابراز شادی می‌کند. مهارت و تبحر سعدی در ادبیات فارسی به حدی بود که به راحتی و بدون زحمت می‌توانست هر نوع تجربه‌ای را در قالب شعر بیان کند. *گلستان* او بهترین نمونه است. اگرچه این کتاب یک کتاب تعلیمی و اخلاقی است، اما حاوی بهترین تزیینات ادبی و سبک ادبی است. قصیده‌های سعدی سبک شعری مشخصی دارند. به جای مدح و ثناء، نصیحت و نصیحت می‌کرد. گاهی اوقات از چیزهای معنوی به زیبایی استفاده می‌شود. زبان ساده و روان سعدی با اندیشه‌ها و مضامین جدید تحولی در ترکیب قصیده ایجاد کرد که در زمان او کم نظیر بود. (سراجی و عیسی شاهدی، ۹۰-۹۲) در کتاب *گلستان* با بیان داستان‌های مختلف توصیه‌هایی کرده است. او در اشعار *گلستان* در کنار واژه‌های فارسی از واژه‌های عربی نیز استفاده کرده است. در بیشتر نقاط *گلستان* از آیات قرآن هم استفاده می‌کرد.

گلستان سعدی، مخزن اخلاق است. او در داستان‌های مختلف *گلستان* از عظمت خداوند یاد می‌کند. اگر کسی با پدر بد رفتار کند، پدر از او ناراضی است. اگر غلام کار نکند، ارباب او را دوست ندارد؛ اگر سربازان از دستورات شاه اطاعت نمی‌کردند، شاه آنها را برکنار می‌کرد. اما خداوند از هیچ کس با نارضایت از رزق و روزی دریغ نمی‌کند. (المؤمن، ۳)

داستان : داستان یکی از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین قالب‌های ادبی با حضور فعال و مؤثر در نظم و نثر است. هدف داستان علاوه بر سرگرمی، ایجاد جامعه‌ای شاد و ایده‌آل با افراد تکامل یافته است و به همین دلیل جنبه‌های مختلف شادی و شفا و تکامل و انحطاط نسل‌ها را در قالب داستان منعکس می‌کند. «حکایت نوعی داستان ساده و غالباً مختصر واقعی یا ساختگی است که مناسب برای بیان حکمت و پند و اندرز به طرز موجز می‌باشد» (رزمجو، ۱۹۲)

استراتژی‌های داستان پردازی در *گلستان* سعدی

سبک نگارش سعدی، لحن منحصر به فرد، هنر بدون تقلید سروده شده است. او نویسنده‌ای خلاق است که هوشمندانه هر کلمه را در جای خود قرار می‌دهد و داستان‌های کوتاه ساخت و تا آنجا که تکنیک‌های داستانی پیش می‌رود، شاهکاری ماندگار در خاطره‌ها به جا گذاشته است. این شیرین‌ترین نثر فارسی *گلستان* هنرمندانه، آموزنده و موجز ساخته شده است. نغمه روان، خوش آهنگ، زبان خوش، شیوایی و حکمت عصر او در این اثر جاودانه تجسم یافته است.

استراتژی‌های داستان پردازی در گلستان شیخ سعدی

(শেখ সাদির গুলিস্তানে গল্প বলার কৌশল)

تمرکز بر تأثیرات داستان نویسی در این کتاب از منظر عناصر داستانی نشان می‌دهد که نویسنده بر دانشی پایدار از سبک داستان و روایت هنری و استفاده از منابع علمی و مستند فراوان بنا نهاده است که در این کتاب گرانبها نهفته است و راز ماندگاری، پذیرش و جهانی شدن آن نیز به این صنایع بستگی دارد. آثار سعدی، به‌ویژه گلستان، با جهانی بودن، برای مردم از هر سن و طبقه، با هر سلیقه و سنی جذابیت خاصی داشته است. در مدارس معمولاً بعد از متون دینی گلستان خوانده می‌شود. اهمیت و مقبولیت این شاهکار ادبیات فارسی در بین اقشار مختلف مردم وجود دارد. مجموعه حکایات آن لذت بخش و روشنگر است. اگر ادعا کنیم که او فصیح‌ترین خطیب و فصیح‌ترین نویسنده است، قولی است که صادق است.^۱ (فروغی، دوازده) هر معانی را در عبارتی بیان می‌کرد که بهتر، زیباتر و موجزتر نمی‌توانست باشد. از دیدگاه هنری، الگوهای داستانی حکایات گلستان، نشان‌دهنده قانونمندی این نوع ادبی در گذشته است.

در این جستار، مهم‌ترین عناصر داستانی گلستان مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد تا قواعد داستان نویسی توسط هنرمندان و نویسندگان معاصر مشخص شود و عبارات توصیفی کلاسیک به اختصار و حجم کم با توجه به موقعیت مناسب و موقعیت فعلی توجه ویژه‌ای داشتند. «سبزیان‌پور، ۹۵» در «کلیله و دمنه»، «تذکره الاولیا»، «اسرار التوحید»، «مقالات شمس»، «مرزبان‌نامه»، «فیه ما فیه»، گلستان سعد و ... شاهد نمونه‌های جالب داستان‌های بسیار کوتاه هستیم که در نهایت ایجاز و سادگی، با درون مایه جذاب و شخصیت‌های اندک نگارش یافته‌اند و همین دال بر وجود جریان ادبی مینی مالیسم^۱ - که امروزه در ادبیات غرب رواج چشمگیری دارد- در آثار کلاسیک و حکایات فارسی در قرون گذشته است، به عبارتی، بهترین نویسندگان ایرانی چند صد سال پیش، پرچم‌دار کوتاه‌نوشت و کمینه‌گرایی در عرصه ادبیات منثور و منظوم بوده‌اند. (بارت، ۵۰)

در گلستان از عناصر داستانی به صورت حداقل استفاده می‌شود تا خواننده در کمترین زمان ممکن پیام را بفهمد. مزیت دیگر این اثر گرانبها و رمز و راز خرمی جاودانه آن برای علاقه‌مندان آشکار می‌شود. از مجموع ۱۷۸ حکایت گلستان، قریب به ۸۰ حکایت بسیار کوتاه وجود دارد که از بسیاری جهات، قابل انطباق با داستان‌های مینی مالیستی^۲ ادبیات غرب است؛ یعنی ادبیات کلاسیک ما ضرورت داستان مینی‌مال و موجز را دریافته و در آثار کهن فارسی به کار بسته است که ساختار داستانی برخی از این حکایات با معیارهای نقد نوین داستان‌های امروزی قابل بررسی است.

مهم‌ترین عناصر داستانی در گلستان

شخصیت

اشخاص ساختگی داستان را شخصیت داستانی گویند که مهمترین عناصر داستان و ایجاد ذهن نویسنده است. (میرصادقی، ۱۹۹) «این عنصر مهم داستانی، پیرنگ را استوارتر و درون مایه را جذاب تر می‌کند و مهم ترین عنصر انتقال دهنده تم داستان و عامل طرح داستان، شخصیت داستانی است.» (یونسی، ۲۵) در واقع نویسنده عواطف و افکار خود را از طریق شخصیت‌های داستان بیان می‌کند و به پیام داستان عینیت و جان و روح می‌بخشد و در هر اقدامی اعمال شخصیت‌ها زنجیره‌ای از رویدادها را ایجاد می‌کند.

«شخصیت داستانی معمولاً انسانی است که به درخواست نویسنده وارد صحنه داستان می‌شود و با تکنیک‌های مختلف نویسنده ویژگی‌های خود را برای خواننده آشکار می‌کند و کنش‌های مورد نظر نویسنده را انجام می‌دهد و سرانجام از صحنه داستان بیرون می‌رود» (اخوت، ۱۲۵) محدود بودن شخصیت، ویژگی مهم حکایت‌های کهن و داستانک‌هاست.

شخصیت پردازی

خلق شخصیت‌هایی که ویژگی‌های اخلاقی و روانی در اعمال و آنچه می‌گویند و انجام می‌دهند و به صورت مردم عادی ظاهر می‌شوند، شخصیت پردازی می‌گویند. نویسنده برای اینکه بتواند شخصیت‌های زنده و قابل ربط را ارائه دهد باید به موارد زیر توجه کند:

۱. شخصیت‌ها در رفتار و خلیات خود ثابت قدم باشند.
۲. شخصیت‌ها باید پذیرفتنی و واقعی جلوه کنند.
۳. برای اعمال خود انگیزه معقول داشته باشند. (میرصادقی، ۲۰۰)

روش‌های شخصیت پردازی

نویسنده خصوصیات جسمی و روحی شخصیت‌های داستان را گاهی مستقیماً و به یکی از روش‌های زیر بیان می‌کند: از زبان خود شخصیت، از زبان شخص دیگر، از زبان راوی و یا تلفیقی از سه روش قبل و گاه با شخصیت پردازی غیر مستقیم که عوامل کنش، گفتار، نام، محیط و وضعیت ظاهری در آن دخیل‌اند.

استراتژی‌های داستان پردازی در گلستان شیخ سعدی

(শেখ সাदিক গুলিস্তানে গল্প বলার কৌশল)

بعد اصلی شخصیت اندیشه اوست که قابل لمس و درک نیست ولی اعمال و گفتارش به نوعی ابعاد درونی او را نشان می دهد. شخصیت داستانی را ذهن نویسنده خلق می کند. «همین نکته، نویسنده را صفتی خداگونه می دهد و او را دچار تجربه ای غریب اما لذت بخش می کند.» (مستور؛ ۳۴) خالق اثر گاه با کمک تخیل شخصیتی را خلق می کند که بار اصلی داستان را به دوش می کشد و می تواند به ذائقه خوانندگان پاسخ دهد و این نیاز به شخصیتی قوی و جذاب دارد. این بدان معناست که شخصیت ها باید به گونه ای باشند که اعمالشان ناشی از ویژگی های روحی، فکری و اخلاقی آن ها باشد. (موام، ۱۰) در دنیای داستان، همه با انواع آدم ها و شخصیت ها، مانند محیط اطراف، با تیپ های شخصیتی متفاوتی که در یکدیگر منعکس شده اند، سر و کار دارند.

انواع شخصیت های پردازی

شخصیت یا قهرمان اصلی یا محوری، شخصی است که در مرکز داستان قرار دارد و نویسنده سعی می کند توجه خواننده را به او جلب کند. (موام، ۲۰۰) حکایت ها و داستان های کوتاه قدیمی به دلیل فرم کوتاه خود تک شخصیتی یا دارای چند شخصیت هستند و از نظر تغییر و تحول به دو دسته تقسیم می شوند:

شخصیت ایستا شخصیتی است که در داستان تغییر نمی کند یا اندک تغییری می پذیرد و در پایان داستان همان گونه است که در آغاز داستان بوده است و حوادث داستان در او اثر نمی کند و یا تأثیر چشمگیر ندارد. قصه ها و داستان های کوتاه و حکایت ها از این گونه اند؛ یعنی شخصیت های ایستایی دارند و دگرگونی کمی می پذیرند. (موام، ۲۰۰)

شخصیت پویا شخصیتی است که در طول داستان دستخوش تغییر و تحول شود و جنبه ای از خصیت، عقاید جهان بینی یا خصلت و خصوصیت فردی او تغییر کند و ممکن است این تغییر عمیق باشد یا سطحی، پردامنه یا محدود، در جهت تعالی پیش رود یا تباهی. (موام، ۲۰۱)

شخصیت ها براساس رفتار و گفتارشان، در گونه های مختلف دسته بندی شده اند که در اینجا به چند مورد مهم اشاره می شود.

شخصیت قالبی شخصیتی که نسخه بدل یا کلیشه شخصیت دیگری است. او هویت خود را ندارد، ظاهرش آشناست، گفتارش قابل پیش بینی است، اعمالش مشخص است و بر اساس الگو رفتار می کند. مثل کسی که تظاهر به نادانی می کند. شخصیت هایی که می توان واژه «نما یا مأب» را پشت سر آن ها

استراتژی‌های داستان پردازی در گلستان شیخ سعدی

শেখ সাদির গুলিস্তানে গল্প বলার কৌশল

آورد مثل روشن فکر نما، مقدس نما، فرهنگی مأب، لردمأب، شخصیت قراردادی که به شخصیت قالبی بسیار نزدیک است از نمایش‌های سنتی گرفته شده و در قصه‌های قدیمی دیوها، پری‌ها، غولها، جادوگرها، عیارها، وزیرها و... را گویند. (همان: ۲۰۳)

شخصیت نوعی یا تیپ «بیانگر خصوصیات گروهی از مردم است که آن را از سایر طبقات متمایز می‌کند و نمونه‌ای از افراد آن گروه است؛ مانند اساتید گنج، وکلای حيله‌گر» (همان: ۲۰۵) در *گلستان* درویشی، نجیب، خوش قلب، جوان، صاحب‌دلی، زنی، دانشمند، دوست، مددکار، پارسایی، منجمی و... از این گونه اند. تیپ شخصیتی بر اساس یکی از معیارهای زیر است:

نام شغل: قاضی، نعل‌بندی، مشت‌زنی، بازرگانی، خطیبی، حکیمی، یکی از وزرا، یکی از فضلا، معلم کتابی، شتربان، بیطار.

صفت: طایفه دزدان، غافلی، مردم آزاری، ظالمی، شیادی، پارسایی، صیادی، دزدی، عالمی، ابلهی، ناخوش‌آوازی، پیری، توانگری، گدایی.

نام شهر یا محل: هندوی، اعرابی‌ای، درویش خراسانی، خواننده‌ای مغربی، بزازان حلب، مردم قریه.

شخصیت‌های دارای اسم خاص

پادشاهان و خلفا و وزرا: هرمز، انوشیروان، بزرگمهر، اسکندر رومی، هارون الرشید، عمرولیث، حجاج یوسف، ملک زوزن، اردشیر بابکان، سلطان محمود، محمد خوارزم‌شاه.

پیامبران: یحیی (ع)، موسی (ع).

عرفا: ذوالنون مصری، عبد القاد گیلانی، ابو الفرج بن جوزی.

شخصیت‌های قرآنی: لقمان، قارون.

برخی شخصیت‌های معروف: حاتم طایی، جالینوس، سبحان وائل، حسن میمندی.

شخصیت‌های داستان *گلستان* شخصیت‌هایی ساده، ایستا و فعال هستند و قالب باریک داستان، هر فرصتی را از آنها سلب می‌کند تا شخصیت را پرورش دهند و با یکی دو کلمه او را به خواننده منتقل کنند. (بی‌انصافی پادشاه: ۳۸/مهابت هرمز: ۳۶/حرص سبکتکین: ۲۸/عدل نوشینران: ۴۷/و...) و گاه پیام یک حکایت، محور و اساس داستان را پی‌ریزی می‌کند.

در باب اول *گلستان* (زندگی نامه شاهان) شامل ۴۱ حکایت، یک حکایت با یک شخصیت، ۲۱ حکایت با دو شخصیت، پانزده حکایت با سه شخصیت، دو حکایت با چهار شخصیت، یک حکایت با پنج شخصیت

استراتژی‌های داستان پردازی در گلستان سعدی

(শেখ সাদির গুলিস্তানে গল্প বলার কৌশল)

است، یکی حکایت شش شخصیتی آمده است. داستانک‌های مورد بررسی در این مقاله نیز بیشتر دو یا سه شخصیتی‌اند.

در این فصل شخصیت اصلی یا شاه یا خلیفه است که نام آنها به دو صورت عام و خاص آمده است. یازده تا از داستان‌ها دارای شخصیت واقعی با نامی خاص است. (محمود سبکتکین، آغلمش، هرمز، حجاز یوسف، نشیروان عادل، ذوالنون مصری، بزرجمهر، هارون الرشید، اسکندر روم و دیگران. تصویری که از پادشاهان گلستان در ذهن خواننده شکل می‌گیرد غالباً تصویر مدیران و مدبر، آگاه به دولت، با تجربه است که از ویژگی‌های آن بی‌حرمتی و بی‌عدالتی، ظلم و شهوت است و عدم دوستی و بطالت در امور دولتی و گاه ملایم، بردبار و بخشنده، توجه و دوست داشتنی به موضوع، گوش دادن به وزیر ناصح و کردار و... که خواننده آن‌ها را از توصیف مستقیم شخصیت‌ها از سوی نویسنده دریافته است.

در این حکایت سعدی با معرفی شخصیت به کوتاه‌ترین شکل ممکن جوهره شخصیت را بیان کرده است: «ابلهی را دیدم سمین، خلعتی ثمین در بر و مرکبی تازی در زیر و قصبی مصری بر سر. کسی گفت: سدی چگونه بینی دیبای معلم بر این حیوان الا یعلم؟ گفتم: یکی خلقت زیبا به از هزار خلعت دیبا.» (سعدی، ۱۰۳)

بسیاری از حکایت‌ها، شخصیت‌های عام یا کلی دارند (شخصیت قراردادی)؛ نظیر پادشاهی، اسیری، وزیری، سرهنگ‌زاده‌ای، غلامی، حکیمی، درویشی، صاحب‌دلی، یکی از ملوک عرب، یکی از وزرا، و... که هدف غایی نویسنده از آن، ابلاغ درون‌مایه و نشانی دادن اندیشه‌ای است که در ذهن دارد، مثل جسارت پارسا در حق ملک بی‌انصاف، در حکایت زیر. «یکی از ملوک بی‌انصاف، پارسایی را پرسید: از عبادت‌ها کدام فاضل‌تر است. گفت: تو را خواب نیمروز؛ تا در آن یک نفس، خلق را نیازاری.» (سعدی، ۳۴) کانون روایت بر پایه حدافل شخصیت و در این حکایت مینی‌مال است. (شخصیت‌ها: پادشاهی بی‌انصاف و پارسایی)

نمونه داستان گلستان سعدی:

«هرمز را گفتند: وزیران پدر را چه خطا دیدی که بند فرمودی؟ گفت: خطایی معلوم نکردم، لیکن دیدم مهابت من بر دل ایشان بی‌کران است و بر عهد من اعتماد کل ندارند؛ ترسیدم از بیم گزند خوش، آهنگ من کنند.» (سعدی، ۳۶)

«یکی از وزرا پیش ذوالنون مصری رفت و همت خواست که روز و شب به خدمت سلطان مشغولم و به خیرش آمیدوار و از عقوبتش ترسان. ذو النون بگریست و گفت: اگر من خدای را چنین پرستیدمی که تو سلطان را، از جمله صدیقان بودمی.» (سعدی، ۵۵)

«کسی مژده پیش انوشیروان عادل آورد و گفت: شنیدم که فلان دشمن تو را خدای برداشت. گفت: هیچ شنیدی که مرا بگذاشت؟!» (سعدی، ۵۸)

«اسکندر رومی را پرسیدند: دیار مشرق و مغرب به چه گرفتی؟ که ملوک پیشین را چنین فتحی میسر نشده. به عون خدا هر مملکتی را که گرفتم رعیتش نیاززردم و نام پادشاهان جز به نکویی نبردم.» (سعدی، ۶۱)

بیشتر شخصیت‌های داستان‌های قدیمی، به ویژه شخصیت‌های داستان‌های گلستان، شخصیت‌های ایستا هستند و تغییر خاصی در آن‌ها مشاهده نمی‌شود. به دلیل ایجاز حاکم بر داستان‌ها، گاهی داستان توسط راوی روایت می‌شود و شخصیت‌ها چندان فعال نیستند، اما شخصیت‌ها از دل جامعه انتخاب می‌شوند و مردم با اعمال و رفتار آنها آشنا می‌شوند. داستان واقعی تر به نظر می‌رسد. گاهی قهرمان داستان اسم خاصی دارد و نشان از اهمیت او دارد. در این گونه داستان‌ها، شخصیت‌ها پایگاه اجتماعی و موقعیت تأثیرگذاری دارند. یعنی یک شخصیت برجسته و معروف، رسالت انتقال پیام را بر عهده دارد که بر تأثیر و ادراک کلام در خواننده می‌افزاید.

«عبد القادر گیلانی را دیدند در حرم کعبه روی بر حصا نهاده همی گفت ای خداوند. بر من ببخشی. و اگر هر آینه مستوجب عقوبتم در قیامت نایبنا برانگیز تا در روی نیکان شرمسار نشوم.» (سعدی، ۶۸)

«موسی (ع) قارون را نصیحت کرد که: احسن کما احسن الله الیک. نشنید و عاقبتش شنیدی.» (سعدی، ۱۶۳)

«یکی از بزرگان پارسایی را گفت چه گویی در حق فلان عابد که دیگران به طعنه سخنها گفته‌اند. گفت بر ظاهرش عیب نمی‌بینم و از باطنش غیب نمی‌دانم.» (سعدی، ۶۷)

شخصیت غیر انسانی: در *گلستان* رایت و پرده، گیان و کل و طوطی و غراب نیز روایتی دارد. «این نوع حکایات را، افسانه تمثیلی یا فابل^۳ گویند.» (میر صادقی؛ ۳۳) «در ادبیات فارسی می توان فابل و پارابل^۴ را مثل یا تمثیل گفت که همیشه به وضوح، قصد تعلیم دارد.» (پورنامداریان؛ ۱۴۲)

غزل غنایی فارسی که از رودکی و فرخی آغاز شده و در دیوان ظهیر فریابی و انوری ابیوردی صیقل خورده بود در سعدی به اوج لطافت و اثر گذاری رسید و رویکردی متعالی و سیال پیدا کرد. زبان ترم و

استراتژی‌های داستان پردازی در گلستان سعدی

(শেখ সাদির গুলিস্তানে গল্প বলার কৌশল)

بی‌پیرایه و عاطقی و سادگی و از دل بر آمدگی فضای داستان سعدی را به تصرف خود در آورده است و او با این هنر خداداد دل‌های فارسی زبانان را مسخر و قلمرو سخن را ملک مسلم خود کرده است. سعدی در تمام زمینه‌های ادب فارسی یکه تاز و مدعی است. او در نویسندگی هم راه مستقل و میانه و در عین حال ممتاز و بدیعی گشوده است. کتاب *گلستان* وی در هشت باب هر چند به ظاهر خُرد و کم حجم است؛ اما در واقع، نویسندگی سخن فارسی را به حد کمال رسانده است. بسیاری از سخنان کوتاه او در این کتاب، امروز به صورت ضرب المثل، آویزه گوش و ورد زبان هر فارسی گویی شده است. همانندی اندیشه‌های سعدی با سخنان نویسندگان و شاعران اروپایی و به عبارت بهتر همانندی کار آنان با شاعر شیرین سخن فارسی، گاهی آدمی را به شگفتی وادارد و نشان می‌دهد که روح عالمگیر وی زودتر از هر شاعر و نویسنده شرقی دیگری به سراغ دنیای غرب رفته و اندیشه‌وران سرزمین‌های دیگر را شیدای سخن خویش کرده است. شاید به همین دلیل بود که *گلستان* وی خیلی زود و از سده‌های هفدهم میلادی به زبان‌های اروپایی ترجمه شد و شاعران و متفکران بسیاری از اندیشه‌های وی الهام گرفتند. هم لافونتن شاعر فرانسوی پاره‌ای از تمثیل‌های او را به نظم در آورد و هم گوته شاعر آلمانی از برخی از قطعات او الهام گرفت، چنان که ولتر و ویکتور هوگو هم با نام و آثار وی آشنایی پیدا کردند. بخشی از عشق و علاقه امرسون شاعر امریکایی هم به ادب فارسی به دلیل اعتقاد و ارتباط او با اندیشه‌های بلند سعدی است. (باحقی، ۸۳-۸۵) این مایه قبول و حسن شهرت سعدی در دنیای غرب و نزد اندیشه‌وران اروپایی از او چهره‌ای جهانی و آشنا پدید آورد تا آن جا که وقتی سازمان ملل متحد در سده بیستم ایجاد گردید دو بیت زیر که از ابیات معروف سعدی است، برسر در بنای این سازمان در نیویورک نقش بست:

که در آفرینش زیر گوهرند

دگر عضوها را نماند قرار

بنی آدم اعضای یکدیگرند

چو عضوی بدرد آورد روزگار

(سعدی، ۳۳)

نتیجه‌گیری:

از مباحث مزبور می‌توان گفت که در داستان‌های گلستان سعدی استراتژی و تکنیک یا شخصیت پردازی که وجود دارد در این مقاله توضیح شد و سبک و شیوه داستان سعدی نسبت به سایر آثار هم دوره آن و حتی آثار دیگر ادوار، همانگونه که در متن به آنها اشاره گردید برتری دارد و شایسته ستایش است. سبک زبانی سعدی منحصر به فرد و ویژه‌ی خود اوست، سادگی نثر او و در عین حال ممتنع و محال بودن آن موجب خلق اثری ارزشمند به نام *گلستان* شده است طوری که پس از گذشت قرن‌ها این کتاب هنوز در اوج قله نثر پارسی بی همتا ایستاده است. شیوه نگارش سعدی به سبک عراقی محدود نمی‌شود و علائمی از سبک خراسانی و واژگان پهلوی در آن دیده می‌شود و این ویژگی نشان می‌دهد که *گلستان* به طور کامل در حوزه سبک عراقی نمی‌باشد بلکه ویژگی‌های سبک خراسانی را نیز در خود دارد و توجه به این نکته به جذابیت بیش از پیش *گلستان* نسبت به دیگر آثار هم دوره می‌افزاید.

منابع و مأخذ

- اخؤ، احمد. *دستور زبان داستان*. نشر فردای اصفهان، ۱۳۷۱.
- بارت، جان. *چند کلمه دربارهٔ مینی‌مالیسم*، ترجمه مریم نبوی‌نژاد. فصل‌نامهٔ زنده رود، اصفهان، ۱۳۷۵.
- پورنامداریان، نقی. *رمز و داستان‌های رمزی در ادب فارسی*. انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۶.
- داد، سیما. *فرهنگ اصطلاحات ادبی*. انتشارات مروارید، ۱۳۷۸.
- رزمجو، حسین. *انواع ادبی*. انتشارات دانشگاه فردوسی، ۱۳۷۵.
- سرکار، محمد ابوالکلام. *ادبیات ترجمه فارسی در بنگلادش: ۱۹۷۱-۲۰۰۵*. انجمن آسیایی بنگلادش، ۲۰۱۵.
- سعدی، مصلح الدین. *گلستان سعدی*. (به کوشش: نور الله ایزدپرست). امیرکبیر، ۱۳۶۷.

استراتژی‌های داستان پردازی در گلستان شیخ سعدی

(শেখ সাদির গুলিস্তানে গল্প বলার কৌশল)

- سعدی، مصلح الدین. گلستان. (ویرایش گلشیری). نشر ققنوس، ۱۳۸۹.
- شفق، دکتر رضا زاده. تاریخ ادبیات / ایران. انتشارات امیرکبیر، ۱۳۴۱.
- شمیسا، سیروس. سبک شناسی شعر. انتشارات میترا، ۱۳۸۳.
- شیرازی، طارق ضیاء الرحمن؛ و عیسی شاهی. تاریخ ادبیات فارسی. انتشارات بین‌المللی الهدی، ۲۰۰۷.
- صفا، دکتر ذبیح الله. تاریخ ادبیات در ایران. جلد سوم. انتشارات فردوس، ۱۳۶۶.
- فروغی. گلستان سعدی. (تصحیح). نشر ققنوس، ۱۳۶۶.
- کاسب، استاد عزیز الله. زندگینامه شاعران / ایران. انتشارات گلی، ۱۳۸۱.
- مستور، مصطفی. مبانی داستان کوتاه. نشر مرکز، ۱۳۸۷.
- موام، سامرست. درباره رمان و داستان کوتاه. ترجمه کاوه دهگان، ۱۳۸۲.
- المؤمن، حضرت مولانا مفتی عبدالله. گلستان و بوستان حضرت شیخ سعدی (ره). انتشارات امدادیه، ۲۰۱۱.
- میرصادقی، جمال. ادبیات داستانی. انتشارات شفا، ۱۳۸۸.
- یاحقی، دکتر محمد جعفر. کلیات تاریخ ادبیات فارسی. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها و مبدع تحقیق و توسعه علوم انسانی، ۱۳۸۹.
- یونسی، ابراهیم. هنر داستان نویسی. انتشارات نگاه، ۱۳۸۸.